গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদন

(১ম খন্ড)

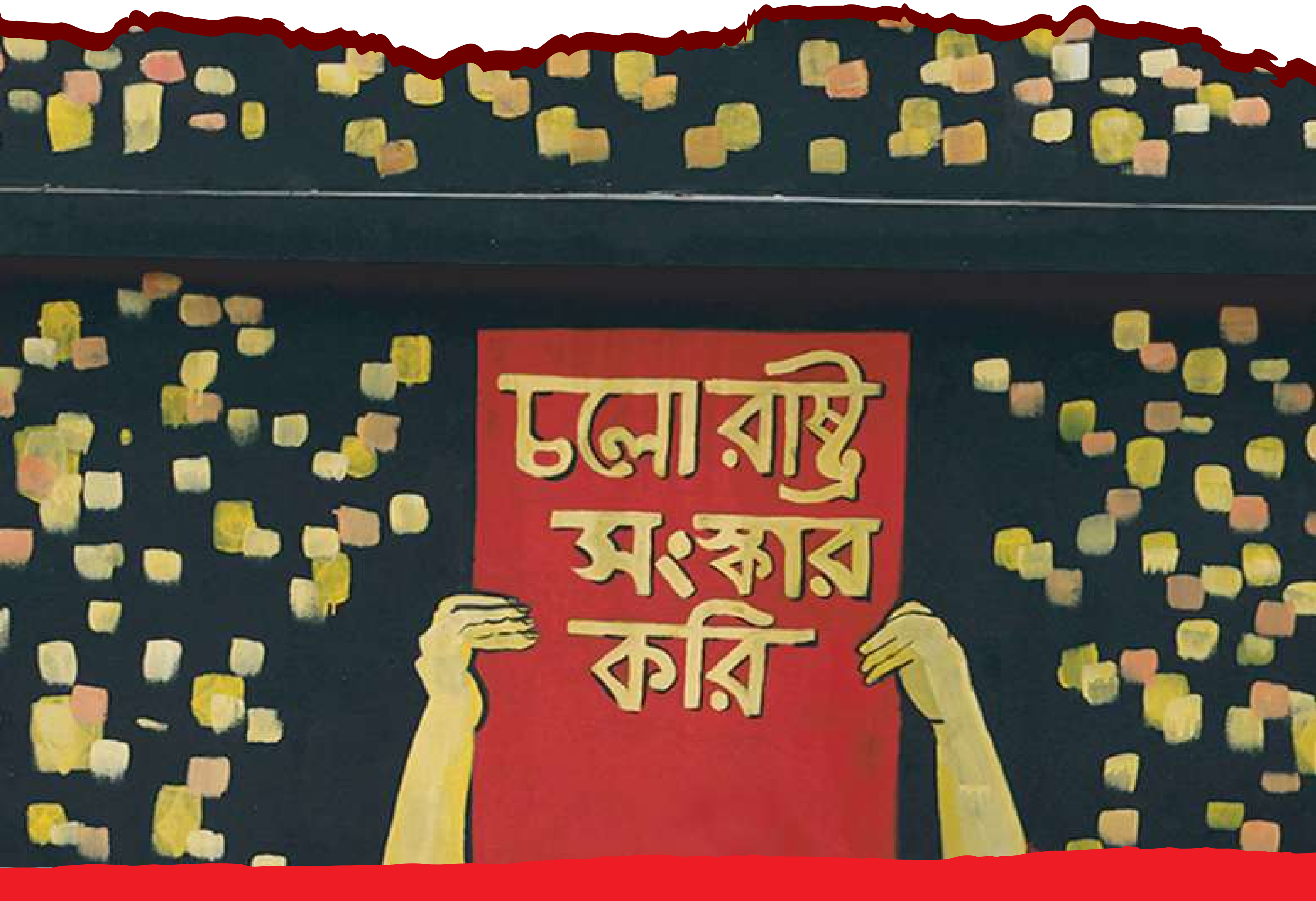

এপ্রিল ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদন
(১ম খন্ড)

এপ্রিল ২০২৫

প্রকাশক

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ

চব্বিশের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ব্যবহৃত গ্রাফিতি চিত্র আলোকে

মুদ্রণ সমন্বয়

মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

বর্ণ বিন্যাস

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাঁধাই

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

উৎসর্গ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সকল শহীদ, আহত এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত

সারা বাংলার সকল বারুদ ধারণ করেছে এক সাঈদের বুক
সকল তরুণের হৃদ ক্যানভাসে আজ এক সাঈদের মুখ।
সাঈদ এখন অনাগত দিনের কোটি তরুণের হৃদ স্পন্দন
সাঈদ এখন মুক্তিকামী কোটি তরুণের বিজয় কেতন।

তোফায়েল আহমেদ
২১ জুলাই, ২০২৪

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের শুভেচ্ছা বার্তা

জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সুসংহত একটি গণতান্ত্রিক ও স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মান এবং অব্যাহত সুশাসন, সেবা ও উন্নয়নের টেকসই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য স্থানীয় সরকার ও শাসন ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে দক্ষ ও একটি সেবামুখী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পথে আইন, কাঠামো এবং চর্চাগত নানা বাধা-বিপত্তি রয়েছে। এ ব্যবস্থা কিছুটা আমাদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, আর বেশীর ভাগই চর্চা ও সংস্কৃতিগত অমনোযোগীতা ও উদাসিনতা।

জুলাই গণঅভূত্থানের পর এসব বাধা অপসারণ করে অন্যান্য বিষয়ের মতো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে নতুন বাংলাদেশের উপযোগী করে বিশ্বমানে উন্নীত করার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সে সুযোগ গ্রহণ করে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন জাতির ভবিষ্যত পথ নির্মাণের ও স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানা বিষয় যথা স্থানীয় সরকার আইন, কাঠামো, কার্য, অর্থ, নারী পুরুষের সর্বজনীন অংশগ্রহণ, পার্বত্য অঞ্চলসহ সারা দেশের সকল জাতি গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ, নতুন প্রতিষ্ঠানিক চর্চা এবং পুরানো প্রথা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংস্কারের রুপরেখাসহ অনেক গুলো মৌলিক আইনের খসড়াও তৈরি করে দিয়েছে।

আমি আশা করি দেশের নাগরিক সমাজ স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনসহ এগারোটি কমিশনের সুপারিশসমূহ গভীরভাবে বিবেচনা করবে, যা আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশকে গড়ার পথে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থাকবে।

আমি স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধান প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ-সহ সকল সদস্যদের তাদের এ অমূল্য অবদানের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আশা করি দেশ ও জাতি এ দলিলের সর্বোত্তম ব্যবহার করে প্রভুত সফলতা অর্জন করবে।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস
প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নামে

মাননীয় কমিশন প্রধানের ভূমিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রত্যাশা ও স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী একটি অশুভ শক্তি দেশের গণতন্ত্র ও সকল গণতান্ত্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে পুরো জাতিকে এক কালো গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল। জুলাই ২০২৪ এর অভ্যুত্থানের পর পুনরায় এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নে জাতি জেগে উঠেছে। সে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান সিঁড়ি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নানামুখি সংস্কার।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জনগণের দোড়গোড়ার সরকার। এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে কার্যকর ছিল না। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কারকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে এ বিষয়ে সংস্কারের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছেন।

এ কমিশনে অংশগ্রহণ করে জাতীয় দায়ীত্ব পালনের সুযোগ প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমরা এটিকে গতানুগতিক সরকারি কাজের কোনো দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করিনি। এটি আমাদের কাছে ছিল পবিত্র ইবাদতের অংশ। বরং সকল ঐকান্তিকতা, প্রচেষ্টা ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা অতি অল্প সময়ে এ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি তা আমাদের বিচার্য নয়, তবে জাতি ব্যর্থ হবে না। জাতি প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পুর্ণ সফলকাম হবে।

কমিশন প্রণীত প্রতিবেদনকে দুটি অংশে ভাগ করে দুইটি পৃথক খন্ড প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম অংশে সরসরি স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত তেরোটি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অংশে বিবিএস পরিচালিত জরিপসহ আরো ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্নক অধ্যায়গুলোর আলোকে একীভূত স্থানীয় সরকার আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। সে খসড়াটি “স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ ২০২৫” নামে প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূল বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ প্রতিবেদনের প্রথম খন্ডে এবং বিভিন্ন অধ্যায়ের সুপারিশের আলোকে তিনটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও পার্বত্য তিনটি জেলা পরিষদের তিনটি আইনের সংশোধনীর খসড়া প্রস্তাব পৃথকভাবে দ্বিতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া অন্য তিনটি আইন হচ্ছে স্থানীয় সরকার কমিশন আইন/অধ্যাদেশ ২০২৫, জাতীয় ভৌত অবকাঠামো ও ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২৫ ও পার্বত্য তিন জেলা পরিষদ আইনের তিনটি সংশোধনী।

তবে দীর্ঘদিনের প্রচলিত অভ্যাস ও প্রতিষ্ঠিত প্রথাগত প্রতিবদ্ধকতাসমূহ পরিবর্তনে অনেকের অনাগ্রহ থাকে এবং নতুন বিষয় সহজে গ্রহণের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক জড়তা ও দ্বিধা-দ্বন্দ থাকে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশে তৃণমূল থেকে উন্নততর গণতান্ত্রিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ার পথে এ কমিশনের নানা সুপারিশ দেশে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করবে।

স্থানীয় সরকার কমিশনসহ অপর ১০টি কমিশনের সুপারিশসমূহ দেশের সকল মহলের সুবিবেচনা লাভ করুক এবং মহান আল্লাহর কাছে এদেশে অর্থবহ একটি সমতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসন, ন্যায়বিচার ও সুশাসনের রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, এ প্রার্থনা করি।

অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ
কমিশন প্রধান
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন - সদস্যবৃন্দ

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

আবদুর রহমান
সদস্য এবং
অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

ড. মাহফুজ কবীর
সদস্য এবং
পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল
এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, রমনা, ঢাকা

মাশহুদা খাতুন শেফালী
সদস্য এবং
নির্বাহী পরিচালক, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র,

ড. মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম
সদস্য এবং
অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

ড. কাজী মারুফুল ইসলাম
সদস্য এবং
অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইলিরা দেওয়ান
সদস্য এবং
লেখক ও মানবাধিকার কর্মী

ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান
সদস্য এবং
অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

১ম খণ্ড

প্রথম অংশ

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
	সুপারিশমালার সংক্ষেপ	i - xvi
অধ্যায়-এক	স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন গঠনের পটভূমি, গঠন ও কর্মপরিধি	০১-১১
অধ্যায়-দুই	পূর্বতন সকল স্থানীয় সরকার কমিশন ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে গঠিত কমিশনের সুপারিশসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা	১২-২৯
অধ্যায়-তিন	জাতীয় রাষ্ট্র ও স্থানীয় রাষ্ট্র: বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ	৩০-৪০
অধ্যায়-চার	বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সংগঠন ও আইন: সংস্কারের পথচিত্র	৪১-৭১
অধ্যায়-পাঁচ	একীভূত আইনী কাঠামোর যৌক্তিকতা ও একটি আইনের খসড়া	৭২-৭৪
অধ্যায়-ছয়	স্থানীয় সরকার নির্বাচন	৭৫-৮২
অধ্যায়-সাত	নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা: সংগঠন, কাঠামো ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুপারিশ।	৮৩-১০৮
অধ্যায়-আট	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অর্থায়ন	১০৯-১৫৮
অধ্যায়-নয়	পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের জাতিগোষ্ঠীবান্ধব স্থানীয় সরকার	১৫৯-১৭৬
অধ্যায়-দশ	গ্রামীণ বিরোধ নিষ্পত্তি: উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ আদালত স্থাপন, গ্রামীণ সালিশ ও এডিআর এর সংযোগ স্থাপন	১৭৭-১৮৮
অধ্যায়-এগারো	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নারী	১৮৯-২০৪
অধ্যায়-বারো	স্থানীয় সরকার কমিশন	২০৫-২১০
অধ্যায়-তেরো	স্থানীয় সরকার সার্ভিস	২১১-২১৮

দ্বিতীয় অংশ

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
অধ্যায়-চৌদ্দ	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পুনর্গঠন: মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সরকারি দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহের সংস্কার একত্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার সংস্থা, সমবায় ও এনজিও কর্মের সংযোগ ও সমন্বয়।	২১৯-২৭০
অধ্যায়-পনেরো	পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন ও জবাবদিহি নিশ্চিতের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর স্থাপন	২৭১-২৮১
অধ্যায়-ষোলো	জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের রূপরেখা (ভূমি ব্যবহার আইন)	২৮২-২৯০
অধ্যায় সতেরো	**বিবিধ বিষয়-**	২৯১-৩০৬
	• দুর্নীতি প্রতিরোধ ও মানবাধিকার রক্ষায় স্থানীয় সরকার	২৯১-২৯৪
	• স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দের সমিতি/এসোসিয়েসন	২৯৪-২৯৬
	• সামাজিক নিরাপত্তা	২৯৭-৩০৫
	• জাতীয় বিকেন্দ্রায়ন নীতি প্রণয়ন	৩০৫
	• স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তকরণ	৩০৬
	• স্থানীয় সরকার দিবস	৩০৬
	• জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন	৩০৬
অধ্যায়-আঠারো	বিবিএস পরিচালিত জাতীয় জরিপের ফলাফল	৩০৭-৩২৩
	উপসংহার	৩২৪
	গ্রন্থপঞ্জি	৩২৫-৩২৭
	সুপারিশ বাস্তবায়নে অনুসরণীয় পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া	৩২৮-৩২৯
সারণি তালিকা	১.১: মতবিনিময় সভাসমূহের তালিকা	৭-৮
	১.২: রাজনৈতিক দলের নিকট পত্র প্রেরণের মতামত গ্রহণের তালিকা	৯-১০
	১.৩: স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন কর্তৃক অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে জনমত সংগ্রহের চিত্র (মাধ্যম: ই-মেইল, মতামত ফরম সংগ্রহ, ওয়েবপোর্টাল, হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসেঞ্জার প্রভৃতি	১০
	১.৪: কৃতজ্ঞতা স্বীকার	১০
	১.৫: কমিশনের সাথে সংযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	১১
	৩.১: স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানীয় সরকার ইউনিটের কার্যাবলি	৩৭-৩৮
	৪.১: বিরাজিত ইউনিয়ন পরিষদের জনসংখ্যার অসমতার চিত্র	৪৫-৪৬

৪.২: জেলা পর্যায়ে প্রস্তাবিত হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ ৬৪-৬৫
৬.১: জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনী ব্যয় (২০১১-২০২৪) ৭৯-৮০
৮.১: জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় সরকারে অর্থায়ন ১১৩
৮.২: স্থানীয় সরকারে অর্থায়ন বাজেট ও জিডিপি'র অংশ (শতাংশ) ১১৩
৮.৩: কয়েকটি দেশে স্থানীয় সরকারসমূহে সরকারের আর্থিক অংশীদারিত্ব ১১৫
৮.৪: বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পের বিভিন্ন উদাহরণ ১১৬
৮.৫: স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে আরোপনীয় বিভিন্ন ধরণের করের তালিকা ১১৭-১১৮
৮.৬: কয়েকটি পৌরসভার স্থানীয় রাজস্ব আয় ও মোট ব্যয়ের হিসাব ১১৮-১১৯
৮.৭: কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় রাজস্ব আয় ও মোট ব্যয়ের হিসাব ১১৯-১২০
৮.৮: কয়েকটি উপজেলা পরিষদের স্থানীয় রাজস্ব আয় ও মোট ব্যয়ের হিসাব ১২০
৮.৯: কয়েকটি জেলা পরিষদের স্থানীয় রাজস্ব আয় ও মোট ব্যয়ের হিসাব ১২১
৮.১০: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা স্থানীয় রাজস্ব ও মোট ব্যয়ে স্থানীয় রাজস্বের অংশ ১২১
৮.১১: সিটি কর্পোরেশনসমূহের প্রাপ্তির উৎস ১২৪
৮.১২: স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে আরোপীয় বিভিন্ন ধরণের কর-বর্হিভূত আয়ের উৎস তালিকা ১২৫-১২৬
৯.১: পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণনার একটা তুলনামূলক চার্ট (১৯৭২-১৯৯১) ১৬২
৯.২: পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমিতি বিশ্লেষণ: জনগণনা ২০১১ ও ২০২২ ১৬৩
৯.৩: পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার তথ্যচিত্র ১৬৩
৯.৪: ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী সমতলের জাতিগোষ্ঠীগুলোর পরিসংখ্যান ১৭২-১৭৬
১৩.১: বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অর্পিত কার্যাবলির তুলনায় মানব সম্পদ ২১২-২১৩
১৩.২: স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ২১৫
১৭.১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ২৯২
১৭.২: গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ৩০০
১৮.১: দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সমর্থন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩০৯
১৮.২: নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি প্রবর্তন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩০৯
১৮.৩: নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১০
১৮.৪: নির্বাচনে প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১১
১৮.৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১১
১৮.৬: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অভিন্ন আইন প্রণয়ন করা উচিত মনে করেন (উত্তরদাতাদের %) ৩১২
১৮.৭: উপজেলা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনাবিদের কার্যালয় থাকার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত(উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৩
১৮.৮: স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৩
১৮.৯: স্থানীয় সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের সময়সূচি সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৪
১৮.১০: স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৪
১৮.১১: গ্রাম আদালত ব্যবস্থার কার্যকারিতা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৫
১৮.১২: উপজেলা পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত পুনরায় প্রতিষ্ঠা সমর্থন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৬

১৮.১৩: দুর্বল পৌরসভাগুলোতে যাচাই-বাছাই করে বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৬
১৮.১৪: পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা পরিষদ নির্বাচন আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত সংক্রান্ত মতামত(উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৭
১৮.১৫: আগামী দিনে পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন আয়োজন সংক্রান্ত মতামতের জেলাভিত্তিক বিন্যাস (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৮
১৮.১৬: পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা পরিষদে নির্বাচনের সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৮
১৮.১৭: পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৮
১৮.১৮: পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩১৯
১৮.১৯: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিষেবাগুলো গ্রহণের জন্য অনলাইনে আবেদন ও অভিযোগ জানানোর সুযোগ সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩২০
১৮.২০: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করার পর সন্তুষ্টি/অসন্তুষ্টি অনলাইনে প্রকাশ সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩২০
১৮.২১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা এবং পরিসংখ্যান জনগণের জন্য উন্মুক্ত এবং অনলাইনে মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া উচিত সংক্রান্ত মতামত(উত্তরদাতাদের শতাংশ) ৩২১
১৮.২২: মূল নির্দেশকগুলোর সহগ ৩২২-৩২৩

ছক তালিকা

৪.১: ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো ৪৭
৪.২: জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো ৪৮
৪.৩: ইউনিয়ন পরিষদের কমিটিসমূহ ৫৭
৪.৪: ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা কার্যক্রম ৫৮
৪.৫: ইউনিয়ন পরিষদের স্বাস্থ্য কার্যক্রম ৫৯
৪.৬: ইউনিয়ন পরিষদের বাজার ব্যবস্থাপনা ৫৯
৪.৭: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমাজসেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণে ইউনিয়ন পরিষদ ৬০
৪.৮: ইউনিয়নে কর্মরত এনজিও'দের সাথে কর্ম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ৬১
৪.৯: প্রস্তাবিত জেলা পরিকল্পনা বই এর কাঠামো ৬৭
৪.১০: খাতভিত্তিক বিশেজ্ঞ দল ও বিষয়ভিত্তিক জেলা পরিকল্পনা ৬৮
৪.১১: জেলা পরিকল্পনা ব্যবস্থা ৭০
৪.১২: প্রস্তাবিত জেলা পরিকল্পনা বই-এর কাঠামো ৭১
৪.১৩: জেলা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ম্যাট্রিক্স ৭১
৬.১: একই তফসিলে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর নির্বাচন ব্যবস্থা ৮১

২য় খণ্ড ০১-১৬৫

আইনসমূহের তালিকা

১। স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫
২। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০২৫
৩। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০২৫
৪। বান্দরবান জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫
৫। রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫
৬। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন
সুপারিশমালার সারাংশ

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধান প্রধান ৬০টি সুপারিশ নিম্নে প্রদত্ত ছকে যৌক্তিকতাসহ প্রতিবেদনের সারাংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এ ৬০টি প্রধান সুপারিশকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। যেমন, সারাংশে সন্নিবেশিত সুপারিশ নং- ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হলে মূল প্রতিবেদনের অধ্যায় ৩, ৪ ও ৫-এর প্রায় ৫০ এর অধিক সুপারিশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এভাবে ১৮টি অধ্যায়ে এ প্রতিবেদনের প্রতিটি অধ্যায়ে গড়ে ১০টি করে ধরা হলে প্রায় ১৮০টি সুপারিশ রয়েছে। এই ১৮০টি সুপারিশ থেকে আলাদা করে প্রধান প্রধান ৬০টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

স্থানীয় সরকার সংগঠন ও আইন

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
১.	গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তিনটি স্তর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এবং নগর স্থানীয় সরকারের দুইটি প্রতিষ্ঠান পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন বহাল থাকবে।	এই মূহুর্তে বিরাজিত স্তর কাঠামোতে পরিবর্তন কাম্য নয়। তবে দীর্ঘ মেয়াদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্তর বিন্যাস ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস করার বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন হবে।
২.	স্থানীয় সরকারের ৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠান, যথা: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের জন্য একটি সহজ, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমজাতীয় গণতান্ত্রিক সাংগঠনিক কাঠামোতে রূপান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কাঠামোসমূহের পাঁচটি ছক প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হলো। এই কাঠামোগুলো নতুন অধ্যাদেশ প্রণয়ন সাপেক্ষে অবিলম্বে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যায়। এ লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশের খসড়া ও মূল প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে (পাঁচটি ছক শেষে সংযুক্ত করা হলো)। (অধ্যায়- তিন, চার ও পাঁচ)	• এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংগঠনসমূহ অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, দক্ষ ও কার্যকর হবে। • নির্বাচন পদ্ধতি সহজতর হবে। • জবাবদিহিতা সুনির্দিষ্ট হবে।
৩.	স্থানীয় সরকারের ৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠান, যথা: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এ প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃথক পাঁচটি আইন রয়েছে। রয়েছে শতাধিক অধঃস্তন আইন, অসংখ্য বিধি ও প্রজ্ঞাপন। এই আইনের জঞ্জাল স্থানীয় সরকার কার্যকরের একটি প্রধান বাঁধা, তাই কমিশন এই ৫(পাঁচ)টি আইনকে একটি সমন্বিত আইনে একীভূত করার সুপারিশ করছে। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি একক আইন হতে পারে। এ আইনটির খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। আইনটির শিরোনাম হতে পারে- “স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ ২০২৫”। (অধ্যায়- তিন, চার, পাঁচ ও খসড়া অধ্যাদেশের জন্য দ্বিতীয় খন্ড দেখুন)	পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে অধ্যাদেশ আকারে জারি করা যাবে।
৪.	এই একীভূত আইনটি অধ্যাদেশ আকারে জারি হলে একটি একক তফসিলে ৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন একসাথে করা সম্ভব হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।	একই তফসিলে নির্বাচন করা সম্ভব হলে নির্বাচনী ব্যয় এক-চতুর্থাংশে নেমে আসবে। নির্বাচনে জনবল নিয়োগ ১৯ লাখ থেকে ৯ লাখে, সময় ২২৫ দিনের পরিবর্তে ৪৫ দিনে নেমে আসবে এবং পাঁচ বছরে

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	(অধ্যায়- ছয়)	একবার শুধু একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রয়োজন হবে।
৫.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনটি সরকার একটি সুবিধাজনক ও যৌক্তিক সময়ে অনুষ্ঠিত করতে পারে। তবে একক তফসিলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে একটি অধ্যাদেশ বা আইনের মাধ্যমে বিরাজিত সকল স্থানীয় সরকার সংস্থা বিলুপ্ত করতে হবে।	একটি নতুন আইন/অধ্যাদেশ পাশ হবে। সে আইন/অধ্যাদেশের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে।
৬.	ইউনিয়ন পরিষদের জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে ওয়ার্ডের সংখ্যা পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের জনসংখ্যা সর্বোচ্চ ৪,৭৫,০০০ থেকে সর্বনিম্ন প্রায় ৫,০০০ জনগোষ্ঠী পর্যন্ত বিস্তৃত। এক্ষেত্রে ওয়ার্ডের সীমানা ও জনসংখ্যা পুনঃনির্ধারণ ব্যতীত ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। তাই প্রতিটি ওয়ার্ডে জনসংখ্য ১,২০০-১,৫০০ জন ধরে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ সর্বনিম্ন ৯টি থেকে সর্বোচ্চ ৩৯টি পর্যন্ত ওয়ার্ড হতে পারে। এ বিষয়টিকে মূল্যায়ন করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আশু উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। (অধ্যায়- তিন ও চার)	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা বৃদ্ধি কাম্য নয়। তাতে সরকারি ব্যয় বাড়ে। কিন্তু সেবা বাড়ে না। জনসংখ্যা অনুপাতে ওয়ার্ড ও বাজেট বাড়িয়ে সে সমস্যা সমাধান করা যায়।
৭.	উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচনের সুবিধার্থে উভয় পরিষদের ওয়ার্ড পদ্ধতি কার্যকর করার সুপারিশ করা হলো। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদের তিনটি ওয়ার্ড হিসেবে পরিগণিত হবে এবং একটি উপজেলা জেলা পরিষদের তিনটি নির্বাচনী ওয়ার্ডে বিভক্ত হতে পারে। (অধ্যায়- তিন ও চার)	উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সুনির্দিষ্ট ওয়ার্ড সৃষ্টি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে। জনগণ সরাসরি উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদে সদস্য নির্বাচিত করতে পারবে।
৮.	ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে $\frac{১}{৩}$ (এক তৃতীয়াংশ) ওয়ার্ড নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে এবং তা ঘুর্ণায়মান পদ্ধতিতে তিনটি নির্বাচনে একটি সংস্থার সকল ওয়ার্ডের নির্বাচন সম্পূর্ণ হবে। এ ঘূর্ণায়মান নারীর সংরক্ষিত ওয়ার্ড ব্যবস্থা আগামী তিন নির্বাচনের পর পুনর্মূল্যায়ন হতে পারে। (অধ্যায়- তিন, চার ও এগারো)	এ্যাডভোকেট রহমত আলী কমিশন ১৯৯৭ এর সুপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষিত ৩টি নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার আইন (ইউনিয়ন পরিষদ) এর দ্বিতীয় সংশোধনের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে ১৯৯৭ সালে ৪৫,০০০ নারী ৪,২৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিযোগিতা করে ১২,৮২৮টি আসনে নির্বাচিত হন। কিন্তু সংরক্ষিত নারী আসনের সঙ্গে তিনটি সাধারণ আসন সাংঘর্ষিক হওয়ায় এই বিধানটি বিগত ২৭ বছর যাবত অকার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি-২০০৭ সালে এই ব্যবস্থাটি পর্যালোচনা করে এই বিধানটির পরিবর্তে মোট ওয়ার্ড সংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করার সুপারিশ করে। এই সুপারিশ মোতাবেক স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ), নগর স্থানীয় সরকার পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ২০০৭ এ ৪০ ভাগ আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হলেও অদ্যাবধি তা

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
		বাস্তবায়ন করা হয় নাই।
৯.	স্থানীয় সরকার (ইউনয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এ ৬৩ ধারার অধীন তৃতীয় তফসিলে ৭টি মন্ত্রণালয়ের ৯টি অধিদপ্তরের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর (ট্রান্সফার) করার কথা। কিন্তু অদ্যাবধি ঐ অধিদপ্তরগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারি হস্তান্তরিত হয়নি। অবিলম্বে এই ৯টি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করার সুপারিশ করা হলো। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে। (অধ্যায়- তিন ও চার)	৭টি মন্ত্রণালয়ের ৯টি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের অফিস ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে শূন্য পড়ে আছে। স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানও ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়টি ২০০৯ সন থেকে বিভিন্ন পর্যায় থেকে দাবি আকারে পেশ করা হয়েছে।
১০.	স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ধারা ২৪-এর অধীন তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী সরকারের উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত ১৭টি দপ্তরের কার্যাদি, জনবল ও অর্থ পরিষদের তহবিলে হস্তান্তর করার বিধান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন অসামঞ্জস্য বা সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের স্থায়ী কমিটি করা আছে। বর্তমানে দৃশ্যতঃ দপ্তর স্থানান্তরিত হলেও কার্য ও অর্থ উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়নি। ফলে উপজেলা পরিষদ প্রকৃত অর্থে অকার্যকর। অবিলম্বে এ বিষয়ে অর্থ, জনবল ও কার্যাদি সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তরের সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- তিন, চার ও পাঁচ)	উপজেলা পরিষদে বর্তমানে কার্যত: কোন প্রশাসনিক জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রায় ৫০ শতাংশ চিকিৎসক নিয়মিতভাবে অনিয়মিত। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রায় ৪০ শতাংশে প্রধান শিক্ষকবিহীন এবং বিদ্যালয়সমূহে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কোনো পদ নেই। মন্ত্রিপরিষদের বিভাগের ঐ কমিটি অবিলম্বে বিষয়টি মূল্যায়ন করে দেখতে পারেন।
১১.	২০০০ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত জেলা পরিষদ একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ সদৃশ প্রতিষ্ঠান। এখানে জেলায় কর্মরত উন্নয়ন ও সেবামূলক দপ্তর-অধিদপ্তরের সাথে জেলা পরিষদের কোন সংযোগ নেই। অপরদিকে, ব্যাপক কারচুপির নির্বাচনের কারণে জনগণের সাথেও জেলা পরিষদের কোন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি। জেলা পরিষদ পুনর্গঠনের ব্যাপারে কমিশনের অনেক সুপারিশ রয়েছে। তন্মধ্যে দুটি প্রধান সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে। ক) পার্বত্য তিন জেলা পরিষদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমতলের সকল জেলায় কর্মরত সরকারি বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরগুলোর কার্য (Function), জনবল (Functionary), অর্থ (Fund) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা, এবং খ) জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ ও জেলা বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির একটি রূপরেখা এ প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের আইনি উদ্যোগ নেয়া। (অধ্যায়- তিন ও চার)	জেলা পরিষদকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার এটি একটি প্রধান পদক্ষেপ। একটি জেলায় জাতীয় সরকারের কাজ ও অর্থ ব্যয়ের একটি সামগ্রিক চিত্র জাতি দেখতে পাবে। জেলায় একটি আনুভূমিক পরিকল্পনা হওয়ার কারণে জেলাভিত্তিক অনেক কাজ জাতীয় সরকারকে করতে হবে না।
১২.	দেশের সমতলের ৬১টি জেলায় একটি সমন্বিত জেলা পরিকল্পনা কাঠামো ও জেলা বাজেট প্রণয়ন করে জেলার সকল সরকারি ব্যয় দৃশ্যমান করতে হবে (অধ্যায়-চার)।	

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কার্যাবলীর পুনর্গঠন		
১৩.	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম ও তার অধীনে পরিচালিত দুইটি বিভাগের কার্যাবলি ও কাঠামো পরিবর্তন করা হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের (MOLGRDC) পরিবর্তে মন্ত্রণালয়ের নামকরণ **'স্থানীয় সরকার, জনসংগঠন ও জনপ্রকৌশল সেবা'** (Ministry of Local Government, Public Institutions and Public Services Engineering(MOLGPI & PSE) মন্ত্রণালয় করা যেতে পারে। উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি বিভাগ থাকবে- (১) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পরিবর্তে বিভাগের নাম **"স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ"** (Local Government and Public Institution Division) এবং (২) স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিবর্তে **'জনপ্রকৌশল সেবা বিভাগ'** (Public Service Engineering Division)।	● মন্ত্রণালয়কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও স্মার্ট মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করা যাবে। ● মন্ত্রণালয়ের অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌক্তিকীকরণ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিমুখি হবে।
	"স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ" (Local Government and Public Institution Division) স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি) প্রশাসন ও উন্নয়ন তত্ত্বাবধান সংশ্লিষ্ট কার্যাদি; স্থানীয় শাসন ও সেবা প্রদানকে শক্তিশালী করা; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্থাপন ও প্রশাসনিক বিষয়াবলি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন, দেশের সমবায়, পল্লী উন্নয়ন ও সকল সমষ্টিক উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল তথা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং সমবায় সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন করবে। **"জনপ্রকৌশল ও সেবা বিভাগ"** (Public Service Engineering Division) মূলত এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও দেশের সকল ওয়াসা কার্যালয়সমূহের কার্যাদি, বড় ও মাঝারি শহরের অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরের বাইরের সারাদেশের ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ভূমি ব্যবহার আইন বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান, পল্লী এলাকার ব্রিজ, কালভার্টসহ সড়ক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি; গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি সহায়তা, পানি, স্যানিটেশন এবং শিক্ষার জন্য নীতি বাস্তবায়ন	● অপ্রয়োজনীয় অনেক বিষয় কাটছাট হবে। ● প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় যুক্ত হবে। ● নতুন একটি অধিদপ্তর যুক্ত হবে এবং পুরনো চারটি সংস্থা দুইটি সংস্থায় একীভূত হতে পারে।

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	করবে।	
১৪.	স্থানীয় সরকার, সমবায় ও অন্যান্য তৃণমূল জন-সংগঠন যাতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগে স্থানান্তর করার সুপারিশ করছে। (অধ্যায়-চৌদ্দ)	এনজিও যেহেতু জনসংগঠন তার ব্যবস্থাপনা স্থানীয় সরকার ও জনসংগঠন বিভাগের আওতাধীন হওয়া সমীচীন।
১৫.	সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবিকে একটি একক সংগঠনে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। (অধ্যায়-চৌদ্দ)	• সরকারের ব্যয় কমবে এবং সমবায়ের কাজে গতিশীলতা আসবে। • দুইটি অধিদপ্তরের অসুস্থ প্রতিযোগিতা হ্রাস পাবে।
১৬.	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে কর্মরত দুটি প্রকৌশল অধিদপ্তর, যথা: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে একত্রিত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অভিন্ন ক্যাডার ''জন প্রকৌশল সেবা'' নামক একটি নতুন ক্যাডার সৃষ্টি করে তার অন্তর্ভূক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। (অধ্যায়-চৌদ্দ)	• প্রকৌশল সেবা সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য হবে। গ্রাম পর্যন্ত প্রকৌশল সেবার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। • গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুমোদিত নকশা ও পরিকল্পনা ছাড়া কোন পাকা স্থাপনা করা যাবেনা।
১৭.	গোপালগঞ্জ, জামালপুর, রংপুর, সিলেট প্রভৃতি জেলায় যেসব নতুন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেগুলোর অন্য কোনো বিকল্প ব্যবহারের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। (অধ্যায়-চৌদ্দ)	অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও প্রশাসনিক ঝামেলা হ্রাস পাবে। দীর্ঘ মেয়াদে এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের অর্থের অপচয় ঘটাবে।
১৮.	এনআইএলজি'র ব্যাপক পুনর্গঠন প্রয়োজন। এ প্রতিষ্ঠানটিকে সত্যিকারের একটি স্থানীয় সরকারের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বার্ড, কুমিল্লা ও আরডিএ, বগুড়া'র প্রাতিষ্ঠানিক মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। (অধ্যায়-চৌদ্দ)	প্রতিষ্ঠানটিকে একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয় না এটি কার্যকর কোনো প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি একটি কার্যকর একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যায়।
১৯.	সমবায় সেক্টরের জন্য সমবায়ীদের অর্থে একটি পূর্ণাঙ্গ তফসিলি ব্যাংক স্থাপনের সুপারিশ করা হলো। বর্তমান পল্লী উন্নয়ন বিভাগের অধীন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ও জাতীয় সমবায় ব্যাংককে এই নবগঠিত তফসিলি ব্যাংকের সাথে দায় দেনা অর্থ সম্পদ নিরূপন করে একীভূত করা যেতে পারে।	সমবায় সেক্টরের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক স্থাপন করতে সরকারের কোনো ভূর্তকির প্রয়োজন হবে না। শুধু সমবায়, এনজিও ও অন্যান্যদের মোবিলাইজ করতে হবে। আইনগতভাবে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, জাতীয় সমবায় ব্যাংক, বিআরডিবি'র পদাবিক ও এসএফডিপি এসব প্রতিষ্ঠানের পুঁজি ও সমবায় সমিতির পুঁজি একত্রিত করে নতুন একটি আইন কাঠামোর অধীন নেদারল্যান্ডের সমবায়ীদের রাবো ব্যাংক বা সুইজারল্যান্ডের সমবায়ীদের ব্যাংকো রাইফিসানের অনুরূপ একটি নতুন সমবায় ব্যাংক কাঠামো তৈরি করতে হবে। এ ব্যাংক অবশ্যই পেশাদার ব্যাংকার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।
২০.	এনজিও প্রতিষ্ঠান যারা ক্ষুদ্র ঋনদানের সাথে জড়িত তারাও এই ব্যাংকের অংশীদার হতে পারে।	
২১.	সারাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নের একটি ভাল সমবায় সমিতিকে এ ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংক নিয়োগের জন্য তৈরি করে নেয়া যেতে পারে।	
২২.	দেশের সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মালিকানার ২য় খাত সমবায়। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় খাত যথা পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরে ব্যাংক আছে কিন্তু সমবায় খাতে সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ কোনো ব্যাংক নাই। বর্তমানে সমবায়ের কোনো অর্থসংস্থানের সুযোগ নাই। কোনো সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক সমবায়কে ঋন দেয় না।	

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা		
২৩	জাতীয় ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা ও জাতীয় ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ আইন, ২০২৫ জারির সুপারিশ করা হলো। এই আইনের একটি খসড়া তৈরি করে সংযুক্ত করা হয়েছে। (অধ্যায়- ষোলো ও খসড়া আইনটি দ্বিতীয় খন্ডে দেখা যেতে পারে)।	দেশে ভূমি ব্যবহারের জন্য সর্বশেষ ও সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য পালনযোগ্য কোনো আইন নাই। তাই মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ভূমি ফ্রি স্টাইলে ব্যবহার চলছে। কিছু কিছু ভূমির ব্যবহারকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। নতুবা ১০/২০ বছর পর আবাদী জমি, বনভূমি, জলাভূমি, পাহাড় হাওড়, বাওড় বিলুপ্তি হয়ে যাবে। অপরদিকে গ্রাম শহর সর্বত্র অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণের লাগাম টেনে পরিকল্পিত ভাবে স্থাপনা নির্মাণ করে পানি প্রবাহ, পরিবেশ ইত্যাদি রক্ষা করতে হবে।
২৪.	প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ অনুসরনে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠন ও কার্যক্রম শুরু করা।	
২৫.	জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরে একটি ভৌত পরিকল্পনা ইউনিট স্থাপনসহ জেলা পর্যায়ের ভৌত পরিকল্পনা ইউনিট স্থাপন করা।	
২৬.	জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিলের সভা করে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি অধ্যাদেশ -২০২৫ অনুসরনে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি গঠন করা	
গ্রামীন বিরোধ নিষ্পত্তি ও উপজেলা আদালত		
২৭.	উপজেলা পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপন এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন সিনিয়র সহকারী জজ এর পদায়নের মাধ্যমে এডিআর আদালত স্থাপনের সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- দশ)	জেলার নিচে কোন আদালত না থাকার কারণে বিচার ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা সীমিত। তাই উচ্চ ও নিম্ন উভয় আদালতে মামলার জট অসহনীয়।
২৮.	সালিশ ব্যবস্থাকে এডিআর অফিসারের তত্বাবধানে ন্যস্ত করতে হবে। কোনো সালিশ আপোষ-মীমাংসা না হলে এডিআর অফিসার তার আপিল শুনবেন। এডিআর অফিসার সালিশ ব্যবস্থার তত্বাবধান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যতদিন পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ আদালত প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত গ্রাম আদালত ব্যবস্থা বহাল থাকবে। (অধ্যায়- দশ)	• গ্রামীণ সালিশ ব্যবস্থা গতিশীল হবে। • এডিআর কার্যালয়ের সাথে যুক্ত হওয়ায় সালিশ ব্যবস্থা জোরদার হবে। • গ্রামীণ সালিশকারদের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।
স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে অন্যান্য সেবা		
২৯.	ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদকে কার্যকরভাবে স্বাস্থ্য সেবার সাথে সংযুক্ত করার উপায় হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে অনুমোদিত জনবল যা আছে তা সম্পূর্ণভাবে পদায়ন করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে এবং এই দুই প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে জনবল ও সম্পদসহ হস্তান্তরিত হতে পারে। (অধ্যায়- চার)	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়নের এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অব্যবস্থা পুরা জাতির জন্য দূর্ভাগ্যজনক। শুধু বিরাজিত প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি কার্যকর করলে এ সমস্যার সুরাহা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করে একজন মহিলা চিকিৎসকসহ মোট তিনজন চিকিৎসককে পদায়ন করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র সরকার ইচ্ছা করলে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বেও(পিপিপি) চালাতে পারে।
৩০.	সাধারণভাবে দেখা গেছে, প্রায় সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি বড় সংখ্যক চিকিৎসক সংশ্লিষ্ট উপজেলা থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করে অন্যত্র সংযুক্তিতে নিয়োজিত। ঠিক একইভাবে ইউনিয়ন	• সংযুক্তিতে অন্যত্র নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব কর্মস্থলে ফিরিয়া আনা উচিত। • জরাজীর্ণ কেন্দ্রগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে এ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ করা।

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্রগুলোতে অনেক পদ শূন্য ও অবকাঠামো জরাজীর্ণ। এ দুটি বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এসব শূন্যতার পূরণ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের মধ্যে যেন পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে বিষয়ে সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- চার)	• কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সাথে একীভূত করার একটি নীতি গ্রহণ।
৩১.	প্রায় ১৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক-এর মধ্যে বেশিরভাগই প্রায় বন্ধ। তাই ভবিষ্যতে কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে সমস্ত জনবল, সেবা ও সরবরাহ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হতে পারে। (অধ্যায়- চার)	
৩২.	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে কোন এনজিও, দানশীল ব্যক্তি ও সংগঠন স্বেচ্ছায় সেবা ও সহায়তা দিতে চাইলে তা ব্যবহারের জন্য নীতিমালা দরকার। (অধ্যায়- চার)	এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সরকারি ব্যয় না করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো সচল হতে পারে। তবে প্রয়োজনীয় জনবল সরকারকে দিতে হবে।
৩৩.	দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়মূহে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কোনো পদ নেই। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের অধিকার প্রাপ্ত হতে পারে । (অধ্যায়-চার)	প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে।
৩৪.	ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সাথে উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সংযুক্তির একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। (অধ্যায়-চার)	ইউনিয়ন পরিষদ শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম জোরদার হবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি সচল হবে।
	স্থানীয় সরকারের অর্থায়ন	
৩৫.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ দ্বিগুণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। চলতি অর্থ বছরে অন্তত: জিপির এক শতাংশ স্থানীয় সরকারের ব্যয় বরাদ্দ জাতীয় বাজেট থেকে সংস্থান করার সিদ্ধান্ত নিন (অধ্যায়-আট)	বিভিন্ন উৎসের ও তদবিরভিত্তিক বরাদ্দ প্রথা উঠিয়ে দিতে হবে।
৩৬.	সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বাজেট কোড অনুযায়ী একীভূত বাজেট কাঠামো অনুসরণ করে বাজেট প্রণয়ন করা যেতে পারে। বাজেট কাঠামোর খসড়া মডেল কমিশন প্রতিবেদনে রয়েছে। (অধ্যায়- আট)	সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বাজেটে শৃঙ্খলা আসবে।
৩৭.	সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যেগুলো স্থানীয় সরকারের ভৌগলিক এলাকায় বাস্তবায়িত হয় সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের উপর ন্যস্ত করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে।	এখন উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চেয়ারম্যান কোথাও সরকারি কর্মকর্তা ও এমপি'র সাথে সমন্বয় করেন।

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
৩৮.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের সকল কমিটি থেকে এমপি অথবা এমপির প্রতিনিধির সদস্যপদ প্রত্যাহার করে দিতে হবে।	এ ব্যবস্থা বহাল থাকলে দুর্নীতি ও রাজনীতি দুটিই হতে থাকে।
৩৯.	স্থানীয় পর্যায়ে কর আদায়ের কর্তৃত্ব শুধু ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে অর্পণ করতে হবে। উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ নানা ফি ও সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারলেও কর আদায়ের অধিকারী হবে না। (অধ্যায়- আট)	বর্তমানে উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদও কর আদায় করে। সকল উপজেলা ও জেলা পরিষদকেই কোনো না কোনো ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত। সুতরাং করের দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।
৪০.	মডেল কর তফসিল হালনাগাদ করতে হবে। খসড়া হালনাগাদকৃত মডেল কর তফসিল কমিশন ইতোমধ্যে প্রস্তুত করেছে। (অধ্যায়- আট)	বিগত এক দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন হয়েছে তেমনি গ্রাম ও শহর উভয় এলাকারই মূল্য সূচক অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ কর, ফি ও চার্জের হার একই থাকায় সম্ভাবনার তুলনায় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব অনেক কম অর্জিত হয়েছে।
৪১.	মধ্য মেয়াদে বিএমডিএফ-এর সংস্কার করে স্থানীয় সরকার ট্রাস্ট ফান্ডে (এলজিটিএফ) রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এ তহবিল শুধু পৌরসভা নয় অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সবার দান-অনুদান স্থানীয় সরকার ট্রাস্ট ফান্ডে জমা হবে এবং নিয়মানুযায়ী সকল স্থানীয় সরকার সংস্থা এ তহবিল ব্যবহার করতে পারে। (অধ্যায়- আট)	বিএমডিএফ-এর তহবিল সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে যাতে করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদসহ পার্বত্য অঞ্চলের পরিষদসমূহও এখান থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন করতে পারে। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এ ট্রাস্ট ফান্ডে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের রাজস্ব আয়ের/উদ্বৃত্তের একটি নির্ধারিত অংশ জমা করবে। প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন করতে পারবে।
৪২.	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পরিবেশ কর ও পর্যটন কর আরোপের উদ্যোগ নিতে হবে। বেসরকারি/ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য স্থানীয় সরকারকে কর দিতে হবে। করের হার নির্ধারণে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করতে সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- আট)	পরিবেশ করের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমবে। আদায়কৃত করের অর্থ দিয়ে পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় গৃহীত প্রকল্পে অর্থায়ন করা যাবে। পর্যটন কর থেকে আহরিত অর্থের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজ নিজ এলাকায় পর্যটনের সুবিধা ও অবকাঠামো উন্নয়ন করবে, বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো সংরক্ষণ করবে যাতে করে পর্যটনকে ঘিরে জনসমাগম বৃদ্ধি পায় এবং নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। বেসরকারি উদ্দ্যেগে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে বাণিজ্যিক ও নিজস্ব ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পানি সরবরাহ হচ্ছে। এ কর্মকাণ্ডে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে বাংলাদেশের পানি ব্যবহার নীতিমালারও ব্যত্যয় ঘটে।
৪৩.	হাটবাজারসহ স্থানীয় সম্পদ থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্য ইজারা আয়ের মূল্যায়ন করতে হবে এবং সকল হাটবাজারের যথাযথ নিবন্ধন করতে সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- আট)	দেশে প্রায় ৯,৩৫০টি হাটবাজার চালু হয়েছে কিন্তু সেগুলো নিবন্ধিত নয়। ইজারা মূল্য নির্ধারণে পেশাদার মূল্যায়ন পরিচালিত হয় না। ফলে হাট-বাজারগুলোর উন্নয়ন হয় না এবং এদের যেমন ইজারা হয় না, তেমনি স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার এ ইজারা মূল্যের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।
৪৪.	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অর্থায়নের সূচক (financing index) তৈরি করে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সস্তরে অর্থায়নের করতে সুপারিশ করা হলো।	বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থায়নের কোন সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নেই। রাজনৈতিক বিবেচনায়

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	(অধ্যায়- আট)	গৃহীত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনগুলোতে অর্থায়ন করা হয়। উপজেলায় এডিপি বরাদ্দের জন্য আয়তন ও জনসংখ্যাকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। অর্থায়নের এ গতানুগতিক ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কারণে একই স্তরের স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আর্থিক সক্ষমতা ও উন্নয়নে মধ্যে বিপুল বৈষম্য টিকে থাকছে।
৪৫.	জাতীয়ভাবে আহরিত মূসকের এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে বরাদ্দ করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে কেন্দ্রীয় সরকার আহরিত মোট রাজস্বের এক চতুর্থাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করতে সুপারিশ করা হলো । (অধ্যায়- আট)	স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে কম বরাদ্দ করলেও এক্ষেত্রে সমস্যা হবে না। স্থানীয় অবকাঠামো নির্মাণ স্থানীয় বরাদ্দ থেকে করা হবে।
	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তর	
৪৬.	প্রতিটি স্থানীয় পরিকল্পনা ও বাজেটের আর্থিক (financial) নিরীক্ষা, কর্মসম্পাদন (performance) নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষার জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হলো। এ অধিদপ্তরের নাম হবে 'স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর' (অধ্যায়- পনেরো)	যথাযথ নিরীক্ষার অভাবে প্রকল্পসমূহের গুণগত মান যেমন নিশ্চিত করা যায় না, তেমনিভাবে অনেক দুর্নীতি ও অর্থ অপচয়ের সুযোগ তৈরি হয়। আর প্রকল্পগুলো প্রয়োজনীয় ছিল কিনা, সামাজিক ও পরিবেশগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয় কিনা এবং স্থানীয় জনগণের উপকারে আসছে কিনা তাও জানা যায় না।
	পার্বত্য তিন জেলার স্থানীয় সরকার	
৪৭.	তিন পার্বত্য জেলার সরকারি ৩০টি দপ্তরের যাবতীয় কাজ, জনবল ও অর্থ তিন জেলা পরিষদের নিকট সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তর করতে হবে। আগামী অর্থবছরে (২০২৫-২০২৬) উল্লেখিত দপ্তরসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদগুলোর কাছে হস্তান্তর হলো কিনা তা জাতীয় সংসদে আলোচিত হতে পারে। (অধ্যায়- নয়)	সাধারণত ধরে নেওয়া হয়েছে যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে জেলা পর্যায়ের সরকারী ৩০টি দপ্তরের কাজ, জনবল ও অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিষদগুলোর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যায়, দৃশ্যতঃ কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও দপ্তরের বাজেট জেলা পরিষদের তহবিলে হস্তান্তর হয়নি। ফলে পরিষদসমূহ তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেনা।
৪৮.	তিন পার্বত্য জেলার সব ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভাগুলোকে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত করা ও এসব প্রতিষ্ঠানের বাজেট স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করার সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- নয়)	তিন পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন। তাই জেলার যেকোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গেলে সমন্বয়হীনতার কারণে সেসব উন্নয়ন কাজে দ্বৈততা সৃষ্টি হয় এবং টেকসই হয় না। তাই স্থানীয় সরকারের এ প্রতিষ্ঠানগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হস্তান্তর করে উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ অন্যান্য কাজে সমন্বয় আনতে হবে।
৪৯.	(ক) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ অবিলম্বে (২০২৫ এর মধ্যে) নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। (খ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য তিন জেলা পরিষদ আইনে সংশোধনী আনা আবশ্যক। আইনের যেসকল ধারায় সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা	১৯৮৯ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের দ্বারা প্রথম এবং শেষবার নির্বাচন হয়েছিল। এরপরে আর কোনো নির্বাচন হয়নি। যে দল ক্ষমতায় এসেছে সেই দলের মনোনীত ব্যক্তিদের দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করে জেলা পরিষদগুলো পরিচালনা

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	রয়েছে সেসব ধারাসমূহের সংশোধনীর প্রস্তাবনা সংযুক্ত করা হলো। (দ্বিতীয় খন্ড) (গ) জাতীয় নির্বাচনের ভোটার তালিকা নিয়ে এ নির্বাচন করা যেতে পারে। জেলা পরিষদ নির্বাচনটি হবে সংসদীয় পদ্ধতিতে এবং স্ব-স্ব জাতিসত্তার মানুষ স্ব-স্ব জাতির প্রতিনিধিদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন। এজন্য পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে সংশোধনী আনা আবশ্যক। সংশোধনীর একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। (অধ্যায়- নয়)	করা হয়েছে। ফলে দীর্ঘ তিন দশক ধরে মনোনীত দলীয় লোকদের দ্বারা পরিষদগুলো পরিচালিত হওয়ায় এগুলো দুর্নীতির আখড়া ও অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং এ প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৮৬ শতাংশ মানুষ পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন চায়। তাই এ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অতি দ্রুত সম্পন্ন করা দরকার।
৫০.	পার্বত্য জেলার তিন সার্কেল চীফগণকে জেলা পরিষদে স্থায়ী সদস্য পদে অন্তর্ভূক্ত করলে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। (অধ্যায়- নয়)	পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ২৬নং ধারায় বলা আছে- পরিষদের সভায় সার্কেল চীফগণের যোগদানের অধিকার আছে। কিন্তু এ ধারাটি বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক নয়। তাই সার্কেল চীফদের কখনো পরিষদের সভায় ডাকা হয় না। কিন্তু প্রথাগত নেতা হিসেবে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের একটা ভূমিকা থাকা আবশ্যক। পার্বত্য জেলার তিন সার্কেল চীফগণকে জেলা পরিষদে স্থায়ী সদস্য পদে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
৫১.	বাজার ফান্ড প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত করে বাজারগুলোকে মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা যেতে পারে। ইজারালব্দ অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে ৫০%, পৌর এলাকায় হলে পৌরসভা ৫০%, সার্কেল চীফ এর কার্যালয় ১০%, এবং সরকার ৪০% হারে পাবে। আর বাজার ফান্ডের কর্মচারিগণ জেলা পরিষদে আত্মীকৃত হবেন। (অধ্যায়- নয়)	বাজার ফান্ড জেলা পরিষদের অধীন। পরিষদসমূহ একদিকে সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ পায়, অন্যদিকে, বাজার ফান্ডের আহরিত অর্থও জেলা পরিষদ নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের হাট বাজারগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় হলেও চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির মাধ্যমে সেই অর্থ আত্মসাত হচ্ছে।
৫২.	পার্বত্য তিন জেলায় ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের আয়কর মওকুফ রহিত করে তা আদায় বহাল করার সুপারিশ করা হয়েছে। (অধ্যায়-নয়)	এ ভ্যাট মওকুফে পার্বত্য জেলার পাহাড়ি-বাঙালি কোন গরীব উপকৃত হয় না। একটি মধ্যস্বত্বভোগী এ অর্থে উপকৃত হয়।
	স্থানীয় সরকার সার্ভিস	
৫৩.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল কাঠামোকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সাম্যতার অধীন কার্যকর ব্যবস্থায় রূপান্তরের স্বার্থে একটি ‘‘স্থানীয় সরকার সার্ভিস’’ কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে। (অধ্যায়-তেরো খসড়া আইন দ্বিতীয় খন্ড)	স্থানীয় সরকারের কর্মরত জনবলের কোনো চাকরির নিশ্চয়তা নেই, নেই কোন একীভূত সার্ভিস কাঠামো। মেধা ও যোগ্যতার চেয়ে নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পায়। এ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হতে হবে।
	স্থানীয় সরকার কমিশন	
৫৪.	স্থায়ী ‘স্থানীয় সরকার কমিশন’ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করে এবং অতি সত্বর স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করে তাকে কার্যকর করার সুপারিশ করা হলো। এ মর্মে একটি অধ্যাদেশের খসড়া কমিশন প্রস্তুত করেছে। (অধ্যায়-বারো ও অধ্যাদেশের খসড়া দ্বিতীয় খন্ডে দেখুন)	১। স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইন-কানুন, বিধি-বিধান ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ইত্যাদির থিংক ট্যাংক হিসেবে কাজ করবে। ২। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের যাবতীয় সুপারিশ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এ কমিশন প্রয়োজন। ৩। স্থানীয় সরকার কমিশন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ন্যায়পাল হিসেবেও কাজ করবে।
	মহানগরের স্থানীয় সরকার	
৫৫.	দীর্ঘমেয়াদে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য দ্বি-স্তর	দেশের প্রশাসনিক রাজধানী ও বাণিজ্যিক রাজধানী

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	বিশিষ্ট মহানগর সরকার (সিটি গভর্নমেন্ট) সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে সিটি গভর্নমেন্ট সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে পারে। এ সিটি গভর্নমেন্ট দুই স্তর বিশিষ্ট হতে পারে। যেমন ঢাকা শহরে ২০/২৫ টি ছোট সিটি কাউন্সিল হতে পারে। আবার ঢাকা উত্তর-দক্ষিণে দুই সিটি কর্পোরেশন মিলে একটি বৃহত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে পারে। (অধ্যায়-ছয়)	এ দুই মহানগর ব্যবস্থাপনায় বর্তমান সিটি কর্পোরেশন কাঠামো ও কার্যাবলি পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট নয়। এই দুই মহানগরের নগর ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনকে একত্রিত করে একটি বৃহত্তর ঢাকা মহানগরী কাউন্সিল এবং পুরো ঢাকা শহরাঞ্চল জুড়ে বিশটি সিটি কাউন্সিল গঠিত হতে পারে। একইভাবে বৃহত্তর চট্টগ্রাম মহানগর কাউন্সিল ও পুরো মহানগরে আরো দশটি ছোট ছোট সিটি কাউন্সিল গঠিত হতে পারে। যাদের গঠন কাঠামো, কার্যাবলি অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ও অর্থায়নে বিশদ কাজ করার প্রয়োজন হবে।
	বিবিধ বিষয়াবলী	
৫৬.	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির তিনটি স্তর আছে (১) মেঘা প্রকল্প দুর্নীতি (২) সেবা প্রার্থীদের সাথে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং স্থানীয় সরকা প্রতিষ্ঠানের ভেতরের এক বিভাগ আরেক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দূর্নীতি। (অধ্যায়-তেরো)	অনিয়ম, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও দুর্নীতির এক ঘুর্ণাবর্তে পুরো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জর্জরিত। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেক বিভাগ-অনুবিভাগ এবং টেবিলে টেবিলে অনিয়ম, অদক্ষতা ও দুর্নীতি। মনিটরিং ডিজিটাইজেশন, অডিট এবং অনিয়মের কড়া শাস্তির বিধান এখানে একটি অপরিহার্য বিষয় হওয়া উচিত।
৫৭.	সরকার অত্যন্ত গুরত্ব সহকারে সারা দেশের সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি অঙ্গ যথা আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের জন্য প্রযোজ্য একটি জাতীয় বিকেন্দ্রিকরণ নীতি ঘোষণা করতে পারে। (অধ্যায়- তিন, চার ও আঠারো)	জাতীয় বিকেন্দ্রায়ন নীতির আলোকে সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর তাদের নিজ নিজ সংগঠনের কার্যাবলি ও পুনর্বিন্যাস করবে।
৫৮.	দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নাগরিক পরিসরের বিকাশ এবং ব্যক্তি উদ্যোগ সমষ্টিক উদ্যোগ ও দাতব্য উদ্যোগকে উৎসাহিত করার সমস্ত ব্যবস্থা বিকেন্দ্রায়ন নীতির অন্তর্ভূক্ত হবে মর্মে সুপারিশ করা হলো।	এক সময় দেশের প্রায় ৯০% স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, সড়ক, সেতু ইত্যাদি দাতব্য বা কমিউনিটি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন সরকার অনেক বেশী আগ্রাসী হওয়ায় জন উদ্যোগ হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন কৌশল প্রয়োজন।
৫৯.	জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী স্থানীয় সরকারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ স্থানীয় সরকার সংস্থা (UN Agency for Local Government Promotion) শীর্ষক একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে পেশ করতে পারে। বাংলাদেশ এই সংস্থার সদর দপ্তর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে পারে।	জাতিসংঘের এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিবেদিত কোনো সংস্থা নেই। বাংলাদেশ এ সংস্থাটির হোস্ট হতে পারে। সদর দপ্তর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
৬০.	প্রতিবছর জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের শনিবার আন্তর্জাতিক স্থানীয় সরকার দিবস পালনের জন্য জাতিসংঘে বাংলাদেশ একটি প্রস্তাব গ্রহণের আবেদন করতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হলো।	বর্তমানে ২৪৮টি দিবস পালিত হয়। জানুয়ারি মাসে মাত্র ৬টি দিবস রয়েছে। তাই জানুয়ারিতে এ দিবসটি পালিত হতে পারে।

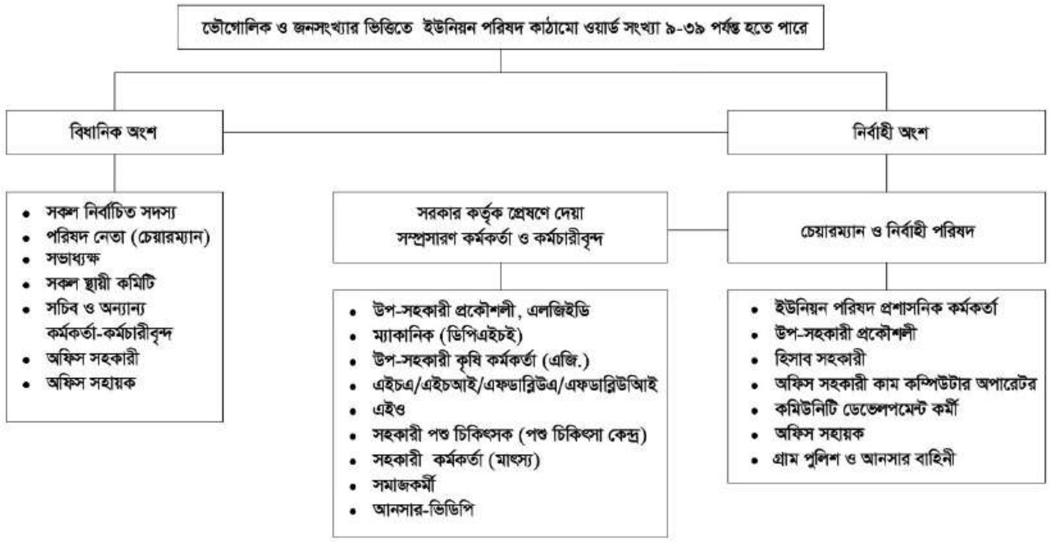

⊛ বি: দ্র: সংগঠন কাঠামো ও টিওএন্ডই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

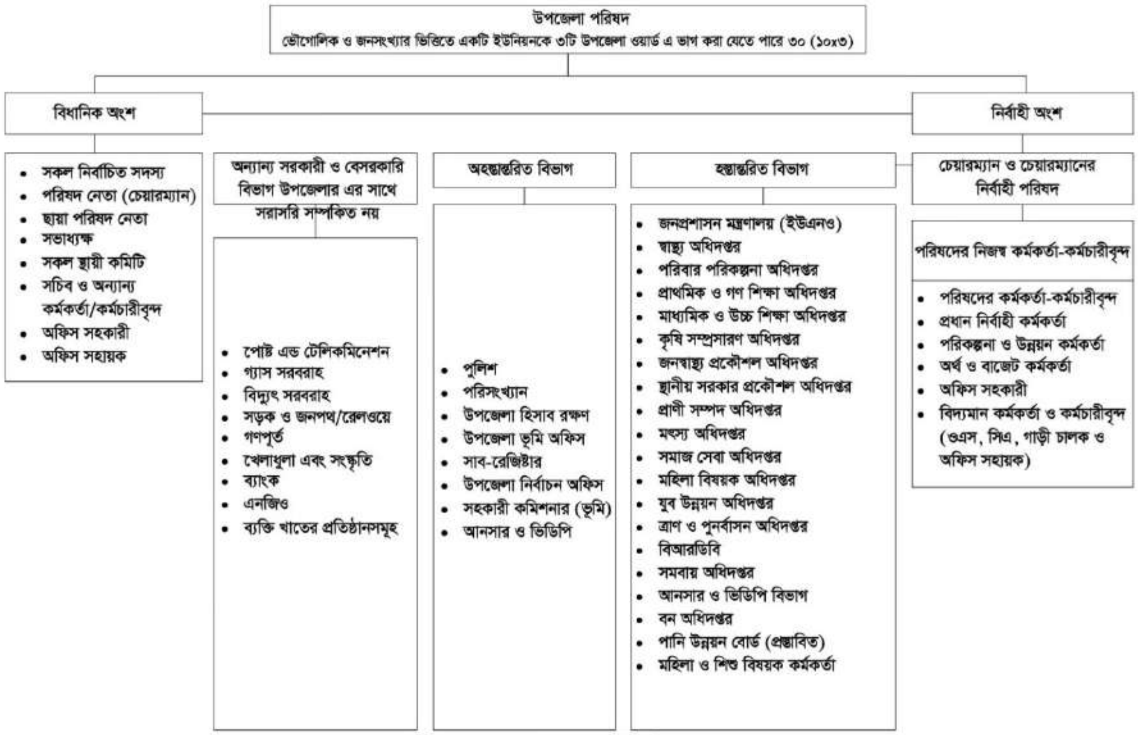

⊛ বি: দ্র: সংগঠন কাঠামো ও টিওএন্ডই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

জেলা পরিষদ ওয়ার্ড-৩০ আনুমানিক
(একটি উপজেলা জেলা পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে)

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত সদস্য
- পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
- ছায়া পরিষদ নেতা
- সভাধ্যক্ষ
- সকল স্থায়ী কমিটি
- সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ
- অফিস সহকারী
- অফিস সহায়ক

জেলা পর্যায়ের সকল সরকারী দপ্তরের জনবল (Functionary), কার্যাবলী (Functions) ও অর্থসম্পদ (Fund)

নির্বাহী অংশ

চেয়ারম্যান+চেয়ারম্যানস্ কাউন্সিল

জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

জেলা পরিষদের বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দপ্তর সমূহ

পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন কাঠামো

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত সদস্য
- পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
- ছায়া পরিষদ নেতা
- সভাধ্যক্ষ
- সকল স্থায়ী কমিটি
- সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ
- অফিস সহকারী
- অফিস সহায়ক

জেলা পর্যায়ের সকল সরকারী দপ্তরের জনবল (Functionary), কার্যাবলী (Functions) ও অর্থসম্পদ (Fund)

নির্বাহী অংশ

চেয়ারম্যান+চেয়ারম্যানস্ কাউন্সিল

জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

জেলা পরিষদের বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দপ্তর সমূহ

পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ

পৌরসভা

জনসংখ্যার অনুপাতে পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৯-৩০ হতে পারে

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরবৃন্দ
- কাউন্সিল নেতা (মেয়র)
- ছায়া কাউন্সিল নেতা
- সভাধ্যক্ষ
- স্থায়ী কমিটি (৫-৭)
- সচিব (নিযুক্ত)
- কাউন্সিল কর্মী

নির্বাহী অংশ

মেয়র ও মেয়রস্‌ কাউন্সিল

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

পৌরসভার বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শ্রেণী ওয়ারী দপ্তর সমূহ :-
শ্রেণী-ক -১৬২ জন
শ্রেণী-খ -৯৬ জন
শ্রেণী-গ - ৭৫ জন

সিটি কর্পোরেশন

(জনসংখ্যা অনুপাতে ওয়ার্ড সংখ্যা যৌক্তিক করা হবে)

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরবৃন্দ
- কাউন্সিল নেতা (মেয়র)
- ছায়া কাউন্সিল নেতা
- সভাধ্যক্ষ
- স্থায়ী কমিটি (৫-৭)
- সচিব (নিযুক্ত)
- কাউন্সিল কর্মী

নির্বাহী অংশ

মেয়র ও মেয়রস্‌ কাউন্সিল

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দপ্তর সমূহ

স্থানীয় সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা
জেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
উপজেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

পৌরসভা নির্বাচন ব্যবস্থা
জেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
উপজেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
পৌরসভা
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ব্যবস্থা
জেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
সিটি কর্পোরেশন
১ ২ ৩ ৪ ৫
৬ ৭ ৮ ৯ ১০
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
২২ ২২ ২৩ ২৪ ২৫
২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫
৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০
৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫
৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০
৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫
৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০
৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫
৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০
৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫
৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০
৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫
৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০
৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫
৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০
১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫
১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০
১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫
১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০
১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫
১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০
১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫
১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০
১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫
১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০

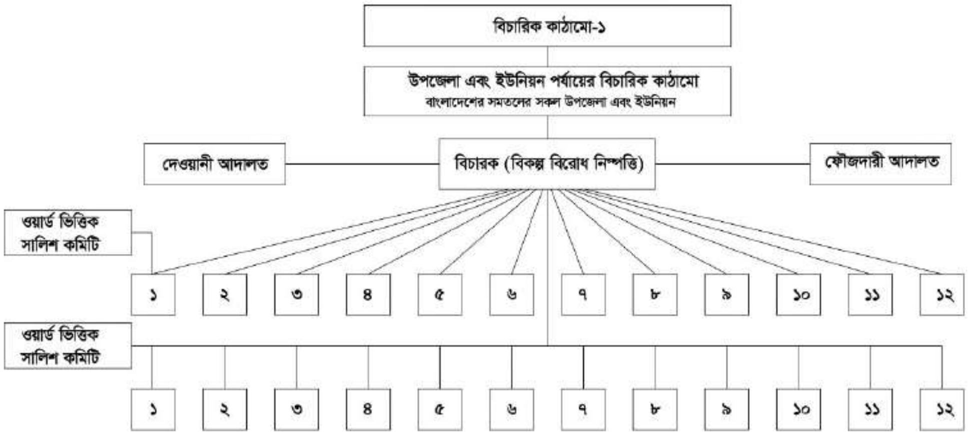
বিচারিক কাঠামো-১
উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিচারিক কাঠামো
বাংলাদেশের সমতলের সকল উপজেলা এবং ইউনিয়ন
দেওয়ানী আদালত
বিচারক (বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি)
ফৌজদারী আদালত
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

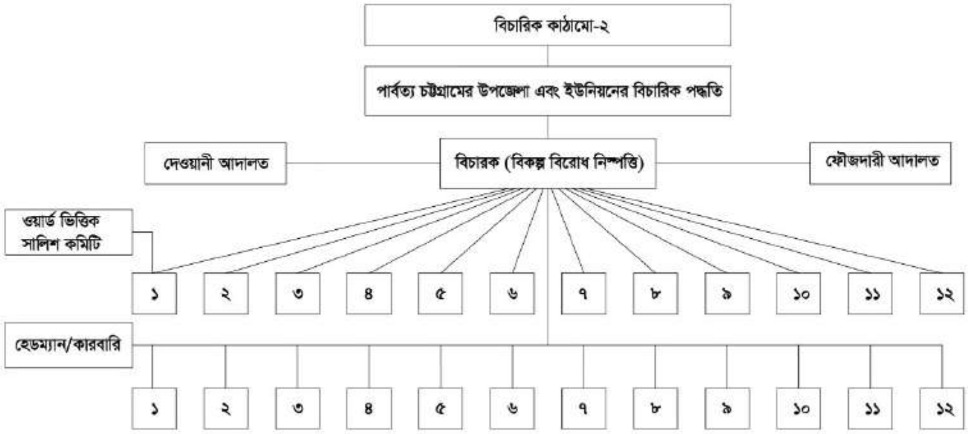
বিচারিক কাঠামো-২
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজেলা এবং ইউনিয়নের বিচারিক পদ্ধতি
দেওয়ানী আদালত
বিচারক (বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি)
ফৌজদারী আদালত
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
হেডম্যান/কারবারি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

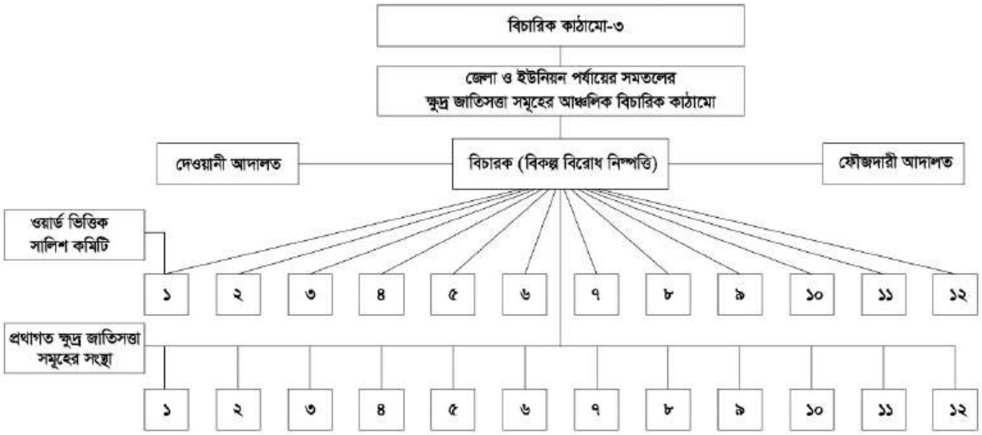
বিচারিক কাঠামো-৩
জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সমতলের
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের আঞ্চলিক বিচারিক কাঠামো
দেওয়ানী আদালত
বিচারক (বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি)
ফৌজদারী আদালত
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
প্রথাগত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের সংস্থা
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

প্রথম অংশ

অধ্যায়-এক

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন : পটভূমি, গঠন ও কর্মপরিধি

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপট ও গঠন

স্থানীয় সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারকে কার্যকরভাবে গড়ে তোলা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন সময়ে ৭টি কমিশন ও কমিটি গঠিত হলেও সেসব কমিশন এবং কমিটির সুপারিশ কখনোই কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। ২০২৪ এর জুলাই-আগস্ট মাসে ফ্যাসিবাদ বিরোধী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্রের সকল দুয়ার খুলে যায়। এ অভ্যুত্থানে প্রায় চৌদ্দশত ছাত্র-যুবক-জনতা প্রাণ উৎসর্গ করেন এবং আরো ৩০ হাজারের মতো মানুষ আহত ও অসংখ্য মানুষের রক্ত ঝরিয়ে ও অঙ্গহানি ঘটিয়ে দেশ-স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ মুক্ত হয়। এ মুক্তির অন্যতম একটি বড় আকাঙ্ক্ষা থেকে দেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১১টি বিভিন্ন সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। তার অন্যতম একটি কমিশন হচ্ছে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন।

ছাত্র জনতার সফল বিপ্লব পরবর্তী গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি প্রজ্ঞাপন (ঢাকা ০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১/১৮ নভেম্বর ২০২৪) বলে প্রফেসর তোফায়েল আহমেদকে প্রধান করে "স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করবার লক্ষ্য" আট সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে। কমিশন গঠিত হবার পর পর কমিশনের একজন সদস্য জনাব এ এম এম নাসির উদ্দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় নতুন সদস্য নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। লেখক ও মানবাধিকার কর্মী মিজ্ ইলিরা দেওয়ান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলামকে কো-অপ্ট করা হয় (প্রজ্ঞাপন তাং-০৮ মাঘ, ১৪৩১বঙ্গাব্দ/২২ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ)। সর্বশেষ সময়ে ফেব্রুয়ারি ৫ এ কমিশনের অন্য এক সদস্য প্রফেসর ফেরদৌস আরফিনা ওসমানকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে এখানেও কমিশনের কাজে নতুন শূন্যতা সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটে (এনআইএলজি) কমিশনের কার্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এনআইএলজি তাদের মূল ভবনের চতুর্থ তলায় একটি সম্মেলন কক্ষসহ তিনটি কক্ষ বরাদ্দ করে কক্ষগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত ও সজ্জিত করে। মন্ত্রণালয়, এনআইএলজি ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) থেকে বারোজন সহায়ক কর্মচারীর ব্যবস্থা করে (কর্মচারী তালিকা-১.৫)। তাছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এনআইএলজি প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ প্রয়োজনীয় বাজেট (অর্থ) সরবরাহ করে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে কমিশন কাজ শুরু করতে সক্ষম হয়।

কাজ শুরু করার সময় প্রথমে কমিশন সরকার প্রদত্ত কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিধি (Terms of Reference) পর্যালোচনা করে। যেহেতু সরকারি গেজেটে বিস্তারিত কোন কর্মনির্দেশনা ছিল না তাই কমিশন সর্বপ্রথম নিজেদের বিবেচনা মত একটি কর্মক্ষেত্র, কর্মপরিধি এবং কর্মপ্রক্রিয়া নির্ধারণ নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক করে নিম্নলিখিত কর্মক্ষেত্র, কর্মপরিধি ও কর্মপ্রক্রিয়া নির্ধারণে উদ্যোগী হয়। প্রতিবেদন কাঠামো হিসেবে ১৫-২০টি বিভিন্ন ক্ষেত্র আলোচিত হয়। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী, স্বায়ত্তশাসিত এবং জনবান্ধব করে গড়ে তোলাই এই কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মজবুত ও গণতান্ত্রিক সংগঠন কাঠামো সৃষ্টি, সহজ ও স্বচ্ছ আইন কাঠামো রচনা, অর্থায়ন ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ, সঠিক সুশাসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন নানা দপ্তর অধিদপ্তরের পুর্নগঠন, জাতীয়ভাবে বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিত ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, বেসরকারি উদ্যোগে ও কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সর্বস্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের করণীয় হিসেবে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিধি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে।

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিধি

(১) দেশে বিরাজিত তিন স্তর বিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা নিম্নস্তর থেকে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এবং নগরাঞ্চলে দুটি প্রতিষ্ঠান যথা পৌরসভা (৩৩০) এবং সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। প্রথমে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো এবং বিরাজিত আইনসমূহের পারস্পারিক সম্পর্ক ও সমস্যা এবং তা সমাধানের পথ অনুসন্ধানের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। আইনের সাথে বিরাজিত সাংগঠনিক কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা দূর করে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন ও সহজেবোধ্য একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন কাঠামো সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবন করার তাগিদ অনুভূত হয়।

(২) দেশের সমতলভূমি ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ ধরনের শাসন ও স্থানীয় সরকার কাঠামো রয়েছে। সে বিশেষ ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনার জন্য রয়েছে পৃথক একটি মন্ত্রণালয়। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজিত অসন্তোষ প্রশমনে স্থানীয় সরকার সম্পৃক্ত প্রশাসন বিশেষ কোন অবদান রাখতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসন কাঠামো নিয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট হয়। একই সাথে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের বিষয়ও আলোচিত হওয়া উচিত বলে ধরে নেয়া হয়।

(৩) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং দেশের প্রশাসনিক এককসমূহ সমান্তরালে অবস্থান করে। যেমন, উপজেলা পরিষদ ও উপজেলার কর্মরত সরকারি দপ্তর ও কর্মচারী পাশাপাশি অবস্থান করেও যেন জল ও তেলের মত পরস্পর মেশে না। এক ধরনের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্যে দিনাতিপাত করে। এখানে তাই ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত একীভূত ও সমন্বিত প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির সম্ভবনা খতিয়ে দেখা হয়।

(৪) ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদের পৃথক কর্মতালিকা রয়েছে। একইভাবে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের বিশাল কার্যতালিকা থাকলেও তার পেছনে কর্মী, কর্ম সহায়তার সংযোগ ও আর্থিক সহায়তা অবিশ্বাস্যভাবে অপ্রতুল। সবটাই বলা যায় বরাদ্দবিহীন ও কর্মীবিহীন কর্মক্ষেত্র বা “Mandate without fund, functionary and freedom”. এ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে একটি টেকসই পথ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

(৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইন ও সাংগঠনিক কাঠামো এবং বহুবিধ বহুস্তরীয় স্থানীয় নির্বাচন ব্যবস্থা রয়েছে। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদের আইন ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটির সাংগঠনিক কাঠামোর সাথে অপরটির কোনো সামঞ্জস্য বা মিল নেই। প্রতিটি স্তরের নির্বাচন ব্যবস্থাও ভিন্ন। ফলে এ তিনটির প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক দ্বন্দ্বমুখর। এখানে তিনটি পৃথক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পরিষদ ও জাতীয় সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকার আয়তন প্রায় সমান। এখানে একধরনের নীরব রাজনৈতিক উত্তেজনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজ করে।

(৬) ইউনিয়ন পরিষদ সম্পূর্ণভাবে চেয়ারম্যান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে সাধারণ সদস্য ও নারী সদস্যগণ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন না বা সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের পরিবেশ বিরাজ করে না। চেয়ারম্যান আইনের কোনো তোয়াক্কা না করে নিজস্ব খেয়াল-খুশী অনুযায়ী পরিষদ পরিচালনা করে। আবার একটি বড় সংখ্যক চেয়ারম্যান এলাকায় বসবাস করেন না এবং নিয়মিতভাবে পরিষদের কার্যালয়ে যোগদানও করেন না। পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কেউই সার্বক্ষণিক নন। কাজের ধরণ ও প্রকৃতি মূলত খন্ডকালীন। সকল খন্ডকালীন নির্বাহী দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়।

(৭) উপজেলা ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র পদাধিকার বলে সদস্য হলেও তারা উপজেলা পরিষদকে নিজের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন না। মেয়রগণ উপজেলা পরিষদের সভায় যোগ দেন না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা প্রশাসনের অধিকর্তা হিসেবে একধরনের বিকৃত চর্চার মাধ্যমে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদ পৃথক দুটি সত্তা হিসেবে পরিচালিত হয়। এতে বিরাজিত আইন ও বিধি লঙ্ঘিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণ পরিষদের সভা পরিচালনার ভার নির্বাহী কর্মকর্তার উপরই অর্পন করে দিয়েছেন। ব্যবস্থাটির গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমের একটি সঠিক পথ অনুসন্ধানের দায়িত্ব কমিশন গ্রহণ করে।

(৮) একইভাবে, জেলা পরিষদ মূলত একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠান। এখানে জনসম্পৃক্ত কোন নির্বাচন নেই। নেই কোনো জনসম্পৃক্ত কর্মসূচি। অথচ প্রায় সব জেলা পরিষদে রয়েছে শতকোটি টাকার নিজস্ব সম্পদ। রয়েছে কাজের বিপুল সম্ভাবনা। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান সময়ে জেলা পরিষদই ছিল স্থানীয় সরকারের মূল উন্নয়ন কেন্দ্রবিন্দু। একসময় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক সবই জেলা পরিষদের আওতাধীন ছিল। এখন জেলা পরিষদের সুপরিসর ভবন এবং সারা জেলাব্যাপী তার সম্পদ রয়েছে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় জেলা পরিষদের অধীনে জেলা পর্যায়ের প্রায় ৩০টি সরকারি দপ্তর কাজ করে। তাদের সকল কাজ, কার্যনির্বাহীগণ ও অর্থ জেলা পরিষদে ন্যস্ত হবার বিধান কার্যকর করার কোন বিধান নেই। সমতলে এক্ষেত্রে একটি বেহাল কাঠামো বিরাজ করছে। জেলার কাজ, কার্যনির্বাহী ও বরাদ্দকৃত অর্থের সাধারণ এবং সমন্বিত কোন পরিবীক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ নেই। জেলায় একীভূত ও জবাবদিহিমূলক কোন প্রশাসন কাঠামো নেই। যা আছে তা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ৪০টির মত দপ্তর-অধিদপ্তরের মাঠ কার্যক্রম। এক্ষেত্রে জেলা পরিষদ পুনর্গঠিত করে একটি সমন্বিত জেলা পরিকল্পনা ও জেলা বাজেটের ব্যবস্থা প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় কিনা, তার সুপারিশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(৯) স্থানীয় সরকারের সিটি করর্পোশন ও কতিপয় পৌরসভা ব্যতীত অন্য সকল পৌরসভার (প্রায় ১০০টি) অবস্থা শোচনীয়। নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ ও সরকারি বরাদ্দ দুই ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এক্ষেত্রে সুপারিশ প্রণয়ন জরুরি বলে কমিশন মনে করে।

(১০) বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের ইতিহাসে একটি বিষয় অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের সকল গুরুত্ব ও আলোচনা পাঁচ বছর পরপর অনুষ্ঠিত একদিনের একটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সে নির্বাচনও ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের শুধুমাত্র একটি পদ চেয়ারম্যান বা মেয়রকে ঘিরেই সকল আলোচনা। তারপর পাঁচ বছরের জন্য তিনি আইনী-বেআইনী যা করেন, তাই হয়ে থাকে স্থানীয় সরকারের কাজ। অনেক সিটি কর্পোরেশনে কাউন্সিলের সভা হয় না। উপজেলা পরিষদসভা মূলত ইউএনও নিজস্ব খেয়াল খুশী মত পরিচালনা করেন। চেয়ারম্যান প্রায় ক্ষেত্রে সাক্ষী গোপাল। দুই ভাইস-চেয়ারম্যান হেড টেবিলে স্থানও পান না। ইউনিয়ন পরিষদে যারা স্মার্ট চেয়ারম্যান, তাদের কাজ মূলত পরিষদ নয়, পরিষদের তিন জন কর্মকর্তা যথা ইউএনও, উপজেলা প্রকৌশলী ও পিআইও সাথে। এক ধরনের বিকৃত প্রকল্প সংস্কৃতি স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনে জন্মলাভ করেছে। চেয়ারম্যান প্রকল্প এনে সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করেন। তারা হন ঐসব প্রকল্পের ঠিকাদার ও প্রকল্প কমিটির নিয়ন্ত্রক। জেলা পরিষদ একধরনের ''অনুরোধের আসর,'' বিভিন্ন লবিং তদবিরকারীর অনুরোধে অর্থ-বণ্টন করেন, তা আবার মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে। এসব অবস্থা বিবেচনা করে এ পরিষদগুলোকে সত্যিকারের স্বচ্ছ ও উন্নয়নমুখী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে কমিশন গ্রহণ করে।

(১১) গ্রাম ও শহর পর্যায়ে বিরোধ মীমাংসার প্রথাগত যে সালিশ-সমঝোতা ছিল, তার এক ধরনের বিলুপ্তি ঘটেছে। একদিকে জেলা থেকে নিচে আনুষ্ঠানিক বিচার কাঠামোর অনুপস্থিতি। অপরদিকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি ৫ সদস্যের আদালত কার্যক্রম চলছে। সভাপতি ও দুই সদস্য যেহেতু রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত এবং তাদের আইনের কোন শিক্ষা ও পটভূমি নেই, সেখানে Miscarriage of Justice একটি সাধারণ পরিণতি। ফলে অনেকে বাধ্য হয়ে থানার দ্বারস্থ হয়। পুলিশ অনানুষ্ঠনিক একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গত ১৫/২০

বছর যাবত রাতে থানায় আদালত বসিয়ে বিচার-সালিশ করে আসছে। জুলাই বিপ্লবের পর অনেক পুলিশ সদস্য এবং চেয়ারম্যান পলাতক থাকায় পুলিশ ও গ্রাম আদালতের বিচার থেমে গেছে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ বিচার বা বিরোধ নিষ্পত্তির কাঠামোর একটি স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।

(১২) কমিশনের আলোচনায় নারী, মানবাধিকার ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসাবাঁধা দুর্নীতির বিষয়টিও সবিস্তারে আলোচনা হয়। এখানে কাঠামো ও কার্য দুটি ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো তুলে আনার সিদ্ধান্ত হয়।

(১৩) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কোথাও কখনও বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান নয়। এখানে সরকারের একটি বৃহৎ মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং তার অধীনে দুটি বিভাগ, যথা স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ রয়েছে। আবার এই দুই বিভাগের অধীনে রয়েছে দুটি জাতীয় ভিত্তিক বৃহত্তর প্রকৌশল বিভাগ। দেশের বড় মহানগরগুলোর পানি সরবরাহের জন্য ওয়াসা, স্থানীয় সরকারের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণ ও স্থানীয় সরকার বিষয়ে গবেষণার জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট এবং একটি অপর বিভাগের দুটি বৃহত্তর দপ্তর একটি সমবায় অধিদপ্তর ও অন্যটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড। তাছাড়া বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (কুমিল্লা বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বগুড়া) সহ আরও ৪টি নবগঠিত একাডেমি নতুনভাবে তৈরি হয়েছে। সবমিলিয়ে ধারণা হয়েছে শুধু কাজের স্বার্থে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন ও সংস্কার প্রয়োজন। স্বল্প মেয়াদে না হলে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে এখানে হাত দেয়ার প্রয়োজন হবে। এ বিষয়ে সংস্কারের সুপারিশমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়।

(১৪) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে মাঠ পর্যায়ে সহায়তা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন স্থানীয় সরকারের জন্য নির্ধারিত মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিদ্যমান অনুবিভাগটিকে একটি শক্তিশালী নতুন অধিদপ্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন। যে অধিদপ্তর প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ আর্থিক কর্মসম্পাদন ও বাস্তবায়নের নিরীক্ষা নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করবে। এ বিষয়টি কমিশন গুরুত্ব সহকারে দেখতে চায়।

(১৫) একসময় বলা হতো সারা বাংলাদেশই একটা গ্রাম। বিগত দুই দশক ধরে সারা বাংলাদেশ একটি অপরিকল্পিত একক শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে। এখানে যততত্র ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে কোনো পরিকল্পনা নকশার প্রয়োজন হয় না। হয় না ভূমি সুরক্ষার কোনো চেতনা। বনভূমি, জলাভূমি, প্লাবনভূমি, পাহাড়, নদী, আবাদী জমি ও বাসস্থানের কোনো চিহ্নিত জমি বা সীমানা (Zoning) নেই। এখানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রকৌশল সংস্থাগুলোর ভূমিকা নির্ণয় করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বৃহত্তর জাতীর স্বার্থে এ বিষয়টি কর্মক্ষেত্রের একটি অংশ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জাতীয় ভৌত অবকাঠামো ও ভূমি ব্যবহার আইনের বিষয় সরকারের চিন্তাধারায় কিছু যুক্ত করা যায় কিনা সে বিষয়টিও কমিশনের কার্যতালিকায় স্থান পেয়েছে।

(১৬) স্থানীয় সরকারে কর্মরতদের জন্য একটি "স্থানীয় সরকার সার্ভিস" কাঠামো গঠন একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কমিশনের কর্মপরিধিতে স্থান পায়। কারণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত ও যোগ্য কর্মচারীর অভাবে ভুগছে। আপরদিকে নানাভাবে নিয়োগ পাওয়া কর্মীদের চাকুরির অনিশ্চয়তা দূর করার কোনো যৌক্তিক প্রশাসনিক কাঠামো নেই। অনেকের কোনো পেশাগত কর্মপরিকল্পনা নেই, নেই কোনো অবসর সুবিধা। বিষয়টি পূর্বে গঠিত তিনটি কমিশনের প্রতিবেদনেও গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে।

(১৭) স্থানীয় সরকারকে অব্যাহত জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিক দিক নির্দেশনা দেয়া, তার বিরাজিত আইন কানুনে নিরন্তর কল্যাণমুখী পরিবর্তন, অর্থায়নে সমতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন সময়ে উদ্ভুত দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন ইত্যাদি কাজে কার্যকর সহায়তার জন্য ''স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন'' গঠনের একটি প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয় এবং এটি কার্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(১৮) স্থানীয় সরকারসহ একদিকে সকল জনপ্রতিষ্ঠান, তথা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সমবায় ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ, অপরদিকে সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কল্যাণমুখী সংস্কার প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগ এবং ঐ দুই বিভাগের কার্যসূচি ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কিছু সংস্কার বিষয়েও কমিশন মতামত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষত, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) এবং স্বতঃস্ফূর্ত জনউদ্যোগের জন্য নতুন করে(Space) পরিসর সৃষ্টির উপায় অনুসন্ধান করেছে।

(১৯) দেশের সামগ্রিক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার আইন বিষয়ে এ কমিশন একটি চিন্তাধারা জাতির সাথে বিনিময় করতে চেয়েছে। কারণ, ভৌত অবকাঠামো ও ভূমি ব্যবহার বিষয়ে কোন আইন না থাকায় দেশের ভূমি ব্যবহারে একটি অনাচার চলছে। এভাবে চললে আগামী ১০/১৫ বছরে কৃষি জমি, বনভূমি ও প্লাবনভূমি ব্যাপকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি কমিশন তার কর্মতালিকাভূক্ত করেছে। এইগুলো বিষয় ছাড়াও আরও অনেক বিষয়, যেমন সর্বত্র ডিজিটাইজেশন, এনজিও, সিভিল সোসাইটির সাথে স্থানীয় সরকার পরিকল্পনার সংযোগ সাধন, নির্বাচন ব্যবস্থাকে দুর্নীতি, কালো টাকা ও পেশীশক্তিমুক্ত, করা, স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সক্ষমতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রার্থীতা নির্ণয় হবে নাকি তা পূর্ব ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। একই বিষয় পার্বত্য এলাকার জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠে আসে। এ সব বিষয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ের-বিশ্লেষণী অংশে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।

(২০) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় স্বতন্ত্র এবং বৈচিত্রপূর্ণ। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে এই অঞ্চলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় রয়েছে কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য। তবে, নানাবিধ সমস্যার কারণে এই এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত একাধিক আইন, ও প্রবিধান বিদ্যমান। আঞ্চলিক পরিষদ আইন, তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ এরকম একাধিক আইনের ফলে প্রায়শই এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে জটিলতা ও অস্পষ্টতা দেখা দেয়। দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদে নির্বাচন না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বৈধতায় সংকট দেখা দিয়েছে। অনির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারছে না। তাছাড়া, ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন, সার্কেল চিফ, হেডম্যান, কার্বারী) সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে, উন্নয়ন ও সামাজিক সংহতি নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানারুপ নাশকতা প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং সীমান্তের বাইরে থেকেও নানারুপ হুমকি ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। তাই পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রায়ন ও প্রশাসন উন্নয়নে সকল জনগণের কার্যকর সম্পৃক্ততা সৃষ্টি সেখানে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। কমিশন সে লক্ষ্যেও অবদান রাখতে পারে বলে মনে করে।

(২১) এই কমিশনের কাজ কেবল সুপারিশ প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সুপারিশগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তারও একটি বিস্তারিত রূপরেখা প্রণয়ন করেছে এই কমিশন। স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, স্থানীয় শাসন ও উন্নয়নের একটি নবতর ধারা সৃষ্টিই ছিল এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য কমিশনকে সহায়তা করেছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও কিছু বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তি। তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং সেগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে কমিশন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করেছে, যা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে এক নতুন যুগে প্রবেশে সহায়তা করবে বলে কমিশন মনে করে।

কমিশনের মতামত ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক মতামত, তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করার সময় একটি বিস্তৃত অধ্যয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, যা নিম্নরুপ:

- স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রতিবেদনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা।
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবেদন/তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ।
- স্থানীয় সরকারের ওপর প্রকাশিত নানা গবেষণাপত্র বই ও নিবন্ধের পর্যালোচনা।
- বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের প্রকাশিত মতামত পর্যালোচনা।
- বেসরকারি সংস্থা, দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা থেকে প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ।
- স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের ফেসবুক, ওয়েবসাইট এবং ই-মেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া, মন্তব্য এবং সংস্কার প্রস্তাব প্রাপ্তি ও বিশ্লেষণ (সংযুক্ত সারণি-১.৩)
- কমিশনের সদস্যগণ মোট ২৭টি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন, যেখানে স্থানীয় সরকার সংস্কারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে (সংযুক্ত সারণি- ১.১)।
- **অনানুষ্ঠানিক সভা:**

√ সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমিতি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন চাকরিজীবী শ্রেণি, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে একাধিক আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক এবং সাংবাদিতা ও সংবাদ কর্মীদের সাথে সভা আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি সভায় গড়ে ১০/২০ জন্য অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যান্য সংস্কার কমিশনের সদস্যদের সাথে বিভিন্ন সময় অনানুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- অন্যান্য সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা ও স্থানীয় সরকার সংস্কারের কার্যপরিধি খসড়া প্রস্তুত করার সময় অন্য ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রদত্ত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

- **রাজনৈতিক দলের মতামত সংগ্রহ**

√ কমিশন কর্তৃক ১৫টি রাজনৈতিক দলের নিকট স্থানীয় সরকার সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে (সংযুক্ত সারণি-১.২)।
√ একাধিক রাজনৈতিক দল থেকে লিখিত ও আনুষ্ঠানিক সংস্কার প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
√ স্বেচ্ছায় কিছু রাজনৈতিক দল ও সংগঠন কমিশনের সাথে মতবিনিময় করেন।

- **জনমত জরিপ**

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহায়তায় ৬৪টি জেলায় বিভিন্ন পেশা ও নারী পুরুষের মধ্য থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক সফল নমুনায়নের মাধ্যমে ৪৬,০৮০ মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার সংস্কার সম্পর্কিত প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা থেকে বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে তিনটি জেলাতে পৃথক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

কমিশনের সীমাবদ্ধতা

পূর্ণাঙ্গ সংস্কার প্রস্তাবনার প্রতিবেদন প্রদানের জন্য কমিশনকে তিন মাস সময় দেওয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় সরকারের ব্যাপক কার্যপরিধির তুলনায় তা ছিল খুবই অপ্রতুল। বিশেষ করে, পাঁচটি স্তর ও প্রতিষ্ঠান যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা

পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সরকরি কর্মকর্তা, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, নারী সমাজের প্রতিনিধিসহ বিশাল জনগোষ্ঠীর থেকে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন প্রদান কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরির স্বার্থে আরও এক মাস সময় বৃদ্ধি করা হয়। এ সময়ের মধ্যে কমিশন পবিত্র রমজান ও দীর্ঘ ঈদের ছুটির ফাঁদে (১লা মার্চ-৫ই এপ্রিল, ২০২৫) পড়ে যায়। কমিশন গঠন প্রকৃতিতেও কিছু সমস্যা ছিল। কমিশনের সদস্যগণের প্রত্যেকের নিজস্ব একটি সার্বক্ষণিক কর্মক্ষেত্র রয়েছে। সার্বক্ষণিক কাজটি বজায় রেখে খন্ডকালীন সময়ের জন্য কমিশনে সত্যিকারের সম্পূর্ণ নিবেদিত অবদান রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অন্তত: ৫ মাসের একটি পূর্ণকালীন কমিশনের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়াও অপ্রতুল সম্পদ ও আরও নানা প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে কমিশনকে কাজ করতে হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন কাজ করতে গিয়ে সরকারি-বেসরকারি, জাতীয়-আন্তর্জাতিক নানা বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের উদার সহায়তা লাভ করেছে। এ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে একটি সংক্ষিপ্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার পত্রে তা উল্লেখ রয়েছে। কমিশনের সাথে সংযুক্ত কর্মীগণের একটি তালিকাও সংযুক্ত করা হয়েছে (সংযুক্ত সারণি-১.৪)।

কর্মচারী সহায়তা: স্থানীয় সরকার বিভাগ, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) থেকে সংযুক্তির মাধ্যমে ১২জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সহায়তার ব্যবস্থা করেছে (সংযুক্ত সারণি-১.৫)।

সারণি ১.১: মতবিনিময় সভাসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	সভার নম্বর	সভার তারিখ	সভার স্থান	উপস্থিতি সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
১)	১ম সভা	২৪/১১/২০২৪ খ্রি.	স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	১০	স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাগণের ও কমিশনের সদস্যগণের সাথে সভা
২)	৬ষ্ঠ সভা	০৯/১২/২০২৪ খ্রি.	স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	১৯	স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাগণের সাথে সভা
৩)	৮ম সভা	১৭/১২/২০২৪ খ্রি.	সেমিনার কক্ষ (এনআইএলজি)	১৪	NILG, LGED, DPHE, WASA, RAJUK, BARD, BAPARD, RDA, BMDF এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের নানা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধিগণের সাথে যৌথভাবে মতবিনিময়
৪)	৯ম সভা	১৯/১২/২০২৪ খ্রি.	সভা কক্ষ, গ্রান্ড রিভারভিউ হোটেল, রাজশাহী	৭০	বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, ছাত্র-জনতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়।
৫)	১০ম সভা	২৪/১২/২০২৪ খ্রি.	সভা কক্ষ, হোটেল সিটি ইন, খুলনা	৭০	ঐ
৬)	১১তম সভা	২৬/১২/২০২৪ খ্রি.	হোটেল মেট্রো, সিলেট	৭৫	ঐ
৭)	১২তম সভা	২৯/১২/২০২৪ খ্রি.	সভা কক্ষ, হোটেল পেনিনসুলা, চট্রগ্রাম	৭৫	ঐ
৮)	১৩তম সভা	৩০/১২/২০২৪ খ্রি.	সভা কক্ষ, সার্কিট হাউজ, রাঙ্গামাটি	৮০	ঐ
৯)	১৪তম সভা	৩১/১২/২০২৪ খ্রি.	সভা কক্ষ, সার্কিট হাউজ, খাগড়াছড়ি	৮০	আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি ও নীতি নির্ধারকগণ, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বেরসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়।
১০)	১৬তম সভা	০৫/০১/২০২৫ খ্রি.	সেমিনার কক্ষ, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা	৪০	মতবিনিময় সভা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের সাথে।

ক্রমিক নং	সভার নম্বর	সভার তারিখ	সভার স্থান	উপস্থিতি সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
১১)	-	০২/০১/২০২৫ খ্রি.	সভা কক্ষ, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা	২০	KIOKA/UNDP এর সাথে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের মতবিনিময়।
১২)	১৭তম সভা	০৬/০১/২০২৫ খ্রি.	সভা কক্ষ, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা	৬৩	প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাথে মতবিনিময়
১৩)	১৮তম সভা	০৮/০১/২০২৫ খ্রি. সকাল: ১০.০০ টা।	অডিটরিয়াম, এনআইএলজি	৩৫	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গ্রামপুলিশ ও অন্যান্য Consultative Group এর সাথে মতবিনিময় সভা
১৪)	-	০৮/০১/২০২৫ খ্রি. দুপুর: ২.৩০ টা	অডিটরিয়াম, এনআইএলজি	১২	DNCC, DSCC, Urban, chief revenue officer ও FIDA এর সাথে মতবিনিময় সভা
১৫)	-	০৮/০১/২০২৫ খ্রি.	সভা কক্ষ, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা		অংশীজন সভা বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি, নাগরিক ঐক্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি।
১৬)	১৯তম সভা	১৪/০১/২০২৫ খ্রি.	উপজেলা পরিষদ হল রুম, সিংগাইর মানিকগঞ্জ।	৯৩	বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, ছাত্র-জনতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় সভা।
১৭)	-	১৪/০১/২০২৫ খ্রি.	উপজেলা নির্বাহী অফিসসারের সভাকক্ষ, সিংগাইর মানিকগঞ্জ।	১৮	উপজেলা পরিষদের সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা
১৮)	-	১৪/০১/২০২৫ খ্রি.	সিংগাইর পৌরসভার সভাকক্ষ	১০	পৌরসভার প্রতিনিধির সাথে মতবিনিময়।
১৯)	২০তম সভা	১৬/০১/২০২৫ খ্রি.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর	৭৯	সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি ও নীতি নির্ধারকগণ, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বেরসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়।
২০)	-		উপজেলা পরিষদ হল রুম, তারাগঞ্জ, রংপুর	৫০	তারাগঞ্জ উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, ছাত্র-জনতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় সভা।
২১)	সাধারণ সভা	২২/০১/২০২৫ খ্রি. সকাল ১০.০০ টা	সভা কক্ষ, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, ঢাকা	১০	CUP, PHAB, Development Centre, উপদেষ্টা আইইডিসিআর Concern Worldwide.
২২)	সাধারণ সভা	২২/০১/২০২৫ খ্রি. বিকাল ৩.০০ টা	সভা কক্ষ, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, ঢাকা	১২	পৌরসভার মেয়র, MAB, চীপ লিডার, GICD, IUGIP Project, LGED.
২৩)	সাধারণ সভা	২২/০১/২০২৫ খ্রি. বিকাল ৪.০০ টা	সভা কক্ষ, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, ঢাকা	৮	ডিজাইন ইউনিট, এলজিইডি, Dept. of URP, JU, Vice President BIP, Member LGRC, Bangladesh Institute of Planners(BIP), IUGIP Project, LGED.
২৪)	২২তম সভা	২৬/০১/২০২৫ খ্রি.	সভা কক্ষ, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, ঢাকা	১০	সমতল আদিবাসী অধিকার আন্দোলন এর প্রতিনিধিগণের সাথে মতবিনিময়।
২৫)	২৩তম সভা	২৭/০১/২০২৫ খ্রি.	সভা কক্ষ, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, ঢাকা	৯	'নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন' এর সদস্যগণের সাথে মতবিনিময় সভা।
২৬)	২৪তম সভা	২৯/০১/২০২৫ খ্রি. সকাল-১০.০০ টা	সভা কক্ষ, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, ঢাকা	৮	স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন সদস্যগণের সভা
২৭)	-	২৯/০১/২০২৫ খ্রি. বিকাল-২.৩০ টা	সভা কক্ষ, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট(২য় তলা)।	২৪	স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল শাখার কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা।

সারণি ১.২: রাজনৈতিক দলের নিকট পত্র প্রেরণের তালিকা

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের কাহার নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তার নাম ও ঠিকানা	পত্র প্রেরণের তারিখ
১	জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মহাসচিব বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২৮/১, নয়াপল্টন (ভিআইপি রোড), ঢাকা-১০০০।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
২	জনাব ডা. শফিকুর রহমান আমীর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
৩	জনাব মো: নুরুল হক (নুর) সভাপতি গণঅধিকার পরিষদ আল রাজী কমপ্লেক্স (৩য় তলা) বিজয় নগর, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
৪	মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (পীর সাহেব চরমোনাই) আমীর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
৫	জনাব জোনায়েদ সাকি প্রধান সমন্বয়কারী গণসংহতি আন্দোলন ৩০৬-৩০৭ রোজ ভিউ প্লাজা, ১৮৫ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
৬	ড. কামাল হোসেন ইমেরিটাস সভাপতি গলফোরাম ৩২, পুরানা পল্টন, সুলতান আহমেদ প্লাজা (১২ তলা, রুম নং-১২০৫), ঢাকা-১০০০।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
৭	জনাব মো: শাহ আলম সভাপতি বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি মুক্তিভবন-৬ষ্ঠ তলা, ২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
৮	জনাব ববি হাজ্জাজ চেয়ারম্যান জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম ২৬০/৬, মালিবাগ মোড়, কক্ষ নং-৬০৫, শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
৯	মাওলানা এ, এ, মতিন চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট ড্রিম আবুল হোসেন টাওয়ার, ২০৭ (৩য় তলা), ১নং গলি ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
১০	প্রফেসর ডা. মেজর (অব.) আব্দুল ওহাব মিনার আহবায়ক আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) সায়হাম স্কাই ভিউ টাওয়ার, ৪র্থ তলা, ৪৫ বিজয়নগর রোড, ঢাকা-১০০০।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
১১	জনাব সাইফুল হক সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ২৭/৮-এ, ৪র্থ তলা, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
১২	ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি ৫০, ডিআইপি এক্সটেনশন (৫ম তলা), নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের কাহার নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তার নাম ও ঠিকানা	পত্র প্রেরণের তারিখ
১৩	জনাব আ স ম আব্দুর রব সভাপতি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জিএসডি ৬৫, বঙ্গাবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
১৪	মাওলানা শায়খ জিয়া উদ্দিন সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম লেভেল-১০, রুম নং-১০০৩/এ, ৫১-৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.
১৫	ডক্টর অলি আহমদ, বীর বিক্রম প্রেসিডেন্ট লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এল.ডি.পি মগবাজার গুলফেশী প্লাজা, ৯ম তলা, ৮-বি, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, (৬৯, আউটার সার্কুলার সড়ক), মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।	১৮/১২/২০২৪ খ্রি.

সারণি ১.৩: স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন কর্তৃক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে জনমত সংগ্রহের চিত্র (মাধ্যম: ই-মেইল, মতামত ফরম, ওয়েব পোর্টাল, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ম্যাসেঞ্জার)

ক্র: নং	ইউপি	উপজেলা	জেলা	পৌরসভা	সিটি কর্পোরেশন	সাধারণ	মোট
ইমেইল	২০	১১	৭	১৩	৩	৩০	৮৪
ওয়েব পোর্টাল (গুগল ডক)						৫	৫
হোয়াটসঅ্যাপ	২৫	১৪	১২	৭	১	৩১	৯০
ফেসবুক/ মেসেঞ্জার	৭৯	৮৩	১২	১৮	১	২০	২১৩
মোট	**১২৪**	**১০৮**	**৩১**	**৩৮**	**৫**	**৮৬**	**৩৯২**

সারণি-১.৪: কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একাডেমিক সহযোগিতা

প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল্লাহ/প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি/ ড. কাজী আনওয়ারুল হক, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব/জনাব হুমায়ুন খালেদ, সাবেক সচিব/প্রকৌশলী জনাব আবুল মনজুর মোঃ সাদেক, প্রকল্প পরিচালক, এলজিইডি/জনাব স্বপন কুমার সরকার, সাবেক অতিরিক্ত সচিব/জনাব তারিক সাইদ হারুন, আরডিআরএস/অধ্যাপক আকতার মাহমুদ ও অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়/জনাব মোঃ জাকি ফয়সাল ও জনাব মোঃ শিহাব উদ্দিন, গবেষক, সিএলজিডি।

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, ঢাকা/ইচিগুচি তোমোহিদে, চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ, জাইকা/স্থানীয় সরকার বিষয়ক উপদেষ্টার কার্যালয়, জাইকা, বাংলাদেশ/ডেমোক্রেসী ইন্টারন্যাশনাল/ওয়াটার এইড, বাংলাদেশ/ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও গভার্নেন্স এ্যাডভোকেসী ফোরাম/কোস্ট ফাউন্ডেশন/ বিএনএনআরসি/বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা/সাপ্তাহিক আমোদ, কুমিল্লা।

ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ

বিচারক (অব:) মোঃ মোতাহার হোসেন/বিচারক (অব:) মাসদার হোসেন/অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম, চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন/অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/অধ্যাপক আবদুল লতিফ মাসুম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়/অধ্যাপক আমীর মোঃ নসরুল্লা, লোকপ্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়/গওহার নঈম ওয়ারা, লেখক ও গবেষক/আহমদ ইকবাল হাসান, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ/রাশেদা আক্তার, প্রাক্তন উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান/মোশারফ হোসেন মুসা, স্থানীয় সরকার বিষয়ক লেখক/আমিনুল আরিফীন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট কর্মসূচি, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন/Professor Dr

Michael Naef, Head of Department, Department of Economics, Durham University, United Kingdom/মাহবুব কবীর, এডভোকেসি এন্ড ইনক্লুশন এডভাইসরি ম্যানেজার, ক্রিশ্চিয়ান ব্লাইন্ড মিশন, ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড/Professor Michael Keith, Director of the Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), and Director of PEAK Urban Research Programme, University of Oxford/Professor Werner Menski, Professor Emeritus, South Asian Law, SOAS, University of London, UK/Dr Vincenzo Bollettino, Director, Program on Resilient Communities, Harvard Humanitarian Initiative, Harvard University, Cambridge, US/Dr David Lewis, Professor of Anthropology and Development, LSE, UK/মোহাম্মদ যোবায়ের হাসান, উপ-নির্বাহী পরিচালক, ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অফ দ্য রুরাল পুওর(ডর্প)/আবদুল্লা আল মামুন, পরিচালক, চাইল্ড প্রটেকশন এন্ড চাইল্ড রাইটস গভর্নেন্স, সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল/ইমাম মাহমুদ রিয়াদ, পানি, স্যানিটেশন, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ।

মাঠ প্রশাসন

বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাটহাজারি, তারাগঞ্জ ও সিংগাইর/সাজেক ইউনিয়ন পরিষদ, বিলাইছড়ি/ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদ, হাটহাজারি/পৌরসভা-সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

স্থানীয় সরকার সিমিতি/এসোসিয়েশন

বাইসস/ম্যাব ও ইউপি ফোরাম/পৌরসভা কর্মচারী সমিতি/গ্রাম পুলিশ সমিতি/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারী সমিতি।

সরকার

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, উপদেষ্টা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/জনাব সিরাজুদ্দিন মিয়া, মূখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়/ড. আবদুর রশিদ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব/জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/ জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, মহাপরিচালক, এনআইএলজি/জনাব সাইফুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা/ জনাব তারিকুল আলম, অতিরিক্ত সচিব/জনাব হেলেনা পারভীন, সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ/জনাব রুমানা ইয়াসমিন ফেরদৌসী, উপসচিব(ড্রাফটিং)/ জনাব মোঃ সালাউদ্দীন আলম মৃধা, সিনিয়র সহকারী সচিব(ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সারণি-১.৫: কমিশনের সাথে সংযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

জনাব মোঃ ইমরানুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা, এনআইএলজি/জনাব মোঃ মেজবাহ্ উদ্দিন খান, এভিটি, এনআইএলজি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, সহকারী প্রোগ্রামার/জনাব আবুল মনসুর মোহাম্মদ শাইম, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর/ জনাব মোঃ মেজবার রহমান, অফিস সহায়ক/জনাব মোঃ কামাল হোসেন, অফিস সহায়ক/জনাব শাহিনা হক, অফিস সহায়ক/জনাব মোঃ নিশাদ আহমেদ নিলয়, অফিস সহায়ক/জনাব মোঃ রাসেল হোসেন, গাড়ী চালক, এলজিইডি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)

জনাব মোঃ সোহেল শেখ, গাড়ী চালক।

অধ্যায়-দুই

পূর্বতন স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনসমূহের সুপারিশ, কার্যকারিতা এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যান্য সংস্কার কমিশনের সাথে তুলনামূলক আলোচনা

ভূমিকা

ব্রিটিশদের আগমনের পর এদেশে দীর্ঘদিনের রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে এবং প্রশাসনে লিখিত নিয়মকানুনের প্রচলন শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসনের ১৯০ বছরের মধ্যে প্রথম ১০০ বছর (১৭৫৭-১৮৫৮) ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল, এবং পরবর্তী ৮৯ বছর (১৮৫৮-১৯৪৭) ব্রিটিশ রানীর শাসনাধীন ছিল। প্রথম পর্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের নিয়মনীতি অনুযায়ী এদেশ শাসিত হতো। পরবর্তীতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রভাবে বিভিন্ন আইন পাশ হলেও গভর্নর জেনারেলদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কারণে তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ, ইচ্ছা ও অভিরুচিই প্রশাসনে প্রাধান্য পেতো।
ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি ও কোম্পানীর প্রশাসক লর্ড কর্নওয়ালিশ এবং মনরো ভারতের শাসন কাঠমো ও তার উদ্দেশ্য নিরুপনে তাদের নিজস্ব মতামতের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে উইলিয়াম বেন্টিংক ও মেকলের নামও উল্লেখযোগ্য। মনরো আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা পৃথকীকরণের পক্ষে সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্নওয়ালিশ এবং অন্যান্যরা কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে একক হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে মোগল প্রশাসনের ধাঁচে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মনরোর পন্থা হেরে যায়। ফলে জেলায় গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে একজন মহাশক্তিধর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরের পদ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে মহকুমা পর্যায়েও মহকুমা হাকিমের পদ সৃষ্টিসহ প্রশাসনে বিভিন্ন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে ব্রিটিশরা ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে একটি দর্শন মেনে চলতে শুরু করে, যা ছিল বড় ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার এড়িয়ে চলা (Tinker 1968)। ফলে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা মোগলদের রেখে যাওয়া কাঠামোর উপরই তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। মোগল কাঠামোর উপরেই মূলত ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর স্বাধীনতার তৃতীয় বছরের মধ্যে ভারতে সংবিধান লিখিত হয়ে গেলেও পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালের পূর্বে তা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৬ সালে গৃহীত সংবিধান ১৯৫৮ সালে স্থগিত বা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬২ সালে সামরিক সরকার কর্তৃক আর একটি সংবিধান লেখা হয়, যা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। ফলে পাকিস্তানের পুরো ২৩ বছর (১৯৪৭-১৯৭০) সময় রাজনীতি ও প্রশাসন কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা লাভে ব্যর্থ হয় এবং প্রশাসনে মূলত ব্রিটিশ ধারাবাহিকতাই রক্ষা করা হয়।

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করার পর এক বছরের কম সময়ে একটি সংবিধান রচনা করা হয় এবং স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিভিন্ন সময়ে গঠিত প্রশাসনিক ও চাকরি পুনর্গঠন কমিটি, বেতন ও চাকরি কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর থেকে প্রথম ৩০ বছরে প্রায় দুই ডজন বিভিন্ন কমিটি/কমিশন কাজ করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাঠামো, কার্য ও সেবাদান প্রক্রিয়ায় এসব কমিটি/কমিশনের প্রতিবেদন মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। এমনকি পূর্বের অনেক কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদন গোপনীয় দলিলের মতো সরকারি নথিবন্দী অবস্থায় আছে। কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও সেগুলোর বাস্তব কার্যকারিতা নেই বললেই চলে।

পূর্বতন স্থানীয় সরকার সংস্কার উদ্যোগের অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ যাবত যতগুলো কমিটি/কমিশন কাজ করেছে, তার মধ্যে দুটি কমিশনের প্রতিবেদনকে গবেষণার মান, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনীতি ও প্রশাসনে মৌলিক পরিবর্তন আনার ইঙ্গিতবাহী

হিসেবে অন্য সব প্রতিবেদনের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া যায়। প্রথমটি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ও উপাচার্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ গঠিত Administrative and Services Reorganization Committee (ASRC) বা চৌধুরী কমিটি। দ্বিতীয়টি হলো ১৯৮২ সালের ২ এপ্রিল রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খানের সভাপতিত্বে গঠিত The Committee for Administrative Reorganization/Reform (CARR) বা খান কমিটি। চৌধুরী কমিটি ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। খান কমিটি দুই মাসের কম সময়ের মধ্যে (২২ জুন ১৯৮২) ২৬৮ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করেন। এই দুটি প্রতিবেদন ছাড়াও এ লক্ষ্যে আরও বহু কমিটি/কমিশনের প্রতিবেদন এবং গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। অন্যান্য কমিটি/কমিশনের অবদানকে খাটো না করেও এটুকু বলা যায় যে, প্রতিবেদনের গবেষণা মান ও বিষয়বস্তুর মৌলিকত্বের দিক থেকে এ দুটি প্রতিবেদন এদেশের প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান পেতে পারে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টার ভালো দিক এবং বাংলাদেশের স্বপ্নকল্পনার রূপায়ণে সহজ ও জটিলতামুক্ত একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপরেখা প্রণয়নে মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিশন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সম্পন্ন করেন। মূলত দুটি কারণে এটি সম্ভব হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়: (১) তৎকালীন সরকার কমিশনের কাজে কোনো রকম হস্তক্ষেপ না করে কমিশনকে চিন্তা ও কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। (২) মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা, নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য এই প্রতিবেদনের গুণগত উৎকর্ষের পিছনে মূল নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। চৌধুরী কমিটি সচিবালয় পুনর্গঠন, কর্মপদ্ধতি (Procedure of work), মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর পুনর্গঠন, জেলা ও অন্যান্য মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, বেতন ও চাকরি কাঠামো, বিভিন্ন সার্ভিস ক্যাডারের একত্রীকরণ ও পুনর্বিন্যাস (১৩টি কেন্দ্রীয় ক্যাডার ও ২৭টি প্রাদেশিক ক্যাডার সরকারি কর্মচারিদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ) ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত সুপারিশ প্রণয়ন করেন। চৌধুরী কমিটির সুপারিশসমূহের মধ্যে যা দেশের সরকারি কর্মচারী কাঠামোকে সুসংহত করেছে তা হলো ৭০০ বিভিন্ন বেতন স্কেল ও ৪০টি ক্যাডারকে একটি একক ব্যবস্থার অধীনে আনা, যা সত্যিকার অর্থে ছিল দুরূহ কাজ। ঐ কমিটি সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ ধারার আলোকে মাঠ প্রশাসনের স্তর এবং স্থানীয় সরকার কাঠামোর উপরও অত্যন্ত স্বচ্ছ সুপারিশ প্রণয়ন করেন। চৌধুরী কমিটি দেশের সকল মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা এবং বিভাগীয় স্তরের প্রশাসনিক একক বিলুপ্তির পক্ষে মত দেন। জেলায় একটি শক্তিশালী প্রশাসনের সুপারিশসহ ডেপুটি কমিশনারের কর্মপরিধির একটি নতুন রূপরেখা প্রণয়ন করেন এবং জেলা, থানা ও ইউনিয়ন এই তিন স্তরে স্থানীয় সরকার গঠনের পক্ষে মতামত দেন।[১]

থানা পরিষদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়ার বিষয়টি ১৯৮২ সালে বাস্তবায়িত হলেও চৌধুরী কমিটিই প্রথমবারের মতো কৃষি, গ্রামীণ প্রকৌশল, পশুসম্পদ, স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ স্যানিটেশন, শিক্ষা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায়, মৎস্য উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি থানা পরিষদে স্থানান্তরের সুপারিশ করেন। তা ছাড়া বিভাগ বা বৃহত্তর জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠনের ব্যাপারে চৌধুরী কমিটি সুপারিশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রতিবেদন সাধারণের পাঠ ও পর্যালোচনার জন্য কখনও উন্মুক্ত করা হয়নি। এই প্রতিবেদন পুনর্মূল্যায়ন করা হলে অনেক ক্ষেত্রে নতুন কমিটি গঠন করার প্রয়োজন পড়ে না। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন একটি যুগান্তকারী সংযোজন হিসেবে দেখা হয়, প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন ক্ষেত্রে অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন একই স্থান পেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়নের ব্যাপারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া শোনা গেলেও চৌধুরী কমিটির ব্যাপারে এ জাতীয় কোনো দাবি কখনও শোনা যায় না। খান কমিটির প্রতিবেদন সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটি অনেক ক্ষেত্রে চৌধুরী কমিটির জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন পুনর্বিন্যাসের যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে তাকে ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেছে। চৌধুরী কমিটির একই সুরে তাঁরাও মহকুমা ও বিভাগীয় স্তর বাতিলের সুপারিশ করেন। বাংলাদেশে জনপ্রশাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে এই দুই প্রতিবেদনকে গবেষণা মান ও সুপারিশের বাস্তবতার নিরিখে প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিবেদন হিসেবে স্থান দেয়া যায়।

---

[১]Mohammad Mohabbat Khan(1980) *Administrative Reforms in Bangladesh*, UPL, Dhaka PP-79-122

চৌধুরী কমিটি (১৯৭৩) ও খান কমিটি (১৯৮২) ছাড়াও পরবর্তীতে গঠিত অন্য তিনটি স্থানীয় সরকার কমিশনের উপরও কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ প্রথমত এই তিনটি কমিশনের প্রতিবেদনের বৃহত্তর অংশ বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। দ্বিতীয়ত ঐ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার কাঠামোতে মারাত্মক কিছু অসঙ্গতি রয়ে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তৃতীয়ত এই প্রতিবেদন ও প্রতিবেদন-ভিত্তিক বিভিন্ন আইন ও বিধিগুলোতে স্থানীয় সরকারকে প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়েছে। সামগ্রিক জনপ্রশাসনের জটিল সম্পর্ক এখানে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। এ তিনটি প্রতিবেদনের প্রথমটি হলো তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে ১৯৯২ সালে গঠিত স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশনের প্রতিবেদন, দ্বিতীয়টি হলো অ্যাডভোকেট রহমত আলী এমপির সভাপতিত্বে ১৯৯৭ সালে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিবেদন এবং তৃতীয়টি ২০০৭ সালে গঠিত ড. এ এম এম শওকত আলীর নেতৃত্বে গঠিত কমিশন। চৌধুরী কমিটি ও খান কমিটির তুলনায় এ তিনটি প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহের পিছনে গবেষণা সমর্থন ছিল অপ্রতুল। যেমন নাজমুল হুদা কমিশন ইউনিয়ন ও জেলা দুই স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। কিন্তু তখনই দেশে উপজেলা স্তরের পক্ষে প্রবল জনমত ছিল এবং বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণা কর্মে উপজেলা পদ্ধতি ও ইউনিয়ন পরিষদ এই দুই স্তরের পক্ষে একটি মত বহুলভাবে আলোচিত হচ্ছিল। তা ছাড়া কমিশন সরাসরি মহিলা সদস্য নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডের পরিবর্তে নয়টি ওয়ার্ড করার পক্ষে যে মত দেন, বিভিন্ন গবেষণা কর্মে ইতোপূর্বে এ মতের জোরালো সমর্থন ছিল। কমিশন ঐ সব গবেষণার কোনো উল্লেখ না করেই ঐ গবেষণার ফলাফলসমূহকে সরাসরি সন্নিবেশ করে নেন। তা ছাড়া স্থানীয় সরকারে সংসদ সদস্যের সম্পৃক্ততা, গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো না করে গ্রামকে স্বেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি উদ্যোগের জন্য উন্মুক্ত রাখার পক্ষেও জোরালো মতামত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, যার কোনো পর্যালোচনা বা উদ্ধৃতি কমিশন প্রতিবেদনে দেখা যায়নি। এই জাতীয় একমুখিতা একটি কমিশন প্রতিবেদনের সম্পূর্ণতা ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা কমিয়ে দেয়। রহমত আলী (১৯৯৭) কমিশনের প্রতিবেদনের পরিসর হুদা কমিশনের তুলনায় কিছুটা বিস্তৃত হলেও একই ধরনের সীমাবদ্ধতা থেকে এ প্রতিবেদনও মুক্ত হতে পারেনি। প্রতিবেদন পড়ে মনে হয় সুপারিশগুলো আগে থেকেই তৈরি ছিল, শুধু একটি কমিশন করে বৈধতা দানের প্রয়োজনে এই প্রতিবেদনটি লেখা হয়। সংবিধানের অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করে চার স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো এ প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু দেশে প্রচলিত স্থানীয় সরকার বিষয়ক প্রায় সকল আলোচনা ও গবেষণায় চার স্তরের সমর্থন পাওয়া যায়নি। তেমনিভাবে সংবিধানের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় প্রশাসনিক স্তর, কাঠামো এবং সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে সমসাময়িক গবেষণা ফলাফল ও সুপারিশসমূহের কোনো আলোচনাও এ প্রতিবেদনে নেই। শেষোক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত আইন ইতোমধ্যে পাশ হয়েছে। সংসদে এবং সংসদের বাইরে এসব আইন নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা না হওয়ার কারণে নতুন স্থানীয় সরকার তার বহু প্রত্যাশিত শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার বিষয়ক এবং কমিশনসমূহের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ

স্বাধীনতা লাভের পরপরই বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার আদর্শগত পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৭ নং আদেশ দ্বারা বিদ্যমান সমস্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করা হয়, শুধুমাত্র বিভাগীয় কাউন্সিল ব্যতীত, যেখানে প্রশাসকগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ইউনিয়ন কাউন্সিল ও জেলা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত (পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদ) ও জেলা বোর্ড (পরবর্তীতে জেলা পরিষদ) করা হয়। বিভাগীয় কাউন্সিলকে প্রতিস্থাপন করে বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ড এবং থানার জন্য থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েতকে সার্কেল অফিসসারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়, থানা উন্নয়ন কমিটিকে এসডিও এবং জেলা বোর্ডকে ডিসির নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২২ অনুসারে প্রতিটি ইউনিয়ন কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় এবং তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হয়; প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে তিনজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। এছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। ১৯৭৫ সালের শুরুতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং

সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারি করা হয়, যা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তিনস্তর বিশিষ্ট কাঠামো প্রবর্তন করে: ইউনিয়ন পরিষদ (UP), থানা পরিষদ (TP) এবং জেলা পরিষদ (ZP)। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যক্রমে পরিবর্তন আনা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা হয়। এসডিও'কে ইউনিয়ন পরিষদের যে কোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী, ইউনিয়ন পরিষদ বিচারিক ক্ষমতা লাভ করে এবং গ্রাম আদালত গঠিত হয়, যেখানে চেয়ারম্যান, দুইজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং দুই পক্ষের প্রতিনিধি সদস্য থাকতেন। এটি সুনির্দিষ্ট কিছু দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে। ১৯৮০ সালে গ্রাম সরকার প্রবর্তন করা হয়, যা ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিট ছিল, কিন্তু ১৯৮২ সালে সামরিক আইন দ্বারা তা বিলুপ্ত করা হয়।

১৯৮২ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য ১০ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়, যার সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৮২ সালের ২৩ অক্টোবর থানা প্রশাসনের পুনর্গঠনের জন্য একটি প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। ১৯৮২ সালের ২৩ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ জারি করা হয় এবং থানাকে প্রশাসনের মূল স্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তীকালে, থানার নাম পরিবর্তন করে উপজেলা করা হয়। উপজেলা পরিষদকে কর আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং এটি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়। ১৯৮৮ সালে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন পাস করা হয় এবং ১২টি বাধ্যতামূলক ও ৬৯টি ঐচ্ছিক কার্যাবলি জেলা পরিষদের অধীনে আনা হয় ।
১৯৯১ সালে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পর স্থানীয় সরকার কাঠামোর পর্যালোচনার জন্য ২৪ নভেম্বর ১৯৯১ সালে তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশন উপজেলা পরিষদ বাতিলের সুপারিশ করে এবং ১৯৯১ সালে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করা হয়।

১৯৯৬ সালে অ্যাডভোকেট রহমত আলীকে প্রধান করে আরেকটি 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠিত হয়। কমিশন চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামোর সুপারিশ করে: গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ। কমিশন আরও সুপারিশ করে যে বিদ্যমান ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে এবং সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক ক্ষমতা সুপারিশ করার জন্য একটি অর্থ কমিটি গঠন করা উচিত। কমিশন উপজেলাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে খুঁজে পায়। বিশেষ করে মহকুমাকে প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বিলুপ্ত করার পর থানা/উপজেলার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। সাংবিধানিক বিধান এবং জনস্বার্থের কারণে কমিশন উপজেলা পর্যায়ে একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার সংস্থা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা খুঁজে পায়। তবে, রহমত আলী কমিশনের এই প্রতিবেদন প্রকৃত অর্থে কখনও কার্যকর হয়নি। তবে, ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন, ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন এবং ২০০০ সালে জেলা পরিষদ আইন পাস করে।

২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কারও উপেক্ষা করা হয়নি। স্থানীয় সরকারকে ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করার জন্য ২০০৭-এ ড. এ. এম. এম. শওকত আলীর নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ কমিটি নামে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। এর সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে জনবল বৃদ্ধি, কর্মকর্তাদের ACR লেখার ক্ষমতা প্রদান, স্থানীয় আয়ের উৎস বৃদ্ধি, ঘূর্ণায়ন পদ্ধতিতে মোট নির্বাচিত আসনের ৪০ শতাংশে মহিলা প্রতিনিধিত্বের বিধান, নাগরিকত্ব সনদ ইস্যু করা, গ্রাম সরকার (গ্রাম সরকার) বিলুপ্ত করা এবং সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সংস্থার উপদেষ্টা করার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা। গুরুত্বপূর্ণভাবে, কমিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এবং এই কমিশনের কাছে জবাবদিহি করতে একটি "স্থায়ী স্বাধীন কমিশন" প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। এছাড়া, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আইন সংশোধন করা হয় এবং ১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনটি পৃথক কমিশন গঠিত হয়েছে, এবং প্রত্যেকটি কমিশনই একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সেই সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রথম কমিশন, নাজমুল হুদার নেতৃত্বে (১৯৯১), দ্বিতীয় কমিশন, অ্যাডভোকেট রহমত আলীর নেতৃত্বে (১৯৯৬), এবং তৃতীয় কমিশন, এ এম এম শওকত আলীর নেতৃত্বে (২০০৭), তাদের গবেষণা ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি স্থায়ী কমিশনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিল। শওকত আলী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, ২০০৮ সালের শেষ দিকে সাবেক সচিব ফয়জুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনটির উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, সমন্বয় সাধন, নীতি সুপারিশ প্রদান এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এটি মূলত স্থানীয় সরকারগুলোর কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে এবং নীতিগত সমন্বয় সাধন করতে গঠিত হয়েছিল। ২০০৭-২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশনের যে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছিল, তা পরবর্তীতে গঠিত আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি, ফলে কমিশনটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন তদারকি এবং নীতিগত দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা ব্যাহত হয়। তবে বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে কমিশন ৪ মাসের কম সময়ের কর্মকান্ডের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা মহামান্য রাষ্ট্রপতির বরাবরে পেশ করা সমীচীন মনে করে। কমিশনের সেই প্রতিবেদনে মূল যে বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছিলো, সেগুলো হলো-

স্থানীয় সরকার সংস্কার বিষয়ক বিগত কমিশন/কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সংস্কার সুপারিশমালা

১. ২০০৮ সনে গঠিত ফয়জুর রাজ্জাক কমিটির সুপারিশ

স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন প্রসঙ্গে

২০০৮ সালের স্থানীয় সরকার কমিশন তাদের প্রতিবেদনে স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। কমিশনের মতে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, স্থানীয় উন্নয়ন এবং স্থানীয় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশকে নিশ্চিত করতে একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা অপরিহার্য ছিল। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল এবং জোটসমূহও এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছিল। যদিও প্রথমবারের মতো গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন কিছু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করেছে, তবুও এটি একটি সাংগঠনিক কাঠামোর সূচনা ছিল। কমিশন আশা প্রকাশ করে যে, ভবিষ্যতে সরকার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে নতুন আইন প্রণয়ন করে দীর্ঘদিনের লালিত এই ধারণাটিকে পুনরায় কার্যকর করতে সচেষ্ট হবে।

স্থানীয় সরকার বিষয়ে সাংবিধানিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

তৎকালীন স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন সুপারিশ করে যে, স্থানীয় সরকার বিষয়ে সংবিধানে কিছু সংস্কার আনা প্রয়োজন। সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯, ৬০ সহ আরও কিছু ধারা ও উপ-ধারায় স্থানীয় সরকার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা স্বাধীনতার পর থেকে কোনো সরকারের আমলে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। সংবিধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অবাধে কাজ করার উপযোগী করার জন্য কোনো সুস্পষ্ট গ্যারান্টি ক্লজ না থাকায়, স্থানীয় সরকারের ভাগ্য রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরেছে। এর ফলে, গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তর দেখা যায়, এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলো আইন অনুযায়ী গঠিত না হয়ে ভিন্নভাবে গঠিত হতে থাকে। কমিশন আরও উল্লেখ করে যে, সংবিধানে ‘স্থানীয় সরকার’ শব্দটি বাংলা পাঠে অনুপস্থিত, যা একটি লক্ষণীয় বিষয়। কমিশন ভারত সরকারের সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনীর উদাহরণ দেয়, যেখানে স্থানীয় সরকারকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার আওতায় আনা হয়েছে।

এই লক্ষ্যে কমিশন নিম্নলিখিত সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাব করে

- সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি পাঠে ‘স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান’ ও ‘স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান’ শব্দগত পার্থক্য দূর করা।
- সংবিধানের ১৫২ নং অনুচ্ছেদে ‘প্রশাসনিক একাংশ’ এর সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা, যাতে স্থানীয় সরকারের স্তর ও সংখ্যা নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো দ্বিধা না থাকে।

- প্রত্যেক প্রশাসনিক এককে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তৈরি করা সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক করা যায় কিনা, তা বিবেচনা করা এবং প্রশাসনিক একক ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সমান্তরাল অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করে সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা। এক্ষেত্রে, একটিকে অপরের অধীনে কাজ করার বিধান রাখার প্রস্তাব করা হয়।
- সংবিধানে স্থানীয় সরকার কমিশন, স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব ও কার্যাবলি এবং অর্থায়ন সম্পর্কিত সাংবিধানিক নির্দেশনা যুক্ত করা।

আইনের পরিবর্তন ও সংস্কার প্রসঙ্গে

২০০৮ সালের কমিশন মনে করে যে, বর্তমানে প্রচলিত পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, পার্বত্য জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রায় ১৪০টির মতো আইন ও অধ্যাদেশ রয়েছে। এছাড়াও, আরও শতাধিক অধঃস্তন আইন বিদ্যমান। এই আইনগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং একই বিষয় বিভিন্ন আঙ্গিকে পুনরাবৃত্তি করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিষয়ক আইনের সঠিক প্রয়োগ, ব্যাখ্যা ও সংশোধন সহজ করার জন্য কমিশন এই পৃথক আইনসমূহ বাতিল করে একটি একীভূত ও সমন্বিত ‘স্থানীয় সরকার আইন’ প্রণয়নের প্রস্তাব করে।

প্রশাসনিক উন্নয়ন ও পরিবর্তন

প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি স্বতন্ত্র জনবল নীতি তৈরি করার সুপারিশ করে। বর্তমানে বিভিন্ন সার্ভিসের কর্মকর্তাদের প্রেষণে এনে কাজ চালানোর কারণে স্থানীয় পরিষদগুলোতে ধারাবাহিক প্রশাসন, সেবা ও উন্নয়নে পেশাদারিত্বের অভাব দেখা যায়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায়, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি দক্ষ জনবল কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই জনবল একটি কেন্দ্রীয় এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ করা উচিত এবং তাদের কর্মক্ষেত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে, যেমন ২০ বছর স্থানীয় সরকারে কাজের অভিজ্ঞতার পর তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির সুযোগ রাখার প্রস্তাব করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন ও গঠন পদ্ধতির পরিবর্তন

নির্বাচন ও গঠন পদ্ধতির পরিবর্তনে কমিশন বর্তমান স্থানীয় পরিষদগুলোর ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাঠামোর সমালোচনা করে, যেখানে কাউন্সিলর বা সদস্যদের ভূমিকা সাধারণত কম থাকে। বিকল্প হিসেবে, কমিশন জাতীয় সংসদের মতো সদস্য বা কাউন্সিলরদের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করার এবং সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচন না করার বিষয়টি বিবেচনা করার প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীতে, নির্বাচিত কমিশনার ও সদস্যদের ভোটে মেয়র বা চেয়ারম্যান নির্বাচনের কথা ভাবা যেতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টিও কমিশন আলোচনা করে। নির্বাচন দলীয় বা নির্দলীয় ভিত্তিতে যাই হোক না কেন, চেয়ারম্যান/মেয়র পদে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে বলে কমিশন মনে করে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন প্রসঙ্গে

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের ক্ষেত্রে কমিশন জাতীয় সরকারের সম্পদ বরাদ্দের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবের কথা উল্লেখ করে। ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার উদাহরণ দিয়ে, যেখানে রাজ্য অর্থ কমিশন স্থানীয় সরকারের বাজেট বরাদ্দের নীতিমালা নির্ধারণ করে, কমিশন বাংলাদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করে। স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতি পাঁচ বছরের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে কমিশন স্থানীয় সরকারের অর্থ ও অর্থায়ন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেয়। পরিকল্পনা কমিশনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে স্থানীয় ও জাতীয় পরিকল্পনার

মধ্যে সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়, যেখানে স্থানীয় পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সংস্কার

বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে কমিশন উপজেলা পর্যায়ে আদালত পুনঃপ্রবর্তনের সুপারিশ করে। ১৯৯১ সালে উপজেলা থেকে আদালত প্রত্যাহার করার পর, উপজেলা পর্যায়ে আদালত ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। অবকাঠামো বিদ্যমান থাকায়, উপজেলা পর্যায়ে আদালত কার্যকর করা সম্ভব। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় কাঠামো পুনর্গঠন করা জরুরি। এছাড়াও, বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের কাছে সহজলভ্য ও ব্যয়সাশ্রয়ী করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত পুনঃস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জেলা ও রাজধানী কেন্দ্রিক আদালত ব্যবস্থার চাপ কমাতে এবং গ্রামীণ জনগণের সুবিধার জন্য উপজেলা পর্যায়ে আদালত স্থাপন করা সময়ের দাবি। উপজেলা থেকে আদালত প্রত্যাহারের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থার একটি উপ-কাঠামো তৈরি করা দরকার। উপজেলা পর্যায়ে আদালত সম্প্রসারণের পাশাপাশি, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি হিসেবে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিচার কাঠামো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

জেলা পরিষদ ও জেলা পরিকল্পনা কাঠামো পুনর্বিবেচনা

জেলা পরিষদকে কার্যকর স্থানীয় সরকার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কমিশন র‍্যাডিক্যাল সংস্কারের প্রস্তাব দেয়। ২০০০ সালের জেলা পরিষদ আইন এবং শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের আলোকে কিছু মন্তব্য ও সুপারিশ পেশ করে। জেলা পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে কমিশন মনে করে, জেলা পর্যায়ে একটি সার্বিক ও সমন্বিত পরিকল্পনা ব্যবস্থা চালু করা গেলে জেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম দৃশ্যমান করা সম্ভব হবে এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনায়ন করা যাবে। সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে একটি পরিপত্র জারি করে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের বিভাগীয় প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহ জেলা পরিষদে পেশ করার নির্দেশ দিতে পারে। একই সাথে, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষনে জেলা পরিষদের ভূমিকা স্পষ্ট করা যেতে পারে।

পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পুনর্গঠন

পার্বত্য জেলাসমূহের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সমতল ভূমি থেকে ভিন্ন এবং জটিল। এখানে ইউনিয়ন পরিষদের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী হেডম্যান-কারবারী প্রথা বিদ্যমান। এই পরিস্থিতিতে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করলে সমস্যা আরও জটিল হতে পারে। কমিশন পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের সার্বিক পুনর্বিন্যাস করার সুপারিশ করে, যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলোর কাজের মধ্যে সমন্বয় আনা প্রয়োজন।

২. নাজমুল হুদা কমিশন (১৯৯১) এর প্রধান সুপারিশসমূহ

১. **উপজেলা ব্যবস্থা বিলোপ:** এই কমিশন উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করার সুপারিশ করে। তাদের যুক্তি ছিল, উপজেলা পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে, জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন কাজ করতে পারেনি, জাতীয় সরকারের অনুদানের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল এবং এখানে অনেক দুর্নীতি হয়েছে।
২. **দ্বি-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো:** গ্রামীণ এলাকার জন্য দুই স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রস্তাব করা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়।
৩. **থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি:** ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়।
৪. **গ্রাম সভা গঠন:** গ্রামকে ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক একক ধরে গ্রামসভা গঠনের কথা বলা হয়। এই সভায় ১০ জন সদস্য থাকবেন, যারা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৫. **আইনি পরিবর্তন:** কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, ১৯৯১ সালে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) (রদ) অধ্যাদেশ জারি করে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়। এছাড়া, ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন প্রণয়ন করে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হয়। জেলা পরিষদ ১৯৮৮ সালের আইন অনুযায়ী কার্যক্রম চালায়।
৬. **থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি (TDCC):** একটি বিশেষ নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়, যা ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করে।

৩. রহমত আলী কমিশন (১৯৯৬) এর প্রধান সুপারিশগুলো ছিল

১. **স্থানীয় সরকারের স্তরবিন্যাস:** কমিশন গ্রামীণ এলাকায় ত্রিস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই তিনটি স্তর হলো: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। শহরাঞ্চলে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়, যা পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নিয়ে গঠিত।
২. **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলি ও দায়িত্ব:** ইউনিয়ন পরিষদকে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ, যেমন- রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা প্রদান, কৃষি উন্নয়ন, ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়। উপজেলা পরিষদকে কয়েকটি ইউনিয়নের সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রমের সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেলা পরিষদকে জেলার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে শহরের নাগরিক সেবা প্রদান, যেমন- রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, আবর্জনা অপসারণ, ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়।
৩. **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন:** ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে সুপারিশ করা হয়। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন, অর্থাৎ নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও পৌরসভা মেয়রদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। সকল স্তরে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়।
৪. **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা ও স্বায়ত্তশাসন:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের কার্যাবলি ও দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও স্বায়ত্তশাসন প্রদানের সুপারিশ করা হয়। তাদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয় এবং তাদের বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।
৫. **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ক্ষমতা:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের কার্যাবলি ও দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করা হয়। তাদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়, যেমন কর আরোপের ক্ষমতা, সরকারি অনুদান, ইত্যাদি।
৬. **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবল:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের কার্যাবলি ও দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এই জনবলকে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে তোলার কথা বলা হয়।
৭. **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়। এই ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।
৮. **অন্যান্য সুপারিশ:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ করা হয়।

৪. শওকত আলী কমিশন (২০০৭) এর প্রধান সুপারিশসমূহ

স্তর বিন্যাস ও জনবল কাঠামো

- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তিন স্তর বিশিষ্ট কাঠামো প্রবর্তন এবং প্রস্তাবিত খসড়া অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।
- শহর অঞ্চলে বিদ্যমান পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখা।
- নতুন পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি, এলাকা সংযোজন, এলাকার পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিরপেক্ষ মানদন্ড প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা।
- স্থানীয় সরকার চাকরি কাঠামো গঠন করা।
- প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনভিত্তিক জনবল কাঠামো স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কার্যপরিধির আলোকে নির্ধারণ করা।
- জনবল কাঠামোর আওতায় আনুষঙ্গিক অফিস সরঞ্জামাদিসহ যানবাহনের সংখ্যা নিরূপণ এবং টেবিল অব অর্গানাইজেশন এন্ড ইকুইপমেন্ট (টিওএন্ডই) অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রের অনুন্নয়ন ব্যয় বাজেটে প্রতিফলন ও অনুমোদন।
- স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যমান কাঠামোর অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের দায়িত্ব, প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে প্রদান।
- চাকরি কাঠামোর বিষয়ে বিদ্যমান সরকারি নিয়ম পরিবর্তনপূর্বক স্থানীয় সরকারের জন্য নতুন নিয়ম প্রবর্তন করে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারের চাকরি ও জনবল কাঠামো সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা প্রদান।
- স্থানীয় পরিষদের জন্য প্রণিতব্য চাকরি বিধিতে সচিব ও হিসাব রক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা হিসেবে কম্পিউটার পরিচালনার দক্ষতা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এ জন্য তাদেরকে একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রদান।
- প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একটি হিসাব রক্ষকের পদ সৃষ্টি করে কম্পিউটার জ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ইউনিয়ন পরিষদের কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মেটানোর জন্য বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে সরকার কর্তৃক যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া ও পরিষদ গঠন

- জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং নির্বাচক মন্ডলীর গঠন ২০০০ সনের জেলা পরিষদ আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী হতে পারে, তবে জেলা পরিষদেও সরাসরি নির্বাচিত সদস্যের বিধান সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।
- জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এ জন্য জেলা পরিষদে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা জেলায় অন্তর্ভুক্ত উপজেলার সংখ্যা ভেদে ২০ থেকে ৩৫ রাখা যেতে পারে।
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে চেয়ারম্যান সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।
- উপজেলার জন্য প্রতি ইউনিয়ন থেকে একজন সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ থেকে ১৫-তে উন্নীত হতে পারে।
- বিদ্যমান আইনে সকল স্তরে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা সদস্য নির্বাচিত হতো। বিদ্যমান শতকরা ৩০ ভাগের বিধান বৃদ্ধি করে শতকরা ৪০ ভাগ আসন ঘূর্ণায়মান ভিত্তিতে পরবর্তী তিনটি নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত রাখার বিধান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আগামী তিনটি নির্বাচনের পর নির্ধারিত আসনের প্রথা বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অযোগ্যতার ক্ষেত্র বিদ্যমান আইনের চেয়ে অধিকতর প্রসারিত করা হয়েছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য, সুনাগরিকদের নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি।
- নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা।

সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ করেছে

- ইউনিয়ন পরিষদে বিদ্যমান নির্বাচন প্রথা অপরিবর্তিত রাখা।
- উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ১৯৯৮ সনে প্রণীত আইনের ধারা ৬ অপরিবর্তিত রেখে প্রতি ইউনিয়ন থেকে একজন সদস্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত কর।
- জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য ২০০০ সালের জেলা পরিষদ আইনের ১৭ ধারা অক্ষুণ্ন রেখে জেলা পরিষদে সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা এবং জেলা পরিষদের সরাসরি নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা জেলার শ্রেণিভেদে বিদ্যমান আইনের ৪(গ) ধারা ব্যতীত সর্বনিম্ন ২০ এবং সর্বোচ্চ ৩৫ করা।
- বিদ্যমান জেলাগুলোকে উপজেলার সংখ্যা অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করে জেলা পরিষদে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার বিষয়টি নিষ্পত্তি করা। 'ক' শ্রেণিভুক্ত জেলায় ৩৫ জন, 'খ' শ্রেণিভুক্ত জেলায় ২৫ জন এবং 'গ' শ্রেণিভুক্ত জেলায় ২০ জন সদস্য সরাসরি নির্বাচিত করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ থেকে ১৫তে উন্নীত করা।
- সকল স্তরে মহিলা সদস্য/কাউন্সিলরদের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ আসন ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করা এবং এ ঘূর্ণায়মান ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে গেজেটে প্রকাশ করা।
- আগামী পরপর তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্ধারিত প্রথা বিলুপ্ত করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় (যদি থাকে) প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন নির্ধারণ করা।
- বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রস্তাবিত যোগ্যতা অযোগ্যতার শর্তসমূহ অনুসরণ করা।
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনার জন্য অপর একটি সমন্বিত নির্বাচন বিধি প্রণয়ন কর।
- প্রতি বিধিমালায় নির্বাচনী ব্যয়সীমার বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং এ প্রসঙ্গে সারণিতে বর্ণিত ব্যয়সীমা বিবেচনা করা।
- যেকোন স্তরের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত নির্ধারিত ছক ব্যবহার করা।
- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত খসড়া গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর ধারা ১৪(১) (গ) অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে সকল স্তরের প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রে কতিপয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণ

- প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন এবং নতুন আঙ্গিকে স্থানীয় সরকার পরিদর্শন ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা।
- ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে ওয়ার্ড সভা করার বিধান কার্যকর করা।
- পৌরসভা পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততাসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু কিছু পৌরসভায় গঠিত 'শহর সমন্বয় কমিটি'র কাঠামো এবং কার্যক্রম আরো উন্নত ও সম্প্রসারিত করা।

- সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক অফিসসে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে 'আঞ্চলিক উন্নয়ন ও সেবা সমন্বয় কমিটি' গঠন করে সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা ও কার্য সম্পাদন পদ্ধতিকে যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা।
- বাজেট প্রণয়নে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য বিধান প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে সন্নিবেশিত করা।
- জেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের অনুমোদনের ক্ষমতা জেলা পরিষদকেই প্রদান করা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্পসমূহ উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হওয়ার বিদ্যমান বিধান অপরিবর্তিত রাখা।
- বিদ্যমান জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম অক্ষুন্ন রাখা যায়। জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভাপতি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর জেলা পরিষদের সাধারণ অথবা বিশেষ অধিবেশনে জেলার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড উপস্থাপন করবেন এবং পরিষদের মতামত অনুসারে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধিক্ষেত্রের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে ঐ প্রতিষ্ঠান ও এলাকার জনসাধারণকে অবহিত রাখা এবং প্রয়োজনে মতামত গ্রহণ করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত সকল প্রকল্প সম্পর্কে স্থানীয় উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে অবহিত রাখা।
- প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক "নাগরিক সনদ" প্রকাশ ও প্রতি বছর হালনাগাদ নবায়ন করা।
- কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য আদর্শ নাগরিক সনদ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রণয়ন করা।
- সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।
- প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নতর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং সরবরাহযোগ্য তথ্যাদির একটি তালিকা প্রকাশ করা।
- সকল স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যভার গ্রহণ করার পূর্বে তাদের সম্পদ বিবরণী হলফ এবং দাখিল প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারি করা।
- যে সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি আয়কর প্রদান করে থাকেন তাদেরকে অনুমোদিত ছকের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বছরের আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত বিবরণীর একটি সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করার সুযোগ দেয়া।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি গ্রহণযোগ্য সম্পদ বিবরণী ছক প্রণয়ন করা।

ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আইন শৃঙ্খলা

- পৌরসভা পর্যায়ে নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে 'মেয়র' হিসেবে এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কমিশনারকে 'কাউন্সিলর' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।
- গ্রাম আদালত এবং পৌর এলাকার বিরোধ মীমাংসা বোর্ডের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনবোধে বিচারিক ক্ষমতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন।
- জেলা ও দায়রা জজের অধীনে পরিচালিত আইনি সহায়তা তহবিলের ব্যবহার সংক্রান্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনে এ তহবিল জেলা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালনা করা।
- প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করার পর গ্রাম পুলিশ আইন প্রণয়ন এবং এ আইন প্রণয়নের পর ১৯৬৮ সালের গ্রাম পুলিশ বিধিমালাও হাল নাগাদ করা।
- বিদ্যমান ইউনিয়ন পরিষদ আইনে বর্ণিত গ্রাম পুলিশের ক্ষমতা এবং কর্তব্য অপরিবর্তিত রাখা।
- স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য পৌরসভা পর্যায়ে 'পৌর পুলিশ' গঠন করা; পৌর পুলিশ পরিচালনার জন্য একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ করা।

- আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরকে বিকেন্দ্রীভূত করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণে রাখা; আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনী ও গ্রাম পুলিশকে একটি সমন্বিত বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয়া।
- সার্বিকভাবে পুলিশ প্রবিধান হালনাগাদ করা; এ কাজ সম্পন্ন করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হলে বিদ্যমান পুলিশ প্রবিধানের ৩২ এবং ৩৩ ধারা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের (২০২৪-২০২৫) অধীনে গঠিত বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কার সম্পর্কিত আলোচনা ও সুপারিশসমূহ:

নির্বাচনী সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এবং সাংবিধানিক সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত প্রস্তাবনা নিচে দেওয়া হলো:

৫. বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন

সারসংক্ষেপ (৪ পৃষ্ঠা)

৪. আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ:

৪.১. সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধনীর মাধ্যমে রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। তবে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) এমনভাবে বজায় রাখতে হবে, যেন স্থায়ী বেঞ্চগুলো স্থাপনের কারণে দেশের সর্বত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার কোন ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা বিভাজিত (fragmented) না হয়, এবং রাষ্ট্রের একক (Unitary) চরিত্র ক্ষুণ্ন না হয়।

৪.২. উপজেলা সদরের ভৌগলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, জেলা-সদর থেকে দূরত্ব ও যাতায়াত ব্যবস্থা, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিন্যাস এবং মামলার চাপ বিবেচনা দেশের বিভিন্ন উপজেলায় সিনিয়র সহকারী জজ ও প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত স্থাপন।

১৭. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

১৭.২ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসসের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অবিলম্বে বাংলাদেশ আইন কমিশনের প্রস্তাবিত সালিশ আইনের সংশোধনীগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য অংশীজনদের সাথে আলোচনাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৯. গ্রাম আদালত

গ্রাম আদালত গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা দূরীকরণ। গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম বিচারিক মান রক্ষার জন্য করণীয় নির্ধারণ। গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা। গ্রাম আদালতের উপর বিচারিক তত্ত্বাবধান ও তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসসার এর সভাপতিত্বে একটি তদারকি কমিটি গঠন করা।

২৩. আইন পেশার সংস্কার

২৩.২ বার কাউন্সিল আদেশে আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণের সংজ্ঞা স্পষ্টীকরণ। ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ঢাকায় স্থায়ীভাবে ৫ টি এবং ঢাকার বাইরে প্রতিটি জেলায় একটি করে ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা। ট্রাইব্যুনালের গঠন সংশোধন করে সেখানে একজন বিচারক এবং দুইজন আইনজীবী সদস্য নিয়োগদান।

৬. সংবিধান সংস্কার কমিশন

সারসংক্ষেপ (১০ পৃষ্ঠা)
স্থানীয় সরকার

১. কমিশন সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই) আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই-এর) সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।

২. কমিশন সুপারিশ করছে, যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীন হবে। যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।

৩. এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। যদি প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। উক্ত বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বাজেটে উল্লিখিত ঘাটতি বরাদ্দ দিতে নির্দেশ দিবে।

৪. কমিশন প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন: (অ) প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; (আ) প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; (ই) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।

৫. কমিশন এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করছে।

৬. সংস্কার কমিশন একটি স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করছে যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।

প্রথম অধ্যায়- বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা (৩৮ পৃষ্ঠা)
৬.৩ স্থানীয় সরকার

সুশাসন এবং কার্যকর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করার জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেহেতু সংবিধান স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর ধরন স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেনি, তাই বিদ্যমান অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকরিতার অভাব রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদা ও ক্ষমতা সাধারণ আইনের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ আমলাতন্ত্রের অধীনে রাখা হয়েছে। জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসসার (ইউএনও) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ধারণ করেন। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। সংবিধানে তাদের মর্যাদা ও কাজের রূপরেখাসহ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের স্পষ্ট নির্দেশিকা দিতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়- সুপারিশসমূহ (৫৯ পৃষ্ঠা)
৬. স্থানীয় সরকার

৬.১ ক্ষমতায়ন

৬.১.১ কমিশন সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই) আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে। জাতীয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।

৬.১.২ কমিশন সুপারিশ করছে, যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীন হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।

৬.১.৩ তহবিল ও বাজেট

(অ) এলজিআই ট্যাক্স, চার্জ, ফি ইত্যাদি আরোপ করে স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। সংগৃহীত তহবিল তার বাজেটের বেশি হলে, উদ্বৃত্ত অর্থ ভবিষ্যতের ঘাটতি পূরণের জন্য সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে রাখা হবে।

(আ) যদি প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। উক্ত বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বাজেটে উল্লিখিত ঘাটতি বরাদ্দ দিতে নির্দেশ দেবে।

(ই) আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, আইনসভার একটি নতুন উচ্চকক্ষ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, কমিটির সকল কার্যাবলি স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হবে।

৬.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

কমিশন দক্ষ এবং কার্যকর স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করতে, সকল স্তরের এলজিআই সংবিধানে উল্লেখ থাকার সুপারিশ করছে। বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত এলজিআই থাকবে-

(অ) বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন পরিষদ;
(আ) বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি উপজেলা পরিষদ;
(ই) পৌরসভা; এবং
(ঈ) সিটি কর্পোরেশন।

৬.৩ জেলা সমন্বয় কাউন্সিল

কমিশন প্রতিটি জেলায়, একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা সেই জেলার মধ্যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। সিটি কর্পোরেশন 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর অংশ হবে না, কেননা অনুরূপ উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে। 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর কাঠামো, দায়িত্ব এবং কাজের পরিধি প্রসঙ্গে কমিশন নিমেণাক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে –

৬.৩.১ "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" একটি নির্দিষ্ট জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর নিম্নলিখিত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে –

(অ) প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান;
(আ) প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; এবং
(ই) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান।

"জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" এর সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে চারজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন, যারা প্রত্যেকে এক বছর মেয়াদে কাউন্সিলের সভায় পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করবেন।

৬.৩.২ প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের একটি 'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল' থাকবে যা মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও সকল কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

৬.৩.৩ জেলা সমন্বয় কাউন্সিলের নিম্নলিখিত কার্যাবলি থাকবে-

(অ) সমগ্র জেলা বা জেলার মধ্যে একাধিক এলজিআই-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় করা এবং এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি এলজিআই থেকে তহবিল বরাদ্দের সমন্বয় করা;

(আ) জেলার অমত্মর্গত প্রতিটি এলজিআই-এর বাজেট প্রণয়নে সহায়তা ও তহবিল সংগ্রহে পারস্পরিক সহযোগিতা করা;

(ই) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য উপরোল্লিখিত ৩.২.১ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্বাচকমণ্ডী (ইলেক্টোরাল কলেজ) এর অংশ হিসেবে ভোট প্রদান করা; এবং

(ঈ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য সকল কার্য সম্পাদন করা।

৬.৪ নির্বাচন

(অ) কমিশন স্থানীর সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে কোনো প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ না করার সুপারিশ করছে;

(আ) কমিশন এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করছে।

৬.৫ স্থানীয় সরকার কমিশন

৬.৫.১ কমিশন একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।

৬.৫.২ কমিশন সুপারিশ করছে যে,

(অ) স্থানীয় সরকার কমিশন সকল এলজিআই তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে;

(আ) স্থানীয় সরকার কমিশনের কাছে অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতা থাকবে এবং প্রমাণিত হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ বা অপসারণসহ যেকোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে; এবং

(ই) এলজিআই সমূহের মধ্যে, কিংবা এলজিআই বা কোনো সরকারি বিভাগ কর্তৃক একে ওপরের বিরুদ্ধে অসহযোগিতাসহ অন্য যে কোনো অভিযোগ করলে, স্থানীয় সরকার কমিশনের উভয় পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে যা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৭. জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

সারসংক্ষেপ (১৩ পৃষ্ঠা)

৬.১১ 'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসসার' পদবি পরিবর্তন: 'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসসার' পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'উপজেলা কমিশনার' (Sub-District Commissioner, SDC) ও 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' (District Magistrate & District Commissioner, DC) করার জন্য সুপারিশ করা হলো। 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবি পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা) করা যেতে পারে।

৬.১৩ উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন: উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা হলে সাধারণ নাগরিকগণ অনেক বেশি উপকৃত হবে। এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

৬.১৯ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা

(ক) দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং সরকারের কার্যপরিধি সুবিস্তৃত হওয়ার ফলে বর্তমান প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার কাঠামো যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় না। অপরদিকে, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় মন্ত্রণালয় পর্যায়ে খুঁটিনাটি বহু কাজ সম্পাদন করা হয়। ক্ষমতার প্রত্যর্পণ(ডেলিগেশন) বিবেচনায় দেশে বিশাল জনসংখ্যার পরিষেবা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এর ফলে এককেন্দ্রীক সরকারের পক্ষে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ হ্রাস পাবে। পাশাপাশি রাজধানী ঢাকা শহরের ওপর চাপ হ্রাস পাবে।

(খ) রাজধানী ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ও পরিষেবার ব্যাপ্তির কথা বিবেচনায় রেখে নয়া দিল্লীর মতো ফেডারেল সরকার নিয়ন্ত্রিত ‘ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট’ বা ‘রাজধানী মহানগর সরকার’ (Capital City Government) গঠনের সুপারিশ করা হলো। অন্যান্য প্রদেশের মতই এখানেও নির্বাচিত আইন সভা ও স্থানীয় সরকার থাকবে। ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারয়ণগঞ্জকে নিয়ে ‘ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট’-এর আয়তন নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৬.২০ জেলা পরিষদ বাতিল: স্থানীয় সরকারের একটি ধাপ হিসেবে জেলা পরিষদ বহাল থাকবে কিনা সে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা রয়েছে। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কখনোই নাগরিকদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হননি। কিছু জেলা পরিষদ বাদে অধিকাংশেরই নিজস্ব রাজস্বের শক্তিশালী উৎস নেই। ফলে অধিকাংশ জেলা পরিষদ আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সেহেতু জেলা পরিষদ বাতিল করা যেতে পারে। জেলা পরিষদের সহায়-সম্পদ প্রস্তাবিত সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারকে হস্তান্তর করা যেতে পারে।

৬.২১ পৌরসভা শক্তিশালীকরণ: পৌরসভার গুরুত্ব বিবেচনায় স্থানীয় সরকার হিসেবে একে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য সুপারিশ করা হলো। পৌরসভা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে। কারণ চেয়ারম্যান একবার নির্বাচিত হলে মেম্বারদের আর গুরুত্ব দেয় না।

৬.২২ উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা

(ক) স্থানীয় সরকার হিসেবে উপজেলা পরিষদকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তবে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বাতিল করা যেতে পারে;

(খ) উপজেলা পরিষদকে আরো জনপ্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা যেতে পারে;

(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশোনার ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ করা হলো। এর উদ্দেশ্য তাকে রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে রাখা। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে; এবং

(ঘ) ভূমি ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণির একজন ভূমি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কর্মরত কানুনগোদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অধীনে তাদের পদোন্নতি ও পদায়ন করা যেতে পারে। এরূপ পদোন্নতির পরীক্ষা পিএসসি-র মাধ্যমে হতে হবে। পরবর্তীতে তারা পদোন্নতি পেয়ে ২৫ শতাংশ সহকারী কমিশনার (ভূমি) হতে পারবে।

৬.২৩ ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার: ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯-১১ করা যেতে পারে। প্রতিটি ওয়ার্ডে দুইজন সদস্য নির্বাচিত হবেন, যাদের মধ্যে একজন অবশ্যই মহিলা হতে হবে বলে বিধান করার সুপারিশ করা হলো। এর ফলে একদিকে মহিলাদের ৫০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব এবং তাদের কর্ম এলাকা সুনিশ্চিত হবে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন মেম্বারদের ভোটে। কারণ চেয়ারম্যান একবার নির্বাচিত হলে মেম্বারদের আর গুরুত্ব দেয় না।

৬.২৪ ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর দায়িত্ব দেওয়া:

(ক) উপানুষ্ঠানিক ও মসজিদভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদকে দেওয়া যেতে পারে;
(খ) ইউনয়ন পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কৃষি ও পানি বিষয়ক কমিটি গঠন করা যেতে পারে। একইভাবে পরিষেবা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা কমিটিসহ ও অন্যান্য কমিটি গঠন করা যেতে পারে;
(গ) ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমানে যে গ্রাম আদালত বা সালিশী ব্যবস্থা রয়েছে তাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করা হলে গ্রাম পর্যায়ে মামলা-বিরোধ ইত্যাদি কমে আসবে; এবং
(ঘ) এলাকার জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গনশুনানির মাধ্যমে এসকল কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটিসমূহের কার্যক্রমে তাদের উপস্থিত থাকার সুযোগ দিতে হবে।

১২.৭ জেলা ও উপজেলার সাথে কেন্দ্রের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপন

(ক) স্থানীয় ই-গভর্নেন্স সিস্টেমের সাথে কেন্দ্রীয় ওয়েব পোর্টলের এবং মোবাইল সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সুপারিশ করা হয়েছে;

(খ) জনপরিষেবা গ্রহণকারী বিশেষ করে কৃষক, মহিলা, জেলে প্রভৃতি শ্রেণির নাগরিকরা যাতে সহজে সেবা পেতে পারে সেজন্য সহজগম্য স্থানে সার্ভিস ডেলিভারি পয়েন্ট স্থান করতে হবে; এবং
(গ) ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনপরিষেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৮. দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশন

দুর্নীতি দমনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেছে।

প্রতিবেদনের ১২ নং পৃষ্ঠা

২.২ দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়া দুর্নীতি দমনে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আশা করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা ও দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা। দুদক ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে জাতীয় সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, এটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, সরকারি কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল, স্থানীয় সরকার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এ সকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পারলে দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।”

প্রতিবেদনের ১৪ নং পৃষ্ঠায় স্থানীয় সরকার বিষয়ক সেবা অটোমেশনের কথা বলা হয়েছে।

২.৭ সেবাখাতের অটোমেশন: সাধারণ জনগণকে সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের- বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-

পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের আওতায় আনা আবশ্যক। এর ফলে সেবা খাতে স্বচ্ছতা বাড়বে ও দুর্নীতির প্রবণতা কমবে।”

প্রতিবেদনের ১৫ নং পৃষ্ঠায় ৭ নং সুপারিশে বলা হয়েছে-

“সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের- বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশনের আওতায় আনতে হবে।‘

প্রতিবেদনের ১৬ নং পৃষ্ঠায় স্থানীয় সরকার-এর Open Government Partnership (OGP) এর সদস্যভুক্ত হওয়ার সুযোগের কথা বলা হয়েছে।

“**২.১০ উন্মুক্ত সরকার অংশীদারিত্ব/Open Government Partnership (OGP):** ২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ Open Government Declaration (OGD) প্রণয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত সরকারের ধারণা আন্তর্জাতিকীকরণের সূচনা করেছে। OGD সমর্থনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত সরকার-বিষয়ক ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণ সাপেক্ষে, যে কোনো রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার Open Government Partnership (OGP) এর সদস্যভুক্ত হতে পারে। OGP এর সদস্যদের স্বচ্ছ, অংশীদারিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং একইসঙ্গে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও সুযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৭টি দেশ এবং ১৫০টির বেশি স্থানীয় সরকার OGP এর সদস্যভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ OGP এর সদস্যভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ OGP এর সদস্যভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়নি।”

৯. নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

সারসংক্ষেপ (১৭ পৃষ্ঠা)

১.২ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

(গ) স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পুরো দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে ন্যস্ত করা।

২.১ প্রার্থীদের যোগ্যতা অযোগ্যতা

৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদত্যাগ না করে সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করা।

৯.০ স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন

(ক) একটি স্থায়ী ‘স্থানীয় সরকার কমিশন’ গঠন করা (এ লক্ষ্যে ২০০৭ সালে গঠিত ‘স্থানীয় সরকার শক্তিশালী ও গতিশীলকরণ কমিটি’র আলোকে একটি আইন প্রণয়ন করা);

(খ) জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা;

(গ) স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় করার জন্য আইন সংশোধন করা;

(ঘ) সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের এবং মেম্বার/কাউন্সিলরদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থবহ ভূমিকা নিশ্চিত করার বিধান করা;

(ঙ) স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের বিধান করা;

(চ) এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে শপথ গ্রহণের পূর্বে শিক্ষকের পদ থেকে পদত্যাগের বিধান করা;

(ছ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদপ্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে তাদের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ভোটারদের জানার অধিকার নিশ্চিত করা;

(জ) পার্বত্য এলাকার জেলা পরিষদের নির্বাচনের আয়োজন করা;

(ঝ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বাজেটের ৩০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার বিধান করা; এবং

(ঞ) স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন (২০২৫) পূর্বতন সকল কমিশন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে প্রথম ধাপের ছয়টি কমিশনের সুপারিশসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

অধ্যায়-তিন

জাতীয় রাষ্ট্র ও স্থানীয় রাষ্ট্র: বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ

।এক।

স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সত্যিকার অর্থে কী সরকার, যদি সরকার ধরে নেয়া হয় তাহলে স্থানীয় সরকার পদবাচ্য হবার যোগ্যতার সবগুলো শর্ত এ সরকার কাঠামো পূরণ করে কিনা? এ দেশে বিধিবদ্ধ স্থানীয় সরকার শুরু হবার একটি সময় ধরা হয় ১৬৮৮ সালে মাদ্রাজ এবং ১৭২৬ সালে কলকাতা ও বোম্বাই শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করাকে সূচনাকাল হিসেবে ধরে, তাতে দেখা যায় প্রায় ৩০০ বছর আগে এ দেশে নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পত্তন হয়। আবার ১৮৭০ সনে চৌকিদারী পঞ্চায়েত গঠন করে গ্রামীণ স্থানীয় সরকার শুরু হয় বিধায় ২০২৫ সনে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারেরও ১৫৫ পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। এখন যদি প্রশ্ন উঠানো হয় শত বছর পূর্বে শুরু হলেও সত্যিকার অর্থে এত বছর পরেও এদেশের স্থানীয় সরকার কী কোন বিশেষ 'সরকার' চরিত্র লাভ করতে সক্ষম হয়েছে? অথবা অন্যভাবে বললে বলতে হয় আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কি 'সরকার' পদবাচ্য হবার সব শর্তাবলি পূরণ করতে পেরেছে? পশ্চিমে তত্ত্বিয়ভাবে অনেক লেখক স্থানীয় সরকারকে 'স্থানীয় রাষ্ট্র' হিসেবেও তত্ত্বায়ন (theorisation) করে থাকেন। আমরা এত বছরেও আমাদের স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় রাষ্ট্র পদবাচ্য হবার যোগ্যতার সকল শর্তগুলো সার্থকতার সাথে পূরণ করতে পারেনি।

একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, ব্যবস্থাপনা সংগঠন বা সরকার এবং সার্বভৌমত্ব এ চারটি শর্ত থাকলে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। স্থানীয় সরকার এক অর্থে ''স্থানীয় রাষ্ট্র''। এখানে বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য থেকে সুরক্ষার 'সার্বভৌমত্ব' এর উপাদান ছাড়া অন্য তিনটি উপাদান বর্তমান থাকে। সার্বভৌমত্বেরও একটি অন্য অর্থ বা দিকও আছে, তা হচ্ছে জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব। যে সার্বভৌমত্বের অংশ হিসেবে নাগরিকগণ স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় রাষ্ট্রের আইনকানুন ও বিধিবিধান মেনে নিতে বাধ্য হন। তাও এক ধরনের সার্বভৌমত্বের চর্চা। রাষ্ট্রের আরও নানা চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন: অঞ্চলগত ও ভৌগোলিক এককের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সংগঠন সত্তার একটি নিবিড় যোগাযোগ এবং একটি রাষ্ট্র বা নিদেনপক্ষে সরকার হবার আরও অনেক প্রয়োজনীয় শর্ত থাকতে পারে। সে শর্তসমূহ হতে পারে যেমন, বৈধ নেতৃত্ব কাঠামো, বৈধ সংগঠন কাঠামো, আয় ও ব্যয় নির্বাহের সুনির্দিষ্ট আইনগত ব্যবস্থা, বিধিসম্মত জনসেবা ও সাধারণ পরিষেবা ও উন্নয়ন সাধনের সকল প্রকরণ এবং আইনের অধীন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ব্যবস্থা। এ সরকারের উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার সম্পর্ক হবে সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনের বোধগম্য। সরকার ও রাষ্ট্রের সকল শর্তাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে আমাদের দেশে সকল শর্ত পূরণ করে এরকম স্থানীয় রাষ্ট্র দূরে থাক, স্থানীয় সরকার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই আপাতত বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ড স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় রাষ্ট্র খুঁজতে গলদঘর্ম না হলেও চলবে। কারণ জাতীয় রাষ্ট্রের অধীনে স্থানীয়ভাবে পরিচালিত একটি সরকার ব্যবস্থা এখন একটি বিশ্বজনীন ব্যবস্থা।

সারা পৃথিবীব্যাপী আজকের যে রাষ্ট্রব্যবস্থা তা আদিতে সবই ছিল 'স্থানীয়'। কোনটা গোত্রিয় শাসনের অধীনে গোত্রপতির রাষ্ট্র ও সমাজ, উপজাতীয় কাঠামোয় উপজাতীয় গোত্রপতির শাসন, কোথাও কোন শক্তিশালী ব্যক্তির শাসন, কোথাও যুথবদ্ধ একটি সমজাতীয় গোষ্ঠির যৌথ শাসন। এভাবে কালের বিবর্তনে উপ-জাতীয়তা থেকে জাতীয় রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় উপনীত হওয়াকে কোন কোন রাষ্ট্র দার্শনিকরা বলেন, 'সামাজিক চুক্তি', কেউ বলেন 'বল প্রয়োগ' কিংবা আদিম নৈরাজ্যের 'short- nasty- brute' জীবন থেকে পরিত্রাণের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তার বিনিময়ে কিছু অধিকার ছেড়ে দিয়ে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র গঠিত হয়। কারও মতে ব্যক্তিগত সম্পদ ও পরিবার গঠনের পর থেকে সমাজে রাষ্ট্র গঠন পর্ব শুরু। যে বিষয়টি আমাদের কাছে এ সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে রাষ্ট্রগঠনের শুরুতে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই ছিল প্রধানত ও প্রথমত "স্থানীয়"। পরে তা আঞ্চলিক, জাতীয় ও বহুজাতিক

রূপ লাভ করে। অষ্টাদশ শতকের পর থেকে জাতীয় রাষ্ট্রের পাশাপাশি আবার মূল স্থানীয় রাষ্ট্র জাতীয রাষ্ট্রের পরিপূরক হিসেবে মূলধারায় ফিরে এসেছে। তাই আধুনিক সমাজে স্থানীয়তা পুনরায় নতুন মহিমায় ফিরে এসেছে। জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জীবনের সুষ্ঠু ও সুষম বিকাশের জন্য স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে স্থানীয় গণতন্ত্রের চর্চা জাতীয় গণতন্ত্রের শক্তিশালী পাটাতন বা ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করে।

।দুই।
স্থানীয় সরকার: রাজনৈতিক নেতৃত্বের আঁতুরঘর

স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় রাষ্ট্রের এ ধারনাটি এখন আদর্শগত ভিন্নতা, সংগঠনের প্রকার ও চরিত্র নির্বিশেষে অর্থাৎ পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতি, আবার অপরপ্রান্তে উদার গণতান্ত্রিক, সর্বাত্নকবাদী, একনায়কতান্ত্রিক এমনকি রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও একক একটি মনোলিথিক রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে শাসনকাঠামোর ভৌগলিক বিভাজ্যতাকে অপরিহার্য জ্ঞান করা করা হয়। তাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে পশ্চিমের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক চর্চায় রাজনীতি ও রাষ্ট্র কাঠামোতে একটি বিশিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয়। সেখানে বিশ্ব নন্দিত তাত্ত্বিক ও দার্শনিকগণ যেমন জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮৫৯), আলেক্সিস ডি টকিয়াভেলি (১৮৩৫), হ্যারল্ড লাস্কি (১৯৩১), সি এইচ উইলসন (১৯৪৮), জেরেমি বেন্থাম প্রমূখ দার্শনিক জাতীয় গণতন্ত্র বিকাশের পূর্বশর্ত হিসেবে স্থানীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও লালনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। স্থানীয় সরকারের 'রাজনৈতিক শিক্ষা'র গুরুত্ব প্রসঙ্গে টকিয়াভেলি বলেন "town meetings are to liberty what primary schools are to science: that bring it within the people's reach, the men know how to use and enjoy it (1835, p.63). আর এক ধ্রুপদী ব্যাখ্যায় জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, it provides extra opportunities for political participation, both in electing and being elected to local offices, for people who otherwise would have few chances to act politically between national elections. (Representative Government, 1861).এভাবে ডজন জডন তাত্ত্বিক যাদের Grand Theorist বলা হয়, তাদের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। উদার গণতান্ত্রিক দর্শনের ধারক-বাহকগণ উদার গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যকর বিকাশের জন্য রাজনৈতিক শিক্ষা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক সাম্য, স্থানীয় জবাবদিহি এবং জনসংবেদনশীলতার কারণে স্থানীয় সরকাররের উপর এক ধরনের অপরিহার্যতা আরোপ করেছেন (Smith, B C, 1985, pp 18-23) ।

।তিন।
স্থানীয় সরকারের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

উদার গণতন্ত্রের বাইরে একদল তাত্ত্বিক (Walker, 1981, pp172-3, Durpe1969, p152,Oates 1972, pp11-12)- জন আকাঙ্খা, জনসন্তুষ্টি, জনচাহিদা পূরণ এবং কর ব্যবস্থার প্রতিযোগিতাকে স্থানীয় সরকারের একটি প্রধান বিষয় হিসেবে স্থানীয় সরকারে 'পাবলিক চয়েস' ও 'বাজার তত্ত্বে'র প্রয়োগ দেখাতে চেয়েছেন। তারা বলতে চেয়েছেন শুধু জাতীয় ও স্থানীয় গণতন্ত্রের জন্য ভোট নয়, জনসেবা ও বাজারের প্রতিযোগিতায় সেবামূল্য নিরুপন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পাবলিক চয়েসও স্থানীয় সরকারে জনসম্পৃক্তির একটি প্রধান বিষয় হয়ে যায়। এই গবেষক দল স্থানীয় সরকারের তত্ত্বীয় গুচ্ছে 'অর্থনেতিক নিয়ামককেন্দ্রিক চয়েস তত্ত্বের ব্যাখ্যাকার' হিসেবে পরিচিত।

।চার।
স্থানীয় রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন

মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ স্থানীয় সরকারের চেয়ে 'স্থানীয় রাষ্ট্র' প্রত্যয়টি অধিক ব্যবহার করেছেন। দ্রুপদী মার্কসীয় ধারায় রাষ্ট্র মূলত পুঁজিপতি-বুর্জুয়াদের নির্বাহী কাঠামো। যার মাধ্যমে তারা শ্রমের উদবৃত্ত মূল্য আহরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। বহুদিন যাবত মার্কসবাদীগণ মনোলিথিক রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র, উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদন ব্যবস্থা ও পুঁজি আহরণ প্রক্রিয়ার ভিতরে থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করেছে। ১৯৭০-এর দশকের পর ইউরোপ ও আমেরিকায় 'স্থানীয় রাষ্ট্র' ব্যবস্থার একটি

পুঁজিবাদী যৌক্তিকতা তৈরি হয় (Cockburn, 1973)। এখানে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ও স্থানীয় রাষ্ট্রের একটি পৃথকীকরণ হয়। জাতীয় রাষ্ট্র সরাসরি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে আর স্থানীয় রাষ্ট্র তার উপ-ব্যবস্থাপক হিসেবে 'সামাজিক পুনরুৎপাদন' এর দায়িত্ব পালন করবে। সামাজিক পুনরুৎপাদনের মূল কাজগুলো হবে মূলত 'কল্যাণমূলক রাষ্ট্র' কাঠামোর দক্ষ বাস্তবায়ন (O' Connor 1973)। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় রাষ্ট্র জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার জন্য শ্রমিকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আবাসন, যোগাযোগ ও যানবাহন, জন্ম, মৃত্যু, বিনোদন সকল দায়িত্ব পালন করবে। তাতে পুঁজিপতির শ্রম ব্যয় হ্রাস পাবে। কমে যাবে তার ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্ব। কল-কারখানার মালিকদের ভেরিয়েবল কস্ট (পরিচালন ব্যয়) কমে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। কারণ স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত শ্রমিকের যোগান নিরবিচ্ছিন্ন হবে। বাসস্থান, যানবাহনসহ নানা সুয়োগ-সুবিধার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সুরক্ষার দায়িত্ব স্থানীয়ভাবে বহনের কারণে একদিকে পুঁজিপতির শ্রমিক ব্যয় হ্রাস পেয়ে তার উৎপাদন প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভালো করবে, অপরদিকে শ্রমিক অসন্তোষ কম হবে। নব্য মার্কসবাদীদের একট অংশ মনে করে তাই কল্যান রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করলে শ্রমিক শ্রেণি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়। তাই তারা হোয়াইট হল এবং টাউন হল দুই জায়গায় যুগপৎভাবে সংগ্রাম জারি রাখতে চায় (Stocker 1985)। পশ্চিমের পুঁজিবাদী সমাজের কল্যাণরাষ্ট্র ধারণার সাথে স্থানীয় রাষ্ট্র তথা স্থানীয় সরকারের রাজনৈতিক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সেবা, স্থানীয় গণতন্ত্র চর্চায় নতুন রসায়ন তৈরি করেছে।[২]

।পাঁচ।
বিকেন্দ্রীকরণ: অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনের নয়া সৃজনশীলতা

সম্ভবত আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এল ডি হোয়াইট ১৯২৭ সালের দিকে 'বিকেন্দ্রীকরণ' ধারণাটি একাডেমিক জগতে পরিচিত করান (White, 1927)। তারপর সমাজবিজ্ঞান বিশ্বকোষে তার অন্তর্ভুক্তি ঘটে এবং একটি জনপ্রিয় অভিধা হিসেবে বহুচর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অনেকের মধ্যে ব্রিটিশ একডেমিক ডায়ানা কনিয়ার্স (১৯৮১), মার্কিন লেখক জি সাব্বির সীমা ও ডেনিস এ রনডিনেলি (১৯৮৩), নরম্যান আপহপ (১৯৮৫) প্রমুখের ব্যবহার বান্ধব রচনাসমূহ বিকেন্দ্রীকরণ ধারণাকে আন্তশাস্ত্রীয় একটি বিশেষ ডিসিপ্লিনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় কোন একটি বিশেষ সংগঠনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রবাহ প্রক্রিয়াকে খন্ডিতভাবে না দেখে সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি নিরন্তর ও চলমান প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখা হয়। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে সহজভাবে উপলব্ধির জন্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ এর সকল প্রকার ও পদ্ধতিগুলোকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মাওহুদ, সীমা ও রনডিনেলী এবং নরম্যান আপহফ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মাওহুদ এই ধারণাকে বিপুঞ্জীভূতকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। সীমা ও রনডিনেলী বিকেন্দ্রীকরণকে নিমোক্ত চারটি ভাগে ভাগ করেছেন।

১। পুঞ্জীভূতকরণ (Deconcentration)
২। অর্পণ (Devolution)
৩। প্রত্যার্পণ (Delegation)
৪। বিরাষ্ট্রিকরণ (Privatisation)

১) বি-পুঞ্জীভূতকরণ (Deconcentration): এ ধারণা সরকারের নির্বাহী কাঠামোর অভ্যন্তরে চর্চিত হয়। রাষ্ট্র নানা নির্বাহী আদেশ দিয়ে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, দায়-দায়িত্ব ও অর্থ সরবরাহ শাসন কাঠামোর বিভিন্ন একক, স্তর ও সংগঠনের অভ্যন্তরে প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে বণ্টন ও বরাদ্দ করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কেন্দ্রিক প্রশাসন ও সেবার দায়িত্ব বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক অধস্তন দপ্তরে প্রত্যর্পিত হয়। বি-পুঞ্জীভূতকরণ মূলত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এর মাধ্যমে প্রশাসনের এক স্তর থেকে অপর স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় কিংবা পদ সোপানকেন্দ্রিক ওপর থেকে নিচে ক্ষমতা কর্তৃত্ব স্থানান্তর করে। এটি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় প্রশাসকদের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হস্তান্তর ঘটে।

[২] Tofail Ahmed (2012) *Decentralisation and The Local State; Political Econolmy of Local Governnance in Bangladesh*, Agamee Publication, Dhaka

২) অর্পণ (Devolution) নির্বাহী আদেশে নির্বাহী বিভাগের ভেতরে এ কর্তৃত্বের হস্তান্তর হয় না। এটি সংবিধানের নির্দেশনার আলোকে আইন সভা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আইন, বিধি বিধান প্রণয়ন, অর্থ সংগ্রহ, করারোপসহ ও আর্থিক, প্রশাসনিক, সেবা ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, দায়-দায়িত্ব শাসন কাঠামোর বিভিন্ন একক ও স্তরে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সংস্কার আলোচনায় প্রশ্ন দেখা দেবে, বিকেন্দ্রীকরণ ধারণার 'অর্পণ' ধারণা বা ধরণটি এখানে যথাযথভাবে কার্যকর কিনা। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রদেশ বা স্টেট পর্যায়ে একই প্রক্রিয়ায় ঐ ক্ষমতা অর্পিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া জাপান, জার্মানি, ভারত প্রভৃতি দেশে এভাবে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণের একটি আদর্শ অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশে যেহেতু প্রদেশ নেই, তাই হয়ত স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বিকেন্দ্রায়ন এখানে কীভাবে কতটুকু করা প্রয়োজন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যেতো, যা সত্যিকারে অর্থে করা হয়নি। এ পদ্ধতি হচ্ছে রাজনৈতিক ও আইনগত কর্তৃত্বের হস্তান্তর বা সরাসরি জাতীয় সংসদ থেকে স্থানীয় সংসদসমূহে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব স্থানান্তরিত হতে পারে।

৩) বিকেন্দ্রীকরণ ধারণার প্রর্ত্যপণ (Delegation) সাধারণ ব্যবস্থাপনার 'ডেলিগেশন অফ অথরিটি' নয়। এটি একটি ভিন্নতর ধারণা ও প্রক্রিয়া। ডেলিগেশনের আওতায় সাধারণী বিভাগ বা মন্ত্রণালয় স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিশেষ বিশেষ পৃথক বা বিশেষায়িত কার্যাদি সূচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বিশেষায়িত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। এই বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান বা এককসমূহ, যথা পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, সাংবিধানিক ও অন্যান্য বিধিবব্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীন কর্মপ্রক্রিয়া অনুসরণ করে। তাদের দক্ষতা, কর্মকুশলতা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। যেমন: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা হাসপাতালের মাধ্যমে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে থাকে। কৃষি, শিক্ষা, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, পানিসম্পদ প্রভৃতি বিশেষায়িত সংস্থা গঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সময়োপযোগিতা ও কর্ম উপযোগিতা মূল্যায়ন করে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন আধুনিকায়ন, পুনর্গঠন, সুষমকরণ, ক্ষেত্র বিশেষে কিছু সংস্থার একত্রিকরণ (merger) ও কিছু সংস্থার বিলুপ্তিও ঘটে। বাংলাদেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে এরকম প্রায় ৪০০ সংস্থা রয়েছে। তারা কোন সাধারণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকেও স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে কাজ করার অধিকার ভোগ করে।

৪) বেসরকারিকরণ (Privatization) আজকাল বিকেন্দ্রীকরণের একটি কার্যকর পদ্ধতি ও ধরন হিসেবে অতি সমাদৃত হচ্ছে। একসময় রাষ্ট্রের সকল সেবা ও সরবরাহ (Supply and Services) কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য ছিল। সে হিসেবে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সদ্য ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত দেশসমূহ জাতিগঠনের অংশ হিসেবে সরকারের আমলা কাঠামোর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নানা সেবা ও উন্নয়ন সংস্থা গড়ে তোলে। কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানি সরবরাহ, যোগাযোগ, প্রভৃতি কাজের জন্য সরকারি সংস্থা সৃষ্টি হয়। কালক্রমে দেখা যায় সরকারি খাতের ঐসব সংস্থার অদক্ষতা, দুর্নীতি ও গণবিরোধী নীতির কারণে সেবা ব্যবস্থা অদক্ষ ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সরকার ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে সর্বজনীনভাবে অসফল। তাই দেখা যায়, আজকাল পরিবহণ ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, টেলিফোন ব্যবস্থাসহ সকল সেবার বেসরকারিকরণ হয়েছে এবং তাতে ভোক্তার পছন্দের পরিসর বেড়েছে, কমেছে সেবামূল্য এবং অবসান ঘটেছে একচেটিয়াত্বের (Monopoly)। অপরদিকে ব্যাংক, বীমা, ব্যাংক বর্হিভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দারিদ্র্য বিমোচন কাজে এনজিওর সম্পৃক্তি, ইত্যাদি অনেক সুফল বয়ে এনেছে। মোটকথা বিকেন্দ্রীকরণের বেসকারীকরণ ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে অরাষ্ট্রীয় (non-state actor) সেবাদান কারীদের জন্য সমাজে একটি উপযুক্ত পরিসর সৃষ্টি হয়েছে। আপহফ বিকেন্দ্রীকরণের শেষোক্ত ধারণা বিরাষ্ট্রিকরণকে আরও চারটি উপরিবিভাগে বিভক্ত করেন। যথা মধ্যস্থতাকরণ (Intermediation), সেবায়ন (Philanthropisation), মুক্তবাজার (Marketisation) ও বিচ্ছিন্নকরণ (dispersal) ধারণাগুচ্ছের মাধ্যমে বিরাষ্ট্রীয়করণের ধারণাকে তিনি আরো অধিক সংহত করেছেন। আপহফ বিকেন্দ্রীকরণের শেষোক্ত চারটি ধারনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলো নিম্নরুপ:

১। দাতব্যায়ন (Philanthropization)

২। মধ্যস্থতায়ন (Intermediation)
৩। মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতায়ন (marketization)
৪। বিচ্ছিন্নকরণ (Dispersal)

১) দাতব্যায়ন নানা দানশীল ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্যোগে এদেশে একসময় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রাকারের যোগাযোগ অবকাঠামো এবং চাষাবাদ ও পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্যোগে সংগঠিত হতো। এসব কাজের হাজার বছরের জনপরিসরে ব্যাপক সম্পৃক্তি। মাত্র বিগত ষাট থেকে সত্তর বছরের ইতিহাস রাষ্ট্র এসব কাজে এগিয়ে এসেছে। দেশের বিদ্যমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ এবং নামকরা শতবর্ষি কলেজগুলোর সবই বেসরকারি, ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্যোগের ফসল। অপরদিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মঠ, কবরস্থান, শ্মশান, ঈদগাহ, খেলার মাঠ অনেক কিছুই ব্যক্তি ও সমষ্টির দানশীলতার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। বর্তমানে দানশীলতা, সামষ্টিক উদ্যোগ, ব্যক্তির সমাজসেবার ঐতিহ্যের উৎসাহে ভাটার টান। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও সেবার আগ্রাসন ব্যক্তি পরিসরকে সংকুচিত করে দিচ্ছে। রাষ্ট্র এখন মসজিদ-মন্দির ও ধর্মীয় কাজেও অর্থ বরাদ্দ করে। এক শ্রেণির রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রীয় অর্থে এসব কাজ করে বাহবা নিতে চায়। দেশে যাকাত, ফিতরা, সদকার দান খুব সামান্য নয়। এসব উৎসের অর্থ রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে বৃহত্তর পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অবদান রাখতে অসমর্থ বা অনুৎসাহিত। দানশীলতা ও দাতব্য কর্মকান্ডে যেসব সেবার অপার সম্ভাবনা, রাষ্ট্রের সেসব ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে এসে ব্যক্তি উদ্যোগ ও ব্যক্তি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা উচিত।

২) মধ্যস্থতায়ন একটি রাষ্ট্র স্বীকৃত উপায়। নির্মাণ কাজে ঠিকাদারি, চুক্তিভিত্তিক নানা কাজ-পিপিপি আকারে বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা এসবের আধুনিক উদাহরণ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ক্ষেত্র বিশেষে এনজিও রাষ্ট্রের পক্ষে অনেক কাজ করে থাকে। দেশে একটি 'জাতীয় বিকেন্দ্রায়ন নীতি' প্রণিত হলে সে নীতির আওতায় সাব-কনট্রাক্টিং, মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান ও পিপিপি আরও গতি লাভ করবে। সরকারের সক্ষমতা ও সম্পদের উপর চাপ কমবে। উন্নয়ন কাজের আকার, পরিমাণ ও গতি বাড়বে। সৃষ্টি হবে নতুন নতুন কাজের সৃজনশীল ক্ষেত্র।

৩) মুক্তবাজার প্রতিযোগিতা ও বিচ্ছিন্নকরণ বিষয়ের ক্ষেত্র আরও অনেক বেশি সম্প্রসারিত হতে পারে। মুক্ত বাজারকে কাজ করতে দিলে উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থার অদক্ষতা দূর হয়ে যায় এবং প্রতিযোগিতায় অক্ষম বা দুর্বল উৎপাদক বাজারে টিকতে পারে না, তাতে শেষ পর্যন্ত ভোক্তা উপকৃত হয়। এ ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার প্রতিযোগিতাকে সুস্থ ধারায় বিকাশের জন্য রাষ্ট্রকে অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী রেগুলেটর নিয়োগ করতে হয়, যারা পণ্যের গুণমান ও দাম নির্ধারণে সহায়ক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করবে। বিচ্ছিন্নকরণও তেমনি রাষ্ট্রকে অনেক সেবা কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে তা ব্যক্তি ও সমষ্টির উপর ছেড়ে দিতে বাধ্য করে।

ভুলবশত আমাদের দেশের একাডেমিক কমিউনিটি বিকেন্দ্রীকরণ ধারণা প্রয়োগের কথা চিন্তা করতে গিয়ে স্থানীয় সরকারের প্রসঙ্গে বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রিভূত করে সেখানেই থেমে যায়। বিকেন্দ্রীকরণের অন্যান্য ধরণাগুলো যথাস্থানে যথাযথভাবে কার্যকর না হলে বিকেন্দ্রীকরণ সার্বিকভাবে কোন প্রতিষ্ঠানেই সফল হবার নয়। তাই স্থানীয় পরিসরে নানা বেসরকারি উদ্যেগকে স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সরকারের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করার বিষয়টি বিকেন্দ্রকরণের একটি সৃজনশীল উদ্যোগ। স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ক্ষুদ্র ঋণ, নারী উন্নয়ন, মানবাধিকার সুরক্ষা প্রভৃতি কাজে স্থানীয় সরকারের অংশীদার হিসেবে আধুনা এনজিওরা ভালভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। তাতে অর্থ সম্পদ ও দক্ষ জনবলের সুষম ব্যবহার হতে পারে। একইভাবে নির্বাহী বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রয়োগের জন্য "জাতীয় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি" প্রণয়ন হতে পারে। তাতে রাষ্ট্র অনেক অব্যবহৃত শক্তি, সামর্থ ও সম্পদ ব্যবহারের সুয়োগ পেতে পারে[৩]।

---

[৩] Ahmed(2012) বিকেন্দ্রীকরণের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য অনুসরণ করা যেতে পারে, পৃষ্ঠা-৩৮-৭৮

। ছয় ।

উপমহাদেশে স্থানীয় শাসন ও সরকারের ঐতিহাসিক বিকলাঙ্গতার দুর্বহ বৃত্তাবদ্ধতা: যে বৃত্ত ভাঙ্গার এখনই উপযুক্ত সময়

উপমহাদেশ তথা বাংলা অঞ্চলে স্থানীয় শাসনের ইতিহাসের চারটি ধারক্রম পাওয়া যায়। প্রথম ধারাটি প্রাগৈতিহাসিক, যার একটি বিস্তারিত ধারণা মুলত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ধারাটি খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে মুসলমানদের নানা গোষ্ঠির শাসন থেকে শেষ মোগল শাসন পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় ধারায় প্রায় দুইশত বছরের ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনকাল এবং শেষ এবং চতুর্থ ধারা ঔপনিবেশোত্তর পাকিস্তানের চব্বিশ বছর ও বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের অধিক সময়কালের শাসন।

প্রথমত প্রাগৌতিহাসিক সময়কাল অনেক দীর্ঘ। এসময়কালের খুঁটিনাটি চিহ্নিত করা সহজসাধ্য কাজ নয়। তবে এটুকু স্বীকার করতে হয় যে, ঐ সময়কার রাজা-রাজন্যবর্গ সাধারণের অনাড়ম্বর নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় খুব একটা হস্তক্ষেপে আগ্রহী ছিলেন না। ক্ষুদ্র গ্রামীণ জীবন ছিল প্রকৃতিনির্ভর খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পশুপালন কেন্দ্রিক। গ্রামে একটি স্বাভাবিক প্রশাসন ছিল যেখানে বাইরের হস্তক্ষেপ ছিল অনুল্লেখ্য। যাকে চার্লস মেটকাপের সরলীকৃত বর্ণনায় ‘ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলমানদের আগমনে গ্রামে বড় কোন ঝাঁকুনি লাগেনি। কারণ শাসকরা ছিল মূলত নগরের মানুষ। প্রকৃতিগতভাবে বণিক ও যোদ্ধা। সেনাপতি ও যোদ্ধার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আঙ্গিকে তারা শাসন ব্যবস্থাকে সাজায়। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহ দমনে যত মনোযোগী ছিল, অভ্যন্তরীণ শাসন-প্রশাসনে তত মনোযোগ তাদের ছিল না বা প্রয়োজনও মনে করেননি। সৈন্য সংগ্রহ ও কর প্রাপ্তিতে তাদের শাসনকার্য সীমাবদ্ধ ছিল। সপ্তদশ শতক থেকে ইউরোপীয় বণিকদের পদচারণায় ভারত বর্ষের নানা স্থানে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য দেখা দিলেও দিল্লীওয়ালারা সে সবকে খুব একটা আমলে নেয়নি। ফরাসি, পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ বণিকগণ শুধু বাণিজ্যিক পশরার লেনদেন নিয়ে এদেশে তাদের কর্মকান্ড সীমিত রাখেনি। তারা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ পাহারার জন্য অস্ত্র সম্ভার, রণতরী এবং সৈন্যবাহিনীও গড়ে তোলে। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে। আবার সুযোগ বুঝে এ দেশের শাসকদের সাথেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। একসময় পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ইংরেজ বণিকগণ বাংলার শাসন ক্ষমতা অধিকার করে। বিদেশি বণিকগণ যখন কোন ভিন দেশের শাসনভার গ্রহণ করে তার উদ্দেশ্য ও চরিত্র কী রকম হতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

ব্রিটিশ শাসনের নানা কালপর্বে ভারতীয়দের কল্যাণ তাদের শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল না, তাদের নিজেদের শাসন কাজের সুবিধার জন্যে ভারতীয়দের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে তারা কিছু কিছু চিন্তা ও ধারণা প্রয়োগ করে। তারা ধাপে ধাপে প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা প্রথমে শাসনকার্য ও রাজস্ব সংগ্রহ পৃথকভাবে চালায়। পরে একসময় তারা শাসন, বিচার ও রাজস্ব সংগ্রহ এক হাতে নিয়ে নেয়। পরে একসময় শাসন ও রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্রিটিশ অফিসসারদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে তথাকথিত ‘স্থানীয় সরকার’ কাঠামো গঠন করাও ছিল তার অন্যতম একটি কৌশল ছিল[৪]।

১৭৫৭ থেকে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে জন সম্পৃক্ততা বলতে কর্নওয়ালিসের ‘চিরস্থায়ী বন্দেবস্তে’র মাধ্যমে জমিদারী ব্যবস্থা সৃষ্টি এবং ১৮৫৭ সালের প্রথম ‘স্বাধীনতা যুদ্ধে’র পর আসে সরকারি অফিসসারদের নিয়ন্ত্রিত ‘চৌকিদারী পঞ্চায়েত, লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড ও পৌর কমিটিগুলো গঠন । ১৯৩৫ এর পূর্ব পর্যন্ত সরকারি মনোনয়নই ছিল এসব কমিটির প্রধান বাছাই পদ্ধতি। ১৯৩৫ এর পূর্ব পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মনোনয়নই ছিল শেষ কথা। ১৯৩৫ এর পর স্থানীয় স্ব-শাসন নামে এটি প্রাদেশিক বিষয় করা হলে নির্বাচন ও মনোনয়নের মিশ্র পদ্ধতি চালু হয়। কিন্তু কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এমনকি পাকিস্তান সময় পর্যন্ত ইউনিয়ন, থানা ও জেলা তিন পর্যায়ে সকল কাজের চাবিকাঠি মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের হস্তগত থাকে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সম্পদ বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাবপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে সিও (উন্নয়ন) ও মহকুমা হাকিম ছিলেন মূল নিয়ন্ত্রক। থানা পরিষদের সভাপতি ছিলেন মহকুমা হাকিম এবং সহ-সভাপতি সার্কেল

[৪] মোঃ মাসুদুর রহমান(২০১৩) বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।

অফিসসার (উন্নয়ন), জেলা পরিষদের সভাপতি ডেপুটি কমিশনার এবং বিভাগীয় কাউন্সিলের সভাপতি বিভাগীয় কমিশনার। পাকিস্তানের শেষ দশক পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সর্বাত্মক সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। স্ব-শাসনের ধারণাটি বাস্তব অর্থে অলীক ও প্রতীকী, প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক সান্ত্বনার একটি প্রবোধ দান প্রক্রিয়া। এদেশের কিছু উঠতি অধিজন শ্রেণি 'সাহেব-সুবা'দের পাশে বসে একটু মর্যাদার অনুভূতি পাওয়া মাত্র। তবে বলা যায় এতটুকু অর্জন অন্তত হয়েছে যে, এসব উদ্যোগের ফলে ক্রমে কিছু সামাজিক নেতৃত্ব বের হয়ে এসেছে এবং তারা পরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহনে উৎসাহী হয়েছে। বিলম্বে হলেও ভারতীয় সংবিধানের ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক বৃত্তাবদ্ধতাকে ভেঙ্গে নতুন রূপ ও কাঠামো দেয়া হয়েছে।[৫]

বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের পর সাধারণের আশা-আকাঙ্খা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। গণতন্ত্রের প্রবল আকাঙ্খার অংশ হিসেবে অন্যান্য সকল কিছুর মত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় দুর্দান্ত কিছু ইতিবাচক পরিববর্তন সূচিত হয়। তার মধ্যে প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবর্তন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা পুনর্গঠন। তার পরের ইতিহাসে স্থানীয় সরকার নানা নেতিবাচকতায় এমনভাবে নূঞ্জ হয়ে পড়ে, এটি উঠে দাড়াতে গিয়ে বার বার ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানে স্থানীয় শাসন বিষয়ে অনেক প্রগতিশীল বিধান যুক্ত করা হয় হলে দাবি করা হচ্ছিল। এ নিয়ে সবাই আমরা একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। গণতন্ত্রের নানা বিপর্যয়, শাসনতান্ত্রিক সংকট, হত্যা, সামরিক অভ্যুত্থান, গণঅভ্যুত্থান, নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক সকল প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে পড়া প্রভৃতি বড় বড় রাজনৈতিক ইস্যুতে জাতি দিশেহারা থাকে। স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় শাসন এসব ডামাডোলের মধ্যে পড়ে রাজনীতবিদদের সুস্থ স্বাভাবিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানা সামরিক ও বেসামরিক রেজিম ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক বা দলীয় স্বার্থের ধারক-বাহক হয়ে ওঠায় কোন শাসক একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক জনপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকারকে গড়ে তোলার কোন চিন্তশীল নীতিকাঠামো দিতে পারেনি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভোটযুদ্ধের সম্মুখ সৈনিক, স্থানীয় দলীয় কর্মী সংগ্রহ, তাদের পালন-পোষণের হাতিয়ার এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠিস্বার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার এগুলো মুখ্য বিষয় হয়ে দেখা দেয়।

বর্তমানে তিন স্তরের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ তিন স্তর কিন্তু সংবিধানের নির্দেশনা অনুসরণ করে একসাথে একই সময়ে ১৯৭২ সন থেকে শুরু করা হয়নি। ১৯৭২ সালে ইউনিয়ন পরিষদ শুরুর ১০ বছর পর উপজেলা পরিষদ (পূর্বতন থানা পরিষদ) শুরু করা হয়। তার মাঝখানে একটি সংক্ষিপ্ত 'গ্রাম সরকার' কালও অতিবাহিত হয়। গ্রাম সরকার এবং উপজেলা দুইই মূলত দুটি সামরিক সরকারের বেসামরিকীকরনের একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৯১ সালে বিএনপি নির্বাচিত হয়ে কোন বিকল্প সৃষ্টি না করে উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করে দেয়। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সনে ক্ষমতায় এসে ১৯৯৮ সনে নতুন করে উপজেলা পরিষদ আইন পাশ করে। কিন্তু ২০১০ এর আগে সে আইন কার্যকর করেনি। ২০০৭-২০০৮ এ 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' অধ্যাদেশ আকারে উপজেলা পরিষদ আইন পাশ করার পর ২০০৯ সালে ক্ষমতায় ফিরে আওয়ামী লীগ সরকার কিছু বিকৃতি/বিচ্যুতি অন্তর্ভুক্ত করে সে অধ্যাদেশ রেটিফাই করে। অর্থাৎ ১৯৯১ সনে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে বিশ বছর পর নবরূপে ফিরে আসে, কিন্তু পুর্বের ত্রুটিগুলো সারিয়ে নয়, নতুন কিছু ত্রুটি যুক্ত করে। যেমন প্রথম উপজেলায় জাতীয় সংসদ সদস্যের 'উপদেষ্টা'র বিধান ছিল না। প্রেষণে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের উপর পরিষদের পূর্ণমাত্রায় জোরদার নিয়ন্ত্রণ ছিল। এরপর ফিরে আসা উপজেলা পরিষদের নানা বিধান প্রেষণ পদ্ধতিকে শিথিল করে দেয়া হয়। নির্বাচনগুলো দারুণভাবে ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে গণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদ অকার্যকর হয়ে থাকে।

ব্রিটিশ আমল থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা জেলা পরিষদ স্বাধীনতার পর ৩০ বছর অকার্যকর করে রাখা হয়। তবে আওয়ামীলীগ বাকশাল (১৯৭৪-১৯৭৫), বিএনপি (১৯৭৮-১৯৮০), জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি(১৯৮৮-১৯৯০) এবং সর্বশেষ আওয়ামী লীগ সরকার (২০১৪-২০২৪) এ চার সরকারের আমলে চারবারে চারভাবে দলীয় নেতাদের পুনর্বাসন করার এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে জেলায় পরিষদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হলেও একটি কিম্ভুতকিমাকার সংগঠন দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়। বাকশাল আমলে 'জেলা গভর্নর', বিএনপি 'জেলা উন্নয়ন সমন্বয়ক-জেলা মন্ত্রী', এরশাদ

[৫] Mathew, G. (1994) *Panchayati Raj from legislation to movement*. New Delhi: Concept Publishing House.

জেলার একজন দলীয় সংসদ সদস্যকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও বাকি সব মনোনীত সদস্য, সর্বশেষ আওয়ামী লীগ ভোটবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে 'বয়স্ক বঞ্চিত নেতা পুনর্বাসন'এর একটি পদ্ধতি জেলা পরিষদকে ঘিরে অবলম্বন করে। এই হচ্ছে স্বাধীনতার পর তিন প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস। এভাবে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঘনঘন পরিবর্তন কোন প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের সহায়ক হয়নি। তাই বাস্তবিক অর্থে বাংলাদেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে স্থানীয় সরকার কোনভাবে মাটিতে শিকড় নিতে পারেনি। এটি বরাবরই ছিল উন্মুল অতি রাজনীতিকতায় আক্রান্ত একটি দলীয় উপকাঠামো। যা স্থানীয় সরকার হিসেবে চাপানো হয়।

নগর স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে তাতে বড় ধরনের কাঠামোগত অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয়নি। তবে যে অনাচারটা হয়েছে, তা হচ্ছে ঢালাও দুর্বৃত্তায়ন। দেশের শহরের সব ব্যবসা বাণিজ্যের দূর্বৃত্তায়ন ঘটে। তা ঠিকাদারি থেকে বর্জ্য ব্যবসা, ডিশ ও ইন্টারনেট ব্যবসা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। নগর নেতৃত্বে ঢালাওভাবে দূর্বৃত্তের অধিষ্ঠান ঘটে। নগরে সুস্থ পরিকল্পনা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ কাজ করেনি। বিদেশি অর্থায়নে নগরকেন্দ্রিক হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু নগরগুলো ক্রমাগত বসবাস যোগ্যতা হারিয়েছে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপের একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। একদিকে আগ্রাসী রাজনীতি, অপরদিকে প্রশাসন বা আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি শক্ত করা। তার সব উদ্দেশ্য অসৎ না হলেও যদি ভ্রান্তি বশতও করা হয়, তা হচ্ছে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসনের একটি গাঁটছাড়া বেধেঁ দেয়া।দেশের সকল প্রশাসনিক এককে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনের সমান্তরাল উপস্থিতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয়ের অবাধ ক্ষমতা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরগাছা বানিয়ে ফেলে। প্রত্যেক প্রশাসনিক এককের বিপরীতে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার করে একই কাজের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কর্মকর্তা উভয়কে দেয়া হয়েছে। সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে নিম্নের চারটি বিষয় যথা- কাজ (Function) কর্মী (functionary), অর্থ-সম্পদ (Fund) এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা (Freedom) খুবই গরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকারের তার কোনটিই নেই। যেমন: উপজেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্ম, কর্মী ও অর্থ তিনটিই রয়েছে। তেমনিভাবে, শিক্ষা, কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, সমাজ সেবা, যুব, মহিলা ও শিশু প্রতি ক্ষেত্রে একই অবস্থা। স্থানীয় সরকারি দপ্তর যা করে তার সব কাজের দায়িত্ব নানাভাবে স্থানীয় সরকারকেও দেয়া হয়েছে। কিন্তু কর্ম দেয়া হলেও কর্মী, অর্থ ও স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। তাই পুরো বিষয়টি একটি শুভংকরের ফাঁকি হয়ে আছে। এটিকে একডেমিক ভাষায় বলা হয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্ম, দক্ষ কর্মী, কর্ম করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান ছাড়া কাজের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ তথা unfunded mandate। বিষয়টির বোধগম্যতার জন্য সংযুক্ত সারণিটি দেখা যেতে পারে।

সারণি- ৩.১ স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানীয় সরকার ইউনিটের কার্যাবলি

ক্রম	স্থানীয় সরকারের স্তর	মূল উৎস	ধারা অনুসারে কার্যাবলির সংখ্যা	মন্তব্য
১।	ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি)	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯	ধারা ৪৭ এ চারটি মৌলিক কার্যাবলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং একই ধারায় তফসিল-২ এ আরও ৩৯টি কার্যাবলিসহ মৌলিক কার্যাবলি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তফসিল ৪ এ সম্পদ ব্যবহারের ১৩টি কার্যাবলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তফসিল ৫ এ অপরাধ প্রতিরোধের ৫৪টি কার্যাবলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। মোট তালিকাভুক্ত কার্যাবলি = ১১০	বাস্তব পরিস্থিতিতে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চারটি মৌলিক কাজ সম্পাদন করে: ১. প্রথাগত সম্প্রদায় বা সমাজ নির্ধারিত পরিচালিত কার্যাবলি ২. যে কার্যাবলিগুলোর জন্য তারা সম্পদ পায় ৩. বিভিন্ন প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) গুলোতে যে কার্যাবলিগুলো বাস্তবায়ন করে ৪. আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতির বিরোধ নিষ্পত্তি
২।	উপজেলা পরিষদ	স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ১৯৯৮ এবং স্থানীয় সরকার	ধারা ২৩ এবং ২৪ একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করে যাতে সরকার সময় অনুসারে নতুন কার্যাবলি গ্রহণ করতে পারে। তফসিল ২-এ তালিকাভুক্ত ১৮টি	প্রকৃতপক্ষে, উপজেলা পরিষদগুলো এডিপি অনুদানের মাধ্যমে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নেই সীমাবদ্ধ।

ক্রম	স্থানীয় সরকারের স্তর	মূল উৎস	ধারা অনুসারে কার্যাবলির সংখ্যা	মন্তব্য
		(উপজেলা পরিষদ) আইন (সংশোধন), ২০১১	তফসিল ৪-এ তালিকাভুক্ত ৯টি তফসিল ৫-এ তালিকাভুক্ত ৪টি মোট ৩১টি	
৩।	জেলা পরিষদ	স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ২০০০	তফসিল ১ বাধ্যতামূলক ১২টি এবং ঐচ্ছিক ৭টি তফসিল ২(৮) তফসিল ৩(৪৬) মোট ১২+৫১=৬৩	জেলা পরিষদ-এর কার্যাবলি দৃশ্যমান নয়, তবে সম্প্রতি "প্রশাসক" নিয়োগের পর থেকে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়। সমতল জেলার ৬১টি জেলা পরিষদ এডিপি অনুদানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।
৪।	পৌরসভা	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	ধারা ৫০ এবং ৫ উপ-ধারা সহ ১৬টি অন্তর্ভুক্ত ২য় তফসিলের অধীনে ৬৮টি ৩য় তফসিলের অধীনে ২৯টি ৪র্থ তফসিলের অধীনে ৬১টি ৫ম তফসিলের অধীনে ১৪টি মোট ১৭২টি	নগরীর কার্যাবলি কিছুটা হলেও বর্জ্য নিষ্কাশন, রাস্তার আলো ও বাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তা ও নর্দমা মেরামত বা নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট, তবে তফসিলগুলোতে তালিকাভুক্ত অন্যান্য কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয় না।
৫।	সিটি কর্পোরেশন	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯	তফসিল ৩-এ ২৮টি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। মোট ১৬০টি কার্যক্রমের দীর্ঘ বিবরণ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তফসিল ৪-এ ২৬টি তফসিল ৫-এ ৬২টি মোট = ২৪৮	সিটি কর্পোরেশন ৫/৬টি সীমিত কার্যাবলিতে দৃশ্যমান। যেমন- বর্জ্য অপসারণ, রাস্তার বাতি, রাস্তা ও খোলা নর্দমা মেরামত, জন্ম ও মৃত্যু সনদ ইস্যু করা, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি।
৬।	পার্বত্য জেলা পরিষদ	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান তিন পার্বত্য জেলার জন্য তিনটি পৃথক আইন	রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে ৩০টি এবং বান্দরবানে ২৮টি সরকারি দপ্তর ও তাদের কাজ ও কর্মী স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। আসলে কর্মী ও সম্পদ দপ্তরগুলোর হাতেই রয়ে গেছে।	একমাত্র দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠান, যাদের অর্থ ও জনবল আছে, কিন্তু প্রকৃত অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক বৈধতার অভাব রয়েছে।
৭।	পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্কেল প্রধান হেডম্যান-কারবারী প্রথাগত স্থানীয় সরকার	পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০	ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ, ভূমি ব্যবহারের সনদ প্রদান, স্থানীয় সমাজ সংহতি রক্ষা ও বিরোধ নিষ্পত্তি	এলাকায় নির্বাচিত ইউপি বিদ্যমান থাকলেও তিনি পার্বত্য জেলায় প্রথাগত ব্যবস্থা এখনও বিদ্যমান।

জেলায় জেলা প্রশাসন এবং সকল উন্নয়ন ও সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি দপ্তর-অধিদপ্তর থেকে জেলা পরিষদ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ভোট গ্রহণ পদ্ধতির কারণে জনগণ থেকেও বিচ্ছিন্ন একটি রাজনৈতিক ও দলীয় আখড়া। অপরদিকে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কোন প্রকল্প ব্যয় জেলা পরিষদ করতে পারে না। উপজেলা পরিষদ বিভিন্নমুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। তিন জন জনপ্রতিনিধি নিয়ে উপজেলা পরিষদ, একজন চেয়ারম্যান ও দুই জন ভাইস-চেয়ারম্যান। তিন জনেরই নির্বাচনী এলাকার আয়তন ও জনসংখ্যা একই, কিন্তু ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা যা দেয়া হয়েছে তা সবই চেয়ারম্যনের করায়ত্বে। চেয়ারম্যানের হাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব। সকল প্রশাসনিক নেতৃত্বের চাবিকাঠি উপজেলা নির্বাহী অফিসসারের হাতে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ ও পৌরসভার মেয়রগণ পদাধিকার বলে উপজেলা পরিষদের সদস্য। তারা কেউ উপজেলা পরিষদকে নিজের পরিষদ মনে করে না। তারা অর্থ ভাগাভাগির অংশীদার মাত্র। সবার ওপরে স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্যের অদৃশ্য হাতের প্রবল এক নিয়ন্ত্রণ।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ধারাবাহিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন বা মাঠপ্রশাসনের অনুগ্রহভাজন ও অধস্তন অবস্থানে নিজেদের দেখে আসছে। তাই নেতৃত্বের স্বাধীন সত্তার বিকাশের বদলে একটি অধস্তনতার সংস্কৃতি গড়ে উঠে। আবার অপরদিক বিগত দুই দেড় দশক ধরে অতি রাজনীতিকরণের কারণে কোন নিয়মনীতি না মানার একটি নৈরাজ্যকর সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হতে থাকে। এ দুই প্রবণতাই সুস্থ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকাশের পথে একটি সাংস্কৃতিক বিপর্যয়।

ওপরের সারণি মতে, যাদের এত কাজ তাদের সরকারি অর্থ বরাদ্দ ঐ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৭ থেকে ১০ শতাংশ মাত্র। কর্মচারী নেই বললেই চলে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকারে বিভাগের বাজেট যখন ৩৮,০০০ কোটি টাকা সে সময় ৪,৫৭৫টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৬১টি জেলা পরিষদ ও ৩৩০টি পৌরসভার মিলিত বাজেট প্রায় ৪,৩০০ কোটি টাকা। ২০০৯ সালের ইউনিয়ন পরিষদ আইনের ৬৩(১) ধারা অনুযায়ী সাতটি মন্ত্রণালয়ের ইউনিয়ন পর্যায়ের নয়টি দপ্তর ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তরিত হবার বিধান করা হয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে তাদের কার্যালয় স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হয়। বাস্তবে ২০২৫ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ২৪ আনুযায়ী আইনের তৃতীয় তফসিলে ১০টি মন্ত্রণালয়েরসহ ১৭টি দপ্তরের কাজ, কর্মচারী ও অর্থসহ হস্তান্তর করার বিধান রয়েছে। কিন্তু তার একীভূত কোন চিত্র নেই। ২০২১ সালে উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতের একটি রীটে দেখা যায়, উপজেলা পরিষদ চেয়ারমান, ভাইস-চেয়ারম্যানদ্বয়কে বাদ দিয়ে এক নির্বাহী অফিসসার উপজেলা পর্যায়ের ১৪০টা কমিটির সভাপতি।[৬] প্রায় সব কমিটিই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার বলে গঠিত। পার্বত্য তিন জেলা পরিষদে দাবি করা হয় ২৯-৩০টি জেলা পর্যায়ের দপ্তর জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত। কার্যত জেলার দপ্তরগুলো নিজ নিজ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সত্যিকার অর্থে সরকার কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে নিম্নের বিষয়গুলোর ওপর আন্তরিকভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে।

- স্থানীয় সরকারে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গিকার বাস্তবায়ন;
- কার্য (Function), কর্মী (functionary) ও কার্য করার মত অর্থ (Fund) সংস্থান;
- আইন অনুযায়ী কার্যসমূহ সম্পাদনের প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা (Freedom) প্রদান;
- উপরের কার্য, কর্মী, অর্থ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে আইন অনুযায়ী গণতান্ত্রিক সংগঠন কাঠামো ও আইন কাঠামো নির্মাণ;
- রাষ্ট্রের জাতীয় একটি 'বিকেন্দ্রীকরন নীতি' বাস্তবায়নের অঙ্গীকার গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয় থেকে দপ্তর-অধিদপ্তর প্রভৃতিকে দক্ষতা, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার আলোকে পুনর্গঠন;
- ইতিহাসের ভুলত্রুটিগুলো অকপটে স্বীকার করে তার গণতন্ত্রমুখী সংশোধন; এবং
- মন্ত্রণালয় থেকে দপ্তর/অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতা, কার্যাদি, অর্থ ও জনবলের যথাযথ বিকেন্দ্রীকরণ;

পরবর্তী অধ্যায়ে উপরোক্ত আটটি নীতির আলোক স্থানীয় সরকারের প্রতিস্তরের সংগঠন কাঠামো ও উপযোগী আইন কাঠামো প্রণয়ন বিষয় সন্নিবেশিত হবে।

আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সংগঠন আইন সংস্কার

বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহাসিকভাবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে গেছে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে সকল লড়াই সংগ্রাম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পশ্চাৎমুখী যাত্রায় সামিল হয়। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী হয়েও স্বাধীন দেশ ও সমাজ উপযোগী প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ ও তার সুরক্ষায় সফল হতে পারেনি। যার একটি উদাহরণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রত্যাশা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক স্থানীয় শাসন ও সরকার প্রতিষ্ঠায় আমরা ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালপর্ব বাদ দিলেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সময়ের সকল উদ্যোগসমূহ কখনও সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং আবার কখনও কখনও অতি রাজনীতিকতার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। ২০২৪-এর নতুন অভ্যুত্থান আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজে একটি নতুন বন্দোবস্তের স্ব-আরোপিত অঙ্গীকার আদায় করেছে। সে অঙ্গীকারের সূত্র ধরে স্থানীয় সরকারের গণতন্ত্রায়ন এবং গণতান্ত্রিক একটি সেবা ব্যবস্থা ও জাতিগত বিনির্মাণ কাঠামো সৃষ্টির প্রতিশ্রুতিতে সকল মানুষ একত্রিত হয়েছে। আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একদিকে গ্রামীণ পর্যায়ে একটি ত্রিস্তরীয় কাঠামো (ইউনিয়ন পরিষদ,

[৬] রিট আবেদনের আর্জি রিট নং ৯৫৯৩/২০২০। স্থানীয় সরকার বিভাগসহ ১৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে বিবাদী করে এ রিট করা হয়।

উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ) অপরদিকে নগরে একটি দ্বি-স্তরীয় সংগঠন কাঠামো (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) বিদ্যামান। এসব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন হয়, কিন্তু গণতন্ত্রের চর্চা প্রশ্নবিদ্ধ। আইনত কাজের তালিকা আকর্ষণীয় কিন্তু কাজ করা হয় আইনের বাইরে। আইনে যা যেভাবে করতে বলা আছে, তা সে ভাবে হয় না। অন্য অনেক কাজ হয় যা নিয়মনীতি বহির্ভূত। বিরাজিত আইন ও সংগঠন কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যার ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব সংঘাত ও অস্বচ্ছতা।

অধ্যায়-চার

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সংগঠন ও আইন: সংস্কারের পথচিত্র

বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহাসিকভাবে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই সংগ্রামে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে প্রতিবারই সকল লড়াই সংগ্রাম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পশ্চাৎমুখিতায় আক্রান্ত হয়। যাকে বলা যায় তীরে এসে তরী ডোবানো। ১৯৪৭ সালে ও ১৯৭১ সালে সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী হয়েও স্বাধীন দেশ ও সমাজ উপযোগী প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ ও তার সুরক্ষায় সফল হতে পারিনি। যার একটি উদাহরণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রত্যাশা অনুযায়ী সংবিধান রচনা, গণতান্ত্রিক জাতীয় ও স্থানীয় শাসন এবং সরকার প্রতিষ্ঠায় আমরা ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছি। ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালপর্ব বাদ দিলেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সময়ের সকল উদ্যোগসমূহ কখনও সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং আবার কখনও কখনও অতি রাজনীতিকতার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। ২০২৪-এর নতুন অভ্যুত্থান আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজে একটি নতুন বন্দোবস্তের শুভ সূচনার দৃঢ় অঙ্গীকার আদায় করেছে। সে অঙ্গীকারের সূত্র ধরে স্থানীয় সরকারের গণতন্ত্রায়ন এবং গণতান্ত্রিক একটি সেবা ব্যবস্থা জাতিগতভাবে বিনির্মাণ প্রচেষ্টার উদ্যোগে জাতি আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও একাত্ম।

আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একদিকে গ্রামীণ পর্যায়ে একটি ত্রিস্তরীয় কাঠামো (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ) অপরদিকে নগরে একটি দ্বি-স্তরীয় সংগঠন কাঠামো (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) বিদ্যমান। কাঠামোর বিদ্যমানতা প্রত্যাশিত কর্ম ও ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। এ সব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন হয়, কিন্তু গণতন্ত্রের চর্চা প্রশ্নবিদ্ধ। আইনত কাজের সুদীর্ঘ আকর্ষনীয় তালিকা। কিন্তু বীরদর্পে কাজ করা হয় আইনের বাইরে শুধু নয়, আইন ভঙ্গ করে। আইনে যা যেভাবে করতে বলা আছে তা সে ভাবে হয় না। অন্য অনেক কাজ হয় যেখানে নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হয় না। বিরাজিত আইন ও সংগঠন কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যার ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও অস্বচ্ছতা। এ বিষয়গুলোর অবতারণা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে। ঐ আলোচনা থেকে নিম্নরূপ একটি সারমর্মও করা হয়েছে।

- স্থানীয় সরকারে গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়ন;
- কার্য (Function), কর্মী (functionary) ও কার্য করার মত অর্থ (Fund) সংস্থান করা;
- আইন অনুযাযী কার্যসমূহ সম্পাদনের প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা (Freedom) প্রদান ও অর্জন;
- উপরের কার্য, কর্মী ,অর্থ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে আইন অনুযায়ী গণতান্ত্রিক সংগঠন কাঠামো ও আইন কাঠামো বিনির্মাণ;
- রাষ্ট্রের জাতীয় একটি বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়নের অঙ্গিকার রচনা;
- মন্ত্রণালয় থেকে দপ্তর-অধিদপ্তর প্রভৃতিকে পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ (delegation)-এর নিরিখে দক্ষতা, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার আলোকে পুনর্গঠন; এবং
- ইতিহাসের ভুলত্রুটিগুলো অকপটে স্বীকার করে তার গণতন্ত্রমুখী সংশোধন

ওপরের এ বিষয়গুলোকে সামনে নানা অধ্যায়ে পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণসহ সুপারিশ আকারে নানা শিরোনামে পাওয়া যাবে। এ অধ্যায়ে গণতান্ত্রিক, দক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থানীয় সরকারের একটি সংগঠন কাঠামো এবং সে সংগঠনকে স্বয়ংক্রিয় বা সচল রাখার নিশ্চয়তা হিসেবে একটি আইন কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

স্থানীয় সরকারের কাঠামোগত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা

অতি অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নানা রাজনৈতিক পটভূমিতে স্থানীয় সরকার নামে কিছু বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান চালু করা হলেও আন্তঃপ্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কোন একটি ব্যবস্থা হিসেবে স্থানীয় সরকার গড়ে উঠেনি। একটি রাজনৈতিক পটভূমিতে ইউনিয়ন সৃষ্টি করে “ইউনিয়ন পঞ্চায়েত” শুরু করা হয়। কালক্রমে

তাতে একজন চেয়ারম্যান ১২ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। শুরুতে ১৯৭০-এর দশকে একমাত্র নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাপক সমাদৃত হলেও ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় সরকারগুলোর বেআইনী প্রশ্রয়ে তার একনায়কতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক চরিত্র আগ্রাসীরূপ নিয়ে সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। সরকারি কর্মচারিদের যোগসাজসে বিকৃত একটি প্রকল্প সংস্কৃতি গড়ে উঠে। যা আইন-কানুনকে পাশ কাটিয়ে de facto একটি কায়েমী ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠে। চেয়ারম্যান ও মেয়রগণ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠানের চেয়ে শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে। ইউনিয়ন পরিষদের ৯ জন সাধারণ সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ প্রকৃত প্রস্তাবে পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যায়। ধীরে ধীরে তারাও একটি অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে কিছু আর্থিক সুবিধা গ্রহণের একটি চক্র বা নেটওয়ার্কে ঢুকে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত আপোষরফা করেই একটি ব্যবস্থা চলতে থাকে। এভাবে সুপ্রাচীন এ প্রতিষ্ঠানটি জনসেবা নয়, দুর্নীতিবাজদের একটি গ্যাংগ প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করে। নির্বাচনে জনঅংশগ্রহণ শূন্যের কোটায় নেমে আসে। নির্বাচন হয়ে পড়ে নামসর্বস্ব একটি মহা প্রতারণার ফাঁদ। জাতীয় নেতৃত্ব, প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃত্ব একই চরিত্র ধারণ করে। ফলস্বরূপ উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, জনরোষ থেকে বাঁচার জন্য ২০২৪-এর ৫ আগস্টের পরিবর্তনের পর প্রায় ৬০/৭০ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেয়র, কাউন্সিলর ও সদস্য গণরোষে পড়ে আত্মগোপনে বা কর্মস্থল এবং আবাসস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। অনেকে গণপিটুনির শিকার হয়, আবার অনেকে পুলিশের হাতে আটক হয়। অনেকের বিরুদ্ধে মামলা-হামলা ইত্যাদি হয়। এভাবে স্থানীয় পরিষদসমূহে সুস্থ কোন কর্ম পরিবেশ থাকে নাই। ইতিহাসে এরকম ঘটনা নজিরবিহীন। একটি প্রতিষ্ঠান কী রকমভাবে ফ্যাসিবাদী ও নিপীড়ক হলে এ জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে তা ভাবা যায় না।

তাই প্রথমত, ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে গণতান্ত্রিক একটি পরিবেশ বজায় রাখা, একক ক্ষমতা চর্চার পথরুদ্ধ করে পরিষদে ও কাউন্সিলে সবার অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা নিশ্চিত করা এবং নেতা নির্বাচন ও নেতৃত্ব চর্চায় ভারসাম্য আনয়ন একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত সংগঠন কাঠামো গণতন্ত্রায়নের পাশাপাশি আর একটি বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। তা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিভিন্ন স্তরে যে আসাঞ্জস্যপূর্ণ সংগঠন কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোর একটি যৌক্তিক অভিন্ন রূপ-কাঠামো তৈরি করা। যাতে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান কার্যকর সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায়।

তৃতীয় একটি দিক হচ্ছে কয়েকটি কমিশন উপর্যুপরি উপস্থাপনের পরও কোন সমাধান করা হয়নি, তা হচ্ছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একীভূত, সহজবোধ্য ও ব্যবহারকারী বান্ধব একটি একক আইন প্রণয়ন। বিরাজিত ৫ বা ৭টি পৃথক মৌলিক আইন ও শতাধিক অধস্তন আইন থাকার পরও শতশত প্রজ্ঞাপন দিয়ে স্থানীয় সরকার চালাতে হয়। এই জটিল আইন, বিধি ও সার্কুলারের কারণে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ কোন আইনই আর অনুসরণ করে না। প্রযোজনে তারা লবি-তদবির করে আরও একটি নতুন সার্কুলার বের করে। কিংবা অফিসসে ধরণা দিয়ে উৎকোচের মাধ্যমে কাজ আদায় করে। তাই প্রয়োজন ব্যবহার বান্ধব একক আইন।

চতুর্থ আর একটি কান্ড গত ১৫/২০ বছর যাবৎ অব্যাহত গতিতে ঘটে চলেছে। তা হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকল্প অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করে মূল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নতুন প্রকল্প উপাদানকে মূল সংগঠনের অংশ বানিয়ে নতুন একটি 'টিউমার' জাতীয় সংগঠন কাঠামো সৃষ্টি করে দেয়া। প্রায় বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে মন্ত্রণালয় থেকে কোনো যুগ্ম বা অতিরিক্ত সচিবকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। উন্নয়ন সহযোগীদের নিজস্ব আমলা যারা মূলত বিদেশি বা তাদের সহযোগী দেশীয় পরার্শক, তাদের একটি লক্ষ্য থাকে প্রকল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অংশ হিসেবে কোন একটা মডেল বা নমুনা সৃষ্টি করে তা মূল সংগঠনের নীতি কাঠামোর অংশ করে দেয়া। এটিকে তারা প্রকল্পের সফলতা হিসেবে বিবেচনা করে। এজন্য সরকারকে সহজে প্রভাবিত করার উপায় হিসেবে মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করে, যা সত্যিকার অর্থে মন্ত্রণালয়ের রুলস অফ বিজনেসের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ নয়। এভাবে অসংখ্য প্রকল্পের কারণে অনেক নতুন নতুন সার্কুলার হয়। প্রকল্প শেষ হয়ে যাবার পরে অর্থ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় আর প্রকল্প সংগঠন ও কর্মসূচি এগুলো একটি বোঝা হয়ে থাকে।

প্রকল্প ও কনসালটেন্ট উপদ্রুত স্থানীয় সরকার

ইউনিয়ন পরিষদ এ অবস্থার স্বীকার হয়ে তাদের উপর অনেক বাড়তি কাজ, সভা, প্রতিবেদন, রিটার্ন ইত্যাদি চাপানো হয়েছে। যেমন আইন করে ইউনিয়ন পরিষদে 'গ্রাম সভা' চালু করা হয়, যা কখনও কাজ করেনি (Ahmed 2014 & 2015)। ডিজিটাল ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম আদালত, লিংক মডেলের অভিজ্ঞতায় UDCCA। সুইস অর্থায়নে Horizontal Learning। ইউএসএআইডি ও বেশ কিছু এনজিও সহায়তায় এ জাতীয় আরো অনেকগুলো প্রান্তিয় কাজকে মূলধারায় নিয়ে আসে। যা শেষ পর্যন্ত মূল সংগঠনকে সচল ও বেগবান করার চেয়ে আড়স্ট করেছে। স্থানীয় সরকার অঞ্জাণ হয়ে পড়ে পরেছে অতিমাত্রায় কনসালটেন্ট উপদ্রূত।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল কাঠামোগত সমস্যা, গণতান্ত্রিক চর্চার প্রকট সংকট, নেতৃত্বের সমস্যা, নারী প্রতিনিধিদের সমস্যা, অর্থ প্রাপ্তির অপ্রতুলতা ও অব্যবস্থাপনা, অনিয়মিত ও অদক্ষ নিরীক্ষা, সক্ষমতাহীনতা এবং সর্বোপরি আইন ব্যবস্থার অসামঞ্জ্যতা ইত্যাদির উপর ধারাবাহিক কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি।

ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি গুরুতর সমস্যা হলো এসব সমস্যা কোনভাবে কোথাও আলোচিত হলো না বা হচ্ছে না। প্রান্তিয় সমস্যাকে মূলধারায় নিয়ে আসা হয় এবং তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা ও মূল্যায়নধর্মী গবেষণা চলতে থাকে। কিন্ত স্থানীয় সরকার বিষয়ে দীর্ঘদিন কোন মৌলিক গবেষণা হয় না।

যেমন ইদানিং (২০২৫) যে বিষয়টি বহুল আলোচিত এবং ক্রমে জাতি এ আলোচনায় বিভক্ত হয়ে পড়ছে, তা হলো নির্বাচন। স্থানীয় নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনের সময়সূচি অর্থাৎ কোন নির্বাচন আগে এবং কোনটা পরে হতে পারে। এটি একটি নিরর্থক ও ভ্রান্তিপ্রসূত বিতর্ক যা পুরো দেশে ও সমাজকে ব্যস্ত রেখেছে। এটিকে একটি কূট তর্কও বলা যায়। সত্যিকারের জনবান্ধব গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যে দেশে অনুপস্থিত, সে দেশে অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন পরিপূর্ণ সংস্কারের আগে কীভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা বোধগম্য হয় না।

নির্বাচন নিয়ে বিভ্রন্তিকর আলোচনা

নির্বাচনী আলোচনায় একটি বিভ্রান্তিকর আলোচনা স্থানীয় সরকারের সংস্কার বিষয়ক আলোচনাকে কিছুটা বিপথগামী করছে। তা হচ্ছে, চেয়ারম্যান এবং মেয়র নির্বাচনে মানুষ সরাসরি ভোট দিতে না পারলে তা অগণতান্ত্রিক হবে এবং গণতন্ত্রের বিরাট একটি বিচ্যুতি ও ক্ষতি হয়ে যাবে। পরোক্ষভাবে সদস্য ও কাউন্সিলরের ভোটে চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাচন হলে ব্যাপকভাবে ভোট কেনা-বেচা হতে পারে। অন্যান্য সব সংস্কার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এটিই একমাত্র আলোচনা। কোন আশঙ্কাই অমূলক নয়। এদেশে ভোট কেনা-বেচার ঐতিহ্য নতুন নয়। কিন্ত তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা দেখতে হবে। সরাসরি মেয়র ও চেয়ারম্যান নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার ও পেশী শক্তির প্রয়োগ নিয়ে এতদিন অনেক বেশি অভিযোগ ছিল। তার সাথে যুক্ত হয় ব্যাপক মনোনয়ন বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক দলীয় মনোনয়ন। কম অর্থশালীদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখার কৌশল। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে পাঁচ বছরের জন্য 'রাজা' বানানো হতো। সে রাজা কিন্ত পাঁচ বছর প্রতিষ্ঠানের চেয়ে নিজেকে বড় ভাবতে শুরু করতেন। একক ব্যক্তির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের স্থলে কর্তৃত্ব, ভূমিকা ও ক্ষমতা অনেকের মধ্যে বিতরণের একটি ব্যবস্থা করা গেলে শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের নতুন পরিসর সৃষ্টি করা যায় কিনা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা সুযোগ থাকা চাই। রাতারাতি আবার পূর্বের সমালোচিত পদ্ধতি ভাল হয়ে যেতে পারে না। তাই সবার কাছ থেকে জাতি একটা উন্নত বিকল্প প্রত্যাশা করে। গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে অভাবী, অশিক্ষিত ও অসৎ সমাজে সহজে সফল হয় না। যে প্রার্থীকে একজন ভোটার ভোটটা দেবেন তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না, যে এই প্রার্থী তার ভোটের মর্যাদা রক্ষা করবেন। সমাজের এই মৌলিক স্থানে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন না হলে নির্বাচনী গণতন্ত্রের সফলতা প্রশ্নবিদ্ধই থাকবে।

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ সফল আন্দোলন ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট সদস্যগোষ্ঠী পালিয়ে যাওয়ার পর আন্দোলন থেকে নতুন রাষ্ট্র গড়ার একটি দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা উঠে আসে। সে লক্ষ্যে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। ৫টি কমিশন ফেব্রুয়ারি-২০২৫ এর

মধ্যে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। ইতোমধ্যে দেশে সংস্কার ও নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের একক প্রত্যাশা ক্ষীণ হয়ে অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন করার দবি উঠতে থাকে। সাথে তৃণমূল থেকে স্থানীয় নির্বাচনের দাবি উঠে। কারণ ইতোমধ্যে বেশিরভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নেতৃত্বশূন্য। এসব বিতর্ক দেশে সামগ্রিক রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

এ কমিশন স্থানীয় সরকারের স্তরসমূহ আপাতত হ্রাস-বৃদ্ধি না করে প্রতিটি স্তরের কাঠামোকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে চেষ্টা করছে। বর্তমানে প্রতিটি স্তরের কাঠামো ভিন্ন। নতুন ব্যবস্থায় সকল স্তরে অভিন্ন কাঠামো করার বিষয়ে কমিশন কাজ করেছে। এ অভিন্ন কাঠামোর একটি প্রধান উপাদান হবে সকল স্তরে যৌক্তিক ওয়ার্ড ব্যবস্থা এবং সকল ওয়ার্ড সদস্যের গণতান্ত্রিক পন্থায় অবারিত কাজ করার সুযোগ। এতদিন চেয়ারম্যান বা মেয়রদের একক কর্তৃত্বে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয়ে আসছে। এখন গণতান্ত্রিক অংশগ্রহনে সবার গঠনমূলক ভূমিকা নিশ্চিতের একটি উদ্যেগ প্রাধান্য পাক।

অসম ওয়ার্ড ব্যবস্থা

প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদের কিছু অসঙ্গাতির বিষয় তুলে ধরা যাক, যা অবিলম্বে দূর করতে হবে। জনসংখ্যা ভেদে ছোট, বড়, অতিবড়, মাঝারি ইউনিয়ন রয়েছে। আবার ভৌগোলিক আয়তনেও বড় বা ছোট ইউনিয়ন আছে। ইউনিয়ন পরিষদের জনসংখ্যা নিম্নে ৪ হাজার থেকে উর্ধ্বে চার লাখ (সাভারের ধামসোনা) পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝখানে ৫০ হাজার থেকে ২-৩ লাখের অনেক ইউনিয়ন পরিষদ (সারণি-১ দেখুন) রয়েছে। আয়তনের দিক থেকে দেখলেও দেখা য়ায় রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার ‘সাজেক’ ইউনিয়নের আয়তন ৬০৭ বর্গমাইল। এরকম আরও অস্বাভাবিক বৃহৎ ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। সাজেকের সদস্যদের সরল স্বীকারোক্তি তারা কখনও তার নিজের ওয়ার্ড পুরোটা ঘুরে দেখতে পারেননি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, বড় ছোট সকল ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সর্বত্র নয়টি ওয়ার্ড করা হয়েছে এবং তা বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে চলছে। আগামীতে জনসংখ্যা ও আয়তনের ওপর ভিত্তি করে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ঢালাওভাবে না বাড়িয়ে ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হবে। কারণ পরিষদ বাড়লে সরকারি ব্যয় বাড়ে। ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি করে সে সমস্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাধান করা যায়। ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সংখ্যা সর্বনিম্ন নয় থেকে সর্বোচ্চ ঊনচল্লিশে এ সীমাবদ্ধ করা যায়। ভারতের পশ্চিম বঙ্গে এরকম একটি নীতি অনুসৃত হয় এবং তা ইতিবাচক প্রমাণিত হয়েছে।

সাজেক ইউনিয়ন পরিষদ: অবহেলা ও উদাসীনতা কুতুব মিনার

‘সাজেক’ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার একটি ইউনিয়ন। আয়তন ৬০৭ বর্গমাইল। সরকারি হিসেবে জনসংখ্যা ৩২,৬৬২ হলেও বেসরকারিভাবে ৪৫,০০০ বলে অনুমিত হয়। খানা সংখ্যা ১২০০০। চাকমা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখো, মারমা, রিয়াং এবং বাঙ্গালি জাতি গোষ্ঠীর লোকজন এখানে বসবাস করে। বাঙ্গালি খানা সংখ্যা ৩০০ এবং জনসংখ্যা ১২০০ বলে মনে করা হয়।

৬টি মৌজার এ ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ১২ জন সদস্য ও একজন চেয়ারম্যান ছাড়াও ৬জন হেডম্যান ও ৮৬ জন কারবারি রয়েছে। ৯টি ইউনিয়ন ওয়ার্ড এর মধ্যে নতুন লংকর ও পুরান লংকর মিলে ১নম্বর ওয়ার্ড, উজানছড়ি-ভুয়াছড়ি (ওয়ার্ড-৭), বেটলিং-জোপই (ওয়ার্ড-৮) ও শিয়ালদাই-লুই চিইল্লাতলি (ওয়ার্ড-৯)-এ চারটি ওয়ার্ড দুর্গম এলাকায় অবস্থিত।
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধানসহ সাতজন সদস্য এবং সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন প্রতিনিধি এবং এনআইএলজি’র একজন অনুষদ সদস্যসহ ১০ জন এ সফরে ছিলেন। পরিষদের সচিব বিশ্বজিত চক্রবর্তী এনআইএলজিতে সচিবদের প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। তিনিই আমাদের পরিষদে সর্বপ্রথম অভ্যর্থনা জানান। আমাদের পুরো দল সকাল ১০টার আগে পরিষদ কার্যালয়ে পৌছাই। চেয়ারম্যান অতুল লাল চাকমা, সদস্য বিপিকা চাকমা, সুমিত চাকমা, মন্টু কুমার ত্রিপুরা এবং বনবিহারি চাকমা আধা ঘন্টার মধ্যে পৌছে যান।

চেয়ারম্যান অতুল লাল জানান ইউনিয়ন পরিষদে অর্থ সংকট প্রকট। মাত্র ২.৫ লাখ টাকার মত নিজস্ব আয়। এখানে ভূমি হস্তান্তর রাজস্ব, বাজার রাজস্ব ও ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ পাওয়ার কোন উপায় নেই। টিআর, কাবিখা, ভিজিএফ, ভিজিডি বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায খুবই অপ্রতুল। এখানে ৩৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি উচ্চ বিদ্যালয় ও পাঁচটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৯টি কেয়াং, ১৭টি গির্জা, ১৪টি মন্দির, পাঁচটি মসজিদ ও ২ টি মাদ্রাসা। চেয়ারম্যান সাহেব শিক্ষার সমস্যা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, স্কুলগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ‘বর্গা’ প্রথায় চলে। বর্গা অর্থ হচ্ছে বদলি শিক্ষক – সরকার নিয়োজিত শিক্ষকগণ নিজেরা স্কুলে না এসে অন্য একজনকে দিয়ে পাঠকর্ম সারেন। প্রায় শিক্ষকই অনিয়মিত।

ওয়ার্ড মেম্বারগণ সরাসরি স্বীকার করেন যে, দুর্গম হওয়ার কারনে তারা তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ড পুরোটা কখনও ঘুরে দেখতে পারেননি। মানুষ ভোটে অনেক কষ্ট করে অংশ গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনীর একজন সদস্য জানান, 'সাজেক বা পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির মানুষ ভোটদানের ব্যাপারে খুবই সৎ ও আগ্রহী। তারা দুর্গম এলাকা থেকে ভোটের পূর্বদিন এসে হোটেলে থাকেন এবং উৎসব আনন্দে ভোট দিয়ে পরদিন বাড়ি ফিরে যান'। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ভোটের পর তাদের প্রতিনিধিগণ তাদের সাথে এলাকায় দেখা করতেও যেতে পারেন না।

বাঘাইছড়ির আট ইউনিয়নের মধ্যে সাজেক বৃহত্তম। সাজেক ইউনিয়নে গত নির্বাচনের ভোটার সংখ্যা ছিল ১৯০০০, আর আমতলী নামের অপর একটি ইউনিয়নে তা মাত্র ২৫০০। অন্য ইউনিয়নগুলোতে ৯০০০ এর বেশি কোথাও নাই। সদস্য ও চেয়ারম্যান বাবুর বক্তব্য এ ইউনিয়নকে খন্ডিত না করে ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়নো প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় সাজেকের ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ এর স্থলে ২১ বা ন্যূনতম ১৮ হলে ভাল হয় বলে তারা একমত হন। ইউনিয়নকে ২১ ওয়ার্ডএ ভাগ করা হলে গড়ে ভৌগলিক এলাকা হয় ২৯ বর্গ মাইল এবং ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০৪ জন। তা হলে প্রত্যেক এলাকার লোকজন একজন মেম্বার কে অন্তত দেখতে পাবেন।

সাজেক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে খুবই আকর্ষণীয়। পর্যটনের আহরিত রাজস্বের একটি অংশ ইউনিয়ন পরিষদের পাওয়া উচিত। চেয়ারম্যান সাহেবের হিসাব মতে তাঁর এলাকায় ১৩০টির মত রিসোর্ট আছে। কোন রিসোর্টই কর দেয় না। আমাদের সফরকারী দল সকল রিসোর্ট এর উপর কর ধার্য করার সুপারিশ করে। এ ব্যাপারে বাঘাইছড়ির উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকেও অবহিত করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও এ পরিষদকে কিছু রাজস্ব সহায়তা দিতে পারে। সেনাবাহিনী পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য পর্যটকদের যানবাহনগুলোকে পাহারা দিয়ে পাহাড়ে আনা নেয়ার জন্য সামান্য কিছু সার্ভিস ফি নিয়ে থাকে। এ ফি'র সামান্য কিছু রাজস্ব প্রতি তিন/ছয় মাস অন্তর এ পরিষদকে দেয়া যেতে পারে। তারা অন্তত তাদের গ্রাম পুলিশ বাহিনীকে পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত করতে পারে।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় সম্পদ আহরণে সহায়তা, সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে ব্যবহার করা হলে প্রশাসন ও উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততা বাড়বে। প্রান্তিক মানুষগুলো সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলস্রোতে সামিল হতে উৎসাহিত হতে পারে।
ভৌগলিকভাবে দুর্গম এলাকায় ৬০৭ বর্গমাইলের একটি ইউনিয়নে ৯+৩= ১২ জন। ওয়ার্ড সদস্য থাকা একটি চরম সরকারি অবহেলা ও উদাসীনতার নিদর্শন।

৩১.১২.২০২৪

জনসংখ্যার সাথে যৌক্তিকভাবে ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ না করে এখানে নির্বাচন করা কতটুকু সঙ্গত। তাই আমাদের সুপারিশ হবে নির্বাচন কমিশন সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদগুলোর ওয়ার্ডের সীমানা অবিলম্বে পুণঃনির্ধারণ করে দিবে।

জনসংখ্যা ও আয়তনের সামঞ্জস্য বিধান করে নির্বাচন কমিশনের নিজের ডিলিমিটেশন আইন অনুযায়ী ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারণ করে দিতে পারেন। নিম্নে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদসমূহের বিরাজিত জনসংখ্যার একটি চিত্র উপস্থাপন করা হলো। এখানে ১০,০০০ থেকে ১,০০০-২,০০০ এর অনেকগুলো এলাকা রয়েছে যাদের দুরবর্তী কোনো বিচ্ছিন্ন চর বা বনাঞ্চলে অবস্থানের পৃথক ভৌগোলিক অবস্থান বা সত্তা রয়েছে। তবে ঐ সত্তাগুলো ইউনিয়ন পরিষদ হিসেবে স্বীকৃত কিনা স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে ঐ সব ক্ষুদ্র জনপদগুলোকে নিকটস্থ এক বা একাধিক ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যুক্ত করে দেয়া যায় অথবা বিশেষ আয়োজনে উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে রাখা যেতে পারে।

সারণি-৪:১ বিরাজিত ইউনিয়ন পরিষদের জনসংখ্যার অসমতার চিত্র

জনসংখ্যা	ইউনিয়ন সংখ্যা	প্রস্তাবিত ওয়ার্ড সংখ্যা
২,৫০,০০০ বা তদুর্দ্ধ	৭	৩৯
১,৫০,০০০ থেকে ২,৫০,০০০-এর নিচে	৫	৩৬
১,০০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০-এর নিচে	৯	৩৩
৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০-এর নিচে	১৪১	৩০
৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০-এর নিচে	৩০৩	২৭
৩৫,০০০ থেকে ৪০,০০০-এর নিচে	৩৭৫	২৪
৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০-এর নিচে	৬৪২	২১
২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০-এর নিচে	৯১৪	১৮

জনসংখ্যা	ইউনিয়ন সংখ্যা	প্রস্তাবিত ওয়ার্ড সংখ্যা
২০,০০০ থেকে ২৫,০০০-এর নিচে	৯৯৩	১৫
১৫,০০০ থেকে ২০,০০০-এর নিচে	৬৮৬	১২
১৫,০০০-এর নিচে	৫০৩	৯
	৪৫৭৮	

তথ্যসূত্র: বিবিএস এর জনসংখ্যার তথ্য বিশ্লেষণ

পরিবর্তিত অবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সংখ্যা সর্বনিম্ন ৯ থেকে সর্বোচ্চ ৩৯ এর মধ্যে সমন্বয় করা যায়। কারণ, ওয়ার্ড সংখ্যা ও সংরক্ষিত নারী আসন ঠিক রাখার জন্য মোট ওয়ার্ড সংখ্যা তিন দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে।

উপজেলা ও জেলা পরিষদের ওয়ার্ড

তারপর আসবে উপজেলা ও জেলা পরিষদের ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ। বর্তমানে উপজেলা পরিষদে কোন ওয়ার্ড নেই। উপজেলায় ওয়ার্ড সৃষ্টি ইউনিয়নের মত এত জটিল ও কঠিন হবে না। ছোট এবং মাঝারি সকল ইউনিয়ন উপজেলা পরিষদের তিনটি ওয়ার্ড বা নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত হবে। ব্যতিক্রমী বড় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি ওয়ার্ডেও সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। আবার একইভাবে প্রতিটি উপজেলাও জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য তিন থেকে পাঁচটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হতে পারে। জেলা ও উপজেলার ওয়ার্ডগুলো শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত হবে। এ ওয়ার্ডসমূহে ওয়ার্ড সদস্যদের কোন নির্বাহী দায়িত্ব থাকবে না। কারণ ঐ এলাকাগুলোর সবকিছু ইউনিয়ন পরিষদই দেখাশুনা করবে।

এই তিনটি পরিষদের একটি সাধারণ (common) সংগঠন কাঠামো থাকবে। এ সংগঠন কাঠামোর দুটি প্রধান অংশ থাকবে, একটি বিধানিক বা Legislative part অপরটি নির্বাহী বা Executive part অংশ[৭]।

প্রতিটি পরিষদ বা কাউন্সিলে পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন পদাধিকারী বা পদসোপন থাকবে। যারা পূর্ণকালীন তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাবেন। তারা তাদের মেয়াদে পূর্ণ সময় (আস্থা সাপেক্ষে) পরিষদে প্রদান করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোশেনের একটি অভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নরূপ:

[৭] ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার একটি সাংগঠনিক কাঠামো কেরালা, পশ্চিম বংগসহ বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে উঠেছে। কলকাতা সিটি কর্পোরেশন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ছক-৪.১: ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের প্রস্তাবিত সংগঠন কাঠামো

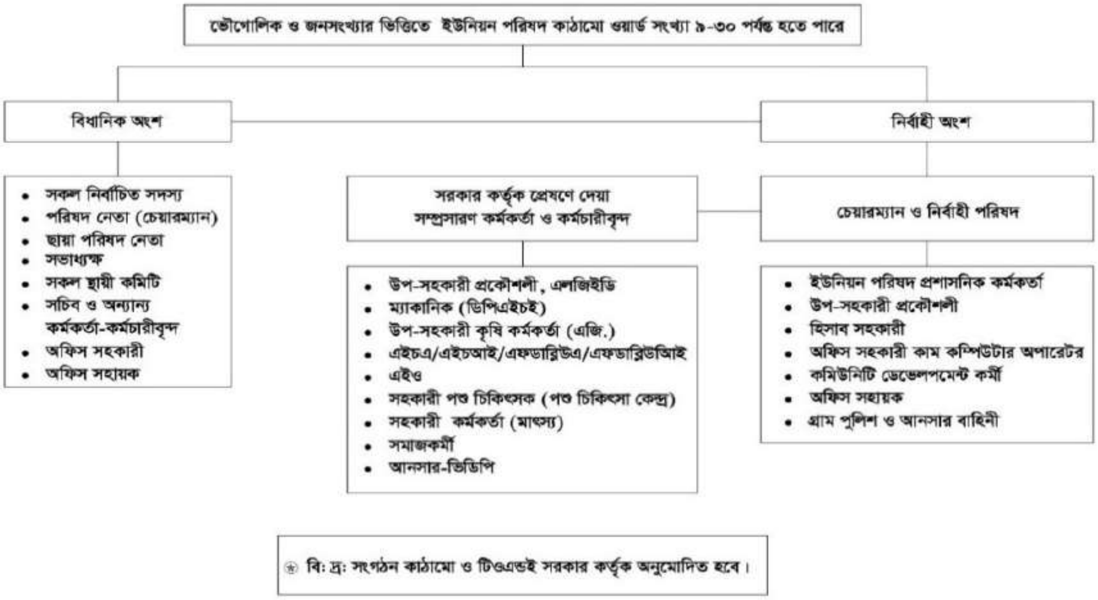

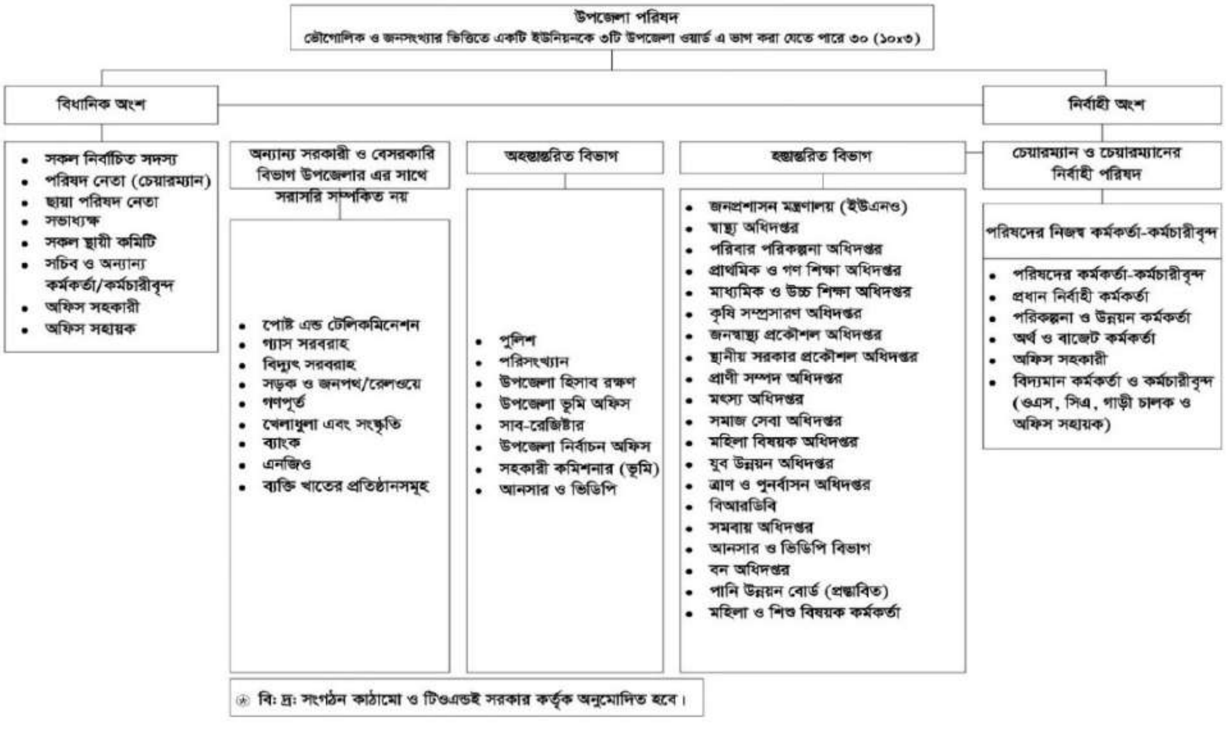

ছক-৪.২: জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন প্রস্তাবিত সংগঠন কাঠামো

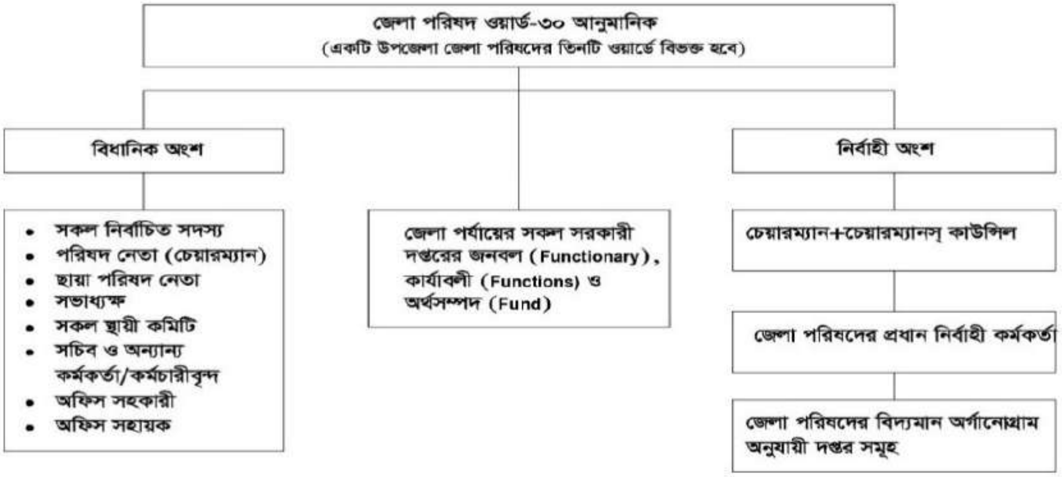

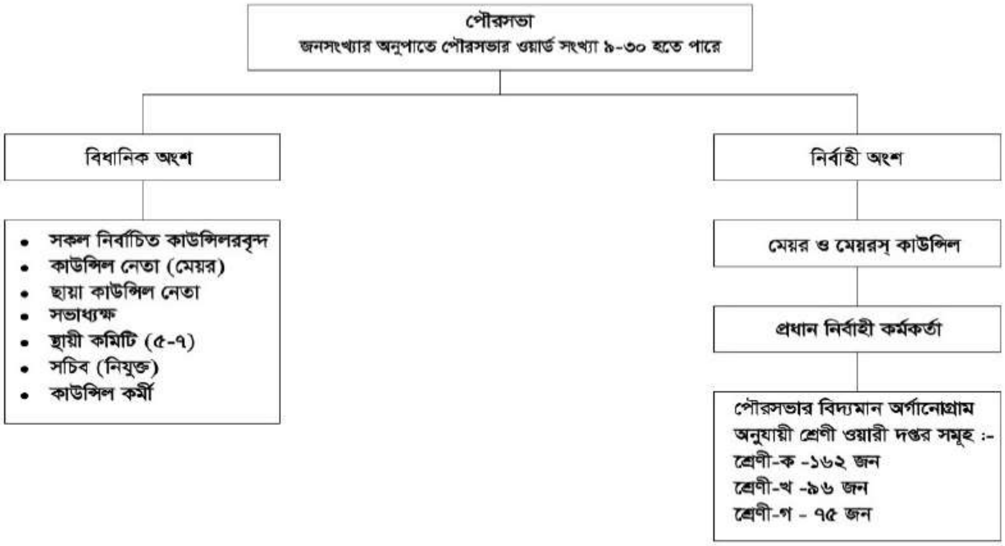

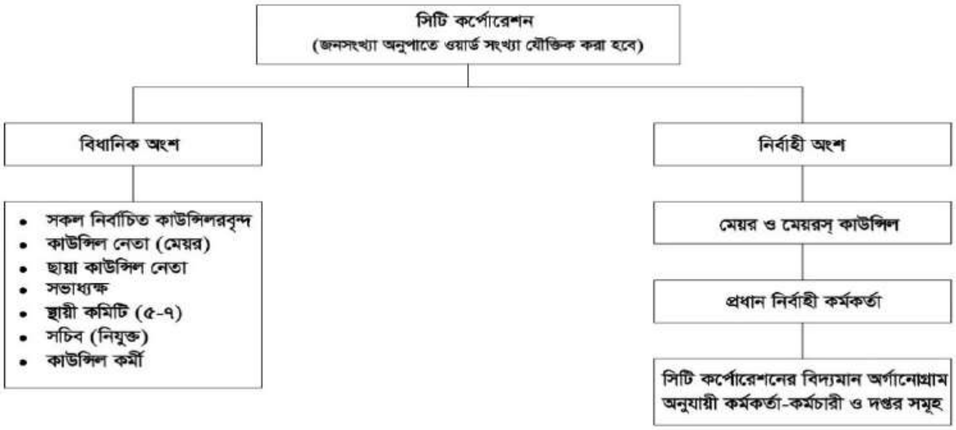

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নতুন বা প্রস্তাবিত সংগঠন কাঠামোর ব্যাখ্যা

✓ দেশে তিন স্তর বিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার এবং দুই পর্যায়ের নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান। এই তিন স্তর বিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার তথা ইউনিয়ন পরিষদ (৪,৫৭৮) উপজেলা পরিষদ (৪৯৫) ও জেলা পরিষদ (৬১+৩) এবং নগর স্থানীয় সরকারের দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৩০টি পৌরসভা ও ১২টি সিটি কর্পোরেশন চলমান রয়েছে। এসকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইন ও সাংগঠনিক কাঠামোতে বড় ধরনের সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা ওপরের চিত্র সম্বলিত কাঠামোতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

তিনটি গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জেলা পরিষদের কার্য ও কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা পরিষদ হবে একটি বিকেন্দ্রিকৃত পরিকল্পনা ইউনিট। ডেপুটি কমিশনারের অফিস পৃথকভাবে এখন যেভাবে জাতীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছে তা করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে সকল দায়িত্ব পালন করবে। তার উপর ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল বিদ্যমান দায়িত্ব বহাল থাকবে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে জেলা কমিশনারের (DC) কার্যালয় বাদে জেলার সকল উন্নয়ন ও সেবা সংক্রান্ত দপ্তরগুলো জেলা পরিষদে ন্যস্ত হবে। যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদায়িত হবেন। জেলা পর্যায়ের হস্তান্তরযোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকা পৃথকভাবে সরকার ও স্থানীয় সরকার কমিশন নির্ধারণ করবে। অনুরূপভাবে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে সংশ্লিষ্ট স্তরের দপ্তরগুলোতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ (Functionary), তাদের কার্যাদি (Functions) এবং অর্থ-সম্পদ (Fund) সংশ্লিষ্ট পরিষদে ন্যস্ত হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদে সচিব ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দুটি পৃথক পদ থাকবে। বর্তমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা কমিশনারের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন। তিনি উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত কর্মকর্তা হবেন না। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনও অনুরুপ সুপারিশ করেছে।

✓ পুরো দেশে অব্যাহত নগরায়নের ফলে নগর দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং গ্রামীণ এলাকা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (ভৌত ও ভার্চুয়াল) ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারমান। ফলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে স্থানীয় সরকারের বিদ্যমান স্তর সংখ্যা হ্রাস করে গ্রামীণ ও নগরীয় ব্যবস্থার বিভাজন দূর করে সমজাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা ও অধ্যয়ন সম্পন্ন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রস্তাবিত 'স্থানীয় সরকার কমিশন' সরকারকে বিশেষায়িত পরামর্শ প্রদানে সক্ষম হবে।

✓ বিদ্যমান গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তিনটি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ড ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু উপজেলা পরিষদে কোন ওয়ার্ড নেই এবং একই নির্বাচনী এলাকা থেকে চেয়ারম্যান ও দুই জন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পৌরসভার মেয়র ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে উপজেলা পরিষদের সদস্য। জেলা পরিষদে সরাসরি কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না। তিনটি স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন প্রকৃতি, নির্বাচন, দায়িত্ব বণ্টন, কর আদায় ও কেন্দ্রের অর্থায়ন এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন বিধায় এগুলোর আইনগত, সাংগঠনিক, কাঠামোগত, সেবা ও শাসনকাঠামোতে ধাপে ধাপে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন হবে।

✓ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের আইন কাঠামো, সংগঠনিক কাঠামো ও নির্বাচন ব্যবস্থা অসম পদ্ধতিতে বিন্যস্ত। এটিকে একটি সমজাতীয় পদ্ধতিতে পুনঃস্থাপনের সুপারিশ করা হলো। সাংগঠনিক কাঠামোসমূহ পূর্বে সন্নিবেশিত হয়েছে। অভিন্ন আইন ও নির্বাচন ব্যবস্থাও এই দুইটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে (অধ্যায়-৪ ও ৫)।

✓ দেশের জাতীয় সরকারের আদলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংসদীয় পদ্ধতির আদলে পুনর্গঠন, নির্বাচন ও কার্যপদ্ধতি পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে কমিশন কিছু নতুন পদ্ধতি/পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ

করেছে। এ পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়িত হলে নির্বাচন ব্যবস্থা সহজ, ব্যয়-সাশ্রয়ী, সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ, তৃণমূলে গণতান্ত্রিক ও গঠনমূলক নীতিবিতর্ক করার ইতিবাচক একটি ব্যবস্থার বিকাশ হতে পারে।

- ✓ গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নতুন পদ্ধতির অধীনে নিম্নলিখিত তিনটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

  (ক) বর্তমানে, ১৯৬০ এর দশক (পাকিস্তান আমলের) জেনারেল আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির আদলে গঠিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংসদীয় পদ্ধতির আদলে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে;

  (খ) পাঁচটি পৃথক আইনের বদলে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহকে একটি একক আইনের অধীনে আনা হবে। বর্তমানে বিরাজিত পাঁচটি পৃথক আইনের স্থলে সবগুলো প্রতিষ্ঠান একটি মৌলিক আইনের অধীনে পরিচালিত হবে; এবং

  (গ) নতুন আইনের অধীনে একই তফসিলে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অধীনে আনয়নের সুপারিশ করা হবে। এ নির্বাচন হবে একদিকে সরকার এবং প্রার্থী উভয়ের দিক থেকে ব্যয় ও সময়-সাশ্রয়ী এবং টেকসই ও অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্রের একটি উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিকাশে সহায়ক। (অধ্যায় ছয় দেখুন)

- ✓ জাতীয় সংসদে যেমন নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ সকল সংসদীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু, তেমনি গ্রাম ও নগর নির্বিশেষে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্য বা কাউন্সিলরগণ হবেন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান নিয়ামক ।

- ✓ গ্রাম-নগর নির্বিশেষে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত থাকবে, যথা (১) বিধানিক অংশ (Legislative Part) এবং (২) নির্বাহী অংশ (Executive Part)।

- ✓ বিধানিক অংশের প্রধান হবেন সদস্যদের দ্বারা মনোনীত “সভাধ্যক্ষ”(জাতীয় সংসদ স্পিকার এর অনুরূপ) এবং নির্বাহী অংশের প্রধান হবেন “চেয়ারম্যান বা মেয়র”। তিনি পরিষদ বা কাউন্সিল নেতা হিসেবেও পরিগণিত হবেন।

- ✓ সভাধ্যক্ষ জাতীয় সংসদের স্পিকারের অনুরূপ দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে পরিষদের সভা/অধিবেশন আহবান করবেন। তিনি সকল সদস্য/সদস্যার মতামত প্রদান এবং কোনো বিশেষ বিষয়ে বিতর্কে অংশ গ্রহণের বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবেন। একইভাবে স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন ও সভাসমূহ নিয়মিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- ✓ সভাধ্যক্ষকে সহায়তা করবেন একজন পূর্ণকালীন ‘সচিবের নেতৃত্বে’ তিন সদস্যের একটি সচিবালয়।

- ✓ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গেজেট প্রকাশের পর সকল সদস্য আইনে নির্ধারিত একটি শপথনামা উপস্থিত একটি ভোটার সমাবেশে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে হাত রেখে একে একে উচ্চ স্বরে পাঠ করে সেটিতে স্বাক্ষর করবেন এবং অতঃপর সদস্যদের জন্য রক্ষিত আসনে আসন গ্রহণ করবেন। পরিষদ বা কাউন্সিলের বাইরে থেকে কোনো সরকারি কর্মকর্তা এসে সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করানোর প্রয়োজন হবে না। তবে শপথ অনুষ্ঠান ও পরিষদের অভ্যন্তরের নির্বাচনসমূহ সম্পাদনের জন্য নির্বাচন কমিশনের অনুমতিপ্রাপ্ত কর্মকার্তগণ দায়িত্ব পালন করবেন।
- ✓ শপথ গ্রহণের পর পরিষদের প্রথম সভায় সকল সাধারণ সদস্যের ভোটে সভাধ্যক্ষ নির্বাচিত হবেন। নির্বাচন কমিশনের একজন প্রতিনিধি শপথ গ্রহণ ও নির্বাচনসমূহ পরিচালনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শপথ গ্রহণের পর ‘সভাধ্যক্ষ’ নির্বাচনের মনোনয়ন গ্রহণ করবেন এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সভাধ্যক্ষ নির্বাচন করবেন।

- ✓ সভাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার পরে তাঁর সভাপতিত্বে পরিষদের চেয়ারম্যান বা কাউন্সিলের মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরিষদের অভ্যন্তরে গোপন ব্যালটে সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হতে চেয়ারম্যান এবং মেয়র নির্বাচন করবেন। এ সময় উপজেলা নির্বাচন অফিস বা নির্বাচন কমিশন মনোনীত উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন এবং তিনি সভাধ্যক্ষকে নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা করবেন।

✓ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি 'পরিষদ নেতা' হিসেবে তাঁর নির্ধারিত আসন গ্রহণ করবেন এবং আইন অনুযায়ী তিন বা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট চেয়ারম্যান বা মেয়রের 'নির্বাহী কাউন্সিল' গঠন করে তা পরিষদের অবগতির জন্য সভাধ্যক্ষের নিকট পেশ করবেন। নির্বাহী পরিষদে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত হবেন।

✓ পরিষদের সদস্যগণ পরিষদ বা কাউন্সিলের কোনো নির্বাহী সদস্যের ব্যাপারে আপত্তি জানাতে পারেন। আপত্তি জানালে চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাহী পরিষদ পুর্নগঠনের সুযোগ পাবেন। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় পরিষদের বিবেচ্য হতে পারে যে, চেয়ারম্যান, মেয়র এবং নির্বাহী সদস্যগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা যথাক্রমে ন্যূনপক্ষে স্নাতক এবং মাধ্যমিক পাশ অগ্রাধিকার পেতে পারে।

✓ পরবর্তী সভার মূল কার্যসূচি হবে 'স্থায়ী কমিটি' সমূহ গঠন। ইউনিয়ন পরিষদে সর্বোচ্চ ৬টি উপজেলা পরিষদে ১০টি, জেলা পরিষদে ১০টি, পৌরসভায় ৬টি এবং সিটি কর্পোরেশনের ১০টি স্থায়ী কমিটি থাকবে। কমিটিসমূহের নাম, বিষয় ও কার্যপদ্ধতি আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। তবে সংশ্লিষ্ট পরিষদ বা কাউন্সিল স্থায়ী কমিটির সংখ্যা ঠিক রেখে নাম, বিষয় ও কর্মপদ্ধতি নিজেদের মত নির্ধারণ করতে পারবে।

✓ ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশেনের সভাধ্যক্ষ, চেয়ারম্যান, মেয়র (পরিষদ নেতা) ছায়া পরিষদ নেতা (ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়া), স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সাধারণ সদস্যগণের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার প্রভৃতি স্বল্প কথায় আইনে এবং বিস্তারিতভাবে আইনের অধীনে প্রণীত বিধিতে বর্ণনা করা থাকবে।

✓ পরিষদ ও কাউন্সিলে সকলের মর্যাদাক্রম হবে নিম্নরূপ:

প্রথম : চেয়ারম্যান বা মেয়র (পরিষদ/কাউন্সিল নেতা),
দ্বিতীয় : সভাধ্যক্ষ,
তৃতীয়ত : ছায়া পরিষদ নেতা (উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে)
চতুর্থত : নির্বাহী সদস্য/নির্বাহী কাউন্সিলরগণ,
পঞ্চমত : স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং
ষষ্ঠত : সাধারণ সদস্য/কাউন্সিলরগণ

✓ চেয়ারম্যান ও মেয়রগণ এবং তাদের নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণ হবেন পরিষদসমূহ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সার্বক্ষণিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মী। তারা নিয়মিত বেতন-ভাতা সম্মানী গ্রহণের অধিকারী হবেন। চেয়ারম্যান ও মেয়রগণ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হিসেবে গণ্য হবেন। তারা নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহীর এক স্তর ওপরের গ্রেডে বেতন/ভাতাদি পাবেন। নির্বাহী কাউন্সিলের অন্যান্য সকল সদস্যগণ সরকারের চাকরিতে প্রবেশকালীন সময়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার সমান বেতন ভাতাদি পাবেন। চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যানের নির্বাহী পরিষদ এবং মেয়র ও মেয়র কাউন্সিল স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

✓ সভাধ্যক্ষও নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণের সমান বেতন-ভাতা পাবেন এবং পরিষদের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

✓ স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ অবৈতনিক হবেন, সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে বিবেচিত হবেন না। তারা জীবিকার জন্য নিজ নিজ পেশায় সময় দিতে পারবেন। তবে, তাঁরা সভায় উপস্থিতির জন্য একটি সম্মানী গ্রহণ করতে পারবেন। অথবা সে সম্মানী মাসিক হারেও হতে পারে।

✓ কোনো চেয়ারম্যান, মেয়র, সভাধ্যক্ষ, সদস্য ও কাউন্সিলর অবৈতনিক হিসেবে কাজ করতে চাইলে বা সম্মানী না নিতে চাইলে পরিষদকে অবহিত করে বিনা পারিশ্রমিক বা বিনা সম্মানীতে সেবা দিতে পারবেন।

✓ বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রতি তিন মাসে একাধারে সর্বাধিক তিন দিন বা তিনটি পৃথক দিন-তারিখে পরিষদসমূহের সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

✓ সভাধ্যক্ষ ও মেয়র পরামর্শ করে প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় রেখে নিয়মিত সভা, বিশেষ সভা ও জরুরি সভা আহবান করতে পারবেন।

✓ সভাধ্যক্ষ সচিবের সহায়তায় সভা পরিচালনা বিষয়ে আইন ও বিধির আলোকে বিস্তারিত একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করবেন। সে নির্দেশিকায় সভার এজেন্ডা নির্ধারণ পদ্ধতি, আলোচনায় অংশগ্রহণ, বিতর্কে অংশগ্রহণের নিয়মনীতি,

আলোচনার জন্য সদস্যদের নোটিশ প্রদান, কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা, সভায় ভাষার শালীনতা, শোভনীয়তা, সদস্যগণের আচরণ প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে লেখা থাকবে। খসড়া নির্দেশিকা পরিষদে পেশ করা হবে। আলোচনা ও বির্তকের মাধ্যমে অবশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সব কিছু অনুমোদিত হতে হবে।

- ✓ সময়ের প্রয়োজনে অধিবেশন, সভা বা সভার কার্যপ্রণালি সংশোধিত হবে। চেয়ারম্যান, মেয়র, সভাধ্যক্ষ পরিষদ বা কাউন্সিলের আস্থা হারালে সে পদে পুনরায় নির্বাচন হবে। আস্থা/অনাস্থার বিষয়টির বিস্তারিত পদ্ধতি আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। শুধুমাত্র ফৌজদারি ও অন্যান্য দুর্নীতি অভিযোগের প্রমাণ ব্যতীত এখানে সরকার কর্তৃক কাউকে বরখাস্ত করার বিধান থাকবে না।

- ✓ সভার সকল সিদ্ধান্ত সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে হবে, তবে কোনো নীতিমালা বা উপবিধির সংশোধনীতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হবে।

- ✓ মেয়র কাউন্সিল ও চেয়ারম্যান কাউন্সিলের দপ্তর বণ্টন এবং মেয়র কাউন্সিল কীভাবে কাজ করবে সে বিষয়ে সরকার একটি বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারে। সে বিধিমালার আলোকে সকল মেয়র বা চেয়ারম্যান কাউন্সিল নিজস্ব উপবিধি প্রণয়ন করে তা পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ করিয়ে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে পেশ করবে।

- ✓ প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন প্রতি বছর এপ্রিল মাসে তিন দিনের একটি বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অধিবেশন করবে।

- ✓ অধিবেশনে উপর বা নিচ স্তরের সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের চেয়ারম্যান বা তার প্রতিনিধি ঐসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বা তার প্রতিনিধি, এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রকৌশল, কৃষি, মৎস্য, সমাজসেবা, পুলিশ, আনসার-ভিডিপিসহ সকল কর্মকর্তা, এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকল সরকারি/বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য বা তার প্রতিনিধির অংশগ্রহণও আবশ্যক বিবেচিত হবে। এই পরিকল্পনা অধিবেশনের পূর্বে স্ব-স্ব পরিষদ ভৌত অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন, জলাবদ্ধতা, বন্যা, সেচসহ কৃষির নানা দিক, পরিবেশ, আইন-শৃঙ্খলা, মাদকাসক্তি, মানবাধিকার, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান, সুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে পরিষদ নিজের প্রয়োজনমত নানা বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করে পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তত করবেন এবং সভাধ্যক্ষ এসকল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন।

- ✓ উপরে উল্লিখিত খসড়া পরিকল্পনায় অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যৌথভাবে করার জন্য পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এলাকায় কর্মরত এনজিও, সিএসও, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের পরিকল্পনা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিকল্পনাও পৃথকভাবে ঐ পরিকল্পনায় যুক্ত হতে পারে। এ বিষয়ে বিদ্যমান ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিধি-২০১৩ এবং উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা নির্দেশিকা অনুসরণ করা যেতে পারে।

- ✓ অধিবেশন শেষে সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে পরিষদে তা অনুমোদিত হবে।

- ✓ পরিকল্পনা অনুমোদনের পর পরিষদের নির্দিষ্ট স্থায়ী কমিটি এ পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিষদের রাজস্ব/অনূন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের খসড়া প্রণয়ন করবে।

- ✓ পরিকল্পনা অধিবেশনের অনুরূপ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় প্রতিবছর মে-জুন মাসের মধ্যে বৃহত্তর জমায়েতে পরিকল্পনা ও বাজেট পেশ করা হবে। এ অধিবেশনে একদিন পরিকল্পনা, অপরদিন বাজেট সর্বসাধারণের আলোচনার জন্য পেশ করা হবে।

- ✓ পরিকল্পনা ও বাজেট অধিবেশনের পর নিজ নিজ কাউন্সিল ও পরিষদে তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবে।

- ✓ পরবর্তীতে চেয়ারম্যান বা মেয়রের নির্বাহী পরিষদ নিজস্ব ও হস্তান্তরিত সরকারি বিভাগের কর্মচারিদের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও বাজেট বাস্তবায়ন করবে।

- ✓ প্রতিটি স্থায়ী কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর প্রযোজ্য বিষয়সমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে কার্যবিবরণী তৈরি করবে।

- ✓ এ কার্যবিবরণীসমূহ সুনির্দিষ্ট একটি এজেন্ডা হিসেবে পরিষদের নিয়মিত সভায় আলোচিত হবে।
- ✓ স্থায়ী কমিটিসমূহ এজেন্ডার বিষয় অনুসারে যে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞকে সভায় আলোচনার জন্য আহবান করতে পারবে।
- ✓ সকল স্থায়ী কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ আনুপাতিক হারে চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবে নারীর অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য হবে।
- ✓ বিশেষ কোনো এজেন্ডার গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন হলে পরিষদ সভায় সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সীমিত করা যেতে পারে। তবে সাধারণভাবে সভা/অধিবেশনসমূহে অনুমতি সাপেক্ষে পর্যবেক্ষক হিসেবে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে।
- ✓ পরিষদ বা কাউন্সিলসমূহে সভা অনুষ্ঠানের নির্দেশিকা, চেয়ারম্যান ও মেয়র কাউন্সিলের কার্যপদ্ধতি স্থায়ী কমিটির কার্যপদ্ধতি, সকল প্রযোজ্য বিধি ও উপবিধি বা উপআইন বিষয়ে প্রস্তাবিত 'স্থানীয় সরকার কমিশন' এর নির্দেশনা ও সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয় তা কার্যকর করবে।
- ✓ দেশের প্রতিটি উপজেলায় দেওয়ানি, ফৌজদারি ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নিয়োজিত বিচারকের সাথে ওয়ার্ড ও কমিউনিটি পর্যায়ের একটি সালিশী ব্যবস্থাকে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জন্য অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্যানেল প্রস্তুত করা যেতে পারে। তবে উপজেলায় পূর্নাঙ্গ আদালত চালু না হওয়া পর্যন্ত গ্রাম আদালত চালু থাকবে।
- ✓ পাচঁটি স্থানীয় সরকার সংস্থার যে কোনো সার্বক্ষণিক কর্মী যথা সভাধ্যক্ষ, চেয়ারম্যান, মেয়র, ছায়া পরিষদ নেতা পরিষদ বা কাউন্সিলের আস্থা হারালে পদসমূহ শূন্য হবে। চেয়ারম্যান বা মেয়রের ওপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে চেয়ারম্যান ও মেয়র কাউন্সিলকেও পদত্যাগ করতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের পদ্ধতি আইন ও বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করা হবে।
- ✓ গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তিনটি পরিষদের কার্যসমূহ ও কার্যপদ্ধতির স্পষ্ট বিভাজন থাকবে। জেলা পরিষদ হবে স্পষ্টত পরিকল্পনা ইউনিট বা একক। এখানে জেলার সকল সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হবে। উপজেলা পরিষদ নিজ উপজেলার সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ভৌত অবকাঠামো, কৃষি, প্রাণিসম্পদ প্রভৃতি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকবেন।

ওয়ার্ড সভা

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯ এ ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে গ্রাম সভার বিধানটি রহিত করে উপজেলা পরিষদের প্রস্তাবিত তিনটি ওয়ার্ডে বছরে তিনটা ওয়ার্ড সভা করার বিধান করা হবে। এই ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে ঐ ওয়ার্ডের ভোটারগণ যে জনপ্রতিনিধিদের ভোট দিয়ে থাকেন তারা কাজের জবাবদিহি করবেন। উপজেলা পরিষদ এ সভাসমূহ আয়োজন করবে এবং আয়োজনের যাবতীয় ব্যয় বহন করবে। সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ বছরে অন্তত: একটি সভায় বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করবেন[৮]।

[৮] Ahmed, T. (2024) 'Policy Issues on Ward Shova in Bangladesh' in Tofail Ahmed (ed.) *Essays on Politics, Governance and Development (1981–2021): Reminiscence and Remembrance*. Comilla: BARD.

স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ের কিছু মৌলিক সেবা

১) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, বিবাহবন্ধন, বিবাহবিচ্ছেদ ও অন্যান্য নিবন্ধন

সেব, সম্পদ ও পেশা নিবন্ধন তথা একটি নাগরিক তথ্যভান্ডার বা তথ্যভিত্তি নির্মাণ। প্রতিটি খানার ১০টি তথ্য সম্বলিত একটি খানা রেজিস্টার থাকবে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে সেটি সংরক্ষণ করবে। যেসব তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নের তিনটি মৌলিক কাজ সম্পন্ন হবে।

- উত্তারিধিকার সনদ
- ভোটার তালিকা হালনাগাদ।
- প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ

জন্ম:মৃত্যু নিবন্ধন-

১ একটি শিশু জন্মের ৩ দিনের মধ্যে শিশুর জন্ম সনদ তার পিতা মাতার কাছে পৌঁছাতে হবে। .সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য ও গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে সেটি নিশ্চিত করবে এবং শহর ও নগরের ক্ষেত্রে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন তা নিশ্চিত করবে।

২. একইভাবে প্রতিটি মৃত্যুর ৩ দিনের মধ্যে মৃত্যু সনদ তার উত্তরাধিকারদের নিকট পৌঁছাতে হবে।

৩. খানা তথ্য রেজিস্টারে জন্ম মৃত্যু, বিবাহবন্ধন ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিবন্ধিত হবে এবং হালনাগাদ হবে।

৪. প্রতি ৩ মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট পরিষদ ও কাউন্সিলের স্থায়ী কমিটি সে তথ্য রেজিস্টারের হালনাগাদকরণ তদারকি করবে।

বিবাহ নিবন্ধন:

১. হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলিম ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিবাহ ও আন্তঃধর্ম বিবাহ নিবন্ধনের দায়িত্ব একক ভাবে আইন মন্ত্রণালয়ের নিকাহ রেজিস্টারের পরিবর্তে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌর কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত হবে।

২. নিকাহ নিবন্ধকদের নিয়োগ, পদায়নসহ সকল কার্যক্রম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করবে। নতুন নিয়োগ না করে ইউনিয়ন পরিষদের কোনো কর্মচারী বা বর্তমান নিকাহ রেজিস্টারের চাকরি ইউনিয়ন পরিষদে ন্যস্ত হতে পারে।

৩. নিকাহ নিবন্ধনের জন্য গৃহীত ফি ৩টি অংশে বিভক্ত হবে (১) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার(২) নিবন্ধককের সম্মানী (৩) জাতীয় সরকারের প্রাপ্য এ ৩টি ভাগে বিভক্ত হবে।

৪. একইভাবে সকল বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক বিরোধ, বিবাহ নিবন্ধকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের রেজিস্টারে নিবন্ধিত হবে।

৫. প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ বিবাহ বন্ধন, বিবাহিতদের বিরোধ, বিবাহিতদের পৃথক বসবাস ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ করবে।

ভূমি রাজস্ব ও ভূমি রেকর্ড:

১. কোনো সুনির্দিষ্ট সিলিং দিয়ে ভূমি রাজস্ব মওকুফের বিধান রহিত করে আইন সংশোধন করতে হবে। দেশের ভূমির শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মালিককে সকল শ্রেণির ভূমির মালিকানা কর প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ছাড়া সারা বাংলাদেশের সমতলীয় বদ্বীপ ভূমি, সমভাষী ও প্রায় সমজাতীয় জনসমষ্টির দেশ। তাই সকল ভূমির মালিকানা ও রেকর্ড সহজ ও স্বচ্ছ ডিজিটাইজ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. ভূমি রেকর্ড সম্পূর্ণ করে সকল ভূমির রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষত; ইউনিয়ন পরিষদ, পৌর কর্তৃপক্ষ ও উপজেলা পরিষদ যৌক্তিকভাবে ভূমি অফিসসের সাথে ভূমি রেকর্ড, ভূমি রাজস্ব, ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা তহসিল অফিসস, সহকারী
কমিশনার ও সাব রেজিস্ট্রার অফিসসের সাথে বছরের দুইবার দুটি মূল্যায়ন সভার মাধ্যমে বিষয়সমূহ (ভূমি) পরিবীক্ষণ করবে।

৪. ভূমি রাজস্ব, ভূমি রেকর্ড, ভূমি বিরোধ ও ভূমি হস্তান্তর বিষয়ক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন যৌথভাবে তৈরি করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় তা প্রকাশ করবে। -

৫. মৌজাভিত্তিক ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের যে মূল্য স্তর নির্ণয় করা হয়েছে। তা সকল ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই মূল্যস্তর যৌক্তিক করতে হবে। অযৌক্তিক মূল্য নির্ণয়ের কারণে একদিকে অনেক জমি বিক্রয়ের-ক্রয় সমস্যার সম্মুখীন। অপর দিকে ভূমি হস্তান্তর ফি দলিলে কম দেখানো একটি সর্বজনীন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। তার ফলেকেন্দ্রীয়সরকার ও স্থানীয় সরকার উভয়ই রাজস্ব হারাচ্ছে।

৬. ভূমি রাজস্ব হার কমিয়ে তার একীভূত একটি রূপ কাঠামো নির্ণয় করতে হবে। প্রতি পাঁচ বছর পর তা নবায়িত হতে পারে।

স্থানীয় এলাকাভিত্তিক সরকারি রাজস্ব, কর, ফি, বিল ইত্যাদি আদায় ও আহরণ বিষয়ক প্রতিবেদন

১. একটি ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌর এলাকা থেকে সরকার কোন বিষয়ে কত রাজস্ব আদায় করে তার একটি এলাকাভিত্তিক চিত্র প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করবে।

২. যেমন এলাকাভিত্তিক বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, পানি কর, যানবাহন ট্যাক্স টোকেন, পাসর্পোট রাজস্ব, ভূমি রাজস্ব ও নানা কর, ভূমি হস্তান্তর কর, নানা লাইসেন্স পারমিট, আবগারি শুল্ক, ভ্যাট, আয়কর, প্রভৃতির ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও পৌর এলাকাভিত্তিক হিসাব প্রকাশ করতে হবে।

৩. ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার ১নং ভূমি বা সকল খাস জমি, বনাঞ্চল, জলাভূমি সরকারি দখল নিশ্চিত করতে হবে।

৪. এসব খাস জমি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব জমি, জলা ভূমি, বনাঞ্চল, বালুমহাল, পাথর মহাল, কোন ভাবেই স্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন হবে না। বন্দোবস্তের আয়োজনে স্ব-স্ব এলাকার স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. বন্দোবস্ত বা লীজ দিলে তা সর্বনিম্ন ১ থেকে সর্বোচ্চ ৫ সনা হতে পারে।

৬. কোনো বন্দোবস্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অজ্ঞাতসারে হবে না। ভূমি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিলাম দিতে হবে।

৭. এ নিলামের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব তহবিল এবং ৫০শতাংশ স্থানীয় সরকারের মধ্যে বণ্টিত হবে।

পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও আহরিত রাজস্ব

১. পানি সম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবহারে একীভূত নীতিমালা কেন্দ্রীয়ভাবে তৈরি করতে হবে।

২. ভূউপরিস্থত ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্র গৃহস্থলি কাজের ব্যবহার, নিরাপদ পানীয়, ব্যবসা ও শিল্পে ব্যবহার, সেচের কাজে ব্যবহার, নৌ চলাচল ও যোগাযোগ, বিনোদন, জলাধার বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগ করে প্রতিটি শ্রেণির পানি ব্যবহারের সর্বোচ্চ পরিমাণ ও পরিমিত ব্যবহারের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. পানি একটি আধা নবায়নযোগ্য সীমিত সম্পদ। শুধুমাত্র বৃষ্টিপাত ছাড়া এ সম্পদ নবায়ন ও পূর্ণভরণ-সম্ভব নয়। তাই এর সংরক্ষণ উন্নয়ন ও ব্যবহার সুপরিকল্পিত হতে হবে।

৪. সকল শ্রেণির পানি ব্যবহারে উপর করারোপ হবে। কর তিনটি পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হবে। পক্ষগুলো হবে পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা) Water Management Organization) (কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার।

জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভৌত পরিকল্পনা

১. জাতীয় পরকিল্পনা কমিশনের অধীনে জাতীয় ভৌত পরকিল্পনা এবং এটি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধদিপ্তর স্থাপন হবে , যার নাম হবে জনপ্রকৌশল অধদিপ্তর। এটি একটি পৃথক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়ছে। (অধ্যায়-ষোল)

২. ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তাবয়নের জন্য বিশেষত ভূমির শ্রেণির রক্ষা ও ভূমির ব্যবহার বিষয়ক আইন প্রণয়ন করে বনভূমি, জলাভূমি, জলাধার, নদীনালা-, খালবিল, সড়ক স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ, পানি নিস্কাশন, জলাভূমি সংরক্ষণ, সাধারণ ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন কাঠামোসমূহের সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।-

৩. পরিকল্পনা কমিশন তিনটি স্তরে ভৌত পরিকল্পনার রুপরেখা করবে, যথা: জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয়। এ পরিকল্পনার রুপরেখা বাইরে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

৪. দেশের সর্বত্র বাড়ি ঘরসহ সকল স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পরিকল্পনা অনুমোদন করাতে হবে।

৫. নির্মাণকালীন সময়েও ঐ কর্তৃপক্ষ তা পরিবীক্ষণ করবে।

৬. জনপ্রকৌশল সেবা অধিদপ্তর ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে করিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

দেশের প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা পরিষদের অধীনে এ বিষয়ে পরিকল্পনাবিদ, ভূগোলবিদ ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারসহ একটি পরিকল্পনা অনুমোদন সহায়ক সেল থাকবে।

ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র ও কর্ম সুনিদিষ্টকরণ

ইউনিয়ন পরিষদসমূহ বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করবে। সে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ২০১৩ সনে জারি করা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে। পরিকল্পনা ও বাজেটের পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে। প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয়ের খাত নির্দিষ্ট হবার পর বাজেটে তা অন্তর্ভুক্ত হবে। স্থায়ী কমিটিসমূহ প্রতিটি পরিকল্পনার অঙ্গ বা উপাদান সংশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করবে। সবার সাথে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি পৃথক পৃথক খসড়া তৈরি করে একটি পরিকল্পনা সম্মেলনের আয়োজন করবে। ঐ আলোচনার পর পূর্ণাঙ্গ পরিষদ পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করবে। পরিকল্পনা অনুমোদনের পর একই প্রক্রিয়ায় বাজেট অনুমোদিত হবে। পরবর্তীতে পরিকল্পনা ও বাজেটের বাইরে কোন ব্যক্তি উদ্যোগে প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্য বা কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন প্রকল্পের ঠিকাদার, সরবরাহকারী-সহ কোনো লাভজনক কাজ করতে পারবে না। নিম্নে ইউনিয়ন পরিষদের কয়েকটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষযের উপর চিত্রসহ একটি নির্দেশিকা যুক্ত করা হলো।

ছক-৪.৩: ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটি সমূহ

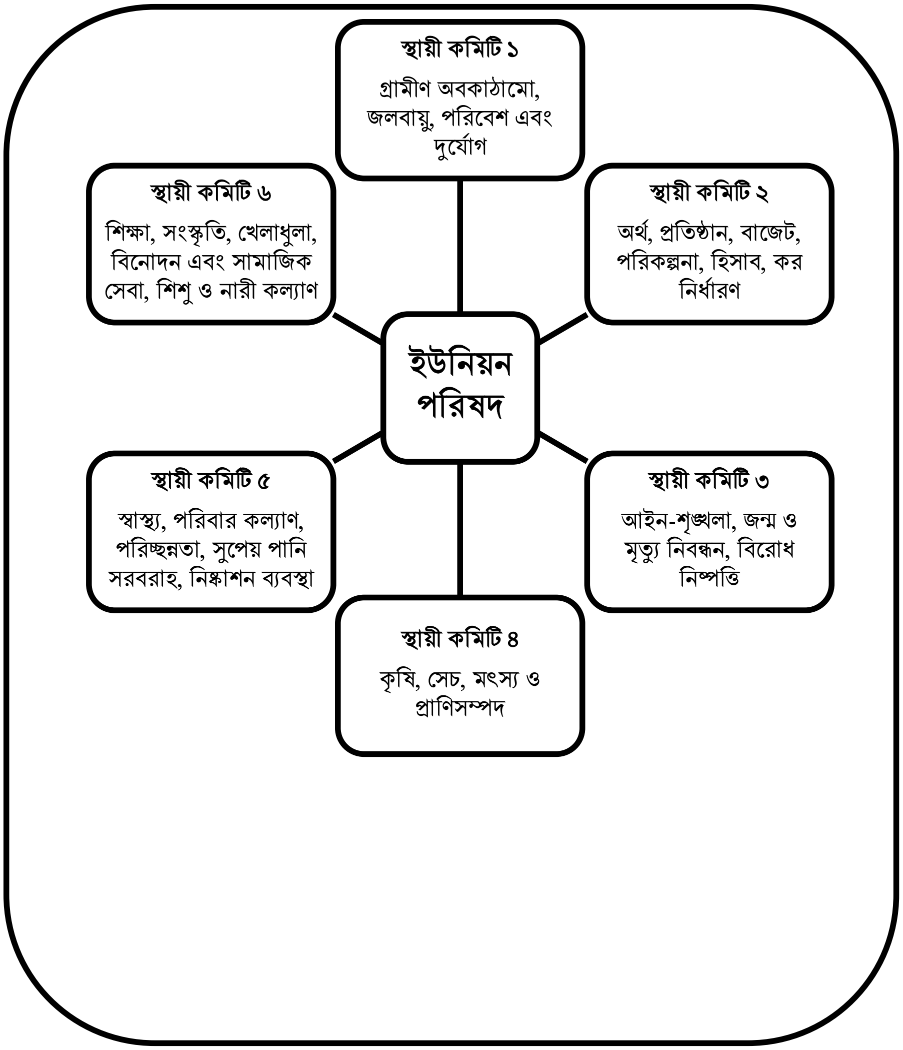

ছক-৪.৪: ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা কার্যক্রম

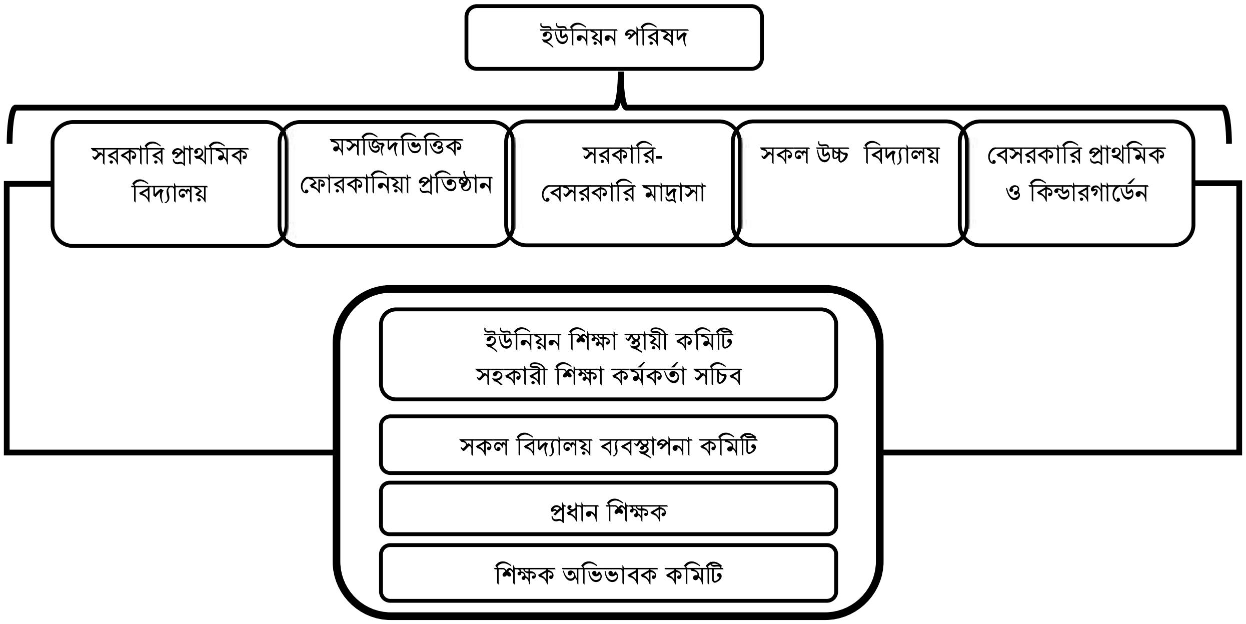

কাজসমূহ

১. ইউনিয়ন পরিষদ একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করবে। সে বইয়ে ‘শিক্ষা পরিকল্পনা’ নামে একটি অধ্যায় থাকবে।

২. শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এই পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করবে এবং শিক্ষার সকল অংশীজন পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নে অংশগ্রহণ করবে।

৩. সকল স্কুল, মাদ্রাসা নির্বিশেষে সকল বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজ নিজ বিদ্যায়তনের পরিকল্পনা করবেন ও পরিষদে জমা দেবেন। পরিকল্পনাকালীন সময়ে শিক্ষক-অভিভাবক সমন্বয় কমিটির সাথে সভা করে মতামত গ্রহণ করবেন।

৪. সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে এই শিক্ষা পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে সহায়তা করবেন।

৫. পরিকল্পনার প্রারম্ভে স্কুল/মাদ্রাসা/সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা, গতবছরের সর্বশেষ ক্লাসের ফলাফল ও সহশিক্ষা কার্যক্রম প্রভৃতির একটি বর্ণনা থাকবে।

৬. আগামীতে শিক্ষার মানোন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জামাদির প্রয়োজন নিরূপণ এবং অর্থ-সম্পদের সংস্থান কীভাবে হতে পারে তার একটি রূপরেখা থাকবে।

৭. চেয়ারম্যান কাউন্সিলের সদস্য, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ সময়ে সময়ে যৌথভাবে স্কুল পরিদর্শন করবেন।

৮. এলাকায় কর্মরত এনজিওসমূহকে শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ডে যুক্ত করতে হবে।

ছক-৪.৫: ইউনিয়ন পরিষদের স্বাস্থ্য কার্যক্রম

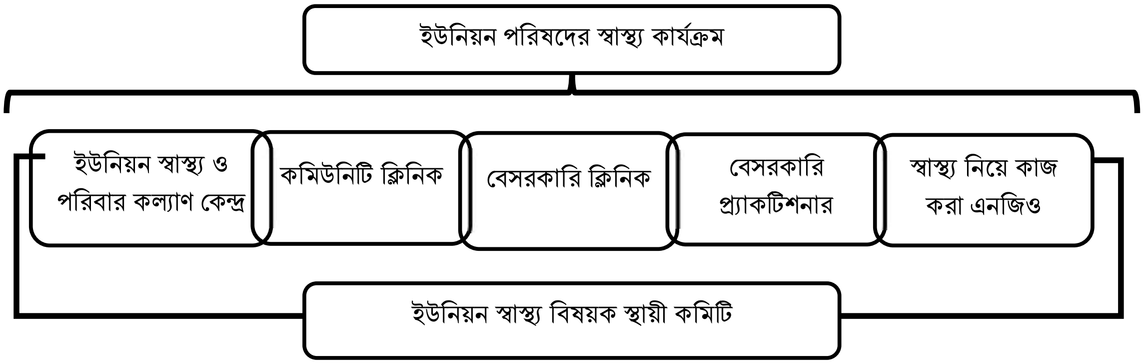

১. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের অবস্থা বিশ্লেষণসহ সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পরিষদের একটি একদিনের কর্মশালা আয়োজন করে জনগণের প্রত্যাশা এবং সেবার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতে কীভাবে সেবা-সরবরাহে, ব্যপকতা ও গভীরতা বৃদ্ধি করা যায় এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি হবে।

২. এ প্রতিবেদন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও সিভিল সার্জন কার্যালয়ে প্রেরিত হবে।

৩. পরবর্তীতে উপজেলায় পরিষদে এ বিষয়টি আলোচনা করে করণীয় নির্ধারিত হবে।

৪. ইউনিয়নের নিজস্ব একটি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা করা হবে। এটি সকল সরকারি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হবে।

৫. সরকার বিচার বিবেচনা করে যদি অকার্যকর, ব্যয়বহুল ও ব্যবস্থাপনা জটিলতার আশংঙ্কা দেখেন তাহলে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ বন্ধ করে বা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সাথে সমন্বয় করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র একটি পূর্নাঙ্গ ইউনিয়ন হাসপাতাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

৬. এই ইউনিয়ন হাসপাতালে একজন মহিলাসহ অবিলম্বে তিনজন চিকিৎসক সাথে সহায়ক নার্স, প্যারামেডিক, হেলথ টেকনোলজিষ্ট ও সহায়ক কর্মীর বন্দোবস্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় বা কোন জাতীয় এনজিও যদি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী হয় সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৭. প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে "স্বেচ্ছাসেবী মেডিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক" ইউনিট বা সমিতি থাকবে। এ সমিতি বা ইউনিটে জনগণের চাঁদায় একটি তহবিল গঠিত হবে। এ তহবিল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নানা প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করবে।

৮. ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক পরিকল্পনার অধীনে একটি স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, মাতৃ স্বাস্থ্য, শিশু কল্যাণ ও পুষ্টি পরিকল্পনা থাকবে। এ পরিকল্পনার অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ছক-৪.৬: ইউনিয়ন পরিষদের বাজার ব্যবস্থাপনা

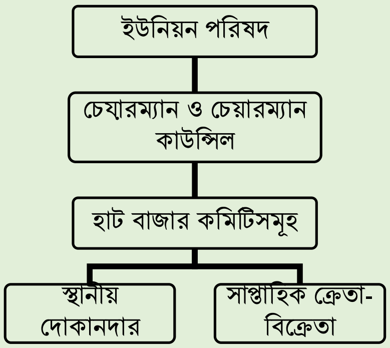

১. বাজার বসার স্থান নির্ধারণ করা থাকবে। যেখানে সেখানে যখন তখন বাজার বসবে না। বাজার সমূহের নিবন্ধন করতে হবে।

২. ব্যক্তি ও সমষ্টি উদ্যোগে নতুন বাজার সৃষ্টি করা যাবে। মহাসড়ক বা চলাচলে বিঘ্নসৃষ্টি করে এমন কোন বাজার বসানো যাবে না। বিশেষত সড়ক-মহাসড়ক থেকে দূরে কোনো উন্মুক্ত স্থানে সাপ্তাহিক কাঁচা বাজার চালু করা যাবে।

৩. বাজারের ইজারা ও আয়-ব্যয় মূল্যায়ন করে ইজারা মূল্য নির্ধারণ হবে। ব্যক্তিগত জমিতে বাজার বসলে জমির মালিক ইজারামূল্যের অংশ পাবে।

৪. বাজারে মলমূত্র ত্যাগের জন্য যথাযথ ল্যাট্রিন স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

৫. হাটবাজার কমিটির সমূহের কার্যপরিধি, মাসিক চাঁদা ও নিয়মিত টোল নির্ধারণ ও সংগ্রহ স্বচ্ছতার সাথে করতে হবে।

৬. বাজারের আইনশৃঙ্খলা, অপরাধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ কঠোরভাবে মনিটর করতে হবে।

৭. স্বেচ্ছাসেবী সকল কর্মকান্ডে নানা কমিউনিটি সংগঠন ও আগ্রহী এনজিওদের যুক্ত করার বিধান করতে হবে।

ছক-৪.৭: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমাজসেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণে ইউনিয়ন পরিষদ

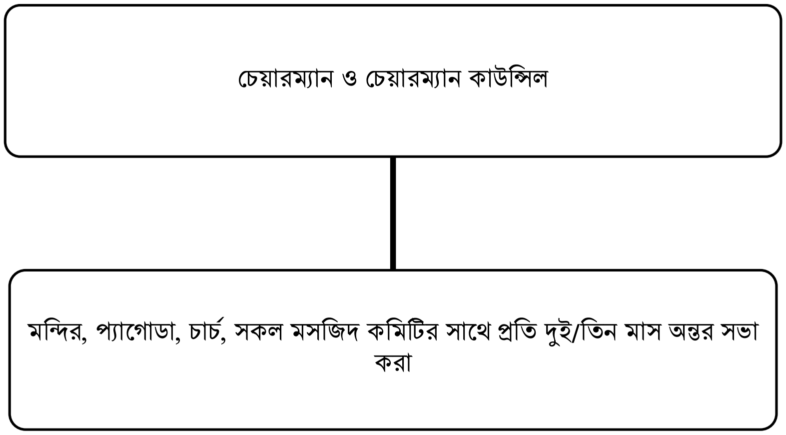

১. মসজিদসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কমিটিসমূহ সঠিকভাবে গঠন।
২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থ তথা আয় ও ব্যয়, নিরীক্ষা ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের সুরক্ষা প্রদান।
৩. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক (স্ব-ধর্মালম্বীদের জন্য) সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ। যেমন: মসজিদ একটি দরিদ্র তহবিল করে সেখানে যাকাত, ফিতরা, সদকা প্রভৃতি গ্রহণ করে দরিদ্র পুনর্বাসন করতে পারে।
৪. মসজিদে বয়স্কদের কোরআন হাদিস শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে পারে।
৫. শিশু, কিশোর ও যুবকদের জন্য নৈতিক শিক্ষার নানা আয়োজন করতে পারে।
৬. এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায়ও তাদের ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত কররা যেতে পারে।
৭. ইমাম মোয়াজ্জিনের জন্য উপযুক্ত সম্মানীর ব্যবস্থা করতে পারে।
৮. এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মসজিদসমূহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সহায়তা করতে পারে।
৯. উগ্র ধর্মীয় মতামত প্রচারের মাধ্যমে বা বিভিন্ন পীর, দরবার ও ফেরকা কেন্দ্রিক সংঘাত যাতে না হয় সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
১০. ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও জাতিগতভাবে ভিন্ন সত্তার অধিকারী নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় মসজিদসমূহ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

ছক-৪.৮ ইউনিয়নে কর্মরত এনজিও’দের সাথে কর্ম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান পরিষদ

ক্ষুদ্রঋণ	স্বাস্থ্য	শিক্ষা	পুষ্টি	মানবাধিকার	সুশাসন

১. এসব কাজসমূহে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি এলাকায় কার্যরত সকল এনজিওদের সভায় আহ্বান করতে পারে।

২. ইউনিয়ন পরিষদের বাৎসরিক পরিকল্পনাকালীন সময়ে তাদের কার্যক্রমগুলো পৃথকভাবে দেখাতে পারে।

৩. যেখানে সম্ভব সেখানে আর্থিক সামাজিক সহায়তা দিয়ে কার্যক্রমগুলো যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সেজন্য তাদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের একটি কর্ম-সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

৪. তবে কারো কাজে অনর্থক হস্তক্ষেপ নয়, সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধিই মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫. স্থানীয়ভাবে নারী-পুরুষের নানা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দানে এনজিওগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. কোনো সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে এনজিও কর্মী ও দলীয় সদস্যগণকে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ করা থেকে বিরত রাখা যাবে না।

৭. এলাকায় সমবায় সমিতিগুলোর সাথে ও ইউনিয়ন পরিষদ একটি সম্পর্ক গড়ে তুলবে। ঋণ সমবায়, কৃষি ও সেচ সমবায়, বিপণন ও ভোক্তা সমবায় প্রসারে সর্বোত্তমভাবে সহায়তা প্রদান করবে।

উপজেলা পরিষদ

অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে ২০১০ সন থেকে উপজেলা পরিষদ দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যশীল। কিন্তু মূল আইন ও বিধিবিধান যেভাবে প্রণীত হয় পরিষদ সত্যিকার অর্থে সেভাবে কার্যকর নয়। ইউনিয়ন, জেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে যেভাবে কাজের জন্য নতুন আইন কানুন প্রয়োজন, উপজেলায় সবকিছুর পূর্ব থেকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন রয়েছে। এখন নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে উপজেলার ক্ষেত্রে আপাতত কর্ম, কর্মী ও অর্থ পরিষদ তহবিলে হস্তান্তর করা হলে সকল প্রয়োজন মিটে যেতে পারে। ঢাকার মানিকগেঞ্জের একটি ছোট উপজেলা এবং রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলা পরিদর্শনের দুটি পৃথক অভিজ্ঞতা এখানে সবার অবগতির জন্য তুলে ধরা হলো। মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় ১৩৬ জন কর্মকর্তা এবং ১০৪৯ জন কর্মচারীর পদ রয়েছে। সেখানে যথাক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারী ৮৩ শতাংশ ও ৮১ শতাংশ পদায়িত। বাকী পদসমূহ শূন্য রয়েছে কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন ভাতা খাতে গত বছরে (২০২৩-২০২৪) খরচ করেছে ৬৩,৭৪,৬২,৬৪৪ টাকা। আর সেবা ও উন্নয়ন খাতে খরচ করেছে ১৮,৯৫,৯০,১৯০ টাকা। তাহলে এখানে বেতন ভাতার তুলনায় উন্নয়ন ও সেবা ব্যয় মাত্র ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ ৩০ টাকার সেবা দেয়ার জন্য ১০০ টাকা বেতন দেয়া হয়।

আর রংপুরের তারাগঞ্জের ক্ষেত্রে যে চিত্র সেটি হচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসকের যে পদ রয়েছে তার ৩০ শতাংশ সব সময় সংযুক্তিতে উপজেলার বাইরে অন্যত্র কর্মরত থাকে। আর একই উপজেলায় প্রায় ৪০ শতাংশ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের সহকারী শিক্ষকেরও কোন পদ নেই। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অনেকগুলো কেন্দ্র সম্পূর্ণ বন্ধ। প্রায় কেন্দ্রে পদ থাকলেও কোন চিকিৎসক, প্যারামেডিক, মেডিকেল ও টেকনোলজিষ্ট নেই। তাহলে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করে জনগণকে কীরকম সেবা দেয়ার বিষয় জাতি আশা করতে পারে? এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে সরকারের বিপুল ব্যয় অপচয় করে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা একটি অলীক চিন্তা। তাই সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে এসব বিষয়ে পরিবর্তনের অঙ্গীকার করতে হবে।

জেলা পরিষদ ও জেলা পরিকল্পনা কাঠামো

জেলা পরিষদ এদেশে স্বাধীনতার পর থেকে কার্যকরভাবে স্থানীয় সরকার হিসেবে কাজ করেনি। এ ক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কারের একটি রূপরেখা পূর্বতন আওয়ামীলীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের "জেলায় জেলায় সরকার" শীর্ষক একটি বইতে বিস্তারিত দেয়া আছে। বিএনপি সরকারের প্রাক্তন পরিকল্পনামন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান 'অংশগ্রহণমূলক জেলা পরিকল্পনা'র একটি উদ্যেগ গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আমেরিকা প্রবাসী জনাব আবু তালেব দীর্ঘদিন ধরে তাঁর স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের রূপরেখা সম্বলিত কিছু ধারণা প্রচার করে যাচ্ছেন। বর্তমান কমিশন সে সব ধারণার সাথে দ্বিমত বা একমত পোষণ করার মতো বিচার বিবেচনার সুযোগ পায়নি। এখন ২০০০ সালে পাশকৃত জেলা পরিষদ আইন কার্যকর। ইতোপূর্বে যখন জেলা বাজেট ও জেলা পরিকল্পনার বিষয়গুলো সামনে আসে তখন, জেলা পরিষদ না থাকায় এসব চিন্তা-ভাবনা ধারনপযোগী কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিলো না। এখন দুর্বলভাবে হলেও জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। এ জেলা পরিষদকে এখন শক্তিশালী একটি রূপ ও কাঠামো দেওয়া সম্ভব। এ পরিষদে পূর্নাঙ্গ একটি বিকেন্দ্রীকৃত জেলা পরিকল্পনা ও জেলা বাজেট প্রণয়ন করা সম্ভব। সে জন্য প্রথমে প্রয়োজন জেলা পরিষদ পূনর্গঠনের স্পষ্ট অঙ্গীকার। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন জেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী রূপ ও কাঠামো দেয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

জেলা পরিষদ আইন ২০০০-এ জেলা পরিষদকে ১২টি বাধ্যতামূলক কাজ এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক কল্যাণ, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত ও সাধারণ এই সাতটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে ৬৮টি কাজ করার ঐচ্ছিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

বাধ্যতামূলক কার্যাবলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র ১১ ও ১২ নং কর্ম দুটির অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোন কাজ না দিয়ে থাকে, তাহলে জেলা পরিষদ আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজস্ব ডাকবাংলো, সরাইখানা ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া অন্য কাজগুলোর কোনটাই সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে করতে পারবে না।

উদাহরণ হিসেবে ২নং কার্যের অধীনে উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার গৃহীত উন্নয়ন কার্যাবলির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়টির কথাই ধরা যাক। উপজেলা ও পৌরসভার নিজস্ব আইন কাঠামো রয়েছে এবং নিজস্ব অর্থসংস্থানের সূত্রও রয়েছে। এখানে ঐ দুটি বিধিবদ্ধ সংস্থা তাদের জন্য নির্ধারিত আইনের অধীনে পরিচালিত হবে। তারা রাজি না হলে জেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভাকে কীভাবে বাধ্য করবে? একই ধরনের সংশয় অন্যান্য কার্যাবলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ঐচ্ছিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও নাজুক। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত প্রভৃতি বিষয়ে পৃথক সরকারি বিভাগ রয়েছে। জাতীয়ভিত্তিক একটি নীতিমালা ও পরিকল্পনার অধীনে ঐ বিভাগসমূহ কাজ করে থাকে। ওখানে জেলা পর্যায়ে পরিষদ ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে ঐ সব সরকারি দপ্তরসমূহের অধিক্ষেত্রের মধ্যে কতটুকু অংশগ্রহণ করতে পারবে তা সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত।

তাছাড়া জেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যাবলি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থান ব্যবস্থা পূর্বের দুটি তফসিল থেকেও দুর্বল। শুধুমাত্র তিনটি উৎস ছাড়া জেলা পরিষদের রাজস্ব আয়ের অন্য সব সুযোগ ভীষণভাবে সংকুচিত হয়ে গেছে। যে চার উৎস এখনও বহাল আছে তা হতে পারে (১) পরিষদের নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় (২) স্থাবর সম্পত্তির উপর ধার্য করের অংশ, (৩) বিজ্ঞাপনের উপর কর এবং (৪) সরকারি অনুদান। আগের অর্থ বছরে (২০২৩-২০২৪) সরকার দেশের ৬১টি জেলা পরিষদে ৫০০ কোটি টাকার অনুদান দিয়েছে। বাকি উৎসগুলো সোনার পাথর বাটির মতই কাগজে থাকতে পারে কিন্তু বাস্তবে কাজে আসছে না।

জেলা পরিষদের কাজের নতুন ক্ষেত্র

১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে জেলা পরিষদকে ৯৭টি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় ঐ কার্যাবলি আবার বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক দুইভাগে ভাগ করা হয় তাছাড়া জেলা পরিষদকে থানা, ইউনিয়ন ও পৌরসভাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের

দায়িত্বও দেয়া হয়। পরে ১৯৮৮ সালের জেলা পরিষদ আইনের অধীনে জেলা পরিষদকে ১২টি বাধ্যতামূলক এবং ৬৯টি ঐচ্ছিক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোনটাই কাজ করেনি।

অপরদিকে উপজেলা পরিষদ সৃষ্টি, পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করার পরে জেলা পরিষদের আওতায় প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন কার্য সম্পাদনের আওতা পূর্বের চেয়েও অনেক বেশি সীমিত হয়ে পড়েছে। জেলা পরিষদকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে তার জন্যে নতুন কর্মক্ষেত্র এবং নতুন ভূমিকার অন্বেষণ প্রয়োজন, যাতে জেলা পরিষদের কার্যক্রম অপরাপর স্থানীয় পরিষদগুলোর ক্ষমতা, কার্যাবলি ও ভূমিকাকে সংকুচিত করার বদলে সহায়ক হয়। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারীর ভূমিকার চেয়ে যদি উন্নয়ন সমন্বয়, রেগুলেটরী বা নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম সমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, জেলায় কর্মরত সরকারি বিভাগগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে একটি সমন্বয়, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনায়ন এবং উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাগুলোকে সহায়তা দান কার্যক্রমকে জোরদার করতে পারে তাহলে জেলা পরিষদের গঠন সার্থক হতে পারে। উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভাসমূহের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ বা তাদের কাজ সংকুচিত করে জেলা পরিষদকে কার্যকর রাখা কোনভাবেই সঠিক হবে না এবং সম্ভবও হবে না। তাই অনেকেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদকে পুনরায় চালু না করার বিষয়ে মতামত দিয়ে থাকেন। চালু এ পরিষদকে শক্তিশালী না করে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি ভ্রান্ত ও অত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

উপরে বর্ণিত অবস্থাকে সামনে রেখে জেলা পরিষদের কার্যক্রমের বর্তমানকার বিরাট তালিকাটি কেটে ছেটে তা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। যাতে সে কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় এবং জেলা পরিষদ সত্যিকারভাবে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৯৯৭ সনে প্রণীত স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রতিবেদনেও জেলা পরিষদের কার্যক্রমকে মাত্র ৯টিতে সীমিত করার সুপারিশ হয়। পূর্বতন বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক পদ্ধতি বর্তমানে আর কার্যকর নয়। তাই উপজেলা পরিষদের অনুরূপ জেলা পরিষদেও সরকারি কার্যক্রমের মধ্যে হস্তান্তরিত ও সংরক্ষিত এই দুই রকমের দপ্তর থাকতে পারে এবং ঐভাবেই কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের আদল সমতলের জেলা পরিষদগুলোতে হুবহু না হলেও বেশির ভাগই বাস্তবায়ন করা যায়। ওপরের বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে পুনরুজ্জীবিত জেলা পরিষদকে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে দেয়া যায়। যথা,

১) জেলা পরিষদ তাদের বর্তমানে চালু কার্যক্রমগুলো করে যাবে এবং জেলাব্যাপী জেলা পরিষদের যে সব সম্পদ ও সেবা কার্যক্রম রয়েছে সে সম্পদ ও সেবা কার্যক্রম যথায়থভাবে পরিচালনা করবে।

২) পুরো জেলায় পরিচালিত বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা, পরিষদ ও সরকারি দপ্তরগুলোর উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে সমন্বিত করে একটি সমন্বিত জেলা পরিকল্পনা তৈরি করবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদ এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো এসব পরিকল্পনা নিজ নিজ প্রয়োজন, অগ্রাধিকার ও সম্পদের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। জেলা পরিষদ এই পরিকল্পনাগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্বৈততা ও অপচয় রোধ করতে সাহায্য করবে। অপরদিকে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করবে। সকল স্থানীয় পরিষদ, সরকারি দপ্তর ও বেসরকারি সংগঠনের প্রকল্পসমূহের সাথে জেলা পরিষদের নিজস্ব প্রকল্পসমূহ যোগ করে একটি জেলা পরিকল্পনা বই তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় তা সরবরাহ করবে। এক্ষেত্রে ভারতের জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের ধারণাটি মূল্যায়ন করে দেখা যেতে পারে।

৩) জেলা পরিষদ নিজস্ব উদ্যোগে আন্তঃউপজেলা সড়ক, মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, মাঝারি ও বৃহৎ পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা বিশেষত খাল নদীর প্রবাহ নিশ্চিত করা ইত্যাদি কার্যক্রমের পরিকল্পনা করবে।

৪) জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সকল সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের তদারকি ও কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি নিয়মমত কার্যনির্বাহী পরিষদ, অভিভাবক পরিষদ, ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি গঠনে জেলা পরিষদ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৫) জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিকের সেবার মাননিয়ন্ত্রণে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা যাতে স্ব-স্ব ঐ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ পালন করে তা নিশ্চিত করবে।

৬) জেলার আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে।

৭) জেলায় শিল্প বাণিজ্য প্রসারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিনোদন, খেলাধূলা প্রভৃতি বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

৮) বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক হস্তান্তরিত বা দেয়া যে কোন কাজ সম্পাদন করবে।

৯) সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ের জেলা পর্যায়ের কার্যক্রমের তদারকি ও পর্যালোচনার অধিকারী হবে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম পরিকল্পনা সংশোধন, সংযোজন ও বাস্তবায়নের জন্যে সুপারিশ আকারে সরকারের কাছে পেশ করবে।

ছক-১ এ উল্লেখিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগসমূহ কার্যক্রম, জনবল ও অর্থসহ জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হতে পারে এবং ঐ সব মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্রেষণে জেলা পরিষদের কাজ করবেন। এই তালিকা বহির্ভূত দপ্তরগুলো সংরক্ষিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতে পারে। তবে সংরক্ষিত দপ্তরগুলোর সাথেও জেলা পরিষদের কার্যকর সম্পর্ক ও জবাবদিহিতা থাকবে।

সারণি-৪:২ জেলা পর্যায়ে প্রস্তাবিত হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ

মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ	অধিদপ্তর/কার্যক্রম	মন্তব্য
১। স্থানীয় সরকার বিভাগ	ক. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর খ. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	এই দুটি অধিদপ্তর ভবিষ্যতে একত্রীকরণ করা যেতে পারে।
২। পল্লী উন্নয়ন বিভাগ	ক. সববায় অধিদপ্তর খ. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	ঐ
৩। সমাজ কল্যাণ	ক. সবাজ সেবা অধিদপ্তর	
৪। মহিলা ও শিশু বিষয়ক	ক. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	এই পাঁচটি অধিদপ্তর ভবিষ্যতে তিনটির পরিবর্তে একটি মন্ত্রণালয়ের অধীন কাজ করতে পারে।
৫। যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	ক. জেলা ক্রীড়া বিষয়ক কর্মকর্তা খ. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গ. জেলা সংস্কৃতি কর্মকর্তা	
৬। কৃষি	ক. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খ. বিএডিসি	একীভূত করা যেতে পারে।
৭। তথ্য	ক. জেলা তথ্য অধিদপ্তর	
৮। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	ক. মৎস অধিদপ্তর খ. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (পশু চিকিৎসালয় ও বিভিন্ন পশু পাখি খামারসহ)	
৯। স্বরাষ্ট্র	ক. আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	
১০। শিল্প	ক. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	
১১। অর্থ	ক. পরিসংখ্যান ব্যুরো	
১২। বন ও পরিবেশ	ক. পরিবেশ অধিদপ্তর খ. বন অধিদপ্তর	
১৩। পানি সম্পদ	ক. পানি উন্নয়ন বোর্ড	
১৪। শিক্ষা	ক. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক	
১৫। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	ক. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর খ. পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর	
১৬। ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	এই অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত হতে পারে।
১৭। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর	এনজিও ব্যুরো	ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সকল প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও ব্যুরো স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত হতে পারে।

মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ	অধিদপ্তর/কার্যক্রম	মন্তব্য
১৮। গণপূর্ত, সড়ক ও জনপথ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ বিভাগ, গ্যাস সরবরাহ কোম্পানীসমূহ	স্ব-স্ব দপ্তর/অধিদপ্তরের কর্ম ও কর্মকার্তাবৃন্দ	ইতোপূর্বে এসব প্রতিষ্ঠানের সাতে কোন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের কোন সম্পর্ক ছিল না। সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

এইসব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জেলা পরিষদের স্থানীয় নিয়ন্ত্রণে কাজ করবেন এবং জাতীয় পরিকল্পনার অংশ বিশেষসহ সকল কার্যক্রম জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করবেন। প্রাথমিক অবস্থায় সকল হস্তান্তরিত বিভাগের রাজস্ব ও সেবা বাজেট জেলা পরিষদ তহবিলে স্থানান্তরিত হবে। জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তরগুলোর সহায়তায় প্রতিটি খাতের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। সে পরিকল্পনাকে সামনে রেখে উন্নয়ন বাজেট প্রণীত হবে। একটি জেলায় সরকার কত অর্থ ব্যয় করে এবং কী কী কাজ হয় তার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে। সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তাদের চাকরির সকল শর্তাদি (তথা পদায়ন পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, অবসর) বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল থাকবে। শুধুমাত্র প্রেষণকালীন সময়ে তারা জেলা পরিষদের নির্দেশনায় কাজ করবেন। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সকল অফিস প্রধানের ‘বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন’ লিখবেন।

জেলা পর্যায়ের সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা, ট্রেজারি রুলস, আয়ন-ব্যয়ন ক্ষমতা, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে নতুন বিধি প্রণয়ন প্রয়োজন হতে পারে।

সংরক্ষিত বিষয়সমূহের সাথে জেলা পরিষদের সম্পর্ক

তাছাড়া জেলায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে যেসব দপ্তর-অধিদপ্তর রয়েছে তারা তাদের স্ব-স্ব অধিদপ্তর ও সংস্থার অধীনে কাজ করলেও জেলা পরিষদের কাছে তাদের বিভাগীয় প্রকল্প ও পরিকল্পনা জমা করবেন এবং ঐসব প্রকল্প ও পরিকল্পনা জেলা পর্যায়ে জেলা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গণ্য হবে। তাই জেলা পরিষদ এই সব কার্যক্রম বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা, কাজের গুণমান, অগ্রগতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করার অধিকারী হবে এবং আন্তঃসংস্থা পরিকল্পনার সমন্বয় করবে। যেমন-বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, সড়ক, পয়নিষ্কাশন, বৃহৎ নদী, খাল বা অন্যান্য পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ইত্যাদি জাতীয় পরিকল্পনা বা প্রকল্পসমূহ জেলা পর্যায়ে জেলা পরিকল্পনা বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। জেলা পরিকল্পনা বই প্রণয়ন, এই বই এর অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকল্প বা প্রকল্পাংশ পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে জেলা পরিষদ হস্তান্তরিত ও সংরক্ষিত নির্বিশেষে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম তদারক করার অধিকারী হবেন। কোন বিশেষ বিভাগের কর্মকর্তাগণ জেলা পরিষদের সাথে এ ব্যাপারে অসহযোগিতা করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী বিধি ও ম্যানুয়াল প্রণয়ন

জেলা পরিষদের কার্যক্রমগুলো পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত বিধি ও ম্যানুয়াল প্রণয়ন করতে হবে।

১. জেলা পরিষদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিধি।
২. জেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিধি ও ম্যানুয়াল।
৩. জেলা পরিষদ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল।
৪. জেলা পরিষদ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল।
৫. জেলা পরিষদ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল (যা সড়ক, বিদ্যুত, টেলিযোগাযোগ, পানি সম্পদ কাঠামো, পানি সরবরাহ, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশনসহ সকল অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি ও কর্মপ্রক্রিয়া

জেলা পর্যায়ে একটি সার্বিক ও সমন্বিত পরিকল্পনা ব্যবস্থা বা পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হলে জেলা পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে দৃশ্যমান করা সম্ভব এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত সকল বিভাগ ও দপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন করার বহুল আলোচিত বিষয়টি একটি বাস্তব রূপ পেতে পারে।

পাঁচটি প্রধান উৎসকেন্দ্র থেকে জেলা পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশসমূহ সমন্বিত হবে

১. জেলা পরিষদের নিজস্ব উন্নয়ন ও সেবা পরিকল্পনা;

২. ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, পৌর কর্পোরেশন এবং উপজেলা পরিষদসমূহের উন্নয়ন ও সেবা পরিকল্পনাসমূহ;

৩. জেলায় কর্মরত বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের নিজস্ব জেলাভিত্তিক কার্যক্রম এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বা জাতীয় সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রকল্পের বিভাজ্য অংশসমূহ;

৪. জেলায় কর্মরত সকল এনজিওসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম, এবং

৫. জেলার অভ্যন্তরে ব্যক্তি বা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোগ এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম।

সরকার জাতীয়ভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে একটি পরিপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজ নিজ বিভাগীয় প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহ জেলা পরিষদে পেশ করার নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। একই নির্দেশে পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এ জেলা পরিষদের কি ভূমিকা হবে সেটিও জানিয়ে দিতে পারে। জেলাভিত্তিক একটি পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার সম্মত হলে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের পেশকৃত পরিকল্পনাগুলো ছক-২ এ দেয়া একটি কাঠামোতে সংস্থাপিত হতে পারে।

ছক-৪.৯: প্রস্তাবিত জেলা পরিকল্পনা বই এর কাঠামো

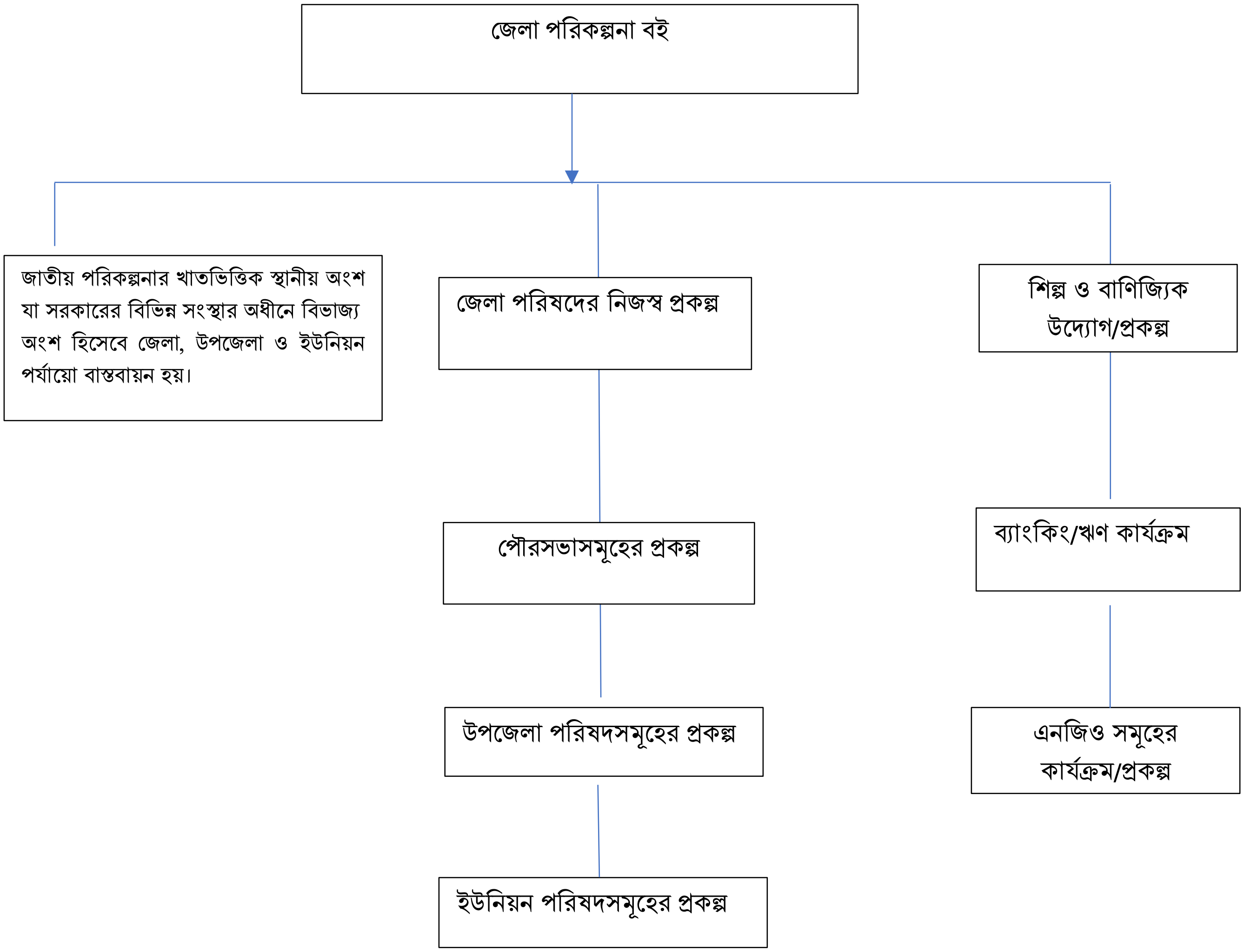

জেলা পরিকল্পনার প্রকৃত সমন্বয়ের জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনাসমূহের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করতে হবে। সমন্বয়ের সুবিধার্থে প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের সংশোধন, রিসিডিউলিং, আকার ও আয়তন কমানো বাড়ানো ইত্যাদির প্রয়োজন হতে পারে। তাই জেলা পরিষদ নিজস্ব একটি পরিকল্পনা কোষ গঠন করে জেলায় কর্মরত বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ কর্মীদের মাধ্যমে এ কাজটি করতে পারে।

পরিকল্পনা কোষ

জেলা পরিষদ পরিকল্পনা সমন্বয়ের জন্যে একটি পরিকল্পনা কোষ গঠন করবে। জেলা পরিষদ প্রধান নির্বাহী, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, জেলা পরিকল্পনাবিদ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তরের একই পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এই পাঁচজন কর্মকর্তা মিলে পরিকল্পনা কোষ গঠিত হবে। জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হবেন এই কোষের প্রধান এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা হবেন সদস্য সচিব। পরিকল্পনা কোষকে কার্যকর করার জন্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তর থেকে দু'জন কর্মকর্তাকে জেলা পর্যায়ে প্রেষণে নিয়োগ দিতে হবে।

খাতভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দল ও বিষয়ভিত্তিক জেলা পরিকল্পনা

৭টি মূল উৎস থেকে প্রাপ্ত পরিকল্পনাগুলো জেলা পরিকল্পনা বই এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে এগুলোর খাত বা বিষয়ওয়ারী বিন্যাস প্রয়োজন হবে। সে জন্য নিম্নে উল্লেখিত বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে নিয়ে খাতভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দল গঠন করতে হবে। খাতভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দলগুলোর গঠন প্রণালি নিম্নরূপ হতে পারে।

ছক-৪.১০: খাত বা বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দল

ক্রমিক নং	পরিকল্পনার বিষয়	সংযুক্ত বিভাগ বা দপ্তরসমূহ	মূল কাজ
১.	পরিকল্পনা সমন্বয় ও জেলা পরিকল্পনা বই তৈরি (জেলা পরিকল্পনা কোষ)	প্রধান নির্বাহী, জেলা পরিষদ, সহকারী প্রধান পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জেলা পরিকল্পনাবিদ, উপ-পরিচালক, আইএমইডি এবং জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দল ও সরকারি বিভাগ, স্থানীয় পরিষদসমূহ, এনজিও এবং ব্যক্তি উদ্যোক্তা সবার কাছ থেকে প্রকল্প তালিকা গ্রহণ করে তা জেলা পরিকল্পনা বই এ অন্তর্ভুক্ত করা ও পূর্ণাঙ্গ খসড়া পরিকল্পনা বই তৈরি।
২.	ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার সম্প্রসারণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	পিডিবি, সড়ক ও জনপথ, টেলিফোন, গণপূর্ত, ওয়াসা, পৌরসভা, এলজিইডি, ডিপিএইচই, ফ্যাসিলিটিজ, পেট্রোবাংলা, গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, বিআইডব্লিউটিসি, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধি।	ভৌত অবকাঠামো খাতে কার্যরত বিভাগসমূহ জেলা পরিষদ প্রধান নির্বাহী আহবানে মিলিত হয়ে নিজ নিজ জেলায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যে সব কার্যক্রম আছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে তা চূড়ান্ত করে জেলা পরিকল্পনা ভৌত অবকাঠামো অংশে লিপিবদ্ধ করাবেন।
৩.	স্বাস্থ্য, পুষ্টি পরিবার কল্যাণ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা	সিভিল সার্জন, জেলা পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের পরিচালকগণ, স্বাস্থ্য কর্মে নিয়োজিত এনজিও, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ইত্যাদি।	জেলাব্যাপী পরিচালিত স্বাস্থ্য কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রকল্প তালিকাভুক্ত করে তা পরিকল্পনা বই এর অন্তভুক্ত করাবেন এবং পরিষদকে পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা দিবেন।
৪.	শিক্ষা কার্যক্রম	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সকল কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষা কর্মকর্তা পৌরসভা, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ইত্যাদি।	জেলার অন্তর্গত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প পরিকল্পনার সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন।
৫.	শিল্প ও বাণিজ্য	শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জেলা শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধি ও অন্যান্য ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি, পৌরসভার প্রতিনিধি, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যানবাহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি, প্রত্যেকটি ব্যাংকের প্রতিনিধি।	জেলায় শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন এবং
৬.	পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।	সববায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, সমাজসেবা, যুব, মহিলা, সিবিক, সকল প্রধান এনজিও এবং সেবামূলক সংগঠনের প্রতিনিধি।	নিজ নিজ বিভাগীয় প্রকল্পসমূহ পেশ করে একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করবেন।
৭.	ব্যাংকিং ও ঋণ কার্যক্রম	জেলায় কর্মরত সকল ব্যাংকের প্রতিনিধি, শিল্প কারখানা ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি এবং এনজিও প্রতিনিধি।	জেলায় ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র ঋণ, শিল্প ও ব্যবসায়িক ঋণ পরিকল্পনা প্রণয়ন।

জেলা পরিকল্পনা কোষ সকল খাতভিত্তিক দল উপদলসমূহ গঠন ও দলসমূহকে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন সরবরাহ করে তাদের মাধ্যমে খাতভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি এবং তা খসড়া পরিকল্পন বই এর অন্তর্ভুক্ত করবে। প্রতি আর্থিক বছর শুরুর তিন মাসপূর্ব থেকে অর্থাৎ মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে দল ভিত্তিক খসড়া পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যাবে। জুন মাসের শেষ

সপ্তাহে সকল বিশেষজ্ঞ দল, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের সকল সদস্য, সংসদ সদস্যগণ এবং জেলার বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি সংগঠন সমূহের উপস্থিতিতে জেলা পরিকল্পনার খসড়া আলোচনার জন্য জেলা পরিষদ একটি বিশেষ অধিবেশন আহবান করবে। জুলাই-আগস্ট মাসে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্তভাবে বাজেট প্রণীত হবার পর জেলা পরিকল্পনা জেলা পরিষদের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন চূড়ান্ত করা হবে। এই অধিবেশনে জেলার সকল জাতীয় সংসদ সদস্যগণও অংশগ্রহণ করবেন।[৯]

সংরক্ষিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিধি

যে সব বিষয় ও বিভাগসমূহ জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি, সে সকল বিভাগ বা দপ্তর সরকারের সংরক্ষিত বিষয় বলে গণ্য হবে। তবে সংরক্ষিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা সমন্বয়, কাজকর্ম পর্যালোচনা ইত্যাদির জন্য সরকার একটি সাধারণ বিধি প্রণয়ন করবে। এই বিধি অনুসারে সকল সংরক্ষিত (Retained Sublect) বিষয়ের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ জেলা পরিষদের সাথে তাদের সকল কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করবে।

জেলা পরিষদের কর্মপ্রক্রিয়া

জেলা পরিষদ প্রতিবছর অক্টোবর মাসের মধ্যে জেলা পরিকল্পনা বই প্রকাশ করবে। এই বই জেলা পরিকল্পনার অংশীদার সকল সংস্থা ও পরিষদের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে।
কোন সংস্থা বা পরিষদ পরিকল্পনা বই এর বাইরে কোন প্রকল্প নতুনভাবে গ্রহণ করতে গেলে তার জন্য জেলা পরিষদের অনুমতি নিতে হবে বা জেলা পরিষদের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দলের মাধ্যমে তা পাশ করাতে হবে। কোন দুর্যোগ বা জরুরি অবস্থা মোকাবিলার উদ্দেশ্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদির জন্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতের জেলা পরিকল্পনাকে অনুসরণ করতে হবে।

পরিকল্পনা বহির্ভূতভাবে উপর থেকে ব্যক্তি বা সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেয়া কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাকে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহিত করে সকল কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত জেলা পরিকল্পনার আওতার্ভুক্ত করা হলে সম্পদের সুষম ব্যবহার সম্ভব হবে। তবে জেলা পরিকল্পনা হবে নমনীয় প্রকৃতির। প্রয়োজনবোধে বছরের অন্য সময়ও নতুন প্রকল্প পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পেশ করা যাবে।

জেলা পর্যায়ে হস্তান্তরিত ও সংরক্ষিত বিষয়ের দপ্তরসমূহের ব্যবস্থাপনা

জেলা পর্যায়ে সরকারি যে সব বিভাগ জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত সেগুলোর সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা জেলা পরিষদে ন্যস্ত হবে। সংরক্ষিত বিষয়সমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা নিজ নিজ দপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হলেও তাদের উন্নয়ন ও সেবা প্রকল্পসমূহ জেলা পরিষদের সাথে সমন্বয় করে জেলা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে। জেলা পরিষদ সরকারের যে কোন বিভাগের কার্যক্রম তদারকি ও পর্যালোচনা করতে পারবে।

জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক সংস্কারে পদক্ষেপসমূহ

১) জেলা পরিষদের নতুন ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জেলা পরিষদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিধি ও ম্যানুয়াল তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা যথাযথ পরিবর্তন।
২) সমন্বিত জেলা পরিকল্পনা বই তৈরির যাবতীয় প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বর্ণনাপূর্বক একটি জেলা পরিকল্পনা ম্যানুয়াল তৈরি করা।
৩) জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে কর্মসূচি বা কার্যক্রমের দ্বৈততা চিহ্নিত করে জেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তর হ্রাস বৃদ্ধির করার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা।

---

[৯] Ahmed, T. and Islam, M.N. (1995) 'Decentralised District Planning in Bangladesh: An Operational Framework', *Development Review*, 7(1 & 2).

৪) জেলা পরিষদের পরিকল্পনা কোষ গঠন করে জেলা পরিষদের পরিকল্পনা কাঠামোকে শক্তিশালীকরণের জন্য প্রতিটি জেলা পরিষদে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে একজন সহকারী প্রধান পদমর্যদার কর্মকর্তা এবং আইএমএডি থেকে উপ-পরিচালক পদমর্যাদার একজন মোট দুই জন কর্মকর্তা জেলা পরিষদে প্রেষণে নিয়োগ করতে হবে।

৫) নবগঠিত জেলা পরিষদ প্রধান নির্বাহীর পদমর্যাদা ন্যূনপক্ষে যুগ্মসচিব পর্যায়ের হবে।

৬) ডেপুটি কমিশনারের পদমর্যাদা উপ-সচিব পদমর্যদার হতে পারে। তিনি জেলার ভূমি, যানবাহন, রেজিস্ট্রেশন, আগ্নেয়াস্ত্র, প্রটোকল ইত্যাদিসহ সরকারের সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম দেখাশোনা করবেন। তবে তার পদবি বাংলায় জেলা প্রশাসক লেখা সঠিক হবে কি না তা বিবেচনা করতে হবে। এ পদের নতুন বাংলা পদবি জেলা কমিশনার হতে পারে। কারণ জেলার উন্নয়ন ও সেবা প্রশাসন জেলা পরিষদে ন্যস্ত হয়ে গেলে জেলা প্রশাসক পদবিটা পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে।

জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী, জেলার ডেপুটি কমিশনার, জেলার সকল জাতীয় সংসদগণ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ৫জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের সদস্য হবেন। তারা জেলা পরিকল্পনা উপর একটি অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী তার সদস্য সচিব। এ কর্তৃপক্ষ জেলার পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন দিবেন।

ছক ৪.১১- জেলা পরিকল্পনা ব্যবস্থা

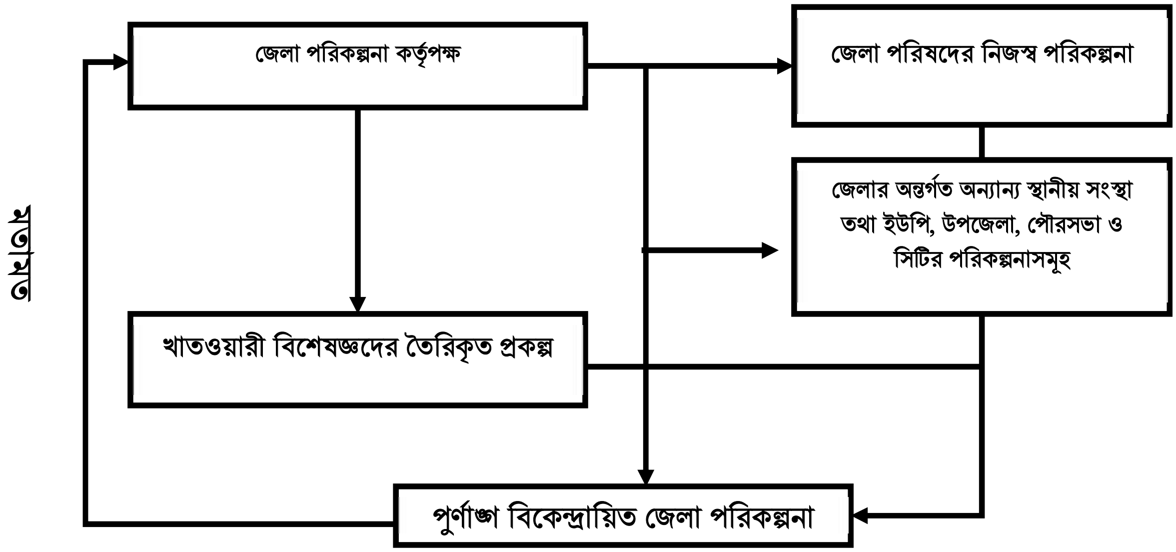

ছক ৪.১২- প্রস্তাবিত জেলা পরিকল্পনা বই-এর কাঠামো

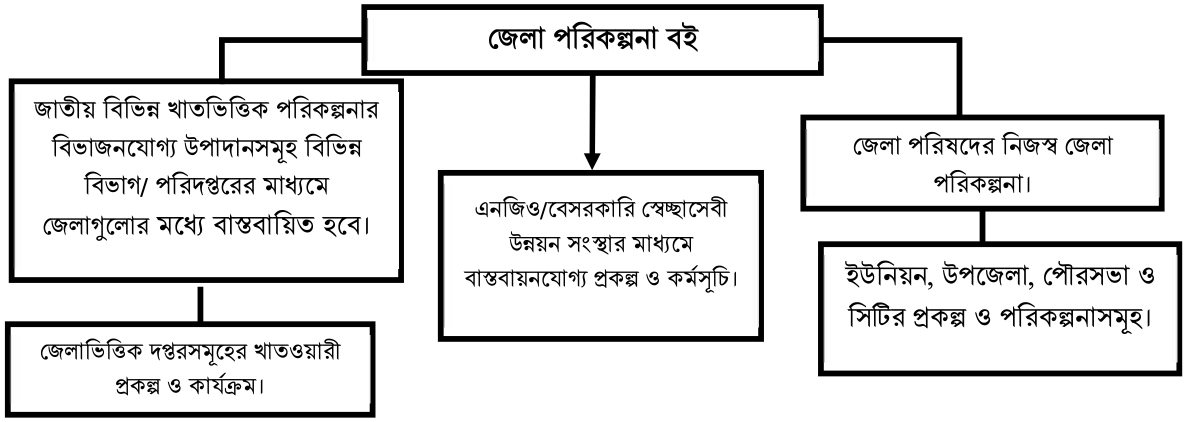

ছক -৪.১৩ জেলা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ম্যাট্রিক্স

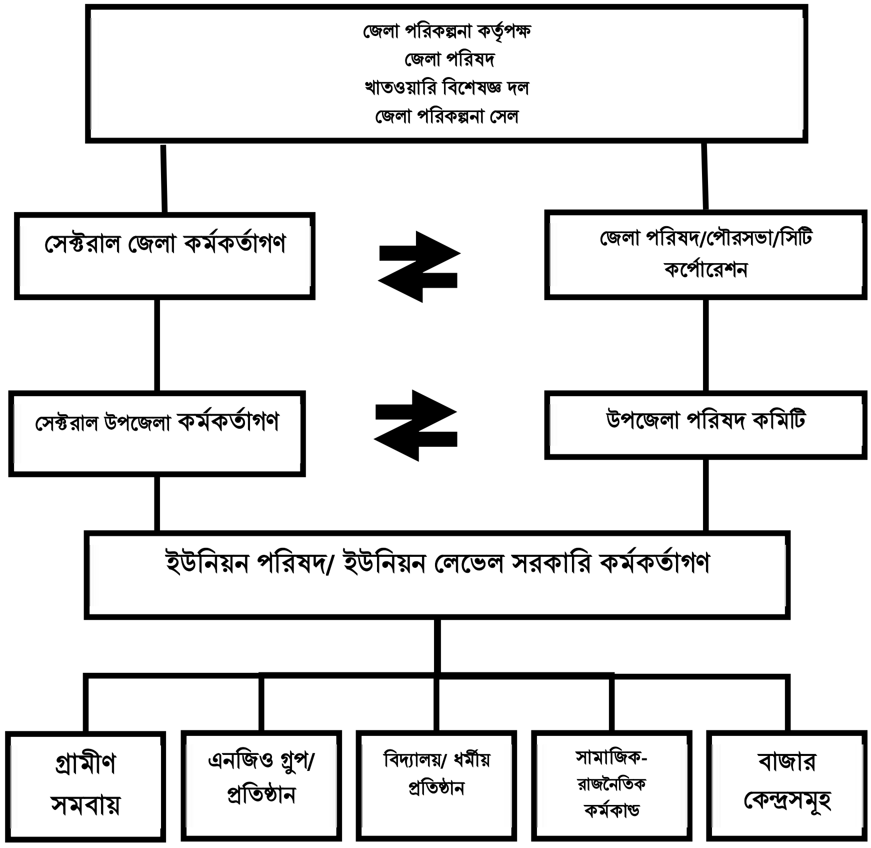

উপসংহার:

জেলা পরিষদের কাজের মাধ্যমে স্বচ্ছ একটি পরিকল্পনা ও জেলায় ব্যয়িত সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের ব্যয়িত অর্থের একটি সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে। জেলা পর্যায়ের এ পরিকল্পনার সম্পূরক বিষয় হিসেবে তা প্রতিবেদনের অধ্যায়-১৪,১৫৩১৬ মিলিয়ে পড়তে হবে এবং পরবর্তীতে নানা চিঠি ও ম্যানুয়ালসমূহ সেভাবে তৈরি করতে হবে।

অধ্যায়-পাঁচ

একীভূত আইনী কাঠামোর যৌক্তিকতা ও দুটি আইনের খসড়া

(সংসদীয় পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একীভূত আইন)

একীভূত আইনী কাঠামো ও সংস্কার প্রস্তাবনা

বৃহত্তর জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধকে সামনে রেখেই জুলাই-আগস্ট'২০২৪-এর ছাত্র-জনতার বিপ্লব ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উৎখাতের মধ্য দিয়ে সুযোগ এসেছে দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী, নাগরিক বান্ধব, বিকেন্দ্রীকৃত এবং কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একীভূত আইন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রণয়ন। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার কর্তৃক ভোটবিহীন, দুর্নীতিযুক্ত ও ব্যয়বহুল নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার কাঠামোকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। তার থেকে সফল উত্তরণের জন্য অত্র কমিশন যুগোপযোগী জনবান্ধব ও কল্যাণমূখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনের নিমিত্তে একীভূত ও সমন্বিত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশ) অধ্যাদেশ, ২০২৫ শিরোনামে একটি সমন্বিত আইন তৈরির সুপারিশ করছে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল স্তরের জন্য সমন্বিত ও একীভূত আইন প্রণয়ন

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বর্তমানে পাঁচটি মূল আইন এবং শতাধিক বিধি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বহু অনুসঙ্গ আইন ও সরকারি প্রজ্ঞাপন, যার দ্বারা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করা হয়। কাজেই ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মূল আদর্শকে ধারণ করে বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা ও উন্নত রাষ্ট্র কাঠামো বিনির্মাণের জন্য যুগোপযোগী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য একীভূত আইনের আওতায় শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামকগুলো নিম্নে বিবৃত করা হল:

(ক) আইন কাঠামোর বর্তমান সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণ এবং একীভূত দুটি একক আইনের প্রেক্ষাপট

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রণীত মৌলিক আইনগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯, উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯, জেলা পরিষদ আইন ২০০০, পৌরসভা আইন ২০০৯, এবং সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯। এই আইনগুলোর অধীনে আবার তৈরি হয়েছে অসংখ্য সাব-অর্ডিনেট আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এবং সার্কুলার। আইন, বিধি, এবং প্রজ্ঞাপনের এই আধিক্য কেবল বিভ্রান্তিই বাড়ায় না, বরং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে সৃষ্টি করে দ্বৈততা এবং অস্পষ্টতা। কোন স্তরের প্রতিষ্ঠান কোন কাজ করবে, কার এখতিয়ার কতটুকু, কার কাছে জবাবদিহি করবে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রায়শই জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেখা দেয় দীর্ঘসূত্রিতা, কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা, এবং সর্বোপরি বিঘ্নিত হয় জনগণের কাঙ্খিত সেবা। এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করে ২০০৮ সালে গঠিত ড. শওকত আলী কমিশন একীভূত আইন প্রবর্তনের সুপারিশ করে। তাদের সুপারিশের অংশ বিশেষ বাস্তবায়ন করে পূর্বের ভিন্ন ভিন্ন সিটি কর্পোরেশন আইনগুলোকে একটি একক আইনের অধীন আনয়ন করা হয়।

এই ক্ষেত্রে, ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতে ৭৩তম এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য একটি শক্তিশালী সাংবিধানিক ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা ব্লক পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদ একটি একক আইন 'পঞ্চায়েত রাজ আইন' দ্বারা পরিচালিত হয়। একই আইনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই তিন প্রতিষ্ঠানের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা কাঠামো "জেলা পরিল্পনা কর্তৃপক্ষ" সৃষ্টি করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলে আমাদের দেশেও একটি "মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ" দ্বারা সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো।

আমাদের দেশে এতগুলো পৃথক আইন হওয়ার কারণ হলো আমাদের পাঁচটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সংবিধান গৃহীত হবার পর একসাথে শুরু হয়নি। ১৯৭২ সালে ইউনিয়ন পরিষদ চালু হয়। তারপর কাজ শুরু করে পৌরসভা। কিন্তু উপজেলা পরিষদ আইন হয় ১৯৮২ সালে ১০ বছর পর একটি সামরিক সরকারকে বেসামরিক করনের একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য থেকে। আবার

ব্রিটিশ সময় ও পাকিস্তান সময় পর্যন্ত জেলা পরিষদের ধারাবাহিকতা থাকলেও স্বাধীনতার পর থেকে ৩০ বছর জেলা পরিষদ অকার্যকর করে রাখা হয়। অবশেষে ২০০০ সালে একটি আইন পাশ হয়। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পটভূমিতে আইন ও সংগঠন চালু হয়। ফলে আইনগুলোর মধ্যে পারস্পারিক অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয়। যার ফলে দেখা যায় ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলার তিনটি স্থানীয় সরকার কাঠামো তিন রকম। সিটি কর্পোরেশনগুলো ও নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ১৯৮০'র দশকের শুরুতে নতুন সংশোধনী আনা হয়। তাই এখানে আবার সনাতন পৌরসভা থেকে ভিন্ন ব্যবস্থার সূচনা করা হয়। **নতুন সুযোগের সুবাদে আইনের একত্রিকরণের শুভ সূচনা হতে পারে।**

জুলাই-আগস্টের বিপ্লবের পর কেন্দ্রীয় সরকারের মত স্থানীয় সরকারেও একটি শূন্যতা তৈরি হয়েছে। দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান একসাথে বিলুপ্ত হবার বা করার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তাই এখন একটি ক্লিন ইজেলে নতুন ছবি আকার সময় ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগে একদিকে পারস্পারিক সাংঘর্ষিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইনগুলোকে যেমন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামোভুক্ত করা যায়, তেমনিভাবে প্রতিটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে এক ব্যক্তির একক কর্তৃত্বাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের যে বিকৃত ঐতিহ্য চেপে বসে ছিল, তা থেকেও বের হওয়ার সময় সমুউপস্থিত।

এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার নামে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আদলে প্রতিটি স্থানীয় পরিষদে চেয়ারম্যান ও মেয়র নির্বাচন করে সকল প্রতিষ্ঠানে এক একজন একনায়ক সৃষ্টি করা হয়েছে। সে এক নায়কগণ নিজেদেরকে পরিষদ বা কাউন্সিলের চেয়ে বড় করে দেখেছেন এবং সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রায়শঃ পরিষদের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট পদ্ধতি লঙ্ঘন করেছেন। ফলে স্থানীয় সরকারে গণতান্ত্রিকতা সম্পূর্ণ ভূলুণ্ঠিত হয়।

এসব বিষয় বিবেচনা করে একক ব্যক্তি বা পদের বদলে পুরো পরিষদ ও কাউন্সিল ব্যবস্থাকে যৌথভাবে প্রধান ভুমিকায় অবতীর্ণ করার পদ্ধতি সৃষ্টির চিন্তাভাবনা শুরু করা হয়। ভারত, বৃটেনসহ নানা দেশের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে আমরা বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির স্থলে সংসদীয় পদ্ধতির স্থানীয় সরকার কাঠামো গ্রহণ করলে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভবনা উজ্জ্বল হয়। নির্বাচন ব্যয় সাশ্রয়ী, সময় সাশ্রয়ী ও অধিকতর অংশগ্রহণমূলক হয়। তাছাড়া নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভোটারদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারে। এখনকার প্রচলিত ব্যবস্থায় একজন ভোটার তিনজন প্রার্থীকে ভোট দেন এবং তিনজনের মধ্যে দায়িত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ায় সাধারণ ভোটার বিভ্রান্ত হয়। সংসদীয় পদ্ধতিতে স্থানীয় নির্বাচন করা হলে সকল ভোটারের একজন নিজস্ব প্রতিনিধি থাকবেন। তিনি সরাসরি তাকে দায়িত্বশীল ভাবতে পারবেন। ইউনিয়ন উপজেলা ও জেলায় তার সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রতিজন ভোটারের কাছে জবাবদিহি করবেন।

তাই এই পদ্ধতিতে সদস্য বা কাউন্সিলর নির্বাচনই মূখ্য। যিনি চেয়ারম্যান বা পরিষদের বা কাউন্সিলের অন্য যে কোন পদ পেতে আগ্রহী তাকে প্রথমেই সদস্যপদে নির্বাচিত হতে হবে। সদস্যরাই সদস্যদের মধ্য হতে চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাচন করবেন। এটি দেশের জন্য অভিনব নয়। আমাদের জাতীয় সংসদে এটিই নিয়ম। তাছাড়া আমাদের প্রতিবেশি ভারতীয় রাজ্যগুলোর স্থানীয় নির্বাচনে সরাসরি সদস্য নির্বাচন এবং সদস্যদের ভোটে প্রধান ও মেয়র নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে।

এসব বিষয়ে পূর্বতন (পঞ্চম) অধ্যায়ের কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনায় নির্বাচিত পদ-পদবির বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

ভোটার কর্তৃক জনপ্রতিনিধি ‘রি-কল’

যিনি নিয়োগ করতে পারেন, তিনি অপসারণও করতে পারেন, এই ধারণাটি ল্যাটিন “*Qui facit, potest disfacere*” হতে উদ্ভুত। পরবর্তীতে “He who does, can undo” নীতি হিসেবে ব্রিটিশরা গ্রহণ করে। ভোটার কর্তৃক জনপ্রতিনিধি ‘রি-কল’ (Recall) হলো একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ভোটাররা তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে নির্ধারিত মেয়াদের আগে অপসারণ করতে পারেন। এটি মূলত জনতার হাতে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর নজরদারি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি মাধ্যম।

রি-কলের মূল বৈশিষ্ট্য:

১. উদ্দেশ্য: জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহি বৃদ্ধি করা এবং জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া।

২. প্রক্রিয়া: নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হয়। প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর পাওয়ার পর একটি রি-কল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৩. আন্তর্জাতিক উদাহরণ:

যুক্তরাষ্ট্র: বেশ কিছু অঙ্গরাজ্যে গভর্নর ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের রি-কলের বিধান রয়েছে।
সুইজারল্যান্ড: কয়েকটি ক্যান্টনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের রি-কল করা যায়।
ভেনেজুয়েলা: ২০০৪ সালে প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজের বিরুদ্ধে রি-কলের চেষ্টা হয়েছিল।
ভারতে রি-কলের অবস্থা: ভারতের সংবিধানে সংসদ সদস্য (MP) বা বিধানসভার সদস্য (MLA) রি-কলের কোনো সরাসরি বিধান নেই। তবে মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড় এবং কিছু রাজ্যে পঞ্চায়েত স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রি-কলের বিধান রয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে রি-কল নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে এটি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

রি-কলের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি:

পক্ষে: (ক) জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি; (খ) দুর্নীতি ও অপশাসন প্রতিরোধে কার্যকর; এবং (গ) জনমতের প্রতিফলন।

বিপক্ষে: (ক) রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার হতে পারে; (খ) স্থিতিশীলতার অভাব, (গ) অযথা নির্বাচন খরচ; এবং (ঘ) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবমূল্যায়ন।

আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় আনার জন্য আগামী তিন মেয়াদের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ভোটার কর্তৃক জনপ্রতিনিধি দ্বারা রি-কল ব্যবস্থা চালু করা অত্যাবশ্যক।

একটি আশঙ্কা ও সমালোচনা

সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচিত মেম্বার ও কাউন্সিলরগণ দ্বারা যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেম্বর ও কাউন্সিলরদের ভোট কেনা-বেচার সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে অনেকের ধারণা। ধারণাটি ঋদ্ধ হয়েছে বিগত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রচলিত রীতি দেখে। এই ব্যবস্থা রোধকল্পে আইনের যুগোপযোগী প্রয়োগ এবং নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠিত বা ঘোষিত হবে। নির্বাচনী অসদাচরণ প্রতিরোধের জন্য ট্রাইব্যুনাল তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় একটি বিষয় থাকবে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা। যাতে প্রার্থীর সনদ, পূর্বের মামলা, অপরাধ যদি থাকে তার তথ্য এবং বর্তমান নির্বাচনে কোন রকম আর্থিক লেনদেন না করার ঘোষণা থাকবে। যদি পরবর্তীতে প্রমাণ হয় সদস্যপদ বাতিল হবে।

তৃতীয় একটি নৈতিক চাপ রাখার জন্য প্রতিজন নির্বাচিত সদ্য নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে হাত রেখে ভোটারদের সম্মুখে শপথ বাক্য পাঠ করবেন। ঐ শপথে তিনি কোনরকম জ্ঞানতঃ অনিয়ম ও দুর্নীতি মুক্ত থাকবেন। এ মর্মে ভোটারদের সম্মুখে ঘোষণা দিবেন।
তিন, চার ও ছয় নম্বর অধ্যায়ের সারমর্ম গ্রহণ করে একীভূত আইনের একটি একক খসড়া তৈরি হলো। যা পৃথকভাবে প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খণ্ডে যুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায়-ছয়

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা, প্রচলিত আইন ও সংগঠনসমূহের আশু সংস্কারের সাথে সুষ্ঠু , অবাধ, ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী নির্বাচন ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গে কিছু সুপারিশ

সূচনা বক্তব্য: স্থানীয় সরকার এদেশের একগুচ্ছ অতি পুরানো শাসন, সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি। স্থানীয় সরকার বিধিবদ্ধ আইনী প্রতিষ্ঠান হলেও এ প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের চেয়েও বেশি নিজস্ব প্রথা-পদ্ধতি অনুসরণ করেই চলে। নির্বাচন ও কার্যপদ্ধতি ছিল অস্বচ্ছ। গণতন্ত্র ও জনজবাবদিহিতা নানাভাবে আড়ষ্ট। অর্থ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। ফলে সেবা ও উন্নয়ন যা হয় তা নাম মাত্র। বিগত ১৫ বছরের একতরফা নির্বাচনের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো গণবৈধতা পায়নি। ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতিতে প্রতিষ্ঠানগুলো আকন্ঠ নিমজ্জিত ছিল। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নানামূখী সংস্কারের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ১৯৮১ সনের পর থেকে গঠিত হয় পাঁচটি সংস্কার কমিটি ও কমিশন। কিন্তু এসব কমিটি ও কমিশনের সুপারিশসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে দিনে দিনে সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে।

একটি দেশ ও সমাজে কার্যকর স্থানীয় সরকার তৃণমূল থেকে গণতন্ত্রকে সুসংহত করে। সাধারণ মানুষ সুশাসনের অংশীদার হয়। উন্নয়ন ও সেবা ব্যয় সাশ্রয়ী এবং গুণ ও মান সম্পন্ন হয়। স্থানীয় সরকার স্থানীয় জনগণের জন্য গণতন্ত্র চর্চার প্রাথমিক ও মধ্যম স্তরের পাঠশালা। এখানে গণতন্ত্র চর্চা জাতীয় গণতন্ত্রকে সুসংহত করে। সবকিছু মিলিয়ে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের উপ-ব্যবস্থা হিসেবে স্থানীয় সরকারের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

দেশের সামগ্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্থারের জন্য সরকার একটি পৃথক কমিশন গঠন করেছে। সে কমিশন স্থানীয় সরকারের ওপর বিস্তারিত সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সার্বিক সংস্কারের সাথে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কমিশন, স্থানীয় সরকারকেন্দ্রিক নির্বাচনের বিস্তারিত সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। সে বিষয়ের কিছু বিশ্লেষণসহ সুপারিশসমূহ পেশ করা হলো।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সমস্যার মূল ও তার বিস্তার: সংবিধানের ১১৯ (১)-এর অধীনে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র জাতীয় নির্বাচনসমূহ নির্বাহের জন্য গঠিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। সংবিধানের ১১৯ (২) অনুসারে নির্বাচন কমিশন সরকার কর্তৃক আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধ হয়ে 'নির্ধারিত দায়িত্বের অতিরিক্ত' হিসেবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে থাকে। সাতটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এবং পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ তিনটি জেলা পরিষদ ও তিন জেলা নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদসমূহ সাতটি ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। আবার ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনগুলোও পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নানা কারণে সকল নির্বাচন সময় মত অনুষ্ঠিত হয়নি। জাতীয় নির্বাচন পাঁচ বছরে একবার একটি তফসিলের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হলেও স্থানীয় নির্বাচনসমূহ একটি সরকারের পুরো পাঁচ বছর সময় কাল ধরে অন্তত সাতটি বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন তফসিলে অনুষ্ঠিত হয়। আবার ১২টি সিটি কর্পোরেশন ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদ শেষে তাদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে থাকে। অন্যদিকে মামলা মোকাদ্দমার কারণে স্থগিত নির্বাচনসমূহ বিভিন্ন অনির্ধারিত সময়ে তফসিল ঘোষণা দিয়ে অনুষ্ঠান করতে হয়। ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা এ তিনটি নির্বাচন আয়োজনের বহর ও বিস্তৃতি তিনটি জাতীয় নির্বাচনকেও হার মানায়। অতীতে এ তিনটি নির্বাচনে শত শত মানুষ নিহত এবং হাজার মানুষ আহত ও পঙ্গুত্ববরণ করেছে। এভাবে পৃথক সাতটি নির্বাচন ও নানা সময়ে পৃথকভাবে সিটি নির্বাচন ও স্থগিত নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান অনেক ব্যয় বহুল, সময়ক্ষেপণকারী এবং প্রশাসনিকভাবে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। একটি সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদের প্রতিবছরই এক বা একাধিক নির্বাচন হতে থাকে । তাতে প্রচুর কর্মদিবস নষ্ট হয়। সারা দেশ নির্বাচনী ডামাডোলে অস্থির ও প্রকম্পিত হয়।

'সংবিধানের ৫৯ (২)-এর সুযোগে 'সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন' সেভাবে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ও কার্যক্রম নির্ধারণ হবে" এ বিধিবিধানের সুযোগে বা অপব্যবহারের কারণে স্থানীয় সরকারের কাঠামো-কার্য নির্ধারণে পারস্পরিক সামঞ্জস্য

বিধান করা সম্ভব হয়নি। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গঠনকাল, গঠনকাঠামো, নির্বাচন ও কার্যক্রম ভিন্ন। তাতে প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন কাজ করতে সমস্যায় পড়ে, তেমনি নির্বাচনও হয়ে পড়ে দীর্ঘ একটি প্রলম্বিত প্রক্রিয়া, ব্যয়বহুল ও সন্ত্রাসপ্রবণ। এ জন্য স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অংশ ৫৯ ও ৬০ এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিধানের ১১৮ ও ১১৯ অনুচ্ছেদের সংশোধনী প্রয়োজন। সাথে প্রয়োজন গ্যারাণ্টি ক্লজ যুক্ত করে স্থানীয় সরকার আইন কাঠামোকে স্থিতিশীল একটি স্থায়ী রূপ ও কাঠামো দেয়া, যা ভারতের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনীতে সে দেশের প্রেক্ষাপটে করা হয়েছে। এখানে কার্যকর সংস্কার ও পরিবর্তন করা হলে স্থানীয় নির্বাচন ব্যয় সাশ্রয়ী, সময় সাশ্রয়ী ও শান্তিপূর্ণ করে বিষয়টি একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে। নিম্নে সেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি: ‘স্থানীয় সরকার’[i] বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন রকম-ফের ও প্রকার ভেদ নির্বিশেষে (পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা , প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ,গণতন্ত্র ইত্যাদি) একটি সর্বজনীন ব্যবস্থা। এটি মূলত রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামোর একটি উপ-ব্যবস্থা (sub-system)। দেশ ও কালভেদে পার্থক্য থাকলেও আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসারে অস্থানীয়, অনির্বাচিত এবং অর্থ-সম্পদ আহরণ ও ব্যয়ের ক্ষমতা রহিত কোন প্রতিষ্ঠান অর্থ্যাৎ এ তিনটি মৌলিক বিষয়ের স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থার ঘাটতি রেখে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ‘স্থানীয় সরকার’ হিসেবে পরিগণিত হয় না। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের তৈরিকৃত কোন আইন বলে নিয়োজিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান ‘স্থানীয় কর্তৃপক্ষ’ (Local Authority) হতে পারে, কিন্তু ‘স্থানীয় সরকার’(Local Government) নয়। এখানে নির্বাচন একটি অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনেরও আবার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ড (Standard) রয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থাকে ‘অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষতার মানদন্ড অনুসরণ করতে হয়। তাছাড়া নেতৃত্ব ও অর্থ ব্যবস্থার বিষয়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭২ সনের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত ও পাশ হওয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান যা একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয় এবং সে সংবিধান দ্ব্যর্থহীনভাবে ‘প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে’ এ অঙ্গিকার ব্যক্ত করে (অনুচ্ছেদ-১১)। পরে সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদের স্থানীয় শাসন অংশের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে নির্বাচন, শাসন ক্ষমতা এবং অর্থ আহরণ ও ব্যয়ের বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই বলা যায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার একমাত্র প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনকে পরিস্কারভাবে সে দায়িত্ব অর্পন করা হয়নি। নানা সময়ে সরকারে আসা রাজনৈতিক দল সমূহ জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, অর্থায়ন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পাস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি ব্যবস্থার পরিবর্তে পরস্পরবিরোধী ও বিচ্ছিন্ন একটি অন্তর্ঘাতমূলক ‘দুর্বৃত্ত ডেন’এ রূপান্তরিত করেছে। তাই স্থানীয় সরকারে অন্তর্ভুক্তিমূলক, শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংবিধান নানাভাবে লংঘিত হয়ে আসছে: স্থানীয় সরকার গঠন সংক্রান্ত সাংবিধানিক অঙ্গিকার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সরকারসমূহ ১৯৭৩ থেকে ধারাবাহিকভাবে অবজ্ঞা, অবহেলা ও উদাসীনতাই শুধু দেখায়নি , দলীয়ভাবে স্থানীয় নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সংবিধানের অঙ্গিকার অনুযায়ী সকল প্রশাসনিক এককে এক সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যার ফলে দেশে বিভিন্ন স্থরে কতগুলো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে কি ‘সত্যিকারের একটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম’ হিসেবে স্থানীয় সরকার গড়ে উঠেনি।

যেমন ১৯৭৩-১৯৮০ সন পর্যন্ত বিভাগ, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন প্রশাসনের চারটি এককের মধ্যে শুধুমাত্র একটি এককে স্থানীয় সরকার ছিল। সেটি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। পৌরসভা কার্যকর থাকলেও কার্যগতভাবে পৌর এলাকা কোন প্রশাসনিক একক ছিল না। পরে সংবিধান ও আইন বাঁচানোর জন্য পৌর এলাকাকে প্রশাসনিক একক ঘোষণা করা হয়। ১৯৮১-৮২ সনে থানা পর্যায়ের প্রশাসনিক এককে উপজেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে ইউনিয়ন ও থানা দুইটি এককে স্থানীয় সরকার গঠিত হয়। জেলায় ঐতিহাসিকভাবে জেলা পরিষদের ভৌত অবকাঠামো একটি ভবন, কিছু কর্মচারী এবং আয়-ব্যয়ের সংস্থান থাকলেও কোন নির্বাচিত পরিষদ ২০১৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত ছিল না। বিভাগ (Division) পর্যায়ে জেনারেল আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের পর কোন জনসম্পৃক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ব্যবস্থা করা হয়নি। ১৯৮০-৮১ সন পর্যন্ত

দেশের সকল জেলায় শুধুমাত্র পৌরসভা ছিল। সর্বমোট পৌরসভার সংখ্যা ছিল ১৯৭৪ পর্যন্ত ৫০টি পরে ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তা ৩২৮ এ উপনীত হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে দেশের সমতলের মত ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার সাথে ১৯৮৮-এর পর পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ যুক্ত করা হয়। দেশের সমতল ও পার্বত্য এলাকা মিলে মোট বিধিবদ্ধ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৫৪৭৯। এসব প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত অনির্বাচিত নেতার সংখ্যা প্রায় ৬০-৬২ হাজার। নির্বাচিত বিধিবদ্ধ স্থানীয় সরকার ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় রয়েছে সনাতনী (Customary) রাজা-হেডম্যান-কারবারী ব্যবস্থা এবং দেশের সেনানিবাসসমূহে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে 'ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড'।

এ দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের চেয়ে পূরোনো: এ দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ১৯৭২ এর সংবিধান সৃষ্টি করেনি, গ্রাম ও শহরসমূহে ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে নতুন দেশের নতুন সংবিধানের মাধ্যমে আত্তিকরণ করা হয়েছে মাত্র। আত্তিকরণটিও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে চৌকিদারী পঞ্চায়েত (১৮৭০), ইউনিয়ন পঞ্চায়েত (১৮৮৫) ইউনিয়ন কমিটি (১৮৮৭) ইউনিয়ন বোর্ড (১৯১৯), ইউনিয়ন কাউন্সিল (১৯৬০) এর ধারাবাহিকতায় প্রথমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ও পরে ১৯৭৩এ 'ইউনিয়ন পরিষদ' পুনর্গঠিত হয়। নগর স্থানীয় সরকারের শুরু ১৬৬৮ সালে। সে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় পৌরসভাসমূহ নবরূপে ১৯৭২ পুনর্গঠিত হয়। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান সময়ে জেলা পরিষদসমূহ একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে জেলা পরিষদ আজ পর্যন্ত সেরূপ শক্তিশালী কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ফিরে পায়নি।

উপজেলা পরিষদে সত্যিকার অর্থে কোন 'পরিষদ' নির্বাচিত হয় না। শুধু তিনজন নির্বাহী নির্বাচিত হন। জেলা পরিষদে সাধারণ জনগণের ভোটাধিকার নেই। পার্বত্য তিন জেলায় ভোটার তালিকা সংক্রান্ত একটি কৃত্রিম জটিলতাকে কেন্দ্র করে ১৯৮৯ সনের পর থেকে পার্বত্য জেলা পরিষদ (বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে কোন নির্বাচনই হয়নি।

তাই বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা হয়েছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের 'নির্বাচন ব্যবস্থা' সংস্কারের উদ্যোগ সফলভাবে করতে হলে বিদ্যমান স্থানীয় সরকারের সাতটি যে পৃথক আইন ও ভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামো তা সংস্কার করতে হবে (আইনসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ সংযোজিত)। এ বিষয়ে সংস্কারের প্রস্তাব রচনা এ কমিশনের আওতাধীন না হলেও এ সম্পর্কে একটি পথ রচনা ব্যতীত স্থানীয় সরকারের জন্য সহজ একটি নির্বাচন ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা দুঃসাধ্য। একইভাবে নির্বাচন কমিশনকেও পৃথকভাবে প্রতিটি স্তরের পৃথক নির্বাচন তফসিলের কারণে নির্বাচনে অনেক ভিন্ন ভিন্ন ম্যানুয়েল ও আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হয়। সর্বশেষ ম্যানুয়েল ও বিধিসমূহ পরিশিষ্ট-২ এ দেখা যেতে পারে।

সাংবিধানিক সংস্কার
সুপারিশসমূহ

১. সংবিধানের স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিধানসমূহের পুনঃপর্যালোচনা দরকার এবং এখানে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথমে তিনটি সুপারিশ করা যেতে পারে।

ক) সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদের সকল "স্থানীয় শাসন" শব্দাবলির স্থলে "স্থানীয় সরকার" প্রতিস্থাপিত হবে। স্থানীয় সরকার বা Local Government আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শব্দ বা প্রত্যয়। অনুবাদ করতে গিয়ে স্থানীয় সরকারের মূল ধারণা বিকৃত হয়ে পড়েছে।
খ) নির্বাচনসহ সকল ক্ষেত্রে "সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন" এ ধারাটির এ অংশ সংশোধন করে সংবিধানে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী একটি কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করে দিতে হবে। যা জাতীয় সরকার ও দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে কাঠামোর সুরক্ষায় গ্যারান্টি ক্লজ যুক্ত করতে হবে। সে কাঠামোটি হতে পারে দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় সরকারের মত রাষ্ট্রপতি শাসিত সকারের

আদলের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির প্রতিরূপ হতে পারে। বিরাজিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে চেয়ারম্যান ও মেয়র সর্বস্ব এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার মত করেই কাজ করে।

গ) সংবিধানের ১১৯(১) অনুচ্ছেদে একটি নতুন লাইন যুক্ত করা যেতে পারে, “নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে স্থানীয় পরিষদের নির্বাচন সমূহ পরিচালনা করিবে।” এটি হলে নির্বাচন কমিশন সরকারের অনুরোধের অপেক্ষা না করে নিজেরা স্বাধীনভাবে স্থানীয় নির্বাচনের সকল তফসিল সময়মত নির্ধারণ করতে সাংবিধানিকভাবে সক্ষম হবে।

২. আইন, সংগঠন ও অন্যান্য কাঠমোগত সংস্কার

ক. ১৯৭২ এর পর ৫টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য পাস্পরিক সম্পর্কবিহীন যে ৫টি পৃথক আইন ও অসংখ্য বিধিমালা সময় সময় জারি করা হয়েছে সে সব আইন ও বিধিসমূহ বাতিল করে সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি একীভূত ও একক স্থানীয় সরকার আইন ও প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করে সকল পরিষদসমূহের মধ্যে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সম্পর্ক ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এরকম একটি আইন করা হলে ঐ আইনবলে পাঁচটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো হবে একই ধাঁচের সংসদীয় পদ্ধতির। তখন নির্বাচন ব্যবস্থাটিও হবে সহজ, ব্যয় সাশ্রয়ী ও সময় সাশ্রয়ী।

খ. প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত নারী আসনসমূহ আবর্তক বা রোটেশনাল পদ্ধতিতে ওয়ার্ড সংরক্ষণ করে পূরণ করা যেতে পারে। তাতে সংগঠনে দ্বৈততা পরিত্যক্ত হবে। নারীগণ একটি নিজস্ব আসনে শাসন ও উন্নয়নে অংশ নিতে পারবেন।

গ. গ্রামীণ ও নগরের সর্বত্র সকল প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো হবে সমরূপ। স্থানীয় সরকারের ‘স্থানীয় সরকার সার্ভিস’ নামক একটি নিজস্ব সার্ভিস কাঠামো থাকবে। সে সার্ভিসের অধীন জনবলের উর্ধ্বমূখী ও নিম্নমূখী পদায়নের সুযোগ থাকবে। কর্মচারিদের ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি করর্পোরেশন পর্যন্ত অভিগম্যতা থাকলে পদোন্নতি ও পদায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ঘ. স্থানীয় সরকারের জন্য জাতীয় সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ছাড়াও জাতীয় সরকারের অর্থ প্রাপ্তির পরিমাণ সম্পর্কিত একটি গ্যারান্টি ক্লজ থাকলে স্থানীয় সরকারের আগাম উন্নয়ন পরিকল্পনা করা সহজতর হয়।

ঙ. সংবিধান ও আইন কাঠামো পরিবর্তন হলে দেশের সমতল ও পার্বত্য সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে একটি অভিন্ন ও একক তফসিলে ভিন্ন ভিন্ন দিনে নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে। দেশের ৫টি প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিযন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠানে পাঁচ বছরে মাত্র একবার সর্বাধিক দেড় থেকে দুই মাস সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

চ. পার্বত্য অঞ্চলে ভোটার তালিকার উপর একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্য একদিনে পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে।

ছ. দেশের কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের অনুরূপ স্থানীয় সরকারসমূহ হতে পারে সংসদীয় পদ্ধতির। প্রতিটি স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচনে শুধু সদস্য বা কাউন্সিলরগণ জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। সাধারণ নির্বাচনের পর মেয়র বা চেয়ারম্যানসহ সকল নির্বাহীগণের নির্বাচন নিজ নিজ পরিষদের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হবে। এভাবে জাতীয় সংসদের মত দুটি পর্যায়ে নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হতে পারে।

জ. একটি একক তফসিলে জাতীয় নির্বাচনের জন্য তৈরিকৃত ভোটার তালিকায় ২০২৫-এর মধ্যে জাতীয় নির্বাচনের আগে এবং পরে অন্য সকল সময় নির্বাচিত সরকারের শেষ সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবার পর পর স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঝ. এখন অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে যেহেতু কার্যত কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নেই তাই এ মুহূর্তে সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন একসাথে করা সম্ভব। এখন নতুন একটি স্বচ্ছ ইজেলে নতুন ছবি আঁকা সম্ভব। নতুবা নতুন নির্বাচনের আগে অনেক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ শেষ করার আইনী প্রশ্ন দেখা দিত।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্ধতি চালু করার আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে জন পরিসরে থাকলেও কোন সুয়োগ সৃষ্টি হয়নি। এখন সে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। চলতি ২০২৫-এর মধ্যে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ৫টি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি একীভূত স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন করে ২০২৫-এর মধ্যে সকল সমতল ও পাহাড়ের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। স্থায়ী স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন এ বিষয়ে বিস্তারিত কাজ জুন ২০২৫-এর আগে সমাপ্ত করতে পারে।

ঞ. একইভাবে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে সংসদীয় কাঠামোতে সংস্থাপিত করে আইন সংশোধন করে ২০২৫ এর মধ্যে পাহাড়ের তিনটি জেলা পরিষদ নির্বাচন সমাপ্ত হতে পারে। আঞ্চলিক পরিষদের বিষয়টি নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে।

কেন ও কীভাবে একক আইন ও তফসিলে স্থানীয় নির্বাচন ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী এবং তুলনামূলকভাবে কম প্রশাসনিক জটিলতামুক্ত হতে পারে সে জন্য নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠনসমূহের সর্বশেষ জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনসমূহের সরকারি ব্যয়, জনবল ব্যবহার ও সন্ত্রাসের একটি চিত্র দেখা যেতে পারে।

সারণি-৬.১: জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনী ব্যয়

প্রতিষ্ঠান	নির্বাচন অনুষ্ঠানের বছর (সংখ্যাসহ)	সরকারি ব্যয় (প্রার্থীর ব্যয় ধরা হয়নি)	নির্বাচনী জনবল নিয়োগ	সন্ত্রাস ও অনিয়ম	মন্তব্য
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন	২০২৪ (৩০০+৫০ আসন)	১৯২৭,৫০,৬৮,১০৭/-	৮,২৪,,৫৯৮	বিরোধী দল না থাকা সত্ত্বেও দলের অভ্যন্তরে ব্যাপক সন্ত্রাস সংগঠিত হয়	এটি ছিল মূলত একদলীয় নির্বাচন
১. ইউনিয়ন পরিষদ (৪৫৭৯)	২০২১ (৪১৩২)	৬০৪,৪৩,৭২,৯৫৯	৯,৩৭,৯৫৯	বিরোধী দলসমূহ নির্বাচন বর্জন করায় সরকারি দলের প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়।	স্থানীয় নির্বাচনে সাধারণত যে হারে ভোটার অংশগ্রহণ থাকার কথা তা ছিল না।
২. উপজেলা পরিষদ (৪৯৫)	২০২৪ (৪৬৯)	১৫৩৯,৮৩,৩৪,৪৩২	৮,৩৭,০৯২	ঐ	ঐ
৩.পৌরসভা (৩৩৮)	২০২০ (২৩২)	১১৮,৭৮,২১,০১৬	৮১,৭২৩	ঐ	ঐ
৪.সিটি কর্পোরেশন (১২)	২০২০ (২০২৪)	১০৪,৯৬,৫৩,৮১১	১,০১,৯৩১	ঐ	ঐ
৫. জেলা পরিষদ (সমতল) (৬১)	২০২২ (৬১)	১৭,২৩,৪৯,১৭৯	৩,৩৩৬	এখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না।	সর্বজনীন ও প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক ব্যবস্থা নয়।
৬.জেলা পরিষদ(পাহাড়)-(৩)	১৯৮৯ সালে প্রথম নির্বাচন হয়।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৯৮৯ সালের পর কোন নির্বাচন হয়নি।
৭. আঞ্চলিক পরিষদ (পাহাড়)-১	২৭ মে ১৯৯৯ সালে গঠিত হয়।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিধান থাকলেও কোন নির্বাচন হয়নি।
৮. রাজা-হেডম্যান-কারবারী (তিন জেলা মিলে ৩৭৫ জন	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নিয়োজিত হন। প্রতিজন মাসে

প্রতিষ্ঠান	নির্বাচন অনুষ্ঠানের বছর (সংখ্যাসহ)	সরকারি ব্যয় (প্রার্থীর ব্যয় ধরা হয়নি)	নির্বাচনী জনবল নিয়োগ	সন্ত্রাস ও অনিয়ম	মন্তব্য
হেডম্যান ও ২৫৩১ কারবারি রয়েছেন।					হেডম্যান ১,০০০ টাকা এবং কারবারি ৫০০ টাকা ভাতা পান।
৯.ক্যান্ট বোর্ড	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	সরকার নিয়োজিত
১-৫ ক্রমিকের স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনের মোট ব্যয় ও জনবল	মোট ৫,৪৮৯টি স্থানীয় পরিষদের মধ্যে ৫০০৬টিতে নির্বাচন হয়	২৩৮৫,২৫,২৯,৩৯৭	১৯,৬২,০৪১		

উৎস: নির্বাচন কমিশন অক্টোবর, ২০২৪

বি:দ্র: শেষের ৮ ও ৯ ক্রমিকে নির্বাচনের বিধান নেই। ৮কে প্রথাগত (Customary) এবং ৯কে প্রশাসনিক ‘সেবা সংস্থা’ হিসেবে দেখা হয়।

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যে কোন গুণমান ও সাধারণ অংশগ্রহণ বিবেচনায় কোন নির্বাচনই নয়। উন্নত নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি বিচারের প্রশ্ন অবান্তর। এরকম প্রহসনের নির্বাচনে ২০২৪ এ ১৯২৭,৫০,৬৮,১০৭ (প্রায় ২,০০০)কোটি টাকা দৃশ্যমান বা আনুষ্ঠানিক ব্যয় হয় এবং ৮,২৪,৫৯৮ জনবল কাজ করেছে। বিপরীতক্রমে পাঁচটি স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে ২,৩৮৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১৯ লাখ ৬২ হাজার লোকবল নিয়োজিত ছিল। অনায়সে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের এ ব্যয় ৬০০/৭০০ কোটি টাকায় নামিয়ে এনে ১৯ লাখের বদলে ৯ লাখ জনবল নিয়োগ করে স্থানীয় নির্বাচন নির্বাহ করা যায়।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়কাল পাঁচটি নির্বাচনের তফসিল বিবেচনায় ২২৫ দিন থেকে ৪৫ দিনে নামিয়ে আনা সম্ভব। ৩৬৫ দিনের একটি বছরে বা ১৮২৫ দিনে ৫টি বছরে আমরা ২২৫ দিন শুধু অর্থহীন নির্বাচনে ব্যয় করে থাকি।

নির্বাচন কমিশনকে বিভিন্ন সময়ের স্থানীয় নির্বাচনের জন্য ১৫ থেকে ২১টি বিধি ও আচরণবিধিমালা তৈরি করতে হয়। এখানে যথাযথ সংস্কার হলে এক বা দুইটি বিধিমালার মাধ্যমে সকল স্থানীয় নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে। সরকারি কর্মকর্তা ও সরকারের অনেক সময় সাশ্রয় হতে পারে (পরিশিষ্ট-২।)

পরিশিষ্ট -১ এ উল্লেখিত পাঁচটি পৃথক আইন দুটি একটি আইনে সমন্বিত হতে পারে। একটি একক আইনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোকে একসাথে আনা হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজ কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। পরিশিষ্ট-২ এর আইনসমূহ বড়জোর একটি আইন ও দুইটি বিধিতে সমন্বিত হতে পারে।

পাঁচটি প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এই পাঁচটি নির্বাচন একটি অভিন্ন তফসিলে করার ফর্মূলাটি একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের একজন ভোটার একই সাথে ভোটের দিন তিনটি ব্যালটে পাবেন একটি ইউনিয়ন, একটি উপজেলা এবং একটি জেলা পরিষদের জন্য। একটি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যকে, এক বা একাধিক ভোট উপজেলা ও জেলা পরিষদের পরিষদ সদস্যকে দিবেন। ক্ষেত্র বিশেষে উপজেলা ও জেলায় সদস্যপদ বেশি হলে উপজেলা ও জেলায় গুচ্ছ পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার ছাপা যেতে পারে। পৌরসভার একজন ভোটার একইভাবে নিজের কাউন্সিলরকে, উপজেলা পরিষদের এবং জেলা পরিষদ সদস্যগণকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট দিবেন। সিটি কর্পোরেশনের ভোটারগণের ক্ষেত্রে একাধিক ওয়ার্ডের ভোটারগণ জেলা পরিষদের একটি ওয়ার্ডের প্রার্থীকেই শুধু ভোট দিবেন। যেহেতু জেলা পরিষদের চেয়ে সিটির ওয়ার্ড সংখ্যা বেশি তাই এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। একই দিনে একটি এলাকায় সকল পরিষদ ও কাউন্সিলে একই তফসিলে নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। নিম্নের চিত্রে ভোটপর্বটি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

ছক-৬.১: একই তফসিলে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ব্যবস্থা

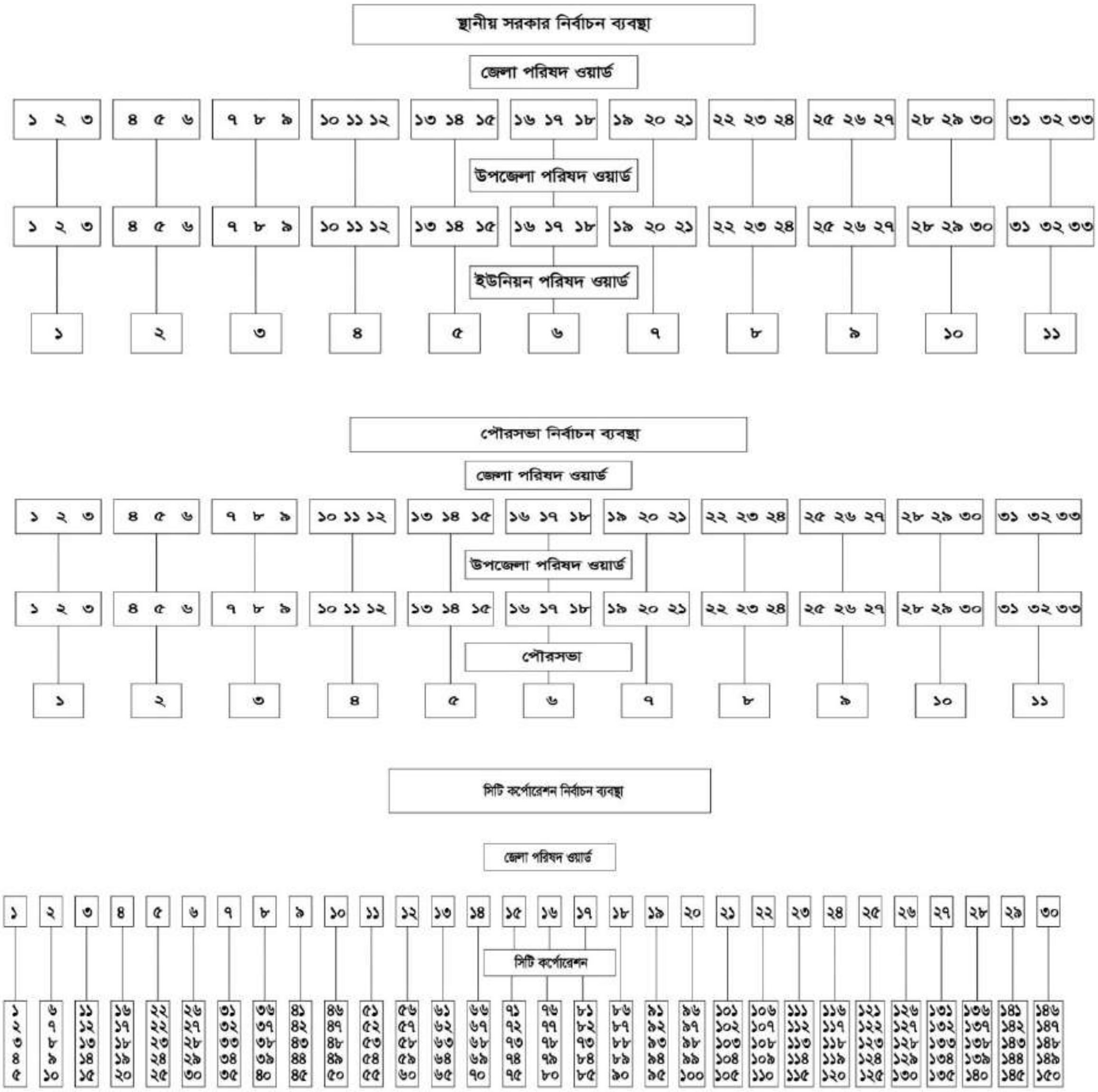

পরিশিষ্ট- ৮.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইনসমূহ

১. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন ২০১০, ৬০ নং আইন

২. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন ২০১৫, ৮নং আইন।

৩. উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮

৪. জেলা পরিষদ আইন ২০০০ (২০০০ এর ২২ নং আইন)

৫. জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৪ নং আইন)

৬. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৪ নং আইন)

৭. স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯

৮. পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৮

৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৯

পরিশিষ্ট- ৮.২

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের জন্য ইসি প্রণীত বিধি-বিধানসমূহ:

সিটি কর্পোরেশন:

(১) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০

(২) সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬

(৩) সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৬

উপজেলা পরিষদ:

(১) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩

(২) উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬

(৩) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯

পৌরসভা:

(১) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০

(২) পৌরসভা (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৫

(৩) পৌরসভা নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯

ইউনিয়ন পরিষদ:

(১) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০

(২) ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬

(৩) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯

জেলা পরিষদ:

(১) জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬

(২) জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬

অধ্যায়-সাত

নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা: সংগঠন, কাঠামো ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুপারিশ

বর্তমান পৃথিবীতে শহর বা নগর যে কোন দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক। সম্প্রতি নগরের গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে নগর শাসনব্যবস্থার গুরুত্বও অন্য যেকোন সময় থেকে অনেক বেশি জোরালো হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বর্তমান নগরায়নের দ্রুত প্রসার, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং উন্নয়ন উদ্ভূত নানা নাগরিক সমস্যা ও সংকটের চ্যালেঞ্জগুলোর প্রেক্ষিতে নগর শাসন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, দক্ষ, সমস্যা মোকাবিলা উপযোগী অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগত ও আইনগত সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে (অধ্যায়: ৩,৪,৫,৬ দেখুন)।

৭.১ বাংলাদেশে নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকাশ

ভারতীয় উপমহাদেশে নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। উপমহাদেশে নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনুঘটকের আন্তক্রিয়ার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে নগর প্রশাসন বিশেষভাবে উন্নত ছিল কারণ শাসকরা ছিলেন মূলত নগরের বাসিন্দা বিশেষত মৌর্য সাম্রাজ্যের (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ–২য় শতক) সময় থেকে তার ইতিহাস পাওয়া যায়। সে সময়ে পাটলিপুত্রের মতো নগরগুলোর জন্য সুসংগঠিত পৌর প্রশাসন ছিল, যেখানে স্বাস্থ্যব্যবস্থা, বাণিজ্য ও অবকাঠামো পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হতো। মুঘল আমলে (১৬শ–১৮শ শতাব্দী) নগর প্রশাসন মূলত একটা কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার স্থানীয় শাখা হিসেবে কাজ করত। এসময়কালে স্থানীয় কর্মকর্তা বা কোতোয়ালরা শহরের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। তবে এই ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। বাংলায় ব্রিটিশরা ১৮৬৪ সালে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট প্রবর্তন করে, যার আওতায় শহরগুলোর জন্য পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা শুরু হয়। বাংলাদেশের বর্তমান রাজধানী ঢাকা ছিল প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত পৌরসভাগুলোর মধ্যে একটি। তবে এই পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত, এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ছিল ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের হাতে। ১৯১৯ সালের বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ-গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট দ্বারা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কার করা হয় এবং ইউনিয়ন কমিটির পরিবর্তে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়, যা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ বৃদ্ধি করে। তবে বাস্তবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বায়ত্তশাসন তখনো উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

ভারতে প্রথম পৌর কমিটি ১৬৮৮ সালে মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে বোম্বে (মুম্বাই) এবং কলকাতায় পৌর প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় (আহমেদ, ২০১৬ ও Akmed 2016)। তবে এসব প্রতিষ্ঠান মূলত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থানীয় সরকারকে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। শহরাঞ্চলের জন্য গড়ে তোলা হয় পৌরসভা। ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠার (১৮৬৪) প্রায় আশি বছর পর ১৯৮৩-এ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে বড় শহরগুলোতে সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার নজির চালু হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা শহরে সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান নগর অবকাঠামো উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, ও পৌরসেবা ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাম্প্রতিক সময়ে নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছে। নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সুশাসন নিশ্চিত করার উদ্যোগও কিছু নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এসব বিচ্ছিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য ফল বয়ে আনতে পারেনি।

ইতিহাস থেকে দেখা যায় নগরায়নের বিকাশ এবং নগর শাসন ব্যবস্থার বিকাশ মোটামুটি একই ধারাক্রমে ঘটেছে। নগরায়ন প্রধানত একটি অর্থনৈতিক ঘটনা যার সাথে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে; গড়ে ওঠে একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিসরও। এই নগরায়নের বিকাশ ও পরিক্রমার পর্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য নগর বিশেষজ্ঞগন বেশ কিছু দৃষ্টিভঙ্গি এবং তত্ত্ব আলোচনা করেছেন, যার একটা সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন নিচে দেয়া হল।

৭.২ নগরায়ন সংক্রান্ত তত্ত্ব: সংক্ষিপ্ত আলোচনা

নগরায়ন সংক্রান্ত তত্ত্বগুলো নগরায়নের প্রক্রিয়া, এর প্রভাব এবং নগর জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে সাহায্য করে। নগরায়নের বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে, যা নগরায়নের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করে। বাংলাদেশের নগরায়নের গতিপ্রকৃতি বুঝতে নগরায়ন সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়:

৭.২.১. আরবানিজম (Urbanism)

আরবানিজম তত্ত্বটি নগর জীবনের বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক কাঠামোকে ব্যাখ্যা করে। এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা হলেন সমাজবিজ্ঞানী লুইস উইরথ (Louis Wirth)। উইরথ তার বিখ্যাত নিবন্ধ "Urbanism as a Way of Life" (1938)-এ নগর জীবনের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন: (ক) উচ্চ জনঘনত্ব: নগরাঞ্চলে জনঘনত্ব বেশি হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়। (খ) সামাজিক বৈচিত্র্য: নগরাঞ্চলে বিভিন্ন পেশা, সংস্কৃতি, ও ধর্মের মানুষ একত্রে বসবাস করে, যা সামাজিক বৈচিত্র্য তৈরি করে; এবং (গ) জটিল সামাজিক সংগঠন: নগর জীবনে সামাজিক সম্পর্কগুলো আনুষ্ঠানিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের হয়, যা গ্রামীণজীবনের সরল ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে ভিন্ন। উইরথের মতে, নগর জীবনে মানুষের সম্পর্কগুলো অস্থায়ী ও স্বার্থপর হয়, যা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব তৈরি করে। এই তত্ত্বটি নগরায়নের নেতিবাচক দিকগুলোকে তুলে ধরে।

৭.২.২. আরবানাইজেশন (Urbanization)

আরবানাইজেশন হলো একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকা থেকে মানুষ নগরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় এবং নগর জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। এই প্রক্রিয়াটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis) তার বই "World Urbanization 1950-1970" (1969)-এ আরবানাইজেশনকে একটি বৈশ্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, নগরায়ন শুধুমাত্র জনসংখ্যার স্থানান্তর নয়, বরং এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনও বটে। ডেভিসের মতে, নগরায়নের প্রধান কারণগুলো হলো: শিল্পায়ন – শিল্পায়নের ফলে নগরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়; প্রযুক্তিগত উন্নয়ন - প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে নগরাঞ্চলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়; গ্রামীণ দারিদ্র্য-গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের অভাব মানুষকে নগরমুখী করে।

৭.২.৩. কেন্দ্রীয়স্থান তত্ত্ব (Central Place Theory)

কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্বটি নগরগুলোর অবস্থান ও কার্যাবলিকে ব্যাখ্যা করে। এই তত্ত্বটি "Die zentralen Orte in Sýddeutschland" শীর্ষক গ্রন্থে ওয়াল্টার ক্রিস্টালার (Walter Christaller, 1933) প্রস্তাব করেছিলেন। হয়েছিল তার বই এ। ক্রিস্টালারের মতে, নগরগুলো কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে কাজ করে, যা চারপাশের এলাকাগুলোকে সেবা প্রদান করে। এই তত্ত্বের মূল ধারণা হলো: (ক) কেন্দ্রীয় স্থান: নগরগুলো কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে কাজ করে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের সেবা ও পণ্য পাওয়া যায়; (খ) পরিসর ও প্রান্তিকতা: প্রতিটি সেবার একটি নির্দিষ্ট পরিসর (range) এবং প্রান্তিকতা (threshold) রয়েছে, যা নির্ধারণ করে যে সেবাটি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং (গ) ষড়ভুজাকার নেটওয়ার্ক: ক্রিস্টালার নগরগুলোর অবস্থানকে ষড়ভুজাকার নেটওয়ার্ক হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা দক্ষতা ও ভারসাম্য বজায় রাখে। এই তত্ত্বটি নগর পরিকল্পনা ও আঞ্চলিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৭.২.৪. বহু-কেন্দ্রিক মডেল (Multiple Nuclei Model)

বহু-কেন্দ্রিক মডেলটি নগরগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে ব্যাখ্যা করে। এই মডেলটি চ্যাপিন ও হ্যারিস (Chauncy Harris and Edward Ullman) তাদের নিবন্ধ "The Nature of Cities" (1945)-এ উল্লেখ করেন। এই মডেল অনুযায়ী, নগরগুলো বিভিন্ন কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত হয়, যেখানে প্রতিটি কেন্দ্র একটি বিশেষ কার্যাবলি সম্পাদন করে। এই মডেল অনুযায়ী নগরের বৈশিষ্ট্য হলো:

- **বহু-কেন্দ্রিক কাঠামো**: নগরগুলোর মধ্যে একাধিক কেন্দ্র থাকে, যেমন ব্যবসায়িক জেলা, শিল্পাঞ্চল, আবাসিক এলাকা, ইত্যাদি।
- **বিশেষিকরণ**: প্রতিটি কেন্দ্র একটি বিশেষ ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে, যেমন শিল্পাঞ্চলে শিল্প কারখানা থাকে, আবাসিক এলাকায় বাসস্থান থাকে।
- **পরিবহন ও যোগাযোগ**: এই মডেলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়, যা বিভিন্ন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

৭.২.৫. সেক্টর মডেল (Sector Model)

সেক্টর মডেলটি নগরগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে ব্যাখ্যা করে। এই মডেলটি হোমার হয়েট (Homer Hoyt) তার "The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities" (1939)-নিবন্ধে প্রস্তাব করেছিলেন। এই মডেল অনুযায়ী, নগরগুলো বিভিন্ন সেক্টরে বিভক্ত হয়, যেখানে প্রতিটি সেক্টর একটি বিশেষ ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন: সেক্টর বিভাজন - নগরগুলো বিভিন্ন সেক্টরে বিভক্ত হয়, যেমন আবাসিক সেক্টর, শিল্প সেক্টর, ব্যবসায়িক সেক্টর, ইত্যাদি। এখানে প্রতিটি সেক্টর একটি নির্দিষ্ট দিকে বিকাশ লাভ করে, যা নগরের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবহন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশের নগরায়নের গতিপ্রকৃতি বুঝতে উপরোক্ত তত্ত্বগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে নগরায়নের হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নগর জীবনের বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করছে। লুইস উইরথের আরবানিজম তত্ত্ব অনুযায়ী, বাংলাদেশের নগরাঞ্চলে উচ্চ জনঘনত্ব ও সামাজিক বৈচিত্র্য দেখা যায়, যা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব তৈরি করছে। কিংসলে ডেভিসের আরবানাইজেশন তত্ত্ব অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও গ্রামীণ দারিদ্র্য নগরায়নের প্রধান কারণ। ওয়াল্টার ক্রিস্টালারের কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্ব অনুযায়ী, বাংলাদেশের নগরগুলো কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে কাজ করে, যা চারপাশের এলাকাগুলোকে সেবা প্রদান করে। চ্যাপিন ও হ্যারিসের বহু-কেন্দ্রিক মডেল এবং হোমার হয়েটের সেক্টর মডেল অনুযায়ী, বাংলাদেশের নগরগুলো বিভিন্ন কেন্দ্র ও সেক্টরে বিভক্ত, যা নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে।

৭.৩. বাংলাদেশে নগরায়নের হার, গতি ও প্রবণতা

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্রুততম নগরায়নের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে নগরায়নের হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে নগরায়নের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেটসহ প্রধান শহরগুলোতে নগরায়ন সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে শহরতলির সম্প্রসারণ, নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন, এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে নগরায়নের প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৮% নগরাঞ্চলে বসবাস করছিল যা বর্তমানে ৪০ শতাংশ ছাড়িয়েছে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে (Statista, 2023)। বর্তমানে দেশে ৫৩২টি নগর কেন্দ্র আছে যার আয়তন ১১২৫৮ বর্গকিলোমিটার যা দেশের মোট আয়তনের মাত্র ৭.৬৬% হওয়া সত্ত্বেও দেশের জাতীয় উৎপাদনে নগরের অবদান শতকরা ষাটভাগেরও বেশি। এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে শহর ও নগরের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। নগর এলাকায় বসবাসরত শতকরা ৬০ ভাগ লোকই সিটি কর্পোরেশনসমূহে এবং এর বৃহৎ অংশ ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাস করেন। বাংলাদেশে এই দ্রুত নগরায়নের মূল কারণগুলো হলো:

- **অর্থনৈতিক সুযোগ**: নগরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি, বিশেষ করে পোশাক শিল্প ও সেবা খাতে।
- **গ্রামীণ দারিদ্র্য**: গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের অভাব মানুষকে নগরমুখী করছে।
- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ**: বাংলাদেশে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়, গ্রামীণ এলাকার মানুষকে নগরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করছে।

বাংলাদেশে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নগরায়ন হচ্ছে বটে, তবে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অপরিকল্পিত এবং ভারসাম্যহীন নগরায়ন। অপরিকল্পিত এবং দ্রুত নগরায়নের ফলে বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ও পরিবেশে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে:

- **সমাজ**: নগরায়নের ফলে সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়েছে এবং নতুন সামাজিক সমস্যা, যেমন অপরাধ ও মাদকাসক্তি, বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **অর্থনীতি**: নগরায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে, কিন্তু একইসময়ে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নগরাঞ্চলে বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে মানুষ নিম্নমানের জীবনযাত্রায় বাস করছে।
- **রাজনীতি**: নগরাঞ্চলগুলো রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। নগরবাসীরা বিশেষ করে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, যা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে।
- **পরিবেশ**: নগরায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দ দূষণ নগর জীবনের একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- দুর্বল ও অপ্রতুল পরিসেবা ব্যবস্থা: অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বিদ্যমান সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, অবকাঠামো ও পরিষেবায় বিপুল চাপ পড়ছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ পরিসেবা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭.৩.১. বাংলাদেশে নগরের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

বাংলাদেশে নগর উন্নয়ন নীতি অনুযায়ী, নগরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

- **শহর (City)**: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ইত্যাদি বড় শহরগুলো এই বিভাগে পড়ে। এগুলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এই শহরগুলোতে গড় জনসংখ্যা ১০ লক্ষাধিক। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ১২টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে।
- **পৌরসভা (Municipality)**: ছোট ও মাঝারি আকারের নগরাঞ্চলগুলো পৌরসভা হিসেবে পরিচালিত হয়। এগুলোর নিজস্ব স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। ৫০,০০০-১০,০০০০ জনসংখ্যার শহর। দেশে বর্তমানে ৩৩০টি পৌরসভা রয়েছে।
- **উপ-শহর (Suburb)**
- **উপজেলা শহর (Upazila Town)**: উপজেলা পর্যায়ের শহরগুলো সাধারণত গ্রামীণ এলাকার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে উপজেলার সংখ্যা ৪৯৫টি।

৭.৪. নগরায়ন, জীবন-জীবিকা এবং সংস্কৃতি

নগরায়নের ফলে জীবন-জীবিকা এবং সংস্কৃতির পরিবর্তন লক্ষণীয়। বাংলাদেশে শহরকেন্দ্রিক অর্থনীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্য, সেবা, শিল্প ও প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটেছে। নগরায়নের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা দ্রুততর হয়েছে, নারী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগের প্রসার ঘটেছে। তবে এর পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক

বৈষম্য, দারিদ্র্য, এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে নিম্নমানের জীবনযাত্রার সমস্যাও তৈরি হয়েছে এবং দ্রুত বাড়ছে বৈষম্য। এ বৈষম্য নাগরিক সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য-পুষ্টি, আয় সর্বত্র অত্যন্ত প্রকটভাবে দুশ্যমান।

নগরায়নের সাথে নগর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে, যা জীবনযাত্রার ধরন, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন, পোশাক, ভাষা ও পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের নগরসমূহে পপ সংস্কৃতি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মাধ্যমে বৈশ্বিক সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে, স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে এই নতুন নগর সংস্কৃতির সংমিশ্রণও ঘটছে। অনেক তা ভারসাম্যহীন ও নৈরাজ্যকর অবস্থাও সৃষ্টি করছে। নগরে অসন্তোষ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সাধারণ সন্ত্রাস বাড়ছে।

৭.৫. নগর স্থানীয় সরকারের কাঠামো ও কার্যপ্রণালি

বাংলাদেশে নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মূলত দুটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কাঠামো আলাদা হলে ও দায়িত্ব ও কার্যপ্রণালি একই, তবে উভয়ই নগরবাসীর সেবা প্রদান ও উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত বলে দাবি করে। অন্তত: আইন তাই নির্দেশ করে।

৭.৫.১ সিটি কর্পোরেশন

সিটি কর্পোরেশন হলো বড় শহর ও নগর অঞ্চলের স্থানীয় সরকার সংস্থা, যা নগরবাসীর জন্য বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনসমূহের গঠন, দায়িত্ব ও কার্যাবলি স্থানীয় সরকার আইন (সিটি কর্পোরেশন) ২০০৯ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

সংজ্ঞা ও দায়িত্ব

সিটি কর্পোরেশন হলো একটি স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার সংস্থা, যা নগর অঞ্চলের প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করে। এর প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- নাগরিকদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ নিবন্ধন এবং এসংক্রান্ত সনদ প্রদান
- নাগরিকদের জন্য পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- ট্রেড লাইসেন্স প্রদান।
- সড়কবাতি দেয়া এবং কবরস্থান/শ্মশান রক্ষণাবেক্ষণ
- নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- নাগরিকদের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করা।

সংখ্যা ও ভৌগোলিক এলাকা এবং প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশে বর্তমানে ১২টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে, যেগুলো দেশের প্রধান প্রধান শহর ও নগর অঞ্চলে অবস্থিত। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে গঠিত হয়, যা সাধারণত বড় শহর বা মহানগরীকে কেন্দ্র করে। যেমন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি।

সিটি কর্পোরেশনের নীতি নির্ধারণের জন্য একটি সিটি কাউন্সিল কাজ করে। কাউন্সিলের প্রধান হন জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মেয়র, যিনি নির্ধারিত ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নেতৃত্ব দেন। কাউন্সিলকে সাচিবিক কাজে সহায়তার জন্য একজন সার্বক্ষণিক সচিব কাজ করেন। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার জন্য মেয়রের অধীন একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তার অধীন, নিজস্ব অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এক কর্মী বাহিনী কাজ

করে। এই কর্মীবাহিনীর মধ্যে প্রধানত দুই শ্রেণীর কর্মী থাকেন: কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রেষণে নিয়োজিত এবং কর্পোরেশনের নিয়োগ করা নিজস্ব কর্মীবৃন্দ।

৭.৫.২ পৌরসভা

পৌরসভা হলো ছোট ও মাঝারি শহর অঞ্চলের স্থানীয় সরকার সংস্থা, যা নগরবাসীর সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত। পৌরসভার কাঠামো, দায়িত্ব এবং কার্যাদি বর্তমানে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

শ্রেণিবিন্যাস

পৌরসভাগুলো তাদের আয়, জনসংখ্যা ও উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত:

- **ক শ্রেণির পৌরসভা:** বড় ও উন্নত শহর অঞ্চলের জন্য, যেখানে আয় ও জনসংখ্যা বেশি।
- **খ শ্রেণির পৌরসভা:** মাঝারি আকারের শহর অঞ্চলের জন্য।
- **গ শ্রেণির পৌরসভা:** ছোট ও কম উন্নত শহর অঞ্চলের জন্য।

দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ও প্রশাসনিক কাঠামো

পৌরসভার প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- নাগরিকদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ নিবন্ধন এবং এসংক্রান্ত সনদ প্রদান
- নাগরিকদের জন্য পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- ট্রেড লাইসেন্স প্রদান।
- সড়কবাতি দেয়া এবং কবরস্থান/ শ্মশান রক্ষণাবেক্ষণ
- নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- নাগরিকদের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করা।

পৌরসভার নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পৌর-কাউন্সিল কাজ করে। কাউন্সিলের প্রধান হন জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মেয়র, যিনি নির্ধারিত ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নেতৃত্ব দেন। কাউন্সিলকে সাচিবিক সহায়তার জন্য একজন সার্বক্ষণিক সচিব কাজ করেন। পৌরসভার প্রশাসনিক কাঠামো নিম্নরূপ

- **চেয়ারম্যান:** পৌরসভার প্রধান নির্বাহী, যিনি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন।
- **কাউন্সিলর:** ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি, যারা তাদের ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
- **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব:** প্রশাসনিক কাজকর্ম তদারকি করার জন্য প্রেষনে নিয়োজিত থাকে। এ দু'জনসহ আরো কিছু সরকারি কর্মকর্তা।
- **বিভিন্ন কমিটি:** যেমন স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য কমিটি, যারা নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

প্রতিটি পৌরসভায় প্রশাসনিক বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার জন্য মেয়রের অধীন একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তার অধীন, নিজস্ব অরগানোগ্রাম অনুযায়ী, এক কর্মী বাহিনী কাজ করে। এই কর্মবাহিনীর মধ্যে প্রধানত দুই শ্রেণীর কর্মী থাকেন: কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রেষণে নিয়োজিত এবং পৌরসভার নিয়োগ করা নিজস্ব কর্মীবৃন্দ।

৭.৬. নগর স্থানীয় সরকারের বর্তমান চ্যালেন্জসমূহ

দুর্ভাগ্যজনক বাংলাদেশের নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর জনপ্রতিনিধিত্বমুলক সেবাদানকারি ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এই প্রতিষ্ঠানগুলো নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, যা তাদের কার্যকারিতা ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে সিদ্ধান্তগ্রহণে গণতান্ত্রিকতার অভাব, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মেয়রের একচ্ছত্র আধিপত্য, আর্থিক অসংগতি, মানবসম্পদের ঘাটতি, কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ, সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, স্বচ্ছতার অভাব, নাগরিক অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা এবং নির্বাচনী জটিলতা উল্লেখযোগ্য।

কাউন্সিলে গণতান্ত্রিকতার অভাব

এখানে কাউন্সিল প্রথা মোটেই কার্যকর নয়। এমনও নজির আছে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে মাসের পর মাস কাউন্সিল সভা হয়নি। হয় না স্থায়ী কমিটিসমূহের সভা মেয়র এবং নির্বাহীগণ কর্পোরেশন পরিচালনা করেন। কাউন্সিলরগণ তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের জন্য কিছু প্রকল্প বরাদ্দ নিয়ে সন্তষ্ট থাকেন।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের আঁতুড়ঘর বলা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান - সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই প্রতিষ্ঠানগুলো শুরু থেকেই সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াতে গণতান্ত্রিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে নীতি নির্ধারণী ফোরাম হিসেবে কাউন্সিল বা পরিষদ কাজ করার কথা যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্তর্গত সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরবৃন্দ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কাউন্সিলর এবং মেয়রের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব, দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে বিশাল পার্থক্য বিরাজ করে। একই সাথে বর্তমান আইন অনুযায়ী মেয়র কর্পোরেশন/পৌরসভার সকল প্রশাসনিক উন্নয়ন কার্যক্রম একচ্ছত্রভাবে পরিচালনা ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ করার সুবাদে কাউন্সিলের উপর মেয়রের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল একটি মিনি সংসদ হবার কথা ছিল। কাউন্সিলরদের একটি বড় অংশ নানা অপরাধী চক্রের হোতা এবং তারা তাদের ওয়ার্ডের নানা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ চাঁদাবাজি ও দখল বাজিতে যুক্ত থাকে। এখানে রাজনৈতিক নেতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বৃত্ত গ্যাংগ, ঠিকাদার, কর্মকর্তাদের একটি দুষ্টচক্র কাজ করে। সাধারণ ও নিরীহ নাগরিক এর ধারে কাছে যেতে পারে না যার দরুন কাউন্সিলের মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনা-বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয় না, ফলে কাউন্সিলের মধ্যে বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনস্বার্থ বিষয়ক বিষয়াবলী উপস্থাপিত হওয়ার সুযোগ কমে যায় এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাউন্সিল তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।

মেয়রের একচ্ছত্র আধিপত্য

বাংলাদেশের নগর স্থানীয় সরকারে মেয়রদের একচ্ছত্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি বড় দুর্বলতা। যদিও স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এই একচ্ছত্র আধিপত্যকে আইনগতভাবেই সমর্থন করে। তবে বিষয়টা যতটা না আইনগত তারচেয়ে অনেক বেশি চর্চাগত ও ব্যবহারিক। মেয়রদের রাজনৈতিক পরিচয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবেচনায় কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে এতটাই পার্থক্য থাকে যে রাজনৈতিক প্রভাব এবং শক্তিমত্তার প্রভাবে কাউন্সিলে মেয়রের একাধিপত্য সৃষ্টি হয়। এখানে কাউন্সিলররা ভিন্নমত প্রদানে শংকিত থাকেন। ভিন্নমত দিলেও বেশিভাগ ক্ষেত্রেই মেয়ররা কাউন্সিলর ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মতামত উপেক্ষা করে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেন, যা প্রকারান্তরে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একধরনের 'সেচ্ছাচারী রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি' সৃষ্টি করে।

ওয়ার্ড পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণের ঘাটতি

পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড হল জনপ্রনিধিত্বের নির্বাচনী একক ও নির্বাহী এলাকা এবং নাগরিক সেবা প্রদানের প্রধান ইউনিট। কিন্তু বাস্তবে বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই ইউনিটটি একটি স্বতন্ত্র কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠেনি। প্রধানত সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা না থাকা এবং সম্পদ বরাদ্দের ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় ওয়ার্ড পর্যায়ের নাগরিকদের চাহিদামত সেবা প্রদান বা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

বড় শহরগুলোতে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে আর এক ধরনের সংকট দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে প্রতিদিন গ্রাম থেকে মানুষ শহরে আসছে। শহরমুখী মানুষদের অন্যতম গন্তব্য হল ঢাকা এবং চট্টগ্রামের মত বড় শহর। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেয়া সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে এসেছে। দেখা গেছে শহরাঞ্চলে একটি তীব্র জনসংখ্যাগত ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান, যেমনটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এখানে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে মোট ১২৯টি ওয়ার্ড রয়েছে, যার মধ্যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ৭৫টি এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৫৪টি ওয়ার্ড রয়েছে।

সিটি কর্পোরেশনগুলোর প্রতিটি ওয়ার্ডে জনসংখ্যার পরিমাণ সমান নয়। শহরের কেন্দ্রীয় এলাকাগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি এবং সেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। এছাড়া, নিয়মিতভাবে নুতন অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ফলে এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে, প্রতি ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ নাগরিকের জন্য মাত্র একজন কাউন্সিলর রয়েছেন, যাকে সাহায্য করার জন্য একজন সচিব থাকেন। বাস্তবতা হল বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের একটা ওয়ার্ডে গড় জনসংখ্যা ৮০,০০০ থেকে ৯০,০০০। গত দশ বছরে এই জনসংখ্যার এই বিপুল উল্লম্ফন হলেও ওয়ার্ডগুলোর সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে, কর্পোরেশনের পরিষেবাগুলো অপ্রতুল হয়ে পড়ছে এবং সাধারণ সেবাপ্রার্থীরা দুর্নীতি এবং বিভিন্ন রকম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তবে কম জনবহুল এলাকাগুলোতে কর্পোরেশনের পরিষেবাগুলো তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য এবং কার্যকর।

কাউন্সিল সভা

কর্পোরেশনগুলোতে কাউন্সিল সভা অনিয়মিত। সভাগুলোতে ইস্যু ভিত্তিক কোন নীতি হয় না। সব কাউন্সিলরগণ শুধু প্রকল্পের পিছনে ছোটেন। একই কাউন্সিলর আবার নামে বেনামে ঠিকাদার ও সরবারহকারী। যা সরাসরি বেআইনী ও স্বার্থের সংঘাত পর্যায়ে পড়ে। কাউন্সিল সভা বা অধিবেশন হবার কথা কর্পোরেশনের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কেন্দ্রবিন্দু। সে কাউন্সিল ও কাউন্সিলর ব্যবস্থাটি এমন একটি পর্যায়ে অবনমিত হয়েছে, স্থানীয় কাউন্সিল গণতন্ত্রের লেশমাত্র ধারণ করে না।

স্থায়ী কমিটিগুলোর অকার্যকারিতা

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ আইননুযায়ী প্রতিটি কর্পোরেশনে কমপক্ষে ১৪টি স্থায়ী কমিটি এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী কমপক্ষে ৫টি স্থায়ী কমিটি (যেমন অর্থ কমিটি, নগর পরিকল্পনা, আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা কমিটি) গঠন করার কথা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এই কমিটিগুলো প্রায়ই অকার্যকর থাকে। কমিটিগুলোকে কার্যকর করার জন্য কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। কমিটিগুলোর কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকসেরও অভাব রয়েছে। এছাড়া কর্পোরেশনের ভেতরকার সংস্কৃতিতে এই কমিটিগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না। ফল হিসেবে এই কমিটিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেহায়েত কাগুজে ব্যাপারে পরিণত হয়। স্থায়ী কমিটিগুলো কার্যকরভাবে বসে না (অধ্যায় আট দেখা যেতে পারে)।

বাজেট ঘাটতি ও সীমিত রাজস্ব

পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের নগর স্থানীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস হলো স্থানীয় কর, ফি, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান। তবে কর আদায়ের অদক্ষতা, সীমিত কর আদায়ের ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা, কর ফাঁকি, এবং করনির্ধারণে সংশ্লিষ্টদের দুর্নীতির কারণে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে কর থেকে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ অনেক কম। এছাড়া কর-বহির্ভূত আয়ের উৎসও সীমিত। এসকল কারণে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোতে বাজেট ঘাটতি একটা সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। উদহারণ হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একটা চিত্র তুলে ধরা যায়। দেখা গেছে ২০২১-২২ অর্থবছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মোট রাজস্ব আয় ছিল ৮৭৯.৫৬ কোটি টাকা। যদিও এই রাজস্ব আয় তার আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ তারপরেও এই আয় কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় অপ্রতুল। ওই অর্থবছরে কর্পোরেশন ছয় হাজার কোটি টাকার উপর বাজেট প্রস্তাব পেশ করে। এক হিসেবে দেখা গেছে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব তার উন্নয়ন বাজেটের মাত্র ১৪ শতাংশ। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন গড়ে ২০২১ – ২২ অর্থবছর থেকে প্রতিবছর গড়ে

৪৫০০ কোটি টাকা সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে অনুদান প্রাপ্তির চেষ্টা করেছে (ঢাকা ট্রিবিউন, ৪ আগস্ট ২০২২) । এই অবস্থা কেবল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে দেখা যায়, তা নয়। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। মোটের উপর এটা পরিষ্কার যে সিটি কর্পোরেশনগুলোর বার্ষিক বাজেটের প্রধানতম অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর নির্ভরশীল (বিস্তারিত অর্থ বিষয়ক তথ্যের জন্য অধ্যায় আট দেখুন)।

পৌরসভার ক্ষেত্রে এই নির্ভরশীলতা আরও অনেক বেশি। পৌরসভার আয়ের উৎস আরও অনেক বেশি সংকুচিত। যদিও শ্রেণীভেদে পৌরসভার রাজস্ব আয়ের পরিমাণের তারতম্য আছে, রাজস্ব আয়ের পরিমাণ উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা একবারেই অপ্রতুল। পৌরসভার ক্ষেত্রে গত ১৫ বছরে আরও একটা বিশেষ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেখা গেছে, ১৯৯১ সালে দেশে পৌরসভার সংখ্যা ছিল ১০৪টি। যা পরবর্তী ২০ বছরে তিনগুনেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৮টিতে পরিণত হয়। ২০২৪ সালে এসে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩০। এই সময়ের মধ্যে পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পৌরসেবার গুনগত মান বৃদ্ধি বা পৌরসভার রাজস্ব আয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। বরং এর বিপরীত চিত্রই প্রকট। স্থানীয় সরকার বিভাগের এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ৩৩০টি পৌরসভার মধ্যে প্রায় ১০০টি পৌরসভার উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা একেবারেই নাই, এমনকি নিজস্ব কর্মচারিদের নিয়মিত বেতন-ভাতা দেয়ার আর্থিক সঙ্গতিও নাই।

অদক্ষ ও অপর্যাপ্ত মানবসম্পদ

বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোতে দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি কার্যকর নগর প্রশাসন ও জনসেবা প্রদানে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণা (২০২০) অনুযায়ী, অনেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাগত ভূমিকায় দক্ষ কর্মীর অভাবে জর্জরিত, যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের মতো জটিল নাগরিক সমস্যা সমাধানে তাদের সক্ষমতাকে ব্যাহত করছে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) তার প্রয়োজনীয় কর্মীবাহিনীর মাত্র ৬০% নিয়ে কাজ করছে, যার ফলে সেবা প্রদানে অদক্ষতা দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি প্রতিবেদন (২০১৯) অনুযায়ী, পৌরসভাগুলোতে ৩০% পদ শূন্য রয়েছে, যা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং যোগ্য প্রার্থীর অভাবের কারণে সৃষ্ট। এই ঘাটতি আরও তীব্র হয়েছে অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং দক্ষ কর্মীদের ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ায়। কারণ দক্ষ পেশাজীবীরা প্রায়ই উচ্চ বেতনের বেসরকারি চাকরির জন্য কর্পোরেশনের চাকরি ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন না। এছাড়া কর্পোরেশনের ভেতরে সরকার থেকে প্রেষণে আসা কর্মকর্তা এবং কর্পোরেশনের নিয়োগ করা কর্মকর্তাদের মধ্যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ নিয়ে মতপার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব কর্পোরেশনের মানবসম্পদকে আরও দুর্বল করে। কর্মচারিদের এই সমস্যা সমাধানে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জরুরি সংস্কার, সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ এবং নগর স্থানীয় সরকারে যোগ্য কর্মী আকর্ষণ ও ধরে রাখার জন্য প্রণোদনা প্রদান অত্যন্ত জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব ও রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায়, যা দক্ষতা ও জবাবদিহিতাকে ক্ষুণ্ন করে। এছাড়া, প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব এবং প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ত সুযোগের কারণে কর্মকর্তারা আধুনিক চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থ হন। বিস্তারিত সমাধানমূলক আলোচনার জন্য অধ্যায়-তেরো দেখা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ

কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ নগর স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসনকে সীমিত করে। বিশেষ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ, তহবিল নিয়ন্ত্রণ করাসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়, যা প্রক্রিয়াকে জটিল ও সময়সাপেক্ষ করে তোলে। এছাড়া, অতিরিক্ত রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে স্থানীয় সরকারের নেতৃত্ব নিজস্ব বিচার-বিবেচনার মত কাজ করতে পারে না।

নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপগুলোর মধ্যে একটি হলো এলজিডি-এর নির্বাচিত নেতাদের পদচ্যুত করার, নির্বাচিত সংস্থাগুলো স্থগিত করার এবং স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম তদন্ত করার ক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালে দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এলজিডি কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরদের স্থগিত করেছিল, যা স্থানীয় বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতাকে তুলে ধরে (দ্য ডেইলি স্টার, ২০২০)। এছাড়াও, এলজিডি স্থানীয় সরকারের বাজেট নিয়ন্ত্রণ করে, যা এর তদারকির নামে অনেক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো

প্রায়শই উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল, এবং তহবিল ব্যবহারের জন্য এলজিডি-এর অনুমোদন বাধ্যতামূলক, যা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে সীমিত করে একটি নির্ভরশীলতা তৈরি করে (বিশ্বব্যাংক, ২০২০)। এই প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থানীয় উদ্ভাবন ও জবাবদিহিতাকে ব্যাহত করার সম্ভাবনা তৈরি করে কারণ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় তদারকিতে তটস্থ থাকেন এবং স্থানীয় প্রয়োজনের চেয়ে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নে বেশি মনযোগী হন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি, ২০১৯)-এর একটি গবেষণা অনুযায়ী, এই ধরনের কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ নির্ভরশীলতার সংস্কৃতি তৈরি করে এবং স্থানীয় শাসনের কার্যকারিতা হ্রাস করে।

সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

বাংলাদেশের নগর শাসন ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হলো সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে দুর্বল সমন্বয়। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি), ওয়াসা (ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সিওয়ারেজ অথরিটি) এবং রাজউক (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)-এর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এই সংস্থাগুলো প্রায়শই একে অপরের সাথে সমন্বয় ছাড়াই কাজ করে, যার ফলে নগর পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়। যেমন, ২০২১ সালে ঢাকার গুলশান এলাকায় জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে ডিএনসিসি এবং ওয়াসার মধ্যে সমন্বয়হীনতা প্রকাশ পায়, যা সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে (প্রথম আলো, ২০২১)। একইভাবে, পুলিশ, বিআরটিএ (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ) এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব যানজট ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে নগরবাসীর সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক বিলম্ব ও অসুবিধা সৃষ্টি হয় (বিশ্বব্যাংক, ২০২০)।

এই সমন্বয়হীনতা বড় শহরের প্রেক্ষিতে বেশি হলেও ছোট শহর বা পৌরসভাগুলোতেও কিছু কম দেখা যায় না। উদহারণস্বরূপ ২০২১ সালে দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত একটি সংবাদের দিকে মনোযোগ দেয়া যেতে পারে। উক্ত সংবাদে দেখা যায় তড়িঘড়ি করে ফুটপাত নির্মাণ, অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের সমন্বয়হীনতার কারণে থমকে যায় রাজশাহীর চারঘাট পৌরসভার শত কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ। ২০২০ সালে সড়ক ও জনপথ বিভাগের আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নীতকরণে ৫৫৪ কোটি ৩০ লাখ টাকার প্রকল্পটি অনুমোদন পায়। কিন্তু সড়ক প্রশস্ত হবে জানার পরও সড়ক ও জনপথ বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় ছাড়াই অনেকটা তড়িঘড়ি করে অপরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করে চারঘাট পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং পৌরকর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়হীনতার দরুন চারঘাট মহাসড়ক প্রশস্তকরণ কাজ শুরু হওয়ায় সদ্য বসানো পানির পাইপলাইন তুলে ফেলা হয়। এর ফলে ভাঙা পড়ে ফুটপাত ও ড্রেন। এতে করে সেবাবঞ্চিত হয় পৌরবাসী এবং রাজস্ব হারায় পৌর কর্তৃপক্ষ[১০]।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব

বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উল্লেখযোগ্য ঘাটতি দীর্ঘদিন ধরে একটি আলোচিত সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের মৌলিক সেবা প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হলেও, প্রশাসনিক অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং তথ্যের স্বচ্ছতার অভাব এই সেবার মানকে প্রভাবিত করছে। বস্তুত নাগরিকদের কাছে তথ্য প্রকাশ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোর উপর জনগণের আস্থা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর ২০২১ সালের একটি জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৭০.৯% খানা বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেখানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ না করা, ঠিকাদার নিয়োগে স্বজনপ্রীতি এবং উন্নয়ন প্রকল্পে বিলম্বের অভিযোগ প্রায়ই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়মের কারণে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। এছাড়া, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আর্থিক অনিয়ম ও

[১০] দৈনিক যুগান্তর। ২৯ আগস্ট ২০২১। https://www.jugantor.com/index.php/tp-bangla-face/458937

জবাবদিহিতার ঘাটতির বিষয়টি উঠে এসেছে। প্রথম আলোর নাগরিক সংবাদের একটি নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়, সমন্বয়হীনতা এবং তথ্য প্রকাশে অনীহার কারণে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা হ্রাস পাচ্ছে।

নাগরিক অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা

বলা হয়ে থাকে স্থানীয় সরকার হল জনগণের দোরগোড়ার সরকার। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হল, মেয়াদান্তে নির্বাচনে ভোট দেয়া ছাড়া সাধারণ নাগরিকদের স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের কোন প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ বা চর্চা স্বাধীনতার এতবছর পরে এসেও তৈরি হয় নি। যেখানে গত পনের বছরে স্থানীয় এবং জাতীয় নির্বাচন পদ্ধতি প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, সেখানে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণের ন্যুনতম ব্যবস্থাও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণ মানুষ তাদের মতামতের প্রতিফলনের কিছুটা সুযোগ পেলেও পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এই সুযোগ একেবারেই নেই বললে চলে। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের অগ্রাধিকার বা প্রয়োজন কর্পোরেশন বা পৌরসভার নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছাতে ক্রমশ ব্যর্থ হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নগর কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের মতামত ও চাহিদা উপেক্ষা করে দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থে বিবিধ রকম উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ফলে নগর কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে যা প্রকারান্তরে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাকে এক ধরণের জনবিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। এছাড়া, নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত হওয়ায় সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা নেই বললেই চলে, যা স্থানীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও চর্চাকে দুর্বলতম স্থানে ঠেলে দিয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় দুর্নীতির প্রকোপ: একটি সংকটময় বাস্তবতা

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় দুর্নীতির প্রকোপ বাংলাদেশের নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধানতম সংকট। বলা হয় যে, ঘুষ ও দুর্নীতি ছাড়া কোনো সেবা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এই সমস্যা শুধু নাগরিকদের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেই বাধা সৃষ্টি করছে না, বরং স্থানীয় সরকারের প্রতি জনগণের আস্থাকেও ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন করছে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় দুর্নীতির বিভিন্ন রূপ দেখা যায়: (ক) সেবা প্রাপ্তিতে ঘুষ: নাগরিকদের ট্রেড লাইসেন্স, বিল্ডিং পারমিট, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, বাড়ি কর আদায় ইত্যাদি সেবা পেতে ঘুষ দিতে হয়; (খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি: উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেটের একটি বড় অংশ দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়। সিটি কর্পোরেশনের সকল প্রকার ক্রয় – যেমন মশক নিধনের রাসায়নিক, টেন্ডার ইত্যাদি দুর্নীতি ছাড়া সম্পন্ন হওয়া প্রায় অসম্ভব; (গ) কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অনিয়ম: অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘুষ না পেলে ফাইল আটকে রাখেন বা সেবা প্রদানে গড়িমসি করেন। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উপর একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিল্ডিং পারমিট পেতে নাগরিকদের গড়ে ১০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এছাড়া, বিভিন্ন প্রকল্পের বাজেটের ২০-৩০% দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে (টিআইবি, ২০২৪)।

পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে নাগরিকদের সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে অতি সম্প্রতি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত একটি জনমত জরীপে দেখা গেছে পৌরসভা-সিটি করপোরেশনে ৩২ শতাংশ সেবাগ্রহীতা দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন এবং ২৭ দশমিক ৭৫ ভাগ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রায় ১৩ শতাংশ হয়রানির শিকার হয়েছেন।

দুর্নীতির এই ব্যাপকতা ও প্রকোপের পেছনে বেশ কিছু কারণ দায়ী:

- **জবাবদিহিতার অভাব:** স্থানীয় সরকারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
- **রাজনৈতিক প্রভাব:** রাজনৈতিক নেতারা প্রায় ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন বা নিজেরাও জড়িত থাকেন এবং সেটি তাদের অবৈধ আয়ের একটি অন্যতম উৎস।
- **মিনি নেতৃত্বের দুর্বৃত্তায়ন:** নির্বাচন সুষ্ঠু না হওয়ায় নানা অপরাধী, সন্ত্রাসী এবং দুর্বৃতরা প্রহসনের নির্বাচনে জয় দেখিয়ে কাউন্সিলর ও মেয়র নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছে।

- **নিম্ন বেতন ও প্রণোদনার অভাব:** কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা কম হওয়ায় তারা ঘুষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করেন।
- **দুর্বল তদারকি:** দুর্নীতি প্রতিরোধে তদারকি ও মনিটরিং ব্যবস্থা অকার্যকর।

দুর্নীতির এই ব্যাপকতা নাগরিক জীবন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দেখা গেছে দুর্নীতির কারণে প্রকল্পের মান নিম্ন হয় এবং সেবার গুণগত মান কমে যায়, নাগরিকরা স্থানীয় সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে। অপরদিকে দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ হওয়ায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি হয়। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একটি রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পে বাজেটের ৩০% আত্মসাৎ হওয়ায় রাস্তার মান নিম্ন হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাজনৈতিক বিবেচনায় পৌরসভায় উন্নিতকরণ

সন্দেহ নাই, বাংলাদেশে নগরায়ন ঘটছে খুব দ্রুতগতিতে। ফলে নগর কেন্দ্রগুলোতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে নাগরিক পরিষেবার চাহিদা। কিন্তু এই বাড়তি চাহিদা মেটানোর সামর্থ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পৌরসভাগুলোর মধ্যে অনুপস্থিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাড়তি আর এক সমস্যা। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বাস্তব অবস্থা বিবেচনা না করে কেবল দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় জনতুষ্টির জন্য বেশ কিছু গ্রামীণ এলাকাকে পৌরসভাতে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু একটি পৌরসভা সচল থাকার জন্য যে অবকাঠামো, লোকবল প্রয়োজন তার বন্দোবস্ত করা হয়নি। সর্বোপরি পৌরসভাকে চালিয়ে নেয়ার জন্য যে পরিমাণ অর্থের সংকুলান দরকার তা কীভাবে আসবে সে ব্যাপারে কোনসদুত্তর পাওয়া যায় না। নিচে সিঙ্গাইর পৌরসভার উপর একটি কেসস্টাডি (কেসস্টাডি-১) উপস্থাপন করা হল যেখানে দেখা যায় পৌরসভা সৃষ্টির কোন বাস্তব প্রয়োজন এবং সম্ভাব্যতা বিবেচনা না করে একটা প্রাচীন ইউনিয়ন পরিষদকে ভেঙ্গে পৌরসভা সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু এই পৌরসভা পরিচালনার জন্য লোকবল এবং আর্থিক সম্পদের সঙ্কুলান করা হয়নি। অপরদিকে নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা দানের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি। কার্যত এই নতুন পৌরসভা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের একটা নতুন খাত সৃষ্টি করা ছাড়া সাধারণ নাগরিকদের আর কোন লাভ হয়নি।

একই সময়ে আরও একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, অনেক জায়গায় দেখা গেছে দেশের ভেতর অনেক নগরকেন্দ্র গড়ে উঠেছে প্রথমত অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কারণে। যেমন ধরা যাক সাভার উপজেলার আশুলিয়া ইউনিয়ন। জনসংখ্যা, অবকাঠামোগত অবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিস্থিতি এবং আর্থিক সক্ষমতার সাফল্য বিবেচনায় আশুলিয়া একটা সম্ভাবনাময় পৌরসভা হয়ে ওঠার সকল শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও এটি এখনো ইউনয়ন পরিষদ মর্যাদায় রয়েছে। সারাদেশ থেকে এইধরনের আরও অনেকগুলো নগরকেন্দ্রের কথা তুলে ধরা যাবে যেগুলো পৌরসভায় উন্নীত হতে পারে। উপরের আলোচিত দুই ধরণের পরিস্থিতি বিবেচনা করে এইটা স্পষ্ট যে বর্তমান পৌরসভাগুলোর সর্বশেষ অবস্থার একটা পর্যালোচনা করা দরকার এবং তার ভিত্তিতে পৌরসভার যৌক্তিকিকরণ করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

কেসস্টাডি ১: ইউনিয়ন পরিষদকে উদ্বাস্তু করে সিঙ্গাইরে পৌরসভা পত্তন

সিঙ্গাইর সদর ইউনিয়ন পরিষদটি শত বছরের পুরানো একটি প্রতিষ্ঠান। ২০০১ সনে এই ইউনিয়নের কিছু অংশ নিয়ে সিঙ্গাইর পৌরসভা গঠিত হয়। উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় মাত্র কয়েক মিটারের ব্যবধানে পায়ে হাঁটা দুরত্বে অবস্থিত। পৌরসভা গঠনের পর তারা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন বা কার্যালয় দখল করে নেয়। পরে ২০১০-২০১১ সালে দ্বিতল পৌরসভা ভবন নির্মিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের ১১ শতক জমি দখল করে পৌরসভার ভবনটি তৈরি হয়। ইউনিয়ন পরিষদ উচ্ছেদ হয়ে মাসিক দশ হাজার টাকা ভাড়ায় একটি ভাড়া করা বাড়িতে কার্যালয় পরিচালনা শুরু করে। পরিষদ কার্যালয়টিও পৌর এলাকায় করা হয়েছে।

সিঙ্গাইর পৌরসভা এবং সিঙ্গাইর ইউনিয়ন পরিষদের লোকসংখ্যা প্রায় সমান। কিন্তু সদর ইউনিয়নের বড় বাজার এবং উপজেলা পরিষদ সন্নিহিত এলাকা পৌরসভার অধিভুক্ত। ইউনিয়নের মাঝখানে পৌরসভা হওয়ায় ইউনিয়নের ওয়ার্ডগুলো পৌরসভার দুই পাশে বিভক্ত গেছে। ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের বড় উৎস ছিল স্থানীয় বাজারটি যা এখন তাদের হাতছাড়া, তাদের ১১শতক জমি ও কার্যালয় ভবন। ইউনিয়ন পরিষদটি এখন দীনহীন একটি এতিমের মত কোনমতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

পৌরসভায় মেয়র-কাউন্সিলর কেউ নেই। সিঙ্গাইর এর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। পৌরসভার মোট খানা সংখ্যা ৭৭৪৭। তার মধ্যে ২৭৩৫ খানায় পানির সংযোগ আছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে চারটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। পানি সরবরাহের রাজস্ব থেকে পৌরসভা গত অর্থবছরে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাক আয় করেছে। গৃহকর বাবত ৭০ লক্ষ টাকা দাবীর বিপরীতে ৬০/৬১ লক্ষ টাকা আদায় করেছে। গত অর্থ বছরে তাদের মোট ব্যয় ৩কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মত। সুয়ারেজ ব্যবস্থা নেই। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। পৌরসভার অনুমোদিত সংগঠন কাঠামোয় ৯৬টি পদ রয়েছে বলে জানানো হয়। তবে বর্তমানে কর্মরত আছে ১৩ জন নিয়মিত ও ২২ জন অনিয়মিত কর্মচারি।

অপরদিকে ইউনিয়ন পরিষদের করুণ দশা। পরিষদ সচল আছে। চেয়ারম্যান, সকল সদস্য, একমাত্র ‘প্রশাসনিক কর্মকর্তা’ এবং গ্রাম পুলিশের ৭ জন কর্মরত। ভূমি হস্তান্তর রাজস্বের ১% পাওয়ায় কর্মচারিদের বেতন হলেও চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীর কোন ব্যবস্থা হয়নি।

সিঙ্গাইর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতা এবং প্রশাসনিক অবহেলা ও উদাসীনতা এবং সরকারের স্থানীয় সরকার গঠনে অস্বচ্ছ ও দায়িত্বহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি ক্লাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

পৌর নেতৃত্বের নাগরিক প্রয়োজন/সেবার প্রতি অবহেলা

দীর্ঘদিন ধরে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোতে গণতান্ত্রিক চর্চা ও জবাবদিহিতার সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে গত দেড় দশকে এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে, যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা ও নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার অভাবের কারণে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো নাগরিকদের সেবা ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি অবহেলা বা গুরুত্ব না দেওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করছে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাস্তা মেরামত এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার মতো মৌলিক সেবাগুলো নাগরিকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রদান করা হচ্ছে না। ২০২২ সালে প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা স্থানীয় সরকারের দায়িত্বহীনতারই প্রতিফলন[১১]।

[১১] প্রথম আলো। ২০২২। "ঢাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: সমস্যা ও সমাধানের পথ।" https://www.prothomalo.com থেকে সংগৃহীত।

কেসস্টাডি ২: সিটি কর্পোরেশনের সেবা জন দাবীর প্রতি চরম অবজ্ঞা

৮ মার্চ ২০২৪ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত মোহাম্মদপুরের বাবর রোডের বিহারী ক্যাম্প সংলগ্ন এলকার ১৫/২০টি বাড়ির বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে ভোগান্তির শিকার হয়ে তাদের এলাকার প্রধানত চারটি সমস্যার বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কাছে সমাধানের জন্য আবেদন করেন। সমস্যগুলো হলঃ (১) উল্লিখিত এলাকায় বেআইনিভাবে রাস্তা, পার্শ্বনালা দখল করে দোকানপাট ও নানা স্থাপনা নির্মাণ করে অধিবাসীদের চলাচল ও বসবাসকে বাধাগ্রস্থ করা; (২) বিহারী ক্যাম্প সংলগ্ন ফুটপাত দখল করে দোকানপাট ও বাজার বসানো হয়। উক্ত রাস্তা ও ফুটপাতের উপর উন্মুক্ত ভাবে গরু, মুরগী ইত্যাদি পশু জবাই করা হয় এবং তাদের উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে সন্নিহিত ১০টি বাড়ির অধিবাসীদের চলাচলের পথ বন্ধ করা এবং আবর্জনা রেখে বাড়িতে প্রবেশের পথ আটকে রাখা; (৩) উচ্চশব্দে মাইকের ব্যবহার এবং সড়ক বন্ধ করে রান্না ও খাওয়া-দাওয়া করে স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্থ করা; এবং (৪) বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ও স্থাপনার মাধ্যমে অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি বৃদ্ধি করা।

উক্ত বাসিন্দারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিবরণ ও ফটোগ্রাফ সহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত আবেদন জমা দেন। ১৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে উক্ত আবেদন কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পাঁচমাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও উক্ত বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। এর মাঝে আবেদনকারীরা বাংলাদেশের সংস্কৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশনের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফলাফল অপরিবর্তিত থাকে।

অতঃপর আবেদনকারীরা একই আবেদন পুনরায়, দেশে রাজনৈতিক পট পরিবরতিনের পর ২৩ সেপ্টেম্বর আরেকদফায় সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করে। ইতিমধ্যে আরও তিনমাস অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। বা বাসিন্দাদের এ বিষয়ে কোন তথ্য জানানো হয় না।

আবেদনকারীরা বিষয়টি ডিসেম্বরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের নজরে আনেন। অতঃপর কমিশনের পক্ষ থেকে বিষয়টিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করে উক্ত আবেদন পুনরায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কাছে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে এবিষয়ে কোন উদ্যোগ বা এ আবেদনের বিষয়ে কোন তথ্য কমিশনে জানানো হয় নি। অতঃপর ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান একই বিষয়ে কি করা হল সেবিষয়ে জানতে চেয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। সর্বশেষে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে এসে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ তাদের অবস্থান সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা সম্বলিত চিঠি কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে উক্ত স্থানে বাসিন্দাদের অসুবিধা দূর করার ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি।

এছাড়াও, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্বহীনতা এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির অভিযোগও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। ২০২১ সালে দৈনিক সমকালের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের একটি বড় প্রকল্পে তহবিল তছরুপের অভিযোগ ওঠে, যা স্থানীয় সরকারের জবাবদিহির অভাবকে স্পষ্ট করে[১২]।

কেসস্টাডি - ২ থেকে স্পষ্ট যে (১) প্রধানত সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে নাগরিকদের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আগ্রহের উল্লেখযোগ্য ঘাটতি আছে; (২) সিটি কর্পোরেশন থেকে পাঠানো ব্যাখ্যা অনুসরণ করে দেখা যায় যে উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কর্পোরেশনের ভেতরেই মোট চারটি বিভাগের কর্তাদের মতামত দিয়েছেন এবং মতামত দিতে তারা প্রায় ৬০ দিন সময় নিয়েছেন। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা কাজ করে যা থেকে আবারো প্রমাণ হয় যে নাগরিকদের সমস্যায় সাড়া দেয়ার ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক এবং আচরণগত সমস্যা আছে; (৩) উক্ত সিদ্ধান্তের ফাইল পর্যালোচনা করে আরও দেখা যায় যে সিটি কর্পোরেশনের সাথে নাগরিক পরিষেবা প্রদানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

[১২] দৈনিক সমকাল। ২০২১

কোন সন্দেহ নাই এ ধরনের ঘটনাগুলো এবং কর্পোরেশনের আচরণ নাগরিকদের মধ্যে স্থানীয় সরকারের প্রতি আস্থা হ্রাস করেছে এবং সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলেছে।

নগর স্থানীয় সরকারের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ দুর্নীতি, প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, আর্থিক সংকট, মানবসম্পদের ঘাটতি, কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ, সমন্বয়হীনতা, স্বচ্ছতার অভাব, নাগরিক অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা এবং নির্বাচনী জটিলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই সমস্যাগুলোর একটা প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনগত দিক আছে। কিন্তু একই সাথে দীর্ঘদিনের অনিয়ম এবং জবাবদিহি না থাকার দরুন এবং সিটি কর্পোরেশনের সকলস্তরের কর্মী নেতৃত্বের মধ্যে এক ধরণের আচরণগত পরিবর্তন হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একধরণের সাংগঠনিক উদাসীনতার সংস্কৃতির জন্ম নিয়েছে যা এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নাগরিকদের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালনে উৎসাহিত করে না। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, আর্থিক স্বচ্ছতা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নাগরিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংস্কারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের কার্যকারিতা ও সেবার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। এই সুপারিশগুলো আরও বিস্তৃতভাবে নিচে বিবৃত করা হল:

৭.৭ পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের জন্য সুপারিশমালা

বর্তমান সময়ের প্রয়োজন মিটিয়ে ভবিষ্যতের জনচাহিদা এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম এমন নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কেমন হতে পারে তার রুপরেখা নির্ধারণ করা সহজ নয়।

বাংলাদেশের নগরগুলোতে কেমন শাসন ব্যবস্থা হতে পারে তার ধারনা পাওয়ার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কেমন নগর শাসন কাঠামো আছে তার একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যায়।

লন্ডনের শহর শাসনের গল্প শুরু হয় উনিশ শতকে, যখন ১৮৮৯ সালে লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল গড়ে ওঠে। পরে ১৯৬৫ সালে এটি গ্রেটার লন্ডন কাউন্সিলে রূপ নেয়, কিন্তু ১৯৮৬ সালে তা ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর ২০০০ সালে গ্রেটার লন্ডন অথরিটি (জিএলএ) জন্ম নেয়। এখানে একজন নির্বাচিত মেয়র শহরের বড় বড় নীতি ঠিক করেন, আর ২৫ জন সদস্যের লন্ডন অ্যাসেম্বলি তাঁর কাজের খুঁটিনাটি দেখে। নিচে ৩২টি বরো আর সিটি অফ লন্ডন কর্পোরেশন স্থানীয় কাজকর্ম চালায়। পরিবহনের জন্য ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন, পুলিশ আর দমকল—এসব মেয়রের অধীনে একসঙ্গে কাজ করে। টাকা আসে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান, কাউন্সিল ট্যাক্স, ব্যবসার কর আর পরিবহনের ভাড়া থেকে। যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় নীতি নিয়ন্ত্রণ করলেও, লন্ডনের মেয়র পরিবহন আর উন্নয়নে অনেকটা স্বাধীন।

দিল্লির স্থানীয় শাসনের শুরু হয় ব্রিটিশ আমলের পৌরসভা সৃষ্টি করার মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর ১৯৯২ সালের ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীতে শহরের স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হয়। ১৯৯৩ সালে দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল সরকার (ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি- এনসিটি) গঠিত হয়। এখানে একজন মুখ্যমন্ত্রী আর বিধানসভা শহর চালায়, আর দিল্লি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন (এমসিডি)—২০১২ থেকে তিন ভাগে বিভক্ত—স্থানীয় কাজ দেখে। তবে কেন্দ্রের নিযুক্ত লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে অনেক ক্ষমতা। দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি পরিকল্পনা করে, পুলিশ কেন্দ্রের অধীনে, আর পরিবহন আলাদা—একটু গোলমেলে অবস্থা। টাকা আসে সম্পত্তি কর, ব্যবহারের ফি আর কেন্দ্রের অনুদান থেকে। কেন্দ্রীয় সরকার পুলিশ আর জমির মতো বড় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে, তাই এনসিটি সরকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে টানাপোড়েন হয়।

কলকাতার স্থানীয় সরকার কাঠামো অনেক পুরনো। ১৮৭৬ সালে কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন (কেএমসি) দিয়ে। ১৯৭০ সালে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ) এলো বৃহত্তর এলাকা দেখতে। কেএমসিতে একজন নির্বাচিত মেয়র আর মেয়র-কাউন্সিল শহর চালায়, আর কেএমডিএ রাজ্যের অধীনে ৩৯টি পৌরসভা আর গ্রামীণ এলাকা নিয়ে কাজ করে। কেএমসি পানি, স্যানিটেশন আর রাস্তা দেখে, আর কেএমডিএ মেট্রো রেল বা জল সরবরাহের পরিকল্পনা করে। তবে সমন্বয়ের অভাবে কিছু জটিলতা থাকে। কেএমসি সম্পত্তি কর আর ফি তুলে, আর কেএমডিএ রাজ্যের টাকায় চলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারই এখানে বড় ভূমিকা রাখে, কেন্দ্র শুধু বড় প্রকল্পে টাকা দেয়।

উপরের পর্যালোচনা থেকে লন্ডনের মতো একটি শক্তিশালী নগর সরকার কাঠামো ঢাকা-চট্টগ্রামের মত শহরে গড়ে তোলা খুব কঠিন নয়। এই নগর সরকার ব্যবস্থা নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং নগরের আইন-শৃঙ্খলা এক ছাতার তলায়

আনতে পারে। দিল্লি আর কলকাতার মতো স্থানীয় কর্পোরেশন যেভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করেছে এবং একই সাথে স্থানীয় রাজনীতিকে একটা গণতান্ত্রিক কাঠামোয় রাখতে সাহায্য করেছে।

সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো একদিনে এক বছরে বা এক নির্বাচনী মেয়াদে সৃষ্টি হয় নি। একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই নীতি নির্ধারক রাজনীতিবিদের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠনগুলোকে সক্রিয় গণতান্ত্রিক, নাগরিকবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় নি। তবে সারা দেশের সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে গত পনের বছরে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত না হওয়ায়। নিয়মিত সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ায় নাগরিকদের কাছে ন্যুনতম জবাবদিহি'র দায়বদ্ধ থাকার তাগিদ মেয়র এবং কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে অপসারিত হয়েছিল বলা যায়। আর এর ফল হিসেবে সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে সঠিকভাবে দায়িত্বপালনে অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল।

বিধায়, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোকে সক্রিয় এবং নাগরিক-বান্ধব করার প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। তবে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধ নেতৃত্ব থাকলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তেমন বলা কঠিন। নির্বাচিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে প্রয়োজন রয়েছে সুনির্দিষ্ট কাঠামোগত, আইনগত এবং আচরণগত সংস্কারসাধন। সংস্কার প্রস্তাবগুলো সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার জন্য আলাদা করে উপস্থাপন করা হল।

৭.৭.১ সিটি কর্পোরেশন

৭.৭.১ পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের জন্য স্বল্প এবং মধ্য মেয়াদী সংস্কার দক্ষ, দায়বদ্ধ এবং নাগরিক-বান্ধব পরিষেবা

আধুনিক নগরের জন্য দরকার আধুনিক নগর পরিচালনা ব্যবস্থা। আধুনিক নগর পরিচালনা একটি জটিল কর্মোদ্যোগ। বর্তমান সময়ে এসে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে নগর পরিচালনায় সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রধানতম ভূমিকা পালন করলেও একামাত্র প্রতিষ্ঠান নয়। নগরের অনেক বিষয়, বিশেষ করে নাগরিক পরিষেবা প্রদানের বিষয়গুলো, অনেক বেসরকারি লাভজনক এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি এবং সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে। যেমন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। বর্তমান আইন অনুযায়ী শহরগুলোতে নাগরিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রধান দায়িত্ব পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের হলেও বাস্তবে দেখা যায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল ধরণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারি হাসপাতালের (জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) সাথে সাথে অনেক বেসরকরারি লাভজনক ক্লিনিক, হাসপাতাল কাজ করে এবং একই সময়ে অনেক বেসরকারি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান (যেমন: দুস্থ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্র্যাক) নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ কোন একটি নাগরিক পরিষেবা প্রদান এখন কেবল মাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে না। এমন বাস্তবতায় নগর পরিচালনায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যকর অন্তর্ভুক্তি এখন সময়ের দাবি। অপরদিকে নগরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি নগর পরিচালনায় অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এই জটিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক মাত্রাসমূহ এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতমুখী নগর পরিচালনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রধানতম ধাপ হল প্রয়োজনীয় আইনগত, কাঠামোগত এবং আচরণগত সংস্কার সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনগুলোকে একবিংশ শতকের উপযোগী করে নগর সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তর করা।

বর্তমানে প্রচলিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের কাঠামোগত পরিবর্তন করে নগর সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তর করা সময় সাপেক্ষ। এই রূপান্তরের জন্য কেবল পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন কাঠামোতে পরিবর্তন হলেই চলবে না বরং একই সাথে অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠানের আইনগত এবং কাঠামোগত সংস্কারও দরকার। এবং একই সাথে মনে রাখা দরকার যে এই রূপান্তরের একটি রাজনৈতিক-অর্থনীতি আছে যা রূপান্তর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। সেই বিবেচনায়, আমাদের সংস্কার প্রস্তাবের দুটো দিক আছেঃ স্বল্প এবং মধ্য মেয়াদের সংস্কার এবং দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার।

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা আর বাংলাদেশের নিজস্ব রাজনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনা করে বাংলাদেশের বড় শহরগুলোর জন্য পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে নিম্নলিখিত সংস্কার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

কাঠামোগত সংস্কার প্রস্তাব

(১) পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের গণতন্ত্রায়ন: পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে গনতন্ত্রায়ন করতে বর্তমান কাঠামোতে বড় রকম পরিবর্তন আনতে হবে। কাঠামোগত এই পরিবর্তনের জন্য সিটি কর্পোরেশনকে একটি "রাষ্ট্রপতি মডেল" থেকে "সংসদীয় মডেল" এ রূপান্তর করতে হবে। এই রূপান্তরের বিস্তারিত রূপরেখা এই প্রতিবেদনের অধ্যায় ৪ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। (ছক ৪ ও ৫ দেখুন)।

(২) ওয়ার্ড পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ: পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের আইন পরিবর্তন করে ওয়ার্ডকে নাগরিক সেবা প্রদানের প্রধান আউটলেটে রূপান্তর করতে হবে। প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা যেমন জন্ম, মৃত্যু নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে সরবরাহ করতে হবে।

(৩) ওয়ার্ডের আকার ও জনসংখ্যার যৌক্তিকিকরণ: কর্পোরেশন এবং পৌরসভার ওয়ার্ডসমূহের মধ্যে আকারের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। নগরগুলোতে যেহেতু প্রায় নিয়মিত আভ্যন্তরীণ অভিবাসন চলমান থাকে, ফলে ওয়ার্ডের জনসংখ্যাও নির্ধারিত সংখ্যার মধ্যে সীমিত থাকে না। এই ওয়ার্ডের আকার জনসংখ্যা এবং ভৌগলিক নৈকট্যের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সীমানার আকারের যৌক্তিকিকরণ করতে হবে। ওয়ার্ডের যৌক্তিকিকরণের কাজটি নির্বাচন কমিশনের তদারকিতে সম্পন্ন হতে পারে।

(৪) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজভিত্তিক সংগঠন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে তৃণমূল সংগঠন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিক অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা জরুরি। এছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনগণের অধিকার রক্ষা ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। এ জন্য সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে তৃণমূল পর্যায়ের সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, কমিউনিটিভিত্তিক এবং এনজিওসমূহের সংগঠনের প্রতিনিধিদের অভিগম্যতা নিশিচত করতে হবে একই সাথে সাথে মতবিনিময়, তথ্যের আদান-প্রদান, পরামর্শ গ্রহণসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কমিটিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) স্থানীয় সরকারের নারী সদস্যগণের ক্ষমতায়ন: সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটিগুলোর এক-তৃতীয়াংশ কমিটির সভাপতির পদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের জন্য স্থানীয় সরকার পরিচালন ব্যবস্থা বিষয়ক 'আইন, বিধিবিধান ও নীতিমালা' বাস্তবায়ন বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি আয়োজন করা উচিত। নারী প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব বিকাশ, যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্প ও বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সকল প্রশিক্ষণে পুরুষ সহকর্মীদেরও সহাবস্থান বিবেচনায় নিতে হবে। নারীদের আয়বর্ধকমূলক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্যোগী করে তুলতে হবে।

নাগরিক পরিষেবার মান উন্নতকরণের জন্য সংস্কার প্রস্তাব

(৬) সমন্বিত নগর পরিকল্প গ্রহণ: অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে যানজট, জলবদ্ধতা, বন্যা ও পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একারণে একটি বিজ্ঞানসম্মত মাস্টার প্ল্যান নগরের টেকসই উন্নয়ন অপরিহার্য।

(ক) সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন: প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনকে একটি বৈজ্ঞানিক ও টেকসই মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে হবে, যা ভূমি ব্যবহার, পরিবহন, আবাসন এবং পরিবেশগত ভারসাম্যকে প্রাধান্য দেবে।

(খ) রাজউক ও সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয়: রাজউকের সাথে সমন্বয় করে অবৈধ স্থাপনা রোধ এবং নগর সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(গ) জোনিং নীতিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগ: আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার জন্য সুস্পষ্ট জোনিং নির্ধারণ করতে হবে।

(৭) দুনীতি নিয়ন্ত্রণ: পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে উভয় ক্ষেত্রেই দুর্নীতি নাগরিক সেবাকে ব্যাহত করছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করলে সেবার মান উন্নত হবে। এর জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো জুরুরীভাবে গ্রহণ করতে হবে।

- **ডিজিটাল স্বচ্ছতা:** সকল সেবা ও ঠিকাদারি প্রক্রিয়া অনলাইনে প্রকাশ করতে হবে এবং ই-টেন্ডারিং বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- **দুর্নীতি দমন ইউনিট গঠন:** সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন ও জবাবদিহিতা ইউনিট গঠন করতে হবে।
- **নাগরিক অভিযোগ ব্যবস্থা:** মোবাইল অ্যাপ বা হটলাইনের মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) স্বচ্ছতা বৃদ্ধি: স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করলে নাগরিকদের আস্থা বাড়বে এবং দুর্নীতি কমবে।

- **বার্ষিক বাজেট ও হিসাব নিকাশ প্রকাশ:** সকল আয়-ব্যয়ের বিবরণী অনলাইনে প্রকাশ করতে হবে।
- **নাগরিক অডিট ব্যবস্থা:** স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকদের নিয়ে বাজেট ও প্রকল্প পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।
- **রিয়েল-টাইম মনিটরিং:** ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি নাগরিকদের দেখার সুযোগ দিতে হবে।

(৯) নাগরিক অংশগ্রহণ: নাগরিক অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এটি নীতিনির্ধারণকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করবে। এর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ

- **ওয়ার্ড কমিটি শক্তিশালীকরণ:** প্রতিটি ওয়ার্ডে নাগরিক ফোরাম গঠন করে স্থানীয় সিদ্ধান্তে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- **পাবলিক হিয়ারিং সেশন:** মাসিক পাবলিক হিয়ারিংয়ের মাধ্যমে নাগরিকদের মতামত নিতে হবে।
- **ইউথ কাউন্সিল গঠন:** তরুণদের নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় যুক্ত করতে যুব উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে।

(১০) স্বতন্ত্র নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ গঠন: ঢাকা নগরের জন্য একটি সমন্বিত নগর পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং এটা পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ঢাকা নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে। বাস, রেল ও নন-মোটরাইজড ট্রান্সপোর্টের সমন্বয় করতে এটি একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিচালিত হবে। এই কর্তৃপক্ষের নন-মোটরাইজড ট্রান্সপোর্ট যেমন সাইকেল লেন ও হাঁটার পথ বৃদ্ধি করতে হবে।

(১১) নগর বিনোদন ব্যবস্থা, নগর পার্ক এবং উন্মুক্ত স্থান জলাশয় ব্যবস্থাপনা: নাগরিকদের মানসিক স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিকাশের সম্ভাবনা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে:

- **প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে একটি পার্ক:** নগরীর ২৫% এলাকায় সবুজ ও উন্মুক্ত স্থান নিশ্চিত করতে হবে।
- **জলাশয় সংরক্ষণ:** দখলকৃত পুকুর, খাল ও নদী উদ্ধার করে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা যায়।

(১২) গ্রিন-ব্লু নেটওয়ার্ক: সবুজ করিডোর ও জলাধার সংযুক্ত করে একটি ইকোলজিক্যাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।

- **কমিউনিটি ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ:** স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে গ্রিন-ব্লু স্পেস ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- **নাগরিক স্বেচ্ছাসেবক প্রোগ্রাম:** বৃক্ষরোপণ ও জলাশয় সংরক্ষণে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

- **স্কুল ও কলেজের অংশগ্রহণ:** শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(১৩) অনালইন সেবা শক্তিশালীকরণ: অনলাইন সেবা দুর্নীতি কমাবে, সময় বাঁচাবে এবং সেবার গতি বৃদ্ধি করবে। একারণে সব সব সেবা ডিজিটালাইজেশন করতে হবে। এটি নগরবাসীর জীবনযাত্রাকে সহজ করবে।

- **অনলাইন সেবা:** জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ট্যাক্স পেমেন্ট, ট্রেড লাইসেন্স, বিল্ডিং পারমিট ইত্যাদি সেবাগুলো সম্পূর্ণ অনলাইনে চালু করতে হবে।
- **ইউনিফাইড সিটি পোর্টাল:** একটি কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইট/মোবাইল অ্যাপ তৈরি করতে হবে যেখানে সব সিটি কর্পোরেশনের সেবা পাওয়া যাবে।
- **ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধি:** স্থানীয় পর্যায়ে ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৪) অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা: সিটি কর্পোরেশনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে এবং নাগরিক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- **২৪/৭ হটলাইন ও মোবাইল অ্যাপ:** নাগরিকরা যেকোনো সময় অভিযোগ করতে পারবে এবং ট্র্যাক করতে পারবে।
- **স্বয়ংক্রিয় টিকেট সিস্টেম:** প্রতিটি অভিযোগের জন্য একটি ইউনিক ট্র্যাকিং নম্বর দিতে হবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট পাঠাতে হবে।
- **জরুরি রেসপন্স টিম:** ড্রেনেজ সমস্যা, রাস্তা মেরামত, বিদ্যুৎ/পানি সংযোগ ইত্যাদির জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া টিম গঠন করতে হবে।
- **পাবলিক রেটিং সিস্টেম:** নাগরিকরা সেবার মান রেটিং দিতে পারবে, যা কর্মকর্তাদের মূল্যায়নে ব্যবহার করা হবে।

(১৫) শিশু এবং নারীদের অংশগ্রহণঃ নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই নগর উন্নয়ন সম্ভব নয়। এটি লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করবে এবং নগরকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করবে। এ লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের তরফে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছেঃ

- নারীদের জন্য কোটা: সিটি কর্পোরেশন কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের ৩০% কোটা নিশ্চিত করতে হবে।
- **নিরাপদ কর্মক্ষেত্র:** সিটি কর্পোরেশনের অফিস ও প্রজেক্ট সাইটে নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
- **মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়তা:** নারীদের ব্যবসা ও স্বনির্ভরতা প্রকল্পে বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে।
- **শিশু ও নারী নিরাপত্তা ইউনিট:** পাবলিক প্লেস, পার্ক ও গণপরিবহনে নারী ও শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ইউনিট গঠন করতে হবে।

(১৬) ফুটপাত দখল মুক্ত করন এবং পথচারীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত এবং নিরপাদ করুন: দুঃখজনক হল ঢাকাসহ সারা দেশের শহরগুলোর ফুটপাত অবৈধভাবে হকারদের দখলে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সাথে চাঁদা-ভিত্তিক নেটওয়ার্কের কারণে বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও এই ফুটপাতগুলো নগরবাসীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করা যাচ্ছে না। এই সমস্যাগুলো সমাধানে স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ততা এবং তদারকির মাধ্যমে একটি টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ৫টি নাগরিক তদারকি কমিটি গঠন করার সুপারিশ করা যাচ্ছে। এই কমিটিগুলো ফুটপাতের ব্যবহার, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, নগর বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে কাজ করবে সিটি কাউন্সিলের সাথে কাজ করবে। কমিটির সদস্যদের স্থানীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হবে এবং তাদের তালিকা সিটি কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হবে। এতে স্থানীয় কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে।

কমিটিগুলোকে আধা-নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করা হবে। তারা ফুটপাত দখল, আবর্জনা ফেলা, বন্যপ্রাণীর ক্ষতি এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করতে পারবে এবং সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করবে। কমিটির কার্যক্রম স্বচ্ছ করতে প্রতি তিন মাসে তাদের প্রতিবেদন সিটি কর্পোরেশনের কাছে জমা দিতে হবে এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। কমিটির সদস্যদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য এবং নগর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া, তারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালাবে।

(১৭) নগর বন্য প্রাণী এবং জীব-বৈচিত্র্য সুরক্ষার জন্য আলাদা বিভাগ গঠন: ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় শহরগুলোতে কবুতর, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, কুকুর, বেজি, শিয়াল, খরগোশ, বানরসহ নানা ধরনের নগর বন্যপ্রাণী এবং পরিত্যক্ত কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য প্রাণীর বসবাস ও নিরাপত্তা গুরুতর হুমকির সম্মুখীন। নগরায়ণ, পরিবেশ দূষণ এবং অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে এই প্রাণীদের আবাসস্থল সংকুচিত হচ্ছে এবং তাদের জীবনযাত্রা বিপন্ন হচ্ছে। অথচ নগর বন্যপ্রাণী ও পোষা প্রাণীর সুরক্ষা শহরের পরিবেশগত ভারসাম্য, প্রাণ বৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, পাখি ও কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণকারী প্রাণী শহরের সবুজ পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়তা করে। পরিত্যক্ত কুকুর-বিড়ালের প্রতি অবহেলা শহরের মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থি। অরক্ষিত প্রাণী রোগ ছড়াতে পারে এবং কখনো কখনো আক্রমণাত্মক আচরণ করতে পারে।

এই সমস্যা সমাধানে সিটি কর্পোরেশনের অধীনে একটি নির্দিষ্ট বিভাগ গঠন করা অত্যন্ত জরুরি। এই বিভাগ নগর বন্যপ্রাণী ও পরিত্যক্ত প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং তাদের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে এবং এর মাধ্যমে শহরের জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং নাগরিক জীবনের মান উন্নত করবে।

৬.৭.২ দীর্ঘ মেয়াদে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের পুনর্গঠন পরিকল্পনা: নগর স্থানীয় সরকার থেকে নগর সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশে যে গতিতে নগরায়ন ঘটছে তাতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান দ্রুত কমে আসছে। দেখা গেছে অনেক ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়কবাতি, যোগাযোগ, বন্দর ইত্যাদির মত সেবা প্রদান করছে এবং এসব ইউনিয়ন পরিষদ অনেক 'গ' শ্রেণির পৌরসভার তুলনায় বেশি রাজস্ব আদায় করে থাকে। তাই দীর্ঘমেয়াদে গ্রাম ও শহরভিত্তিক আলাদা ধরণের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন থাকবে কি না তা ভাবতে হবে।

বর্তমানে এমন কিছু সিটি কর্পোরেশন রয়েছে যাদের আর্থিক ভিত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। যেমন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের তুলনায় বগুড়া পৌরসভার রাজস্ব আয় বেশি, এমন কি তার বাজেটের আকারও তুলনামূলকভাবে বড়। অথচ সমগ্র উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হলেও বগুড়াকে সিটি কর্পোরেশন হিসেবে উন্নীত করা হয়নি। বস্তুত বগুড়া পৌরসভাকে এখনই সিটি কর্পোরেশন হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। অপরদিকে, কুমিল্লা একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা হলেও সেখানকার সিটি কর্পোরেশন হতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। তাই সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে যে সমস্ত পৌরসভাগুলো ভালো আয় করছে এবং যাদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বেশি, তাদেরকে মহানগর হিসেবে ঘোষণা করে সেখানে দীর্ঘমেয়াদে নগর সরকার গড়ে তোলা যেতে পারে। এ ছাড়া, দীর্ঘমেয়াদে জেলা পর্যায়ের পৌরসভাগুলোকেও ক্রমান্বয়ে নগর সরকারের কাঠামোতে রূপান্তরিত করতে হবে।

বর্তমানে অনেক পৌরসভা রয়েছে যাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে সময়মত ভাতা প্রদান করতে পারে না। অনেকের নিজস্ব কর্মকর্তা কর্মচারিদের বেতন ভাতা দীর্ঘসময় ধরে বকেয়া রয়েছে। সরকারি সূত্রমতে, বর্তমানে সারা দেশে ১০২৬ জন অবসরপ্রাপ্ত পৌর কর্মচারীর অবসরকালীন ভাতা বাবদ ৩৮৫ কোটি টাকা এবং ১১৬৭৫ জন কর্মরত পৌর কর্মচারীর বেতন বাবদ প্রায় ৮৭৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় ঘোষণা করা এই পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা মূল্যায়ন করে কিভাবে এগুলোকে কার্যকর রাখা যায় বা আদৌ রাখার দরকার আছে কিনা সে বিষয়ে একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পাশাপাশি পৌরসভার বিষয়ে মধ্যমেয়াদে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে:

প্রথমত, আগামী পাঁচ বছরে কোন নতুন পৌরসভা ঘোষণা করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, যে পৌরসভাগুলো রয়েছে, তাদের নতুন করে শ্রেণিকরণ করতে হবে। এই শ্রেণিকরণের ভিত্তি হবে রাজস্ব আহরণ, ব্যয় ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পরিমাণ, কর্মীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের পরিস্থিতি, জনসংখ্যা, পৌরসভার ভৌগোলিক এলাকার জনসংখ্যা, পৌরসভার ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, যোগাযোগ অবকাঠামো, উন্নয়ন পরিস্থিতি ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, যথাযথভাবে শ্রেণীকরণের পর দুর্বল ও ভঙ্গুর পৌরসভাগুলোর বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, সেগুলোকে পৌরসভা রাখা হবে নাকি আবার ইউনিয়ন পরিষদে রূপান্তরিত করা হবে, তাদের কর্মীদের বেতন ভাতা কীভাবে পরিশোধ করা হবে, নতুন কার্যালয় কোথায় হবে এবং তাদের আর্থিক দায় কে বহন করবে।

বাংলাদেশে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট মহানগর সরকার (City Government) প্রতিষ্ঠা

দ্বি-স্তর নগর সরকারের আন্তর্জাতিক উদাহরণ

লন্ডন, যুক্তরাজ্য

গ্রেটার লন্ডন কর্তৃপক্ষ (GLA) হল বৃহত্তর লন্ডনের জন্য প্রধান স্থানীয় সরকার, যা শহরব্যাপী নীতি ও কৌশল নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং নগরবাসীদের জন্য সকল ধরণের প্রয়োজনীয় পরিষেবার সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এটি সরাসরি স্থানীয় পরিষেবা প্রদান করে না। লন্ডনের ৩২টি বরো কাউন্সিল এবং সিটি অফ লন্ডন কর্পোরেশন তাদের বাসিন্দাদের দৈনন্দিন পরিষেবা প্রদান করে, যেমন শিক্ষা, আবাসন এবং সামাজিক পরিষেবা। GLA পরিবহন এবং আবাসনসহ শহর-ব্যাপী নীতিগুলো গ্রহণ করে, যখন বরো কাউন্সিল স্থানীয় পরিষেবা এবং কমিউনিটি চাহিদা অনুযায়ী কাজ করে। এই দ্বি-স্তর কাঠামো GLA কে বৃহত্তর নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন করতে সক্ষম করে তোলে এবং বরো কাউন্সিলগুলোকে তাদের স্থানীয় প্রয়োজন মোতাবেক বাসিন্দাদের জন্য সমাধান তৈরি করার স্বাধীনতা ও সুযোগ সৃষ্টি করে।

লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

লস অ্যাঞ্জেলেসে কাউন্টি সরকার আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে, যা জনস্বাস্থ্য, সামাজিক পরিষেবা এবং পরিবহনের মতো পরিষেবা প্রদান করে। একটি দ্বি-স্তরীয় ব্যবস্থায় লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির মধ্যে পৃথক নগর সরকার স্থানীয় সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করে, যা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সাথে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধানের ভারসাম্য বজায় রাখে। এই ব্যবস্থা আঞ্চলিক প্রকল্পগুলোতে (যেমন গণপরিবহন সম্প্রসারণ) সহযোগিতার সুযোগ করে দেয়। পাশাপাশি স্থানীয় শহরগুলো যাতে তাদের মৌলিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারে তা নিশ্চিত করে।

মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

মেলবোর্নের শাসনব্যবস্থা ভিক্টোরিয়া রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত বৃহত্তর মেলবোর্ন মহানগর এলাকার মধ্যে কাজ করে। স্থানীয় কাউন্সিলগুলো কমিউনিটি পরিষেবা পরিচালনা করে, যেখানে রাজ্য সরকার আঞ্চলিক পরিকল্পনা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের দিকে নজর দেয়। এই দ্বি-স্তরীয় ব্যবস্থাটি শহরের চ্যালেঞ্জগুলো সমন্বিতভাবে মোকাবিলা এবং স্থানীয় কাউন্সিলগুলোকে তাদের কমিউনিটিগুলোকে কার্যকরভাবে সেবা দেওয়ার সুবিধা ও নমনীয়তা প্রদান করে।

সিঙ্গাপুর

যদিও সিঙ্গাপুর আকারে ছোট, তবু এর নগর প্রশাসন কার্যকরভাবে একটি দ্বি-স্তরীয় মডেলের অধীনে কাজ করে। নগর পুনঃউন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (URA) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে অপরদিকে স্থানীয় শহর কাউন্সিলগুলো দৈনন্দিন পৌর পরিষেবা পরিচালনা করে। সিঙ্গাপুরের মডেল দক্ষতার উপর জোর দেয়, নিশ্চিত করে যে আঞ্চলিক এবং স্থানীয় উভয় চাহিদাই সমন্বিতভাবে পূরণ করা হয়।

টরন্টো, কানাডা

টরন্টোর শহরের শাসন কাঠামো দ্বি-স্তরীয় নগর সরকার মডেলের অন্যতম উদাহরণ। টরন্টো শহর টরন্টো সিটি কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়, যা স্থানীয় নাগরিক পরিষেবা পরিচালনা করে, অন্যদিকে টরন্টো আঞ্চলিক সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ

(TRCA) টরন্টো অঞ্চল জুড়ে বিসত্মৃত পরিবেশগত এবং ভূমি ব্যবহারের সমস্যাগুলো মোকাবিলা করে। দায়িত্বের এই বিভাজন নগর সম্প্রসারণ এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের মতো আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার সময় বিশেষায়িত কার্যক্রম গ্রহণের অনুমতি দেয়।

ঢাকা মহানগর সরকার

বাংলাদেশের মহানগর এলাকায় এক বিশাল সংখ্যক নাগরিক বসবাস করেন। বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এই সংখ্যা বিপুল, যথাক্রমে – ঢাকা উত্তরে ৬৯৯০০০০, ঢাকা দক্ষিণে ৪৩০৫০০০, চট্টগ্রামে ৩২৩০০০০ জনসংখ্যা বসবাস করেন। এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক নাগরিকদের বিভিন্নমুখী সেবার চাহিদা মহানগরগুলোতে একটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট মহানগর সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয় চিন্তা করা যায়। এই প্রস্তাবিত মহানগর সরকার কাঠামো ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রধান ধাপ হোল ঢাকা বা চট্টগ্রামের মত বড় শহরকে লন্ডনের নগর সরকার কাঠামোর আদলে একটি বিকেন্দ্রিকৃত দ্বি-স্তর ব্যবস্থায় রূপান্তর। এই ব্যবস্থায় বর্তমান সিটি কর্পোরেশনকে কেন্দ্রে রেখে প্রচলিত জোন বা ওয়ার্ড-গুচ্ছকে একটা একটি স্বতন্ত্র পৌর-ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে একটা দ্বি-স্তর বিশিষ্ট স্যাটেলাইট কাঠামোতে পরিণত করা।

ঢাকা মহানগরের ক্ষেত্রে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ দুইটি সিটি কর্পোরেশনের স্থলে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট একটি একক মহানগর সরকার প্রতিষ্ঠা করতে করতে হবে। এই মডেল প্রয়োগ করে মহানগর এলাকায় স্থানীয় সরকারের দুটি স্তরের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে: প্রথম স্তরটি হল বৃহত্তর সিটি কর্পোরেশন যা বিস্তৃত মহানগর এলাকার জন্য প্রধান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যা তার অভ্যন্তরের দ্বিতীয় স্তরের একাধিক সিটি কাউন্সিল নিয়ে গঠিত হবে।

এই মহানগর সরকার কাঠামো কার্যকর করতে হলে বর্তমান আইনি কাঠামোতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। প্রথমত, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ সংশোধন করে সিটি কর্পোরেশনকে শক্তিশালী সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, যাতে এটি বিবিধ নাগরিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন ওয়াসা, ডেসকো, বিআরটিএ, ডিএমপি, রাজউক এবং অন্যান্য সংস্থার ওপর নীতিনির্ধারণী ও তদারকি ক্ষমতা পায়। দ্বিতীয়ত, আন্তঃসংস্থা সমন্বয় আইন প্রণয়ন করতে হবে, যাতে সকল সংস্থাকে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের অধীনে কাজ করতে বাধ্য করা যায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট আইনে সংশোধন এনে রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমন্বয় বাধ্যতামূলক করতে হবে, যাতে অবকাঠামো প্রকল্পগুলো সমন্বিতভাবে বাস্তবায়িত হয়। চতুর্থত, সিটি ই-গভর্ন্যান্স আইন প্রণয়ন করে ডিজিটাল ডাটা শেয়ারিং এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে সকল সংস্থার কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাক করা যায়।

অধিকন্তু, আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে। সর্বোপরি, জনগণের অংশগ্রহণমূলক নীতিমালা চালু করে স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণের মতামতকে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এই আইনি সংস্কারগুলো বাস্তবায়িত হলে একটি শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক মহানগর সরকার কাঠামো গঠন সম্ভব হবে, যা নগরবাসীর সেবার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে।

দ্বি-স্তর বিশিষ্ট মহানগর সরকার ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব দুটি স্তরের গঠিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টন করা হবে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন: ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান উত্তর দক্ষিণ বিভাজন তুলে দিতে হবে এবং সমগ্র ঢাকা শহরের জন্য (মেট্রোপলিটন ঢাকা) একটা একক ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হিসেবে পুনগঠন করতে হবে। এই স্তরটি পুরো ঢাকা শহরের বৃহত্তর ভৌগোলিক এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যার মধ্যে অন্তত ২০/২৫টি সিটি কাউন্সিল গঠিত হতে পারে। বর্তমানে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় যে জোন রয়েছে (বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় মোট ১০ টি করে ২০ টি জোন আছে) এই জোনগুলোকে প্রত্যেকটিকে সংশ্লিষ্ট জোনের অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ড সমূহকে নিয়ে একটি করে স্বতন্ত্র **সিটি কাউন্সিল** (যেমন: মিরপুর সিটি কাউন্সিল, গুলশান-বনানী-বারিধারা সিটি কাউন্সিল) হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই সিটি কর্পোরেশনের প্রাথমিক ভূমিকা হল সিটি কাউন্সিলসমূহের সীমানা অতিক্রমকারী বিষয়গুলো নিয়ে কর্মকা-পরিচালনা ও সরকারি দপ্তরসমূহের কাজের সমন্বিত পরিকল্পনা, কার্য সমন্বয় ও কার্যকর নির্দেশনা দান।

যেমন মহানগর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও পরিবহন নেটওয়ার্ক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, নদী ও উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা, জননিরাপত্তা, বৃহদাকারের বর্জ্য পরিশোধন-পুন-প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন, পানি শোধন ও সরবরাহ, বিদ্যুত উৎপাদন ও সঞ্চালন, বিতরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ এবং ভূমি ব্যবহার ও স্থাপনা/ অবকাঠামো নির্মাণ বা ভৌত পরিকল্পনা। এই সিটি কর্পোরেশনের বৃহৎ আকারের নগর সেবা প্রকল্পের গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা থাকবে। সিটি কাউন্সিলগুলোর সাথে দ্বৈততা পরিহার করে রাজস্ব সংগ্রহ।
এই সিটি কর্পোরেশন প্রধান সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে এবং অন্যান্য সেবাদানকারী সংস্থা যেমন ওয়াসা (WASA), ডেসকো (DESCO), বিআরটিএ (BRTA), ডিএমপি (DMP), রাজউক (RAJUK) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন করবে। এই কাঠামোতে একটি **মেট্রো গভরনেন্স কাউন্সিল** (Metro Governance Council) গঠন করা যেতে পারে, যেখানে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সভাপতিত্ব করবেন এবং সকল সংস্থার প্রতিনিধিরা নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে নগর পরিকল্পনা, বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, এবং জননিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোতে সমন্বিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এছাড়াও, একটি **ই-গভর্ন্যান্স প্ল্যাটফর্ম** চালু করে ডাটা শেয়ারিং এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং নিশ্চিত করা যেতে পারে, যাতে সকল সংস্থার কার্যক্রম স্বচ্ছ ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থা নগরবাসীর সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং টেকসই নগর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ও পরিচালনা পদ্ধতি এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত নতুন ব্যবস্থা অনুসরণ করে প্রবর্তন করতে হবে।

সিটি কাউন্সিল: এক একটা সিটি কাউন্সিল তার নিজস্ব ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কাজ করবে যা কতগুলো ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হবে। এই সিটি কাউন্সিলের পরিচালনা কাঠামো প্রস্তাবিত সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার পরিচালনা কাঠামো অনুযায়ী গঠিত হবে। সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এবং স্বায়ত্তশাসন থাকলেও এই সিটি কাউন্সিলগুলো ফাংশনালি বৃহত্তর ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতায় একটি স্যাটেলাইট আকারে যুক্ত থাকবে এবং পরিচালিত হবে। এই প্রত্যেকটি সিটি কাউন্সিলে একজন মেয়র (নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে) এবং মেয়র-কাউন্সিল থাকবে।

কেন্দ্রীয় বা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রীয়ভাবে অন্যান্য নগর পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সমন্বয়ের কাজটি করবেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত কাঠামো ও কার্যাদি অনুযায়ী আইন তৈরি করার কাজটি প্রস্তাবিত স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে।

সিটি কাউন্সিল জননিরাপত্তা (কমিউনিটি পুলিশ) এবং অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবা, মশক নিধন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, স্থানীয় পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ফুটপাত, রাস্তা, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবসায়/পেশার নিবন্ধন/অনুমোদন, স্থানীয় পার্ক, জলাধার এবং কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচিসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের সরাসরি প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। তারা অনেকটা পৌরসভার মত রাজস্ব আহরণ ও সেবা প্রদান করবে। মহানগর সরকারে স্থানীয় কর সিটি কর্পোরেশন নয়, বরং শুধু সিটি কাউন্সিল সংগ্রহ করবে। তারা স্থানীয়ভাবে আহরিত রাজস্বের ৭০ শতাংশ নিজেরা ব্যবহার করবে এবং বাকি ৩০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনে স্থানান্তর করবে। ঢাকা মহানগর সরকারে অঞ্চলভিত্তিক নিম্নোক্ত এলাকায় ২০টি সিটি কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে (এই তালিকা ইঙ্গিত মাত্র; প্রকৃত তালিকা প্রচলিত জোনকে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন মাঠ সমীক্ষা সম্পাদন করে সিটি কাউন্সিলের সীমান নির্ধারণ করবে):

১. বনানী-বারিধারা-গুলশান
২. উত্তরা পূর্ব-পশ্চিম
৩. দক্ষিণ খান উত্তরখান
৪. মিরপুর
৫. পল্লবী
৬. মোহাম্মদপুর
৭. ধানমন্ডি রায়েরবাজার
৮. লালবাগ
৯. কেরানীগঞ্জ
১০. রামপুরা, বনশ্রী, খিলগাঁও, মালিবাগ, মুগদা, বাড্ডা
১১. যাত্রাবাড়ি, সায়েদাবাদ, ডেমরা
১২. রমনা মতিঝিল দিলকুশা
১৩. আরামবাগ, বাংলাবাজার, ওয়ারি, সূত্রাপুর, কোতোয়ালী
১৪. গাবতলী, আমিনবাজার

১৫. বসুন্ধরা, ভাটারা
১৬. কাফরুল, ক্যান্টনমেন্ট
১৭. খিলখেত, কুড়িল
১৮. সাতারকূল
১৯. ডেমরা
২০.তেজগাঁও, আগারগাঁও ও সংসদ ভবন এলাকা

মেয়র নির্বাচন পদ্ধতি

কাউন্সিলগুলোতে নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ড থাকবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে একটি সিটি কাউন্সিলে কমপক্ষে ৯ টি, ১২ টি বা সর্বোচ্চ ১৫টি ওয়ার্ড থাকবে। এই ওয়ার্ডগুলোতে ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে কাউন্সিলর নির্বাচিত হবেন। এক-তৃতীয়াংশ ওয়ার্ডে নারী কাউন্সিলর নির্বাচিত হবেন এবং ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে। এ নির্বাচন পদ্ধতি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রতিটি সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত কাউন্সিলররা নিজেদের ভোটে কাউন্সিলের মেয়র নির্বাচিত করবেন।

অন্যদিকে, সকল সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলররা মহানগর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে ভোটার হিসেবে বিবেচিত হবেন। তারা নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে অথবা বাইরে থেকে কাউকে মেয়র পদে নির্বাচন করতে পারবেন। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচন উন্মুক্ত থাকবে। সেখানে নির্বাচিত কাউন্সিলর এবং বাইরের/অনির্বাচিত ব্যক্তিও নির্বাচনের শর্ত পূরণ করে মেয়র পদে প্রার্থী হতে পারবেন।

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সেবা প্রদানকারী দপ্তর সমূহের প্রধান গণ সিটি করর্পোরেশনের কাউন্সিল সভায় অংশগ্রহণ করবেন তবে তারা ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

চিত্র: দ্বি-স্তর বিশিষ্ট নগর সরকার কাঠামো

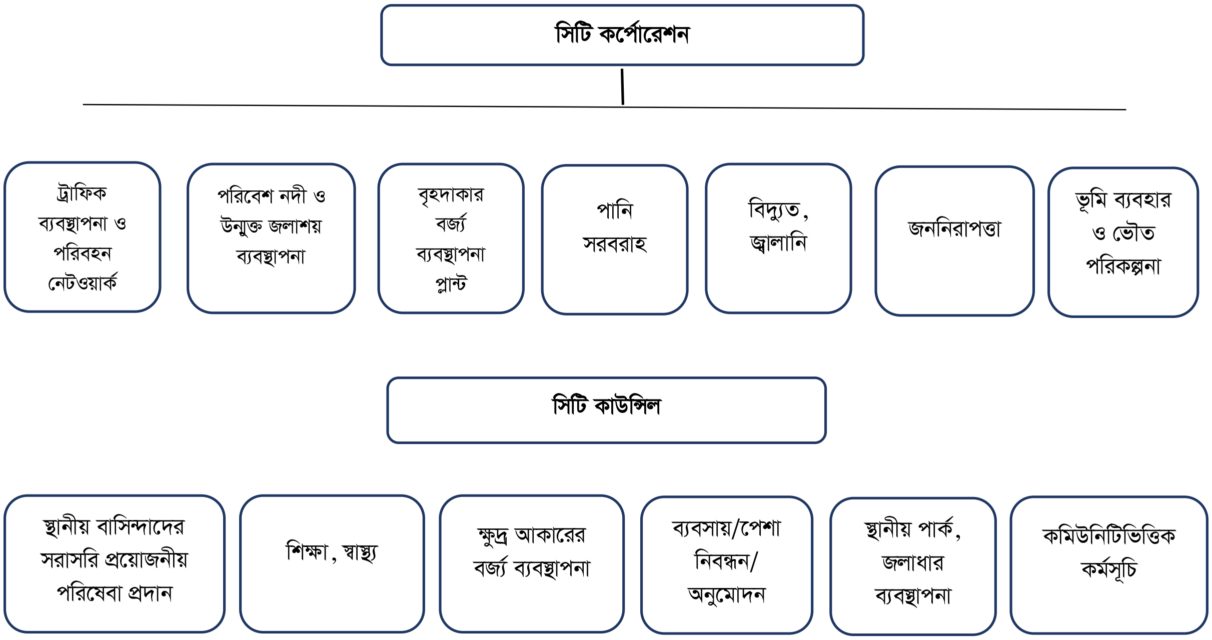

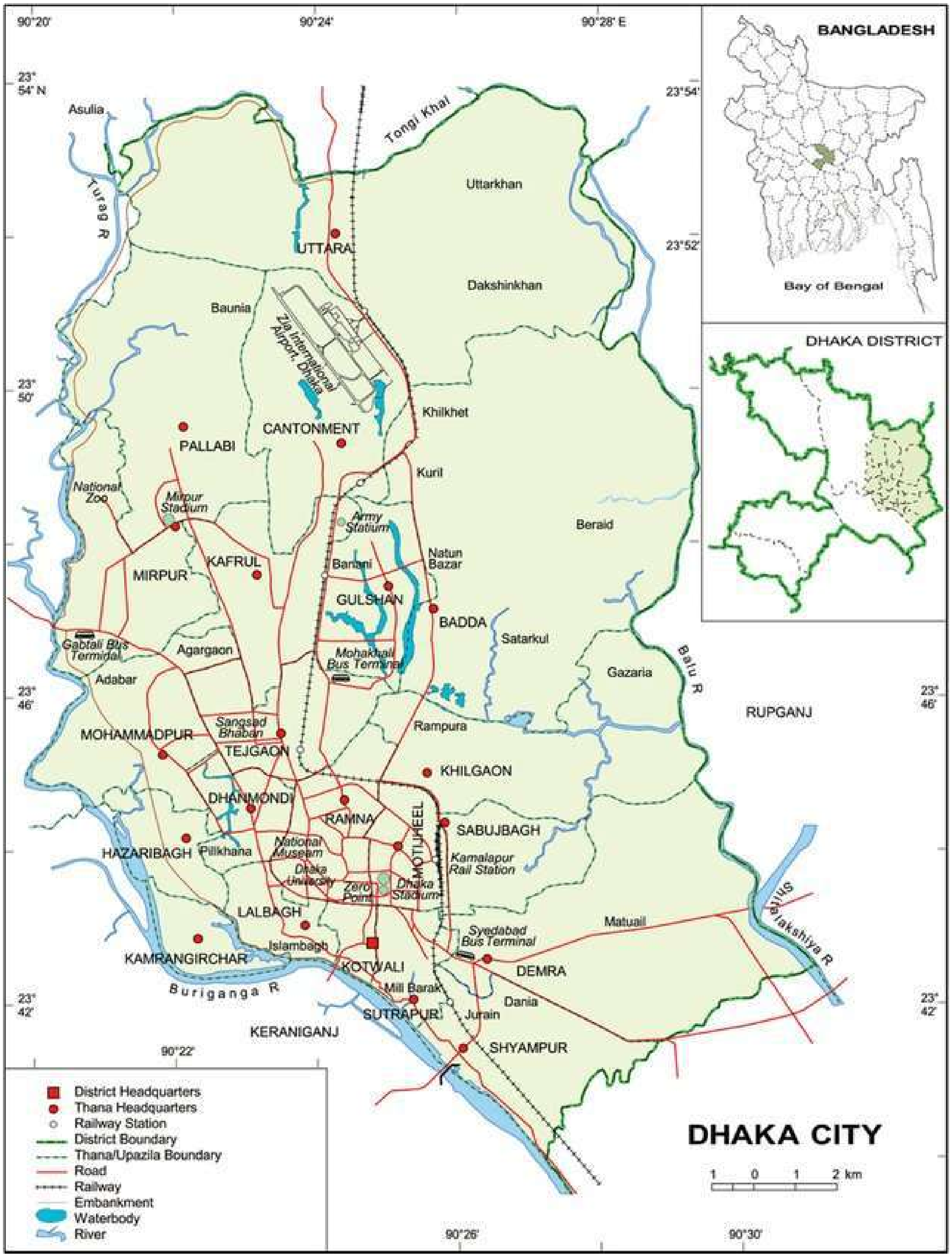
DHAKA CITY
BANGLADESH
Bay of Bengal
DHAKA DISTRICT
UTTARA
Uttarkhan
Dakshinkhan
Baunia
Zia International Airport, Dhaka
CANTONMENT
PALLABI
Khilkhet
Kuril
MIRPUR
KAFRUL
GULSHAN
BADDA
Beraid
Satarkul
Gazaria
RUPGANJ
MOHAMMADPUR
TEJGAON
Rampura
KHILGAON
DHANMONDI
RAMNA
MOTIJHEEL
SABUJBAGH
HAZARIBAGH
LALBAGH
KAMRANGIRCHAR
KOTWALI
SUTRAPUR
DEMRA
SHYAMPUR
KERANIGANJ
Matuail
Dania
Jurain
Buriganga R
Turag R
Balu R
Shitalakshiya R
Tongi Khal
District Headquarters
Thana Headquarters
Railway Station
District Boundary
Thana/Upazila Boundary
Road
Railway
Embankment
Waterbody
River

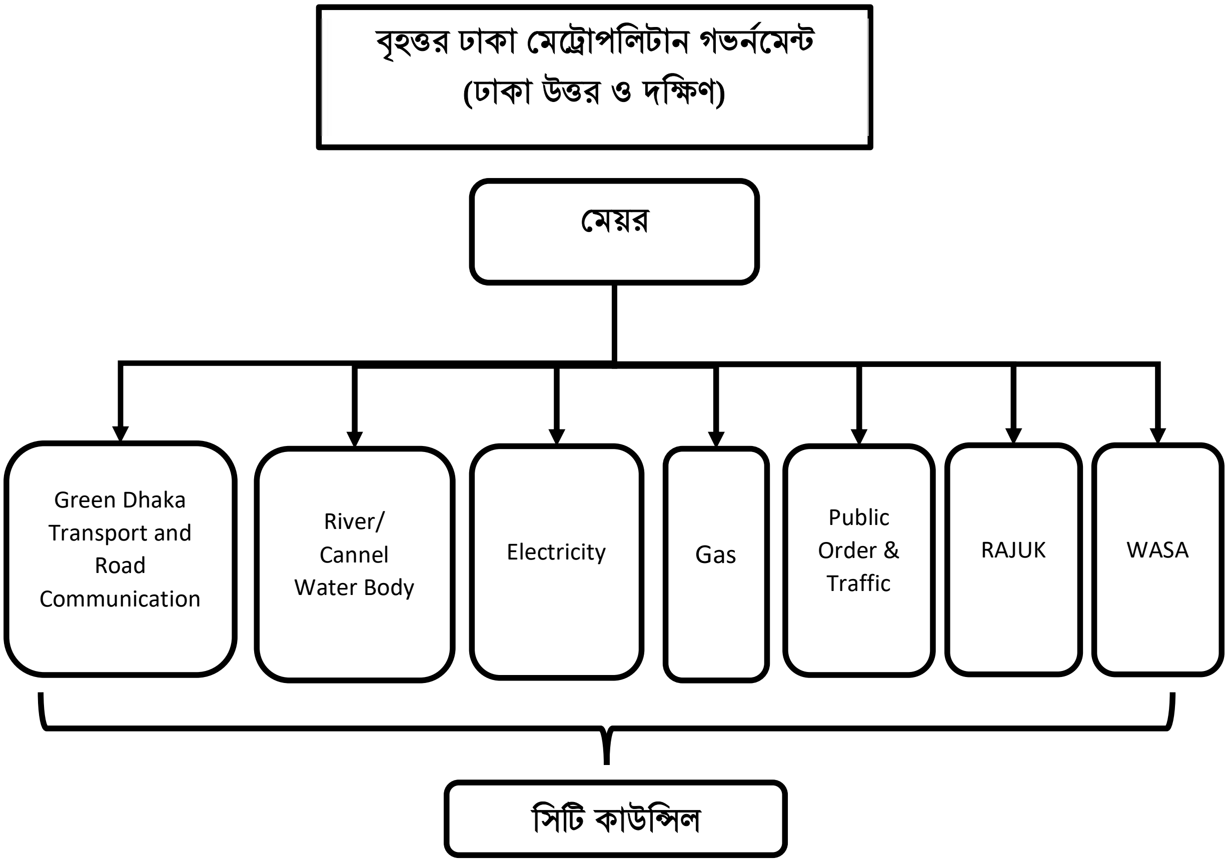

সিটি কাউন্সিল (২০ বা তার অধিক)

মিরপুর ১২, মিরপুর ১০, মিরপুর ১, মিরপুর ১৪, গাবতলী, গুলশান, বনানী, মতিঝিল, আগারগাঁও, শ্যামলী, ধানমন্ডি, শাহবাগ, উত্তরা (উত্তরখান ও দক্ষিণখান), সূত্রাপুর, কামরাঙ্গীচর, শ্যামপুর, দনিয়া, ডেমরা, মাতুয়াইল, সবুজবাগ, খিলগাঁও, বাড্ডা, লালবাগ, যাত্রাবাড়ী, আজিমপুর, খিলখেত ইত্যাদি

অধ্যায়-আট

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অর্থায়ন

৮.১ ভূমিকা

স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি কেবল তৃণমূল পর্যায়ে পরিষেবা প্রদানের জন্য নয়, বরং কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকারিতা ও স্থানীয় প্রশাসনের কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও অপরিহার্য।[১৩] অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সংবেদনশীল আন্তঃসরকারি হস্তান্তরের পাশাপাশি যুক্তিসঙ্গত সম্পদ ভাগাভাগির মাধ্যমে কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।[১৪]

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরেরই আর্থিকভাবে সক্ষম স্বাবলম্বী হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মানসম্মত পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ঘাটতিতে রয়েছে।[১৫] বর্তমানে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের জন্য কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক সূত্র নেই, যদিও কিছু ক্ষেত্রে (যেমন উপজেলা) অর্থ বরাদ্দের জন্য আয়তন ও জনসংখ্যাকে নির্ধারক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সম্পদের ঘাটতি মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের বিষয়ে গভীর ও ব্যাপক ধারণা থাকা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারের বৈষম্যহীন ও টেকসই সংস্কারের জন্য কার্যকর নীতিকৌশল প্রণয়নে এই সম্পর্কের স্বরূপ অনুধাবন অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার দলিলগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আন্তঃসরকারি স্থানান্তর, অর্থায়ন, সম্পদ সংগ্রহ, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন বিষয়ে পৃথকভাবে আলোকেপাত করা হয়নি, যদিও স্থানীয় সরকারকে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের সহায়ক কৌশল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনের এ অধ্যায়ে স্থানীয় সরকারে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে অর্থ বরাদ্দের ধরন, সম্পদ প্রবাহের চ্যানেল ও বৈষম্যের ব্যাপ্তি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্পদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির উপায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অর্থায়ন পদ্ধতির সংস্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে স্থানীয় সরকারসমূহের নিজস্ব আয়ের উৎস বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা, ইত্যাদি বিষয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

৮.২ স্থানীয় সরকারে অর্থায়নের পক্ষে যুক্তিসমূহ

স্থানীয় সরকারে অর্থায়ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা প্রদান এবং উন্নয়নমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। স্থানীয় সরকার অর্থায়নের তত্ত্বসমূহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা স্থানীয় সরকারের জন্য আর্থিক সম্পদের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। স্থানীয় সরকার অর্থায়ন প্রসঙ্গে তত্ত্ব বা নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ, জনগণের পছন্দ তত্ত্ব, স্থানীয় গণপণ্যের তত্ত্ব এবং সামাজিক ন্যায্যতা নীতি।

আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ (fiscal decentralization) তত্ত্ব[১৬]: স্থানীয় সরকার অর্থায়নের একটি মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি হল আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ। এটি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক দায়িত্ব হস্তান্তরকে বোঝায়, যা

---

[১৩] Tofail Ahmed. 2012. *Denationalisation and the Local State: Political Economy of Local Government in Bangladesh*, Dhaka: Agamee Prakashani.

[১৪] তোফায়েল আহমেদ, ''বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন'', বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় শাসন ও পল্লী উন্নয়ন: তিন দশকের নীতিচিন্তা (১৯৯০-২০২২), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ি, কুমিল্লা, ২০২৪, পৃ. ১২৫-১৫৩

[১৫] A. Rahman, Mahfuz Kabir and Mohammad Razzaque. 2007. Bangladesh: Civic Participation in Sub-National Budgeting. In A Shah (ed), *Participatory Budgeting*, Vol III, Washington, DC: World Bank, pp. 1-29.

[১৬] Barfield, C.E., "Rethinking federalism", *The Journal of Economic Perspectives*, 11 (1981), pp. 43-64, DOI: 10.1257/jep.11.4.43

স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে। এই তত্ত্বটি বেশ কয়েকটি মৌলিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত:

- আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ: স্থানীয় সরকারগুলোকে তাদের নির্বাচনী এলাকার নিজস্ব চাহিদা এবং পছন্দগুলোর প্রতি আরও কার্যকরভাবে সাড়া দিতে সক্ষম করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্থানীয় জনগণের মধ্যে নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলো বোঝার জন্য উপযোগী অবস্থানে থাকে, যা তাদের দক্ষতার সাথে সম্পদ বরাদ্দে সহায়তা করে। পর্যাপ্ত তহবিল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকরভাবে তাদের স্বায়ত্তশাসন প্রয়োগ করতে সক্ষম করে, আরও দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

- ক্ষমতায়ন এবং স্বায়ত্তশাসন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজস্ব আহরণের ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ তাদের কিছুটা স্বায়ত্তশাসনের সাথে কাজ করার ক্ষমতা দেয়। পরিষেবা প্রদানে উদ্ভাবন এবং স্থানীয় পর্যায়ে সাড়া প্রদান বৃদ্ধির জন্য এই স্বায়ত্তশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্থানীয় প্রেক্ষাপট অনুসারে সমাধান তৈরি করতে পারেন।

- জবাবদিহিতা এবং স্বচছতা: আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। যখন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয় করার জন্য দায়ী থাকে, তখন তারা তাদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে আরও সরাসরি দায়বদ্ধ থাকে। এই জবাবদিহিতা স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে এবং স্থানীয় শাসনে জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে।

- দক্ষতার জন্য প্রণোদনা: আর্থিক স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে সম্পদ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়। তাদের স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন এবং সম্পদ সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হতে হয়, যার ফলে জনসাধারণের জন্য উন্নত পরিষেবা প্রদান এবং উদ্ভাবন ঘটে।

জনসাধারণের পছন্দ (public choice) তত্ত্ব[১৭]: এই তত্ত্ব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগ জননীতি গঠনে ব্যক্তিগত পছন্দ এবং প্রণোদনার ভূমিকার উপর জোর দেয়। স্থানীয় সরকার অর্থায়ন সম্পর্কিত জনসাধারণের পছন্দ তত্ত্বের মূল নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- ✓ ব্যক্তিগত পছন্দ: ব্যক্তির গণদ্রব্য (public goods) এবং পরিষেবা সম্পর্কে বিভিন্ন পছন্দ থাকে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নাগরিকদের কাছাকাছি থাকার মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের পছন্দের সাথে তাদের পরিষেবাকে আরও ভালভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারে। জনসাধারণের পছন্দের সাথে উপযুক্ত পরিষেবাগুলোর সমন্বয়ের জন্য স্থানীয় সরকারে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের বাসিন্দাদের চাহিদা পূরণ করে উচ্চমানের পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম করে।

- ✓ ভোটার প্রভাব: স্থানীয় সরকারগুলো ভোটারদের সরাসরি প্রভাবের অধীন, যারা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের পছন্দ প্রকাশ করতে পারেন। এই সরাসরি সম্পর্ক স্থানীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ও কর্মীরা জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প এবং পরিষেবাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করে।

- ✓ বাজেটের সীমাবদ্ধতা: জনসাধারণের পছন্দ তত্ত্ব স্বীকার করে যে স্থানীয় সরকারগুলো বাজেটের সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয় যা তাদের নির্দিষ্ট পরিষেবাগুলোকে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করে। এই বাস্তবতা

[১৭] George A. Boyne, *Public Choice Theory and Local Government: A Comparative Analysis of the UK and the USA*, Palgrave Macmillan, 1998.

আর্থিক দায়িত্ব নিশ্চিত করার সাথে সাথে জনসাধারণের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে অর্থায়নের বৈচিত্র্যময় এবং পর্যাপ্ত উৎসের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

স্থানীয় গণপণ্যের (local public good) তত্ত্ব[১৮]: স্থানীয় গণপণ্যের তত্ত্ব স্থানীয় সরকারের অর্থায়নের ন্যায্যতা সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। স্থানীয় গণপণ্য হল এমন পরিষেবা এবং সম্পদ যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সরবরাহ করা হয় এবং এগুলো বাদ দেওয়া যায় না (non-exclusion) এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নয় (non-competitive)। এই তত্ত্বের মূল দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- স্থানীয় গণপণ্যের বৈশিষ্ট্য: স্থানীয় গণপণ্য, যেমন পার্ক, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্থানীয় অবকাঠামো, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা সর্বোত্তমভাবে সরবরাহ করা হয় যারা তাদের জনসাধারণের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণের জন্য এই পণ্য ও সেবাগুলোকে তৈরি করতে পারে। এই স্থানীয় বিধানটি এই পণ্যগুলোকে পর্যাপ্তভাবে অর্থায়ন করা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে পরিষেবার মান হ্রাস পেতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ বা উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্থ হতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো অবকাঠামোতে বিনিয়োগ, স্থানীয় ব্যবসায় প্রসার এবং বিনিয়োগের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহজতর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যাপ্ত অর্থায়ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এমন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নে সক্ষম করে।

- দক্ষ সম্পদ বরাদ্দ: তত্ত্বটি দাবি করে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো গণপণ্যের জন্য সম্পদ বরাদ্দে অধিক দক্ষ। স্থানীয় জনসাধারণের গণপণ্যের অর্থায়নের মাধ্যমে, স্থানীয় সরকারগুলো অপচয় কমাতে পারে এবং জনসাধারণের সবচেয়ে বেশি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলোতে সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

- যৌথ পদক্ষেপ: স্থানীয় অর্থায়ন সাধারণ চাহিদা পূরণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যৌথ পদক্ষেপকে সহজতর করে। যখন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যাপ্তভাবে অর্থায়ন করা হয়, তখন তারা পরিবেশগত স্থায়িত্ব, জনস্বাস্থ্য এবং বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জন সম্পদ ব্যবহার করতে এবং জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারে।

- ন্যায্যতার বিবেচনা: স্থানীয় অর্থায়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের পণ্যের ব্যবস্থা আয় নির্বিশেষে সকল বাসিন্দার প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলোতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করে ন্যায্যতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। এই ন্যায্যতা বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে হয়।

সামাজিক ন্যায্যতার (social justice) নীতি[১৯]: স্থানীয় সরকার অর্থায়নের তাত্ত্বিক ন্যায্যতা সামাজিক ন্যায্যতার নীতির ওপরও ভিত্তি করে। এই নীতি সম্পদ বরাদ্দ এবং জনসেবা প্রদানে ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচারের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। স্থানীয় সরকার অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক ন্যায্যতার মূল দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- সম্পদের পুনর্বণ্টন: স্থানীয় অর্থায়ন সুবিধাবঞ্চিত বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ পুনর্বণ্টন করে সামাজিক ন্যায্যতাকে উন্নীত করতে পারে। পর্যাপ্ত অর্থায়ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিষেবা এবং সুযোগের অভিগম্যতায় বৈষম্য মোকাবিলা করতে এবং আরও ন্যায্য সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করে যাতে সকল

---

[১৮] Joseph E. Stiglitz, "The Theory of Local Public Goods", in Martin S. Feldstein and Robert P. Inman (eds.), *The Economics of Public Services*, Palgrave Macmillan, 1977, pp 274–333.

[১৯] George Boyne, Martin Powell and Rachel Ashworth, "Spatial Equity and Public Services: An empirical analysis of local government finance in England", *Public Management Review*, 3(1), 2001, pp. 19-34.|

সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং সম্পদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা যায়। সুবিধাবঞ্চিত এলাকার জন্য অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে বৈষম্য হ্রাস এবং সামাজিক সংহতি প্রসারের জন্য স্থানীয় সরকার কাজ করতে পারে। অপর্যাপ্ত অর্থায়ন বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, কারণ ধনী অঞ্চলগুলো দরিদ্র অঞ্চলগুলোর তুলনায় বেশি রাজস্ব আহরণ করতে সক্ষম হতে পারে। এই বৈষম্য কম সমৃদ্ধ জনপদগুলোতে অনুন্নয়নের চক্র তৈরি করতে পারে।

- দুর্বল ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্ন আয়ের পরিবার, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন তাদের এমন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম করে যা এই গোষ্ঠীগুলোকে ক্ষমতায়িত করে এবং তাদের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করে। স্থানীয় উন্নয়ন উদ্যোগের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন ছাড়া জনসাধারণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস এবং দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধির সম্মুখীন হতে পারে।
- স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ: সামাজিক ন্যায্যতার নীতিগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। স্থানীয় সরকারে অর্থায়ন এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে জনসাধারণ বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, যা অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন এবং বৃহত্তর জবাবদিহিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। পর্যাপ্তভাবে অর্থায়িত স্থানীয় সরকারগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করতে পারে। বাজেট পরিকল্পনা এবং পরিষেবা প্রদানে নাগরিকদের জড়িত করে স্থানীয় সরকারগুলো স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে পারে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং তারা যে জনসম্প্রদায়কে সেবা প্রদান করে তাদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে পারে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত তাদের কার্যক্রম এবং পরিষেবার অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন উৎসের ওপর নির্ভর করে। এগুলোকে তিনটি প্রধান উৎসে শ্রেণিবিভাজন করা যেতে পারে:

এক, নিজস্ব উৎসের রাজস্ব: এর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় কর (হোল্ডিং কর, সম্পত্তি কর, স্থানীয় ব্যবসায়িক নিবন্ধন কর, সম্পদ ইজারা ও ভাড়া), পরিষেবার জন্য ফি (যেমন পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) এবং জরিমানা। নিজস্ব উৎসের রাজস্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি স্থানীয় সরকারগুলোকে কিছুটা আর্থিক স্বাধীনতা এবং নমনীয়তা প্রদান করে।

দুই, আন্তঃসরকারি স্থানান্তর: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে, যার মধ্যে রয়েছে অনুদান, প্রকল্প সহায়তা এবং রাজস্ব-বণ্টন। এই স্থানান্তরগুলো বিভিন্ন স্থানীয় সরকারের মধ্যে আর্থিক সক্ষমতার বৈষম্য দূর করতে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো ন্যায়সঙ্গতভাবে সরবরাহ করা নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে।

তিন, ঋণ: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন বা বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য ঋণের বাজারে (যেমন বন্ড, অনুদানসহ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, ইত্যাদি) প্রবেশ করতে পারে। যদিও ঋণ বড় অবকাঠামো প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য একটি কার্যকর উপায় হতে পারে, তবে এটি অতিরিক্ত ঋণের বোঝাও তৈরি করতে পারে।

৮.৩ স্থানীয় সরকারে অর্থায়নের ধরন

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে অর্থাৎ অর্থ বিভাগ থেকে স্থানীয় সরকারের বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ হিসেবে আসে। এই অর্থায়নের মধ্যে রয়েছে বেতন-ভাতাসহ মৌলিক পরিচালন ব্যয় সংকুলানের জন্য ''স্থানীয় সরকার সমূহে স্থানান্তর'', বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকারের পাঁচটি স্তরে আলাদা আলাদা ভাবে ''উন্নয়ন সহায়তা'' এবং স্তরভিত্তিক বৈদেশিক সহায়তার ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগীদের বিশেষ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প। এর বাইরে রয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে তৃতীয় লোকাল গভর্নেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-৩), উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিচলন ও উন্নয়ন প্রকল্প, এবং পৌরসভা পর্যায়ে মিউনিসিপ্যাল গভর্নেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি)। সিটি কর্পোরেশনে উন্নয়ন সহযোগীরা অনেক বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। অবশ্য এলজিএসপি-৩-এর কার্যকাল ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে সমাপ্ত হয়েছে এবং এমজিএসপি প্রকল্প বর্তমানে চালু নেই।

বাজেটের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বৃহত্তর স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে পল্লী উন্নয়ন বিভাগে অর্থায়নকে বাদ দিলে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকে স্থানীয় সরকারে বরাদ্দ হিসেবে অভিহিত করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নামে একটি শীর্ষ পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এবং আঞ্চলিক পরিষদের বাজেট আসে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে। এটি ছাড়া ''পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা'' নামে একটি বাজেট রয়েছে যার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সহায়তা আসে। স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার বাজেটে হস্তান্তর ও উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে অর্থায়ন করা হয়। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থ বরাদ্দ আসে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উভয় উৎস থেকে।

সারণি ৮.১: জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় সরকারে অর্থায়ন (কোটি টাকায়)

	২০১৯-২০ প্র	২০২০-২১ প্র	২০২১-২২ প্র	২০২২-২৩ প্র	২০২৩-২৪ স	২০২৪-২৫ ব
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানান্তর	৮৩১	৬২২	৬৩০	৬৫৯	৮৫৭	৮৯৬
উন্নয়ন সহায়তা	২,২৫২	২,১১৫	১,৮১৩	২,৪৫৮	২,৯১৯	৩,৩২৯
এডিপি-বহির্ভুত উন্নয়ন প্রকল্প	১,৭৬১	১,০৮৫	৮১৮	২৪৯	২৭	
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ	৪,৮৪৪	৩,৮২২	৩,২৬১	৩,৩৬৬	৩,৮০৩	৪,২২৬
স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট	২৯,৩৬১	৩২,২১১	৩৩,৯১৩	৩৮,৬০৬	৪৮,৮৪৩	৪৫,২০৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানীয় সরকারের বাজেট	১,১৬৫	১,০০৯	১,২৬১	১,২০৮	১,২৩৮	১,৩৪৭
স্থানীয় সরকারের বাজেট	৩০,৫২৬	৩৩,২২০	৩৫,১৭৪	৩৯,৮১৪	৫০,০৮১	৪৬,৫৫৩
জাতীয় বাজেট	৪২০,১৬০	৪৬০,১৬০	৫১৮,১৮৮	৫৭৩,৮৫৮	৭১৪,৪১৮	৭৯৭,০০০

নোট: (১) প্র = প্রকৃত, স = সংশোধিত ও ব = বরাদ্দ; (২) সরকারের বাজেটে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ক মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট অন্তর্ভুক্ত।

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বছরের বাজেট সংক্ষিপ্তসার ও মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো থেকে নিরূপিত।

সারণি ৮.২: স্থানীয় সরকারে অর্থায়ন হিসাবে বাজেট ও জিডিপি'র অংশ (শতাংশ)

	স্থানীয় সরকারের বাজেটের শতাংশ	বাজেটের শতাংশ	জিডিপি'র শতাংশ
২০১৯-২০ প্র	১৬.৫০	১.১৫	০.১৭৩
২০২০-২১ প্র	১১.৮৭	০.৮৩	০.১০৮
২০২১-২২ প্র	৯.৬২	০.৬৩	০.০৮২
২০২২-২৩ প্র	৮.৭২	০.৫৯	০.০৭৫
২০২৩-২৪ স	৭.৭৯	০.৫৩	০.০৭৬
২০২৪-২৫ ব	৯.৩৫	০.৫৩	০.০৭৫

চিত্র ৮.১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকারি ব্যয় (ক) স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটের শতাংশ (ওপরে বামে), খ. মোট বাজেটের শতাংশ (ওপরে ডানে), এবং গ. জিডিপির শতাংশ (নিচে)

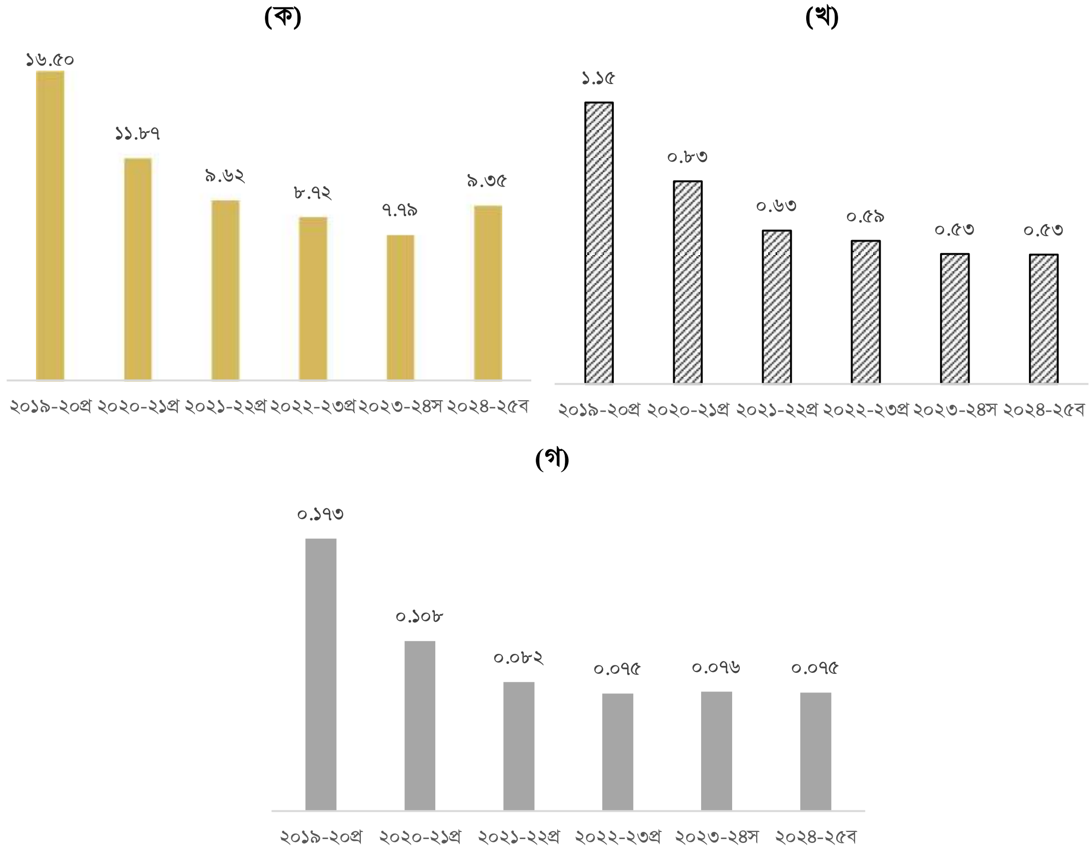

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বছরের বাজেট সংক্ষিপ্তসার ও মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো থেকে নিরূপিত।

আয়ারল্যান্ড ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী ৩৪টি কাউন্টি ও সিটি কাউন্সিলের এবং ৮০টি টাউন কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশের মোট বাজেটের ৯ শতাংশ ব্যয় করে, যা ওই দেশের জিডিপির ২.৩ শতাংশ।[২০] ২০২৪ অর্থবছরে ফিলিপাইনে মোট বাজেটের ১৭.৫ শতাংশ স্থানীয় সরকার ইউনিটগুলোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। সুইজারল্যান্ডে পৌরসভাগুলো জিডিপি'র প্রায় ৬.৬ শতাংশ ব্যয় করে, যা সে দেশের জাতীয় বাজেটের প্রায় অর্ধেক।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকৃত বাজেট অনুয়ায়ী গড়ে একটি জেলা পরিষদ সহায়তা পেয়েছে ৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, উপজেলা পরিষদ ১ কোটি ৯১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, পৌরসভা ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এবং গড়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ পেয়েছে মাত্র ২৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা।[১৮] এ সময়ে জনপ্রতি সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ছিল সিটি কর্পোরেশনে ১৭২ টাকা, পৌরসভায় ১৩০ টাকা এবং ইউনিয়ন পরিষদে মাত্র ৮৭ টাকা। ২০২৩-২৪ সালের সংশোধিত বাজেটে সাধারণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানান্তর ও উন্নয়ন সহায়তা মিলে বরাদ্দ ছিল ৩,৮০৩ কোটি টাকা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য মোট বরাদ্দ স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটের ৮.৭২ শতাংশ, মোট বাজেটের ০.৫৯ শতাংশ এবং মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ০.০৭৫ শতাংশ। অন্যদিকে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে থেকে কি পরিমাণে কর ও কর বহির্ভূত অর্থ ও সম্পদ আহরণ করে তার সামগ্রিক কোনো তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগ বা অন্য কোনো বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের হাতে নেই।

[২০] https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Ireland-Fiscal-Powers.aspx

কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে এমন অপ্রতুল অর্থায়ন স্থানীয় পর্যায়ে মৌলিক পরিষেবা প্রদান এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্ব ও সক্ষমতাকে অত্যন্ত সীমিত করে ফেলেছে।[১৯] কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগগুলো জাতীয় পর্যায়ে গৃহিত উন্নয়ন ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করে। স্থানীয় জনচাহিদাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থায়ন দরকার, বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে তার অতি সামান্য পরিমাণে অর্থায়ন করা হয়। এ কারণে যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলো বাস্তবায়ন করে, সেগুলোতে স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিফলন ঘটার নিশ্চয়তা থাকে না। আর সরকারি দপ্তরগুলো যেহেতু কেন্দ্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো নিজেদের মতো করে বাস্তবায়ন করে, তাই সেগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে শতভাগ জবাবদিহি করার প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়নের সঙ্গে স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদার মধ্যে বড় ব্যবধান থেকে যায়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকান্ড বেশিরভাগই হয়ে পড়ে আনুষ্ঠানিকতা এবং এতে মূল কাজগুলো হয়ে থাকে সনদ ও লাইসেন্স প্রদান, বিরোধ মীমাংসা ও গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচার কাজ সম্পাদন এবং জনগণকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সহায়তা প্রদান করা। অথচ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রদান করে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও জনবলকে সক্রিয়ভাবে ন্যস্ত করলে স্থানীয় সরকার হয়ে উঠতে পারত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থানীয় উন্নয়নের সূতিকাগার।

অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহ অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকার-নির্ভর। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা নিজস্ব আয় থেকে প্রদান করে থাকে। কিন্তু উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর নির্ভর করে। বিশ্বের অনেক দেশে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের আর্থিক অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের আর্থিক অংশগ্রহণ স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্পের অংশীদারিত্ব, পরিবীক্ষণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে পারে।

বিশ্বের কয়েকটি দেশে স্থানীয় সরকারসমূহে সরকারের আর্থিক অংশীদারিত্বের উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

সারণি ৮.৩: কয়েকটি দেশে স্থানীয় সরকারসমূহে সরকারের আর্থিক অংশীদারিত্ব

দেশ	স্থানীয় সরকারের নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন-ভাতা	স্থানীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ প্রকল্পে অংশগ্রহণ/অন্যান্য
জাপান	সব স্থানীয় সরকারে ১০০ শতাংশ স্থানীয় সরকারের আয়	স্থানীয় সরকার ৩০-৩৫ শতাংশ, কেন্দ্রীয় সরকার ৬৫-৭০ শতাংশ
মালয়েশিয়া	স্থানীয় সরকারের নিজস্ব আয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের যৌথ তহবিল	স্থানীয় সরকার ২০-৩০ শতাংশ, কেন্দ্রীয় সরকার ৭০-৮০ শতাংশ
ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও রাজ্য	স্থানীয় সরকারের নিজস্ব আয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের যৌথ তহবিল	স্বচ্ছ ভারত মিশন (স্যানিটেশন প্রকল্প)। স্থানীয় সরকারের সক্ষমতার ওপর প্রকল্প ব্যয় ভাগাভাগি নির্ভরশীল প্রধানমন্ত্রীর গ্রামীণ সড়ক যোজনা (কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে প্রাদেশিক সরকার, জেলা ও পঞ্চায়েত ব্যয় ভাগাভাগি করে থাকে)
ভারত, কেরালা	স্থানীয় সরকারের নিজস্ব আয় এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুদানের যৌথ তহবিল	একই
বাংলাদেশ	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ে নিজস্ব তহবিল, ইউনিয়ন পরিষদে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা এবং নিজস্ব আয়ের যৌথ তহবিল	বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প খুবই কম। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে।

স্থানীয় সরকারের প্রকল্প অর্থায়নের অন্য একটি ভালো উদাহরণ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)। বিশ্বের অনেক দেশে স্থানীয় সরকারের সাথে পিপিপি প্রকল্প গড়ে ওঠার উদাহরণ রয়েছে। নিচে অন্যান্য দেশে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করা হলো।

সারণি ৮.৪: বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পিপিপি প্রকল্পের বিভিন্ন উদাহরণ

দেশ	নগর স্থানীয় সরকার	গ্রামীণ স্থানীয় সরকার
জাপান	ওসাকা এবং টোকিও শহরে বহুতল পার্কিং নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা পার্ক এবং গণপরিসর উন্নয়নের অনেক উদাহরণ রয়েছে।	গণপরিসর, ক্রীড়া কমপ্লেক্স, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
মালয়েশিয়া	কুয়ালালামপুর সিটি সেন্টারে বহুতল পার্কিং নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা	গ্রামীণ অঞ্চলে সুপেয় পানি সরবরাহ প্রকল্প গ্রামীণ অঞ্চলে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ
ভারত, পশ্চিমবঙ্গ	কলকাতা মিউনিসিপালিটির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (সরকারি আর্থিক সহায়তা নিয়ে উন্নয়নকৃত)	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (সরকারি আর্থিক সহায়তা নিয়ে উন্নয়নকৃত)
ভারত, কেরালা	কেরালার Thiruvananthapuram শহরে বহুতল পার্কিং উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কেরালার 'কোচি' শহরে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা	পল্লী অঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি সরবরাহ
বাংলাদেশ	বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পিপিপি'র কয়েকটি মডেল বাস্তবায়িত হলেও স্থানীয় সরকারের সাথে এখনো এ ধরনের মডেল বাস্তবায়িত হয়নি	

স্থানীয় সরকারের আয়ের উৎস

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহের আয়ের মূল উৎস কর রাজস্ব, কর-বহির্ভূত রাজস্ব এবং ইজারা।

১. সিটি কর্পোরেশন পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌর কর/গৃহকর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পার্কে প্রবেশ ফি, বিলবোর্ড স্থাপন ইত্যাদি। কর-বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু সনদ, ব্যবসায় ট্রেড লাইসেন্স/নিবন্ধন ফি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মার্কেটের ভাড়া থেকে আয় ইত্যাদি।
২. পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে মূলত পৌর কর/গৃহকর। কর-বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু সনদ, ব্যবসায় ট্রেড লাইসেন্স/নিবন্ধন ফি।
৩. জেলা পরিষদ উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে হাটবাজার, নৌকাঘাট, জেটির ইজারালব্ধ আয়।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের আয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

তথ্যগত কিছু বিভ্রাট থাকলেও বাংলাদেশের বিগত তিন দশকে জিডিপি সম্প্রসারিত হয়েছে প্রায় ১৪ গুণ এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে প্রায় আটগুণ। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় ইমারত ও বানিজ্যিক অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে কয়েকগুণ, ব্যবসায় সম্প্রসারিত হয়েছে কয়েকগুণ। কিন্তু সে অনুপাতে পৌরকর বা ব্যবসায় কর বাড়েনি। ইউনিয়ন পরিষদসমূহের আওতাধীন গ্রামসমূহের বহুতল বিলাসবহুল বাড়ি নির্মিত হয়েছে। মৎস্য খামার, পশু খামার, ডেইরি-পোল্ট্রি ফার্ম ও ছোট ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।[১৮] কিন্তু স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের(এলজিইডি) একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমীক্ষায় দেখা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। এলজিইডি'র সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার গভর্নেন্স উন্নয়নে বিভিন্ন সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের আয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশের নগর এবং গ্রামসমূহে ইমারত, মালিকানাধীন জমি, বিভিন্ন খামার ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃত তথ্য, যেমন ভবনের এলাকা, জমির পরিমাণ, মালিকানা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য কিংবা তথ্যভাণ্ডার নেই। এ কারণে কর মূল্যায়ন ও কর সংগ্রহের কোন নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। স্থানীয় সরকারসমূহে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসব তথ্য ভাণ্ডার তৈরি এবং একইসঙ্গে এটি ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা কঠিন কাজ নয়।

২. বর্তমানে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল জমির হাই-রেজুলেশন ছবি সংগ্রহ এবং সম্পদের চৌহদ্দি ইত্যাদি সহজে বের করা সম্ভব। একই সাথে মাঠ পর্যায়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে সহজে পৌর কর/গৃহকর ইত্যাদির 'অ্যাসেসমেন্ট ভ্যালু' নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৩. কিছু পৌরসভায় দক্ষ জনবল নেই। ইউনিয়ন পরিষদে কোন কারিগরি কর্মকর্তা নেই এবং কর মূল্যায়ন এবং সংগ্রহের কোন জন্য কোনো কর্মচারি নেই। পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদে উপযুক্ত জনবল সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৪. তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কর মূল্যায়ন ও কর সংগ্রহের একটি আধুনিক তথ্য ভান্ডার এবং পরিচালনা পদ্ধতি গড়ে উঠলে নগর ও গ্রাম পর্যায়ের স্থানীয় সরকারসমূহের রাজস্ব আয় সহজে কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভব।

৫. গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজারসমূহের ইজারা মূল্য নির্ধারণে কোন যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি কিংবা তথ্যভান্ডার নেই। এলজিইডি'র একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমীক্ষায় দেশের বিভিন্ন উপজেলায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের সিন্ডিকেট অত্যন্ত কম ইজারা মূল্যে হাট-বাজার ইজারার তথ্য পাওয়া গেছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কারের মাধ্যমে মূলত তিনটি ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের অর্থায়নের সংকট দূর করতে হবে। প্রথমত, স্থানীয় পর্যায়ে থেকে সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, আন্তঃসরকারি স্থানান্তর সংস্কারের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানান্তরিত করা। তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকারে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকল্প অর্থায়নে সংস্কার।

৮.৪ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

৮.৪.১ স্থানীয় সরকারের কর আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

কর আদায় স্থানীয় সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের আইনগুলোতে করের ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে (সারণি ৮.৫)। অবশ্য বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের কর আদায়ের ক্ষমতা একদিকে সীমিত, অন্যদিকে অনেক স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ভোট হারানোর ভয়ে নিয়মিত কর আদায় করেন না। এ প্রবণতা স্থানীয় সরকারের আইনগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক। হোল্ডিং করের (যা ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় ''বাড়ির খাজনা'' নামে বেশি পরিচিত) ক্ষেত্রে এটি বেশি হয়ে থাকে। এ কারণে অনেক ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ সম্ভবনা ও প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম হয়। তাই গৃহ কর সংগ্রহ না করাকে বেআইনি ঘোষণা করতে হবে। একাধিক্রমে তিন অর্থবছরে কর পরিশোধের উপযুক্ত অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ বাড়ি থেকে গৃহ কর আদায় না করতে পারলে ওই পরিষদে স্থানান্তর ও উন্নয়ন সহায়তা স্থগিত করতে হবে।

সারণি ৮.৫: স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে আরোপনীয় বিভিন্ন ধরনের করের তালিকা

ইউনিয়ন পরিষদ আইনের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় মোট ১৩ প্রকারের আয়ের উৎসের মধ্যে কর	**সিটি কর্পোরেশন আইনের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপনীয় মোট ২৬ প্রকারের আয়ের উৎসের মধ্যে কর ও উপকর**
১. নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপিত ইমারত/ভূমির বার্ষিক মূল্যের ওপর কর অথবা ইউনিয়ন রেইট। ২. পেশা, ব্যবসায় এবং বৃত্তির (কলিং) ওপর কর। ৩. সিনেমা, ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ এবং চিত্ত বিনোদনের ওপর কর। ৪. স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ আয়ের অংশ। ৫. ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত আয়ের অংশ। ৬. বিজ্ঞাপনের ওপর কর। ৭. এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে অন্য যে কোন কর। **উপজেলা পরিষদ আইনের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় মোট ৯ প্রকারের আয়ের উৎসের মধ্যে কর** ১. যে সকল উপজেলায় পৌরসভা গঠিত হয়নি সেখানে সীমানা নির্ধারণপূর্বক উক্ত সীমানা, অতঃপর থানা সদর বলে উল্লিখিত,	১. ইমারত ও জমির বার্ষিক মূল্যের ওপর কর। ২. স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ওপর কর। ৩. ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণের জন্য আবেদনের ওপর কর। ৪. নগরীতে ভোগ, ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানির ওপর কর। ৫. নগর হইতে পণ্য রপ্তানির ওপর কর। ৬. টোল জাতীয় কর। ৭. পেশা বা বৃত্তির ওপর কর। ৮. জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ ও যিয়াফত বা ভোজের ওপর কর। ৯. বিজ্ঞাপনের ওপর কর। ১০. পশুর ওপর কর। ১১. সিনেমা, ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ এবং চিত্তবিনোদনের ওপর কর। ১২. মোটর গাড়ী এবং নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের ওপর কর।

এর মধ্যে অবস্থিত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানার ওপর ধার্যকৃত কর। ২. (ক) যে সকল উপজেলায় পৌরসভা নেই সেখানে থানা সদরে অবস্থিত সিনেমার ওপর কর; (খ) নাটক, থিয়েটার ও যাত্রার উপর করের অংশ বিশেষ, যা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হয়। ৩. রাস্তা আলোকিতকরণের ওপর ধার্যকৃত কর। ৪. উপজেলা এলাকাভুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ আয়ের ১% এবং আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২% অংশ। ৫. সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন খাতের উপর আরোপিত কর হতে অর্জিত আয়। **জেলা পরিষদ আইনের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় মোট ৮ প্রকারের আয়ের উৎসের মধ্যে কর** ১. স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ওপর ধার্য করের অংশ। ২. বিজ্ঞাপনের ওপর কর। ৩. সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।	১৩. সরকার কর্তৃক আরোপিত করের ওপর উপকর। ১৪. সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপনীয় অন্য কোন কর। **পৌরসভা আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত মোট ২৯ প্রকারের আয়ের উৎসের মধ্যে কর ও উপকর** ১. ইমারত এবং ভূমির বার্ষিক মূল্যের ওপর কর। ২. স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ওপর কর। ৩. ভূমি উন্নয়ন কর এবং আদায়কৃত করের ২% অংশ। ৪. পৌর এলাকা হতে রপ্তানি পণ্যের ওপর কর। ৫. পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির ওপর কর। ৬. বিজ্ঞাপনের ওপর কর। ৭. পশুর ওপর কর। ৮. সিনেমা, ড্রামা, নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের ওপর কর। ৯. মোটর গাড়ী ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের ওপর কর। ১০. সরকার কতৃর্ক আরোপিত যে কোন করের ওপর উপ-কর। ১১. এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে অন্য যে কোন কর। ১২. সরকার কতৃর্ক আইন বলে আরোপনীয় অন্য কোন কর।

সূত্র: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইন।

স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের বাজেটসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের আদায়কৃত কর একই স্তরের মধ্যে স্থানভেদে (আনুভূমিক ক্ষেত্রে) ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, কোনো কোনো পৌরসভায় (বিশেষ করে 'গ' শ্রেণিভুক্ত) স্থানীয় রাজস্ব আয় বছরে এক কোটি টাকার কম (যেমন: ভেদরগঞ্জ), অন্যদিকে কিছু কিছু পৌরসভায় ('ক' শ্রেণিভুক্ত, বিশেষ করে যেগুলো জেলা সদরে অবস্থিত তাদের মধ্যে) স্থানীয় রাজস্ব আয় বছরে বিশ কোটি টাকার বেশি (যেমন: বগুড়া, পটুয়াখালী, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, যশোর ইত্যাদি)। 'ক' শ্রেণিভুক্ত পৌরসভাগুলো আর্থিকভাবে সক্ষম থাকার কারণে তারা নিজস্ব অর্থায়নে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত রাজস্বের মাধ্যমে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, অন্যদিকে সরকারের দিক থেকে বিপুল পরিমাণে উন্নয়ন সহায়তা পায়। তারা বাংলাদেশ মিউনিসিপাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বা বিএমডিএফ থেকেও আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতেও (এডিপি) তারা অনেক বেশি বরাদ্দ পেয়ে থাকে। ফলে, দুর্বল পৌরসভাগুলো তাদের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে হিমশিম খায়। আর্থিকভাবে সক্ষম 'ক' শ্রেণির পৌরসভাগুলোতে যেমন বেতনভাতা নিয়মিত দেওয়া হয় তেমনিভাবে অবকাঠামোসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বিশেষ করে, 'ক' শ্রেণিভুক্ত পৌরসভা যেগুলো জেলা সদরে অবস্থিত তাদের সাথে 'খ' বা 'গ' শ্রেণিভুক্ত পৌরসভার স্থানীয় রাজস্ব আয়ে বিরাট ব্যবধান তাদের আর্থিক সক্ষমতার মধ্যে যেমন পার্থক্য তৈরি করে, তেমনিভাবে তাদের উন্নয়ন স্তরের প্রকল্পগুলোর মধ্যেও বড় রকমের আনুভূমিক ব্যবধান তৈরি হয়।

সারণি ৮.৬: কয়েকটি পৌরসভার স্থানীয় রাজস্ব আয় ও মোট ব্যয়ের হিসাব (কোটি টাকায়)

পৌরসভা	স্থানীয় রাজস্ব আয়	মোট ব্যয়	স্থানীয় রাজস্ব মোট ব্যয়ের %
ধুনট	১.৬৯	৯.৮৪	১৭.১৫
উলিপুর	৪.২৩	৮.৮৮	৪৭.৬৩
বগুড়া	৩১.৫০	২৭১.০০	১১.৬২
ভেদরগঞ্জ	০.৭৮	২.৬৫	২৯.৪০
লক্ষ্মীপুর	২৪.৩০	৩৭.১৫	৬৫.৪১
রাজবাড়ি	১৩.৬৩	১৮.২৬	৭৪.৬৭
পীরগঞ্জ	২.৭১	৩.৯০	৬৯.৪৭
পটুয়াখালী	২৮.২৫	৭৬.৩৮	৩৬.৯৯
নীলফামারী	১০.৮৮	৫০.২২	২১.৬৬
নরসিংদী	২৫.৭৫	৩২.১১	৮০.২১

পৌরসভা	স্থানীয় রাজস্ব আয়	মোট ব্যয়	স্থানীয় রাজস্ব মোট ব্যয়ের %
মেহেরপুর	৯.২০	২৫.২০	৩৬.৫৩
মানিকগঞ্জ	২২.৪৯	৬০.২৯	৩৭.৩১
কুষ্টিয়া	২৮.৭১	১১১.৮৬	২৫.৬৭
ঝালকাঠি	১৪.৫৭	২৩.০০	৬৩.৩২
যশোর	৩১.০২	৬৫.২৩	৪৭.৫৬
গোয়ালন্দ	৩.৭৯	১৫.৭৯	২৪.০২
গাইবান্ধা	১৮.৯১	৩৭.১২	৫০.৯৩
দোহার	৬.৩৮	১৬.৫৭	৩৮.৪৯

সূত্র: পৌরসভাসমূহের বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট দলিল (২০১৯-২০ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাজেট দলিল অনুযায়ী)।

বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় রাজস্ব আয় অনেক কম, প্রায় ৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার মত। তবে কিছু কিছু ইউনিয়ন পরিষদ বাণিজ্য কেন্দ্র বা উন্নত অঞ্চলে অবস্থিত, যেখানে জমির মূল্য বেশি এবং জমি হস্তান্তর ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড থেকে আয়, বিভিন্ন ধরনের ফি ও ইজারালব্ধ আয় অনেক বেশি, সেখানে স্থানীয় রাজস্ব আয় কয়েক কোটি টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাভার (ঢাকা), পঞ্চসার (মুন্সিগঞ্জ), শিমুলিয়া (সাভার, ঢাকা) ও বেতিলা-মিতরা (মানিকগঞ্জ সদর) এমন ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে পড়ে। এসব ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা/সরকারি অনুদানও অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদের তুলনায় অনেক বেশি পেয়ে থাকে।

সারণি ৮.৭: কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় রাজস্ব আয় ও মোট ব্যয়ের হিসাব (টাকায়)

ইউনিয়ন পরিষদ	স্থানীয় রাজস্ব আয়	উন্নয়ন সহায়তা/ সরকারি অনুদান	অন্যান্য প্রাপ্তি	মোট ব্যয়	স্থানীয় রাজস্ব মোট ব্যয়ের %
বাচামারা, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ	৩,৩৫২,৬৬৫	২,২০০,০০০	১৫,৪৪৩,১০০	২০,৯৯৫,৭৬৫	১৫.৯৭
বান্দুরা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা	২,০২২,৭৫৪	৭,৩৩৩,৪০২	-	৯,৩৫৬,১৫৬	২১.৬২
বেরুবাড়ি, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	৩,৪০৫,৭০৪	৭০০,০০০	৪৩,৫১৫,৩২৬	৪৭,৬২১,০৩০	৭.১৫
ভোগডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম	৪,২১৬,৩৭২	৫,৭২৮,৬৬৫	৪৬,৯৮০,৪৬৩	৫৬,৯২৫,৫০০	৭.৪১
বিষ্ণুপুর, চাঁদপুর	১,২০৯,২০০	১২,২৫০,০০০	১,৫০৭,২২৫	১৪,৯৬৬,৪২৫	৮.০৮
সাভার, ঢাকা	১৫,৫৪৮,২২৭	৮,০০০,০০০	১,২৭৯,১২৩	২৪,৮২৭,৩৫০	৬২.৬৩
চকমিরপুর, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ	১,০৩৮,৬৯৫	৫,২৪১,০৫০	৬,১১২,৬১৯	১২,৩৯২,৩৬৪	৮.৩৮
হাইমচর, চাঁদপুর	৪৮১,০০০	৬,৫২০,০০০	-	৭,০০১,০০০	৬.৮৭
হলোখানা, কুড়িগ্রাম সদর	৩,৬২৫,০০০	২,৫০০,০০০	৬৬,৪২৩,৩০০	৭২,৫৪৮,৩০০	৫.০০
হাঁসারা, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	১,৪১৫,১৩৪	২,৪৫০,০০০	৫,৭৯২,৬৩২	৯,৬৫৭,৭৬৬	১৪.৬৫
জামালপুর, ঠাকুরগাঁও সদর	২,৮২৯,০০০	১,৮৭৫,০০০	৮,৪৩০,৮০৮	১৩,১৩৪,৮০৮	২১.৫৪
ধর্মগড়, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও	১,৭১৩,৫০০	৩,০০০,০০০		৮,২৭২,০০০	২০.৭১
কালীগঞ্জ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	১,৩১৭,৬০০	৫০০,০০০	৪৪,২২৯,২১১	৪৬০৪৬৮১১	২.৮৬
কল্যাণপুর, চাঁদপুর সদর	৮২১,৬০০	১,৯০০,০০০	৬,৫৪৩,৫৫৩	৯,২৬৫,১৫৩	৮.৮৭
নবগ্রাম, মানিকগঞ্জ সদর	৩,৬১৫,৫০০	১,৫০০,০০০	১০,৯০৯,৭৭০	১৬,০২৫,২৭০	২২.৫৬
পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ সদর	১৯,৮৩৪,৯২৫	৩,০৬০,০০০	১৯,১০১,৬২১	৪১,৯৯৬,৫৪৬	৪৭.২৩
রামপাল, মুন্সিগঞ্জ সদর	৪,৫৬৩,০১৬	১,৭০০,০০০	৯,১৯৭,২০৭	১৫,৪৬০,২২৩	২৯.৫১
রুহিয়া, ঠাকুরগাঁও সদর	১,৭১৫,২০০	১,৫০০,০০০	২৫,৫০০	৩,২৪০,৭০০	৫২.৯৩

ইউনিয়ন পরিষদ	স্থানীয় রাজস্ব আয়	উন্নয়ন সহায়তা/ সরকারি অনুদান	অন্যান্য প্রাপ্তি	মোট ব্যয়	স্থানীয় রাজস্ব মোট ব্যয়ের %
শিমুলিয়া, সাভার, ঢাকা	২৩,৫০৫,০০০	৩,৭০০,০০০	১৬,৪০০,০০০	৪৩,৬০৫,০০০	৫৩.৯০
বেতিলা-মিতরা, মানিকগঞ্জ সদর	৩৬,৬২,৩০০	৩,৫০০,০০০	১৩,১০৪,৫৩২	২০,২৬৬,৮৩২	১৮.০৭

সূত্র: ইউনিয়ন পরিষদসমূহের বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট দলিল (২০১৯-২০ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাজেট দলিল অনুযায়ী)।

বেশিরভাগ উপজেলা পরিষদের স্থানীয় রাজস্ব আয় প্রায় ২ থেকে ৭ কোটি টাকার মত হয়ে থাকে। কিছু উপজেলা পরিষদ দুর্গম, চরাঞ্চল ও পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত, যেখানে সামান্য পরিমাণে স্থানীয় রাজস্ব অর্জিত হয়। তবে কিছু কিছু উপজেলা পরিষদ বাণিজ্য কেন্দ্র বা উন্নত অঞ্চলে অবস্থিত, যেখানে অনেক জমি হস্তান্তর হয়, বাণিজ্যিক কর্মকান্ড থেকে আয়, ইজারালব্ধ আয় অনেক বেশি, সেখানে স্থানীয় রাজস্ব আয় দশ কোটি টাকার ওপরে হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহ সদর, কেরানিগঞ্জ ও নড়াইল সদর। অনেক উপজেলা পরিষদ বিপুল অর্থ উন্নয়ন সহায়তা/সরকারি অনুদান/প্রকল্পের অর্থ পেয়ে থাকে। অবশ্য বেশিরভাগ উপজেলা পরিষদেও উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্ত রাজস্ব থাকে যা দিয়ে তারা নিজস্ব প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

সারণি ৮.৮: কয়েকটি উপজেলা পরিষদের স্থানীয় রাজস্ব আয় ও মোট ব্যয়ের হিসাব (টাকায়)

উপজেলা পরিষদ	স্থানীয় রাজস্ব আয়	উন্নয়ন সহায়তা/ সরকারি অনুদান	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	মোট ব্যয়	স্থানীয় রাজস্ব মোট ব্যয়ের %
বরিশাল সদর	৩৬,৭৪৩,৩০০	২৯,০০০,০০০	৪১,৪৯২,০৮৯	৭৭,৮৫৮,৫৯৯	৪৭.১৯
ভোলা সদর	৪১,৫২৭,০০০	৭২,৩৮২,২০০	৩০,১২৫,৮০০	৮৩,৭৮৩,৪০০	৪৯.৫৬
চরফ্যাশন, ভোলা	২১,০০০,০০০	১২৫,০০০,০০০	১০০,০০০	১৪১,৯০০,০০০	১৪.৮০
দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ	১৭,৯৯৯,৪৫০	১৫৫,৯০৫,৭৫০	২,৮২৫,৪৫০	১৭১,০৭৯,৭৫০	১০.৫২
গোসাইরহাট, শরীয়তপুর	১৫,৪০০,০০০	১৮,৬১০,০০০	৭,৪৫৯,৮৩৬	৩৪,০১০,০০০	৪৫.২৮
হাইমচর, চাঁদপুর	৬,১৭০,০০০	১৯,০০০,০০০	১,১৭৯,৭০০	২৬,৩৪৯,৭০০	২৩.৪২
ঝিনাইদহ সদর	৪১৩,৭৮৬,৫৬২	৫৬৭,৫৮৭,৭৪৯	২,৭৮৮,৫৫৯	৯৮৩,১৬২,৮৭০	৪২.০৯
কেরানিগঞ্জ, ঢাকা	১২০,১৫০,০০০	১৫,৫০০,০০০	২২৩,০০০	১৩৫,৬৫০,০০০	৮৮.৫৭
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	৩০,৩৪৮,১০০	২৫,০০০,০০০	১০০৮৫৭০০	৫৫,৩৪৮,১০০	৫৪.৮৩
কুড়িগ্রাম সদর	২৯,৪৫০,০০০	১৩,০০০,০০০	২৩,০২২,১০০	৩৩,৯৯৩,৫০০	৮৬.৬৩
মহেশপুর, ঝিনাইদহ	৩৭,৫১৩,৭৪৫	৭,০০০,০০০	৬,০৬৭,৮৬৭	৪৪,৫১৩,৭৪৫	৮৪.২৭
মানিকগঞ্জ সদর	৬২,৩০৪,৮০০	৭,৫০০,০০০	৫০,০০০,০০০	৬৯,৮০৪,৮০০	৮৯.২৬
মৌলভীবাজার সদর	৪৪,২৫০,০০০	৩৩,০০০,০০০	২৮,১৬৫,৮৯২	৪৯,০৮৪,১০৮	৯০.১৫
মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	৫,৮৫২,০০০	১৩,২৫২,০০০	৫২,০০০	১৯,০৫২,০০০	৩০.৭২
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	২১,১৮০,২১৩	৩৮,০৬৭,০৬২	১২,৫৫৫,১৭৮	৪৬,৬৩৫,৬৫৫	৪৫.৪২
নড়াইল সদর	১০৭,৫৮২,৭০০	৫১,৬৪৩,০০০	৮৭৭,১৫৫	১৪৭,৫৮২,৭০০	৭২.৯০
নেত্রকোণা সদর	৩৯,৩৬০,০০০	৩২,০০০,০০০	৮৯৫৭৭১৩	৭১,৩৬০,০০০	৫৫.১৬
পঞ্চগড় সদর	৩১,৯৩৯,৫০০	৩৩,২০০,০০০	-	৬৫,১৩৯,৫০০	৪৯.০৩
শরীয়তপুর সদর	৪৪,৮০০,০০০	৪৬,৬০৫,০০০	৩৫,৬০৫,০০০	৮২,৮০০,০০০	৫৪.১১
ঠাকুরগাঁও সদর	৬৯,৫৪৫,৪৬৫	১৫,৯৮৪,০০০	২৪,০০০,০০০	৮৫,৫২৯,৪৬৫	৮১.৩১
রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও	১৮,৮২০,০০০	৬,০০০,০০০	৮৫১,৯০০	২৪,৮২০,০০০	৭৫.৮৩

সূত্র: উপজেলা পরিষদসমূহের বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট দলিল (২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাজেট দলিল অনুযায়ী)।

উপজেলা পরিষদের রাজস্ব আয়ের মূল উৎস হল হাট-বাজার ইজারা থেকে আয় (৪১ শতাংশ), উপজেলা পরিষদের বাসা বাড়ি খাতে আয়/জনমিলন কেন্দ্রের ভাড়া থেকে আয়, ভূমি হস্তান্তর কর (১ শতাংশ), ভূমি উন্নয়ন কর (২ শতাংশ), দরপত্র বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়, নিলামকৃত অর্থ এবং ব্যাংকের মুনাফা। পরিষদসমূহ সাধারণত তিনটি সূত্র থেকে উন্নয়ন সহায়তা পায়: ইউজিডিপি, অনুদান ও এডিপি। রাজস্ব উদ্বৃত্ত ও উন্নয়ন বাজেট থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে এই অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। খাতগুলো হল: কৃষি ও সেচ, শিল্প ও কুটির শিল্প, ভৌত অবকাঠামো, আর্থসামাজিক অবকাঠামো, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র হ্রাসকরণে সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, নারী, যুব ও

শিশু উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ।[২১] এছাড়া পরিষদসমূহ বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নেও অর্থ ব্যয় করে থাকে।

সারণি ৮.৯: কয়েকটি জেলা পরিষদের স্থানীয় রাজস্ব আয় ও মোট ব্যয়ের হিসাব (টাকায়)

জেলা পরিষদ	প্রারম্ভিক স্থিতি	নিজস্ব তহবিল	বিভিন্ন খাতে আয়	সরকারি অনুদান	মোট ব্যয়	নিজস্ব আয় মোট ব্যয়ের %
ঠাকুরগাঁও	১০৩,৮৫৫,২৫৬	৭৫,৫০০,০০০	৯৬,০০০,০০০	৯০,৬০০,০০০	৩২৯,৭৭৫,০০০	৫২.০১
বাগেরহাট	৩৩৯,৫২৯,৫৫৮	১৩৪,৫৭৪,০০০	৪৩,৭৫০,০০০	২৩০,০০০,০০০	৪৩৫,৪২৯,০০০	৪০.৯৫
চাঁদপুর	১৩৪,১৪৫,৫৮৩	২২৫,২০০,০০০	৮০,০০০,০০০	২০০,০০০,০০০	৫০৪,০৫০,০০০	৬০.৫৫
সুনামগঞ্জ	১৭৯,৫৪২,৬৫০	৮৬,৭০০,০০০	৯৭,৮৯৯,৩৫০	১৩০,৬০০,০০০	৪৪১,৪২১,৩৫০	৪১.৮২
কিশোরগঞ্জ	১০১,৬৫৪,৯৫১	১২০,৪২০,০০০	১২৫,০০০,০০০	৬০,০০০,০০০	৩০৬,৫৫০,০০০	৮০.০৬
কুড়িগ্রাম	৯০,০০০,০০০	১৩১,৭০৫,০০০	২৮৪,০০০,০০০	১৮৭,৩১৭,৫৯৭	৬৮৭,০২২,৫৯৭	৬০.৫১
মাগুরা	৩৫৭,৮৫০,১০৩	১৩২,৮৫০,০০০	৯৩,২৫০,০০০	১২১,০০০,০০০	৪৯১,৩২৫,৭৭২	৪৬.০২
মানিকগঞ্জ	৫৯৯,৫৬০,৪৩৩	১৯৯,৯০০,০০০	২৫,৫০০,০০০	৮০,০০০,০০০	৪৭২,৪০০,০০০	৪৭.৭১
রাজবাড়ি	২৬৪,৭৬১,৪৮১	৬৪,৯৪৫,০০০	৫,০০০,০০০	৭০,৫২০,০০০	১২৮,৭০০,০০০	৫৪.৩৫
সাতক্ষীরা	১৮৬,৬৭৬,১০৬	১২৪,৩৮০,০০০	৪৮,৪৫০,০০০	১২০,৪০০,০০০	৩৩৪,৫৮৩,০০০	৫১.৬৬
শরীয়তপুর	৩১১,৫৮১,৩৭৯	১৪৪,১৫৫,০০০	৬,০০০,০০০	৩৫৯,৬৫৫,০০০	৬৩৮,৫৫৭,৪৯৮	২৩.৫১
শেরপুর	২১২,১০২,৫৫৯	৭৮,৮০০,০০০	৯৯,১০০,০০০	১৫০,৫০০,০০০	৩২৯,৩৭০,০০০	৫৪.০১

সূত্র: জেলা পরিষদসমূহের বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট দলিল (২০২৩-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাজেট দলিল অনুযায়ী)।

জেলা পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস দুটি: নিজস্ব তহবিল ও বিভিন্ন খাতে আয়। নিজস্ব তহবিলের মধ্যে রয়েছে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর, ফেরিঘাট-খেয়াঘাট ইজারালব্ধ আয়, রাস্তায় ব্রিজের মাশুল/টোল, ঠিকাদার তালিকাভুক্তি নবায়ন ফি, জনগণের ব্যবহার্যে সম্পাদিত কাজের জন্য ধার্যকৃত ফি, জমি-পুকুর ইজারা বাবদ আয়, অডিটোরিয়াম/মিলনায়তন ভাড়া বাবদ আয়, ডাকবাংলো হতে প্রাপ্ত আয়, মার্কেট-গোডাউন হতে আয়, সরঞ্জাম/যানবাহন ভাড়া থেকে আয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আয়, পরিত্যাক্ত দালান কোটা/যানবাহন/যন্ত্রপাতি/মালামাল/গাছপালা ইত্যাদি বিক্রয় থেকে আয়, দরপত্র/ফর্ম বিক্রি, বিনিয়োগ থেকে আয়, ইত্যাদি। বিভিন্ন খাতে আয়ের মধ্যে মূলত রয়েছে জামানত প্রাপ্তি, অগ্রিম সমন্বয়, ভ্যাট, আয়কর ও বাণিজ্যিক স্থাপনা (বিশেষত মার্কেট) নির্মাণের সেলামি।

সারণি ৮.১০: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা স্থানীয় রাজস্ব ও মোট ব্যয়ে স্থানীয় রাজস্বের অংশ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় রাজস্ব/আয় (টাকা)	স্থানীয় রাজস্ব মোট ব্যয়ের %
ইউনিয়ন পরিষদ	৪,৮১১,৫০৫	১৯.৫০
উপজেলা পরিষদ	৫৭,৮৯১,৫৬৪	৪৯.৬৩
জেলা পরিষদ	২১০,২৫৬,৫২৯	৪৯.৪৮
পৌরসভা	১৫.৪৯	৩২.২১

সূত্র: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট দলিল থেকে নিরূপিত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাড়ি, ব্যবসায়, যানবাহনসহ বিভিন্ন খাতের উপর সরকারি কর আরোপ করে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষমতা ব্যবহার করে তারা স্থানীয় রাজস্ব আদায় করে আর্থিকভাবে অনেকটা স্বাবলম্বী করেছে। অনেক স্থানীয় প্রকল্প এ অর্থে বাস্তবায়ন করছে। সুইজারল্যান্ডে স্থানীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সরাসরি কর থেকে আসে, প্রধানত তাদের নাগরিকদের আয়, সম্পদ এবং সুবিধা এবং স্থানীয় অর্থনীতির ওপর কর থেকে। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারকে কর আদায়ের আরো বিস্তৃত ক্ষমতা দিতে হবে। বাড়ি বা ব্যবসায়ের পাশাপাশি তারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট আয়কর এবং মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

[২১] উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিভাগসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় কোন কোন উপজেলা পরিষদ তার বাজেটে উপস্থাপন করলেও বেশিরভাগ উপজেলা পরিষদের বাজেটে পরিষদের নিজস্ব প্রাপ্তি ও উন্নয়ন ব্যয়ের হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

আদায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে এনবিআর থেকে আদায়কৃত করের একটি অংশ পেতে পারে। এজন্য স্থানীয় সরকারের কর সংক্রান্ত তফশিলে সংশোধনী আনতে হবে।

অন্যদিকে পর্যটন-সমৃদ্ধ এলাকায় ''পর্যটন কর'' আরোপের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। যেমন, নেদারল্যান্ডে পর্যটককে মিউনিসিপাল পর্যটন কর দিতে হয়। দুই ধরনের পর্যটন কর রয়েছে: (ক) স্থল পর্যটন কর (হোটেল, বিছানা এবং নাস্তা, অবকাশ যাপনের কটেজ, ক্যারাভান, তাঁবু ইত্যাদিতে থাকার জন্য) (খ) জল পর্যটন কর (জাহাজে থাকার জন্য)। পৌরসভা প্রতি রাত বা দিনে প্রতি ব্যক্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে, অথবা তারা রাত্রিযাপনের খরচের একটি শতাংশ নির্ধারণ করতে পারে। হার বা শতাংশ প্রতি বছর সমন্বয় করা হয়।[১৯] বাংলাদেশে এ ধরনের কর আরোপের ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে, অন্যদিকে জনগণ সামাজিক ও পরিবেশগত দায়িত্বের বিষয়েও সচেতন হবেন। এ কর থেকে আহরিত অর্থ স্থানীয় পর্যায়ে পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। এতে একদিকে পর্যটক সমাগম বাড়বে, অন্যদিকে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

৮.৪.২ পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় পরিবেশ কর আরোপ করতে হবে।

গতানুগতিক করের পাশাপাশি পরিবেশ কর হতে পারে সকল স্তরের স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানের আয়ের অন্যতম উৎস। পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ কর আরোপ করা যায়। জাপান ও ব্রাজিলে পৌর এলাকায় মিউনিসিপ্যাল পরিবেশ কর চালু আছে।[১৯]

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের এলাকায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে এমন যন্ত্রপাতি ও যানবাহন, প্রাকৃতিক কাঠ ব্যবহার (পুনরুৎপাদন ব্যাতীত) করে এমন পেশা ও ব্যবসায়, পরিবেশগত ঝুঁকি সৃষ্টিকারী যে কোন পেশা ও ব্যবসায়, নিজস্ব ব্যবহারের জন্য যে কোন পণ্য ও সেবা যা পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি তৈরি করে তার উপর পরিবেশ কর আরোপ করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে এ করের হার হতে পারে নিম্নলিখিত ধরনের:

১. মোটরসাইকেল ৫,০০০ টাকা
২. ট্রাক্টর/নসিমন/করিমন, ডিজেলচালিত অগভীর নলকূপ ৮,০০০ টাকা
৩. ডিজেলচালিত গভীর নলকূপ ১৫,০০০ টাকা
৪. কার, মাইক্রোবাস, জিপ, লেগুনা ও পিকআপসহ হালকা যানবাহন ২০,০০০ টাকা
৫. বাস ও ট্রাকসহ ভারি যানবাহন ৪০,০০০ টাকা
৬. ক্রেন, বুলডোজার, এক্সকেভেটর ৪০,০০০ টাকা
৭. স'মিল (কাঠ চেরাই কারখানা) ২০,০০০ টাকা
৮. স্পিডবোট ২০,০০০ টাকা
৯. ইঞ্জিন চালিত নৌকা/ট্রলার ২৫,০০০ টাকা
১০. লঞ্চ/স্টিমার ৭৫,০০০ টাকা
১১. সমুদ্রগামী জাহাজ ২০০,০০০ টাকা

পরবর্তীতে এ কর স্থানীয় সরকারের এলাকায় অবস্থিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন সব রকমের পরিবেশ দূষণকারী যন্ত্রপাতি ও যানবাহন, পেশা ও ব্যবসায়ের ওপর আরোপ করতে হবে। এমনকি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিজেও জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে করে দিতে হবে।

সমগ্র বাংলাদেশে প্রথমেই চালু না করে পাইলট ভিত্তিতে তিন বছরের জন্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় পরিবেশ কর চালু করা যেতে পারে। পরীক্ষামূলক প্রয়োগের পর সংশোধনী করে পরবর্তীতে দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো এ কর চালু করতে পারে।

৮.৪.৩ বেসরকারি/ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য স্থানীয় সরকারকে কর দিতে হবে।

বর্তমানে স্থানীয় সরকারের আওতাধীন এলাকায় অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে বাণিজ্যিক ও নিজস্ব ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সরবরাহ শুরু হচ্ছে। এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এর সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আয় করলেও বা অর্থ-সাশ্রয়ের মাধ্যমে লাভবান হলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো এ কর্মকাণ্ড থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে এতে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্থর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে বাংলাদেশের পানি ব্যবহার নীতিমালারও ব্যত্যয় ঘটে। পরিবেশ ও স্থানীয় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবেচনায় স্থানীয় সরকারের আওতাধীন এলাকায় বেসরকারি/ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে কোনো ধরনের ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের উপর কর ধার্য করতে হবে। পানি বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে পানি উত্তোলনের সক্ষমতার ভিত্তিতে নলকূপের উপর করের পরিমাণ ধার্য করতে হবে।

৮.৪.৪ নিকাহ নিবন্ধন ফি তিনভাগে ভাগ করে এক ভাগ স্থানীয় সরকারকে দিতে হবে।

বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শুধু ইউনিয়ন পরিষদ নিকাহ নিবন্ধন ফি পায়। এছাড়া পৌরসভা আইনের জাতীয় তফসিল অনুযায়ী পৌরসভাসমূহ বিবাহের উপর ফি পায়, যা নিবন্ধন ফি নয় বরং অনুষ্ঠান আয়োজনের উপর ফি। নিকাহ নিবন্ধককে স্থানীয় সরকারের কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত করতে হবে (এ বিষয়ে অধ্যায় চার দেখা যেতে পারে)। এতে করে নিবন্ধকগণ যেমন জবাবদিহির আওতায় আসবেন, তেমনি একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকায়, বিশেষ করে ইউনিয়ন, পৌর ও সিটি এলাকায় বিবাহের সঠিক সংখ্যা জানা যাবে এবং বাল্যবিবাহ রোধ করতে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণও সম্ভব হবে। আর এ ফি সমান তিনভাগে ভাগ করে স্থানীয় সরকার, নিবন্ধক ও কেন্দ্রীয় সরকারের (আইন মন্ত্রণালয়) মধ্যে বণ্টিত হবে।

৮.৪.৫ স্থানীয় পর্যায়ে কর আদায়ের কর্তৃত্ব শুধু ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে অর্পণ করতে হবে।

বর্তমানে সব স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর কর আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষমতাবলে উপজেলা পরিষদের নয় প্রকারের আয়ের উৎসের মধ্যে পাঁচ প্রকারের উৎসই বিভিন্ন ধরনের কর, যার মধ্যে অনির্ধারিত কর ও রয়েছে। এছাড়া আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদের বিজ্ঞাপন, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত করও রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে করের ব্যপ্তি বেশ বড়, যেমন: ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর কর (উপজেলা সদরে পৌরসভা না থাকলে), বিনোদনমূলক ও সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড (সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, যাত্রা ইত্যাদি), রাস্তা আলোকিতকরণ, সম্পত্তি হস্তান্তর ও ভূমি উন্নয়ন করের অংশ (যথাক্রমে ১ শতাংশ ও ২ শতাংশ) রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হল, সকল উপজেলা ও জেলা পরিষদকেই কোনো না কোনো ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত। সুতরাং করের দ্বৈততা পরিহারের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের আইনের তফসিলের সংশ্লিষ্ট অংশের করগুলো বাদ দিতে হবে।

প্রস্তাবিত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সিটি গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে সিটি কাউন্সিলগুলো স্থানীয় কর আদায়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। সিটি গভর্নমেন্টের আওতাধীন সিটি কর্পোরেশন শুধু স্থানীয় পর্যায় থেকে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করবে।

৮.৪.৬ মডেল কর তফসিল হালনাগাদ করতে হবে।

স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের আইন অনুযায়ী রাজস্বের উৎসসমূহ মূলত বিভিন্ন ধরনের কর, ফি ও সেবার উপর চার্জ। এ কর, ফি ও চার্জগুলো আরোপ করার জন্য একক কাঠামো তৈরির উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য এবং ২০১৪ সালে পৌরসভার জন্য মডেল কর তফসিল প্রবর্তন করা হয়। এ তফসিলের ফলে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে কর ও অন্যান্য উৎস থেকে রাজস্ব আদায় সহজ হয়। কিন্তু বিগত এক দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন হয়েছে তেমনি গ্রাম ও শহর উভয় এলাকারই মূল্য সূচক অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ কর, ফি ও চার্জের হার একই থাকায় সম্ভাবনার তুলনায় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব অনেক কম অর্জিত হয়েছে। এ কারণে মডেল কর তফসিল মূল্য সূচকের সাথে সমন্বয় করে

হালনাগাদ করতে হবে। মূল্য সূচক সমন্বিত একটি সংশোধিত তফসিল এ অধ্যায়ের সংযোজনীতে উপস্থাপন করা হল। তবে হালনাগাদ ও যুগপোযোগী একটি নতুন মডেল তফসিল প্রণয়নের জন্য অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ ও বিষেজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করতে হবে। এ ছাড়া প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কর তফসিলকে মূল্য সূচকের সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদ করতে হবে।

৮.৪.৭ পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় পর্যায়ে দ্বৈত টোল পরিহার করতে হবে।

পার্বত্য অঞ্চলে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বারবার টোল দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ইউনিয়ন থেকে পণ্যবাহী একটি ট্রাক জেলার বাইরে যেতে চাইলে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও জেলা পরিষদকে টোল দিয়ে জেলা থেকে বের হতে হয়। অথচ পার্বত্য অঞ্চলের বাইরে অন্য জেলায় শুধু একটি পরিষদে টোল দিতে হয়। এ ধরনের টোল ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক এবং এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করে। তাই পার্বত্য অঞ্চলে একই ব্যবসার বহু-স্তর বিশিষ্ট টোল ব্যবস্থা বাতিল করে শুধুমাত্র স্থানীয় সরকার একটি স্তরে, অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে এ টোল আরোপের ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে।

৮.৪.৮ অপেক্ষাকৃত দূর্বল সিটি কর্পোরেশনগুলোতে স্থানীয় রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

ঢাকার বাইরে অবস্থিত সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে গাজীপুর ও চট্টগ্রামের আর্থিক ক্ষমতা বেশ মজবুত। এর মূল কারণ তাদের নিজস্ব উৎস থেকে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব আয় অর্জিত হয়। অন্যদিকে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার মত সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে দূর্বল এবং তারা কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে আসা উন্নয়ন সহায়তা ও স্থানান্তরের উপর বেশ খানিকটা নির্ভরশীল। নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব বাড়াতে হলে নতুন আয়ের উৎস তৈরি করতে হবে। যেমন - বাজার ও ব্যবসায়িক প্রকল্প তৈরি করা, পিপিপির ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে সহায়তাপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ।

সারণি ৮.১১: সিটি কর্পোরেশনসমূহের প্রাপ্তির উৎস (কোটি টাকায়)

	কর-রেইট, ফি ও অন্যান্য	উন্নয়ন ব্যতীত সরকারি অনুদান	সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (এডিপি)	উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকল্প	মোট প্রাপ্তি	অভ্যন্তরীণ উৎস মোট প্রাপ্তির %
ঢাকা উত্তর, ২০২২-২৩ স	১,১৯৩.৬৫	৩.০০	৮৯৭.৯৫		২,১৪৮.৭২	৫৫.৫৫
ঢাকা দক্ষিণ, ২০২৩-২০২৪ স	১,০৬১.৫৬		৭৮৩.৮৫		১,৮৪৫.৪১	৫৭.৫২
গাজীপুর, ২০২২-২৩ প্র	৩০৩.৮০	১.৪২	২৫.৫০	১২১৬.৫৪	১,৫৪৭.৬৬	১৯.৬৩
চট্টগ্রাম, ২০২৩-২৪ স	৬৭৪.৬৯	০.৬৫	৯৮৩.০৫		১,৬৫৮.৩৯	৪০.৬৮
রংপুর, ২০২২-২৩ প্র	৬৭.৮২	৩.১২	৯৫.৯১		১৬৬.৮৫	৪০.৬৫
খুলনা, ২০২২-২৩ প্র	১৯৭.৫৭	১.০৭	৩৭৩.৭২		৫৭২.৩৭	৩৪.৫২
সিলেট, ২০২১-২২ প্র	৬৪.৩২	১.৯১	৪১২.৯৯	১.৯৬	৪৮১.১৭	১৩.৩৭
রাজশাহী, ২০২৪-২৫ ব	১৮৫.৫০	১.৯৬	৪১০.৪৯		৫৯৭.৯৫	৩১.০২
কুমিল্লা, ২০২০-২১ প্র	১৪.১৭	১.০০	১২.৯৮	২৫.২৩	৭০.৮৯	১৯.৯৯
নারায়ণগঞ্জ, ২০২১-২২ প্র	১৪০.১৭	১.১১	৩৫৬.৩৬		৪৯৭.৬৪	২৮.১৭
ময়মনসিংহ, ২০১৯-২০ প্র	৪০.৫৯	১.১৮	৭০.২৩	১০১.৭১	২১৩.৭০	১৮.৯৯
বরিশাল, ২০২১-২২ প্র	৮২.৮৫	৫.৬২	৫৭.৮২		১৪৬.২৯	৫৬.৬৩

সূত্র: সিটি কর্পোরেশনসমূহের বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট দলিল।

সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদে পিপিপি এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.৪.৯ নগর স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অর্থায়নে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

বর্তমানে বেশিরভাগ সিটি কর্পোরেশনের বাজেটে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়ন জনগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ফরাসি সহায়তা ব্যাংক (এএফডি), জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা এবং দ্বিপাক্ষিক সংস্থাসমূহ যেমন জাপানি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারি উন্নয়ন অনুদানের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নসহ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে সিটি ও পৌরসভার চাহিদা অনুযায়ী বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) গঠন করা হয়েছে।[১৯] অপেক্ষাকৃত ছোট পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর উন্নয়ন অর্থায়নে বিএমডিএফ এবং উন্নয়ন সহযোগিদের অর্থায়ন বাড়াতে হবে। এ অর্থায়ন বাড়ানোর জন্য স্থানীয় উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ বৃদ্ধির উপর জোর দিতে হবে। স্থানীয় কর, ফি, উপকর, বিল, ভাড়া, বিনিয়োগের লাভ ইত্যাদির ওপর গুরু   দিয়ে সম্পদ সংগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করতে হবে যাতে করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কালের মধ্যেই সিটি ও পৌরসভাগুলোর নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৮.৪.১০ কর-বর্হিভূত স্থানীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে হবে।

কর বর্হিভূত রাজস্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস রয়েছে। সাধারণভাবে ফি, ভাতা, পানি সহ সেবার চার্জ, বিল, লাভ/মুনাফা ও সুদ কর-বর্হিভূত আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উপর টোল ও সম্পদের ইজারা থেকেও এ ধরনের রাজস্ব অর্জিত হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হতে হবে সেবার পরিধি ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি, নতুন অবকাঠামো তৈরি যা বাণিজ্যিক/ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা যায় (যেমন: বাজার বা কমিউনিটি সেন্টার, বেসরকারি অফিসসের জন্য স্থান তৈরি ইত্যাদি) যেখান থেকে ভাড়া, অগ্রিম ও সেলামির মত রাজস্ব আসতে পারে। এছাড়া নিজস্ব সঞ্চয় থেকে স্থায়ী হিসেবে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে মুনাফা আসতে পারে। উপরন্তু, সঞ্চয় থেকে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে মুনাফা লাভ করা যায়।

সারণি ৮.১২: স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে আরোপনীয় বিভিন্ন ধরনের কর-বহির্ভুত আয়ের উৎস তালিকা

ইউনিয়ন পরিষদ আইনের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় মোট ১৩ প্রকারের আয়ের উৎসের মধ্যে কর-বহির্ভুত উৎস	**সিটি কর্পোরেশন আইনের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপনীয় মোট ২৬ প্রকারের আয়ের উৎসের মধ্যে কর-বহির্ভূত উৎস**
১. পাকা ইমারতের সর্বমোট আয়তনের প্রতি বর্গফুটের ওপর নির্ধারিত হারে ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি। ২. ইউনিয়ন পরিষদ কতৃর্ক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের ওপর ফি। ৩. ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে নির্ধারিত হাট-বাজার এবং ফেরী ঘাট হতে ফি (লীজ মানি)। ৪. ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে হস্তান্তরিত জলমহাল এর সরকার নির্ধারিত অংশ। ৫. ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে অবস্থিত পাথরমহাল, বালুমহালের আয়ের সরকার নির্ধারিত অংশ। ৬. নিকাহ নিবন্ধন ফি। **উপজেলা পরিষদ আইনের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় মোট ৯ প্রকারের আয়ের উৎসের মধ্যে কর-বহির্ভুত উৎস** ১. উপজেলার আওতাভুক্ত এলাকায় অবস্থিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট-বাজার, হস্তান্তরিত জলমহাল ও ফেরীঘাট হতে ইজারালব্ধ আয়।	১. বাতি ও অগ্নি রেইট। ২. ময়লা নিষ্কাশন রেইট। ৩. জনসেবামূলক কার্য সম্পাদনের জন্য রেইট। ৪. পানি কল ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য রেইট। ৫. স্কুল ফি। ৬. কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কোন জনসেবামূলক কার্য হইতে প্রাপ্ত করের ওপর ফি। ৭. মেলা, কৃষি প্রদর্শনী, শিল্প প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফি। ৮. বাজারের উপর ফি। ৯. কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন ও অনুমতির জন্য ফি। ১০. কর্পোরেশন কর্তৃক কৃত কোন বিশেষ কার্যের জন্য ফি। ১১. পশু জবাই দেওয়ার জন্য ফি। ১২. এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে অনুমোদিত অন্য কোন ফি।

২. বেসরকারিভাবে আয়োজিত মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের ওপর ধার্যকৃত ফি। ৩. ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত খাত এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার আওতা বহির্ভূত খাত ব্যতীত বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্তি ও পেশার উপর পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের ওপর ধার্যকৃত ফি। ৪. পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার ওপর ধার্যকৃত ফি ইত্যাদি। ৫. সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন খাতের উপর আরোপিত রেইট, টোল, ফি বা অন্য কোন উৎস হতে অর্জিত আয়। **জেলা পরিষদ আইনের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় মোট ৮ প্রকারের আয়ের উৎসের মধ্যে কর-বহির্ভূত উৎস** ১. পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরীর ওপর টোল। ২. পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেইট। ৩. পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফি। ৪. পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমূলক কাজ হতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফি। ৫. পরিষদ কর্তৃক কৃত কোন বিশেষ সেবার জন্য ফি।	**পৌরসভা আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত মোট ২৯ প্রকারের আয়ের উৎসের মধ্যে কর-বহির্ভূত উৎস** ১. ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের আবেদনের ওপর ফি। ২. পৌর এলাকায় ভোগ, ব্যবহার অথবা বিক্রয়ের জন্য আমদানি পণ্যের ওপর ফি। ৩. টোল জাতীয় ফি। ৪. জন্ম, বিবাহ, দত্তক এবং ভোজের উপর ফি। ৫. বাতি রেইট ও অগ্নি রেইট। ৬. ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট। ৭. জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন রেইট। ৮. পানির স্থাপনা অথবা পানি সরবরাহের জন্য রেইট। ৯. স্কুল ফি। ১০. পৌরসভা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকৃত কোন জনসেবামূলক কাজ হতে প্রাপ্ত সুবিধাদির উপর ফি। ১১. মেলা, কৃষি প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফি। ১২. পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন এবং অনুমতির জন্য ফি। ১৩. পৌরসভা কর্তৃক বিশেষ সেবার উপর ফি। ১৪. পশু জবাইয়ের জন্য ফি। ১৫. জলমহাল/ফেরীঘাট হইতে ফি। ১৬. পৌর এলাকার সীমানার মধ্যে বালুমহাল/পাথর মহালের উপর ফি।

সূত্র: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইন

পানি সরবরাহ থেকে রাজস্ব আদায় মোট রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সেবা প্রদান করতে অনেক পৌরসভার হিমশিম খেতে হয়, কেননা ভূ-উপরিস্থ পানি ও শিল্প কারখানার কারণে দূষিত পানিকে পরিশোধনের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থ সংস্থান করতে হয়। অন্যদিকে পয়ঃবর্জ্যসহ সমগ্র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যেমন ব্যয়বহুল, তেমনি ফি’র (user fee) মাধ্যমে এ ব্যয় তুলে আনাও অত্যন্ত কঠিন। তাই সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ যেখানে ওয়াসা নেই, সেখানে আধুনিক ও নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃব্যবস্থাপনার সুবিধাসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্লান্ট স্থাপন করতে হবে এবং সেবা প্রদান থেকে বাস্তবসম্মত ফি ধার্য করতে হবে যাতে পৌরসভা ও সিটির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।

প্রস্তাবিত জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার আইন ২০২৫ বলে সকল নির্মাণ পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে প্রণয়ন ও পাশ করার জন্য ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন একটি ফি পাবে। এ অর্থ থেকে স্থানীয় সরকার সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত কর্মচারিদের বেতন বাবদ অর্থ সরকারি তহবিলে হবে জমা হবে।

৮.৪.১১ মধ্যমেয়াদে বিএমডিএফের সংস্কার করে ট্রাস্ট ফান্ডে রূপান্তর করতে হবে।

বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার উন্নয়ন প্রকল্প অর্থায়নের বড় অংশ আসে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকল্প অর্থায়ন থেকে। নগর স্থানীয় সরকার (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) এর উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বিএমডিএফ গঠন করা হয়েছে। এ প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে একটি অংশ (৮০ শতাংশ) অনুদান এবং বাকি অংশ (২০ শতাংশ) ১০ শতাংশ সুদের ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়।

স্থানীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিএমডিএফ-এর অর্থায়নে একটি ভাল উৎস হলেও দুটো কারণে এটি যথাযথভাবে কাজ করছে না। প্রথমত উন্নয়ন সহযোগিদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, পৌরসভা ও সিটিগুলো সরকারের

কাছ থেকে উন্নয়ন সহায়তা পাচ্ছে, যা সুদসহ ফেরত দিতে হয় না। তাই পৌরসভা ও সিটিগুলো বিএমডিএফ থেকে সাধারণত ঋণ নিয়ে এমন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চান না যেগুলো থেকে তারা ভাড়া, ইজারা ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে আয় করতে পারে না। অন্যদিকে এডিপি/উন্নয়ন সহায়তা ও উন্নয়ন সহযোগিদের অর্থায়নে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় সেগুলো থেকে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোতে নিয়মিত রাজস্ব আসে না। তাই স্থানীয় সরকারের রাজস্বের উৎস বৃদ্ধি করতে যে বিনিয়োগ প্রয়োজন তাতে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে বিএমডিএফ থেকে অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অবকাঠামো নির্মাণ ঋণ প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিএমডিএফ-এর তহবিলের আকার বৃদ্ধি করতে হবে। তাই বিশ্বব্যাংকে ও এডিবিসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) আলোচনা শুরু করতে হবে যাতে বিএমডিএফ-এর তহবিল বৃদ্ধি পায়।

বিএমডিএফ-এর তহবিল সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে যাতে করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদসহ পার্বত্য অঞ্চলের পরিষদসমূহও এখান থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন করতে পারে। এজন্য বিএমডিএফ-এর নাম পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকার ট্রাস্ট ফান্ড (এলজিটিএফ) (অথবা স্থানীয় সরকার উন্নয়ন তহবিল বা এলজিডিএফ) করতে হবে। এতে বিভিন্ন চ্যানেলে উন্নয়ন সহযোগিদের অর্থায়নকে এক চ্যানেলে আনতে হবে এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বা একই ধরনের প্রকল্পে অর্থায়নে দ্বৈততা এড়ানো যাবে। অন্যদিকে, যেহেতু গ্রাম শহরের ব্যবধান দ্রুত ঘুচে যাচ্ছে এবং সারা দেশ জুড়েই দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে, তাই সকল স্থানীয় সরকারে রাজস্ব আয় যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পে অর্থায়নের পথ সুগম করতে মধ্যমেয়াদে বিএমডিএফ-কে এলজিটিএফ-এ রূপান্তরিত করতে হবে। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এ ট্রাস্ট ফান্ডে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের রাজস্ব আয়ের/উদ্বৃত্তের একটি নির্ধারিত অংশ জমা করবে। এই জমা থেকে কমপক্ষে পাঁচ বছর পর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন করতে পারবে।

প্রস্তাবিত এলজিটিএফ/এলজিডিএফ-কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এতে স্থানীয় সরকারকে অর্থায়নের জটিলতা নিরসন এবং সহজভাবে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ প্রদান করা যাবে। এর মূল কাজ হবে স্বাধীনভাবে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন করে অর্থায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আর্থিক ও কর্মসম্পাদন নিরীক্ষা পরিচালনা করা।

৮.৪.১২ স্থানীয় সরকারের উদ্ভাবনীমূলক অর্থায়নে বিশেষ বন্ড চালু করা যেতে পারে।

নগরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের বেশিরভাগই আর্থিক সংকটে থাকে। ‘খ’ ও ‘গ’ শ্রেণীর পৌরসভাগুলোর আর্থিক ভিত্তি অত্যন্ত দূর্বল। এর প্রধান কারণ রাজনৈতিক বিবেচনায় এ পৌরসভাগুলো ঘোষণা করা হয়েছে। অনেক ‘গ’ শ্রেণির পৌরসভার নগরের সুবিধা, পরিষেবা, ভবন, ভৌত কাঠামো, শিল্প কলকারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নেই। এ কারণে এসব পৌরসভায় স্থানীয় পর্যায় থেকে সম্পদ আহরণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। আবার ‘খ’ শ্রেণীর পৌরসভায় স্থানীয় পর্যায় থেকে সম্পদ আহরণ করা হলেও তা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় অপ্রতুল। আবার সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি ‘ক’ শ্রেণীর পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলোর স্থানীয় পর্যায় থেকে সম্পদ আহরণের ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম (যেমন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন)। এসব পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলো জনচাহিদার ভিত্তিতে স্থানীয় অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চাইলে এবং নিজস্ব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থায়নে ইচ্ছুক হলে তারা বন্ড ইস্যু করতে পারেন। ব্রাজিল ও মেক্সিকোতে পৌর কর্তৃপক্ষ বন্ড ইস্যু করার মাধ্যমে আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। এসব বন্ডের মাধ্যমে তারা নগর উন্নয়নের জন্য বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, যা ব্যক্তি ও যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা অর্জনে সহায়তা করে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনামে মিউনিসিপাল বন্ড চালু আছে।[২২] বাংলাদেশের পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোতে বন্ড ইস্যুর সুযোগ

---

[২২] Manoj Sharma, Junkyu Lee, and William Streeter. 2023. “Mobilizing Resources through Municipal Bonds: Experiences from Developed and Developing Countries”, *ADB Sustainable Development Working Paper No 88*, Manila: Asian Development Bank.

সৃষ্টি করা হলে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা যেমন সহজ হবে, তেমনি আর্থিক বাজারের সাথে নগর স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করে বেসরকারি বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত হবে। বন্ডে বিনিয়োগ হবে দীর্ঘমেয়াদি। ফলে এটি স্থানীয় সরকারের দায় হলেও তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে স্থানীয় বৃহৎ ও মাঝারি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, যেমন: নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য থেকে জ্বালানি ও জৈব সার উৎপাদন প্রকল্প, ইত্যাদি। এ প্রকল্পগুলো থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত রিটার্ন ইতিবাচক হবে এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিষেবা উন্নত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের বন্ডের দায় পরিশোধ করার সক্ষমতাও বাড়বে।

স্থানীয় সরকারের অর্থ সংস্থানের আরেকটি উপায় হতে পারে গ্রিন বন্ড। বিশ্ব পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে স্থানীয় সরকারের গ্রীন বন্ড প্রচলিত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো ইত্যাদি দেশগুলোতে পৌর কর্তৃপক্ষ এ বন্ড চালু করেছে। টরেন্টা, সান ফ্রান্সিসকো, মেক্সিকো সিটি এবং কেপ টাউন গ্রিন মিউনিসিপ্যাল বন্ড সফলভাবে আর্থিক বাজারে এনেছে।[২৩] এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়া ইতোমধ্যেই গ্রিন বন্ড চালু করেছে।[২৪] বন্ডের অর্থ সুপেয় পানি, বর্জ্য পানি, জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, পরিসর আলোকিতকরণ এবং মেট্রো পরিবহনের জন্য অবকাঠামো তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়।[২৫] ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বাজেটে ১ কোটি টাকার গ্রিন বন্ড বাজারে ছাড়ার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু ঐ বন্ড ইস্যু বাবদ কোনো প্রাপ্তি না থাকায় পরবর্তীতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেটে তারা এ খাতে কোনো প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তি হিসেবে রাখেননি। অথচ নাগরিক সচেনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করলে গ্রিন বন্ডের মাধ্যমে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলো পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার প্রকল্প গ্রহণে, বিশেষ করে urban heat island effect/microclimate change-এর প্রভাব মোকাবিলায় গ্রিন বন্ডের অর্থ ব্যবহার করতে পারে।

মানচিত্র ১: জি-২০ দেশগুলোর ১৪ টি বাজারে ২৩ টি মুদ্রায় দেশীয় বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য চালু করা গ্রিন বন্ড

সূত্র: World Economic Forum (2023), https://www.weforum.org/stories/2023/11/heres-how-3-cities-are-using-municipal-green-bonds-to-finance-climate-infrastructure/

[২৩] https://www.weforum.org/stories/2023/11/heres-how-3-cities-are-using-municipal-green-bonds-to-finance-climate-infrastructure/

[২৪] https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2021/07/The-potential-of-municipal-green-bonds.pdf

[২৫] https://www.southpole.com/news/mexico-city-issues-first-municipal-green-bond-in-latin-america

৮.৪.১৩ বাজেট প্রণয়নের জন্য অভিন্ন কাঠামো ব্যবহার করতে হবে।

বর্তমানে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের বাজেট তৈরিতে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো ব্যবহার করা হয়। এমনকি একই স্তরের স্থানীয় সরকার ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো ও ভাষায় বাজেট প্রস্তুত করা হয়। এ কারণে বাজেটের খাতগুলোর শিরোনাম অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি তৈরি করে। অন্যদিকে কোনো কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী বাজেটের প্রধান খাত অনুযায়ী যেমন উপস্থাপন করে না, আবার বিস্তারিত বাজেটে অনেক সময় স্ব-স্ব প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের হিসাব পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়। আবার খাত ও উপ-খাতের হিসাবসমূহ উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও একই কাঠামো ব্যবহার করা হয় না। তাই প্রতিটি স্তরের বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে অভিন্ন কাঠামো ব্যবহার করতে হবে।

অভিন্ন বাজেট কাঠামো তৈরির মূল উদ্দেশ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা, বিভ্রান্তি দূর করা এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব ব্যয়ের পর নিট আয় কতটুকু থাকলো তার একটি পরিষ্কার হিসাব উপস্থাপন যাতে করে অপ্রয়োজনীয় ও অদক্ষ খাতে ব্যয় কমিয়ে সেবার মান ভালো করা যায়, আউটসোর্সিং সম্ভব হয় এবং ব্যয়-সাশ্রয়ী পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন গড়ে তোলা যায়। এতে স্থানীয় সরকারের সঞ্চয়ের অভ্যাসও গড়ে তোলা যাবে। একীভূত বাজেট কাঠামোর একটি খসড়া এ প্রতিবেদনের সংযোজনীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রণয়ন করে একীভূত বাজেট কাঠামো তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে।

৮.৪.১৪ প্রতিটি স্তরে প্রণীত বাজেট সরকারের নির্বাহী বিভাগে জমা প্রদানের পর অনতিবিলম্বে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

বর্তমানে বেশিরভাগ স্থানীয় সরকার বাজেট প্রস্তুতের পর তা সকলের অবগতির জন্য তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে না। সংস্কার কমিশন বেশির ভাগ ইউনিয়ন ও পৌরসভার ওয়েবসাইটে সর্বশেষ অর্থ বছরের (২০২৪-২৫) প্রস্তাবিত বাজেট পায়নি। অথচ স্থানীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের পরিস্থিতি বোঝার জন্য এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা আনায়নে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেট দলিল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি। এ কারণে স্থানীয় সরকারের আইনে সর্বশেষ বাজেট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। স্থানীয় সরকারের আইন অনুযায়ী অংশগ্রহণমূলকভাবে বাজেট প্রণয়নের প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করার পর প্রস্তুতকৃত বাজেট দলিলটি সরকারের নির্বাহী বিভাগে জমা প্রদানের সাত দিনের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৮.৪.১৫ স্থানীয় সরকারের পরিচালন ব্যয় হ্রাস করতে সেবা প্রদানকারী কিছু জনবল ও সেবার আউটসোর্সিং করতে হবে।

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আইনে স্থানীয় উৎস থেকে অনেক আয়ের খাত থাকলেও সেবা প্রদানকারী জনবলের বেতন-ভাতার পেছনে উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় হয়। এছাড়া যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণেও অনেক অর্থ ব্যয় হয়। এর ফলে পৌর ও সিটি এলাকায় সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হলেও রাজস্ব ব্যয়ের কারণে খুব বেশি রাজস্ব উদ্বৃত্ত থাকে না যেখান থেকে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলো উন্নয়ন ব্যয় ও সঞ্চয়কে কাজে লাগাতে পারে। এ কারণে স্থানীয় সরকারের ব্যয় সাশ্রয় জরুরি আর সাশ্রয়ের একটি ভাল উপায় হতে পারে স্থায়ী বা নিয়মিত জনবলের পরিবর্তে খণ্ডকালীন জনবল নিয়োগ এবং জনবলের আউটসোর্সিং। এছাড়া পানি সরবরাহ, পরিবহন সেবা, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম পরিচালনা, বর্জ্য ও পয়ঃব্যবস্থাপনার মত সেবাকে ইজারার মত আউটসোর্সিং করতে পারলে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলো অনেকটা ব্যয় সাশ্রয় করতে পারবে। এ অর্থ সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

অবশ্য বেশ সাশ্রয়ের পদ্ধতি হিসেবে আউটসোর্সিং কার্যকর কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য কিছু পাইলট ভিত্তিতে ‘ক’ শ্রেণীর পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে সেবাসমূহ কমপক্ষে তিন বছর আউটসোর্সিং করতে হবে। এ প্রক্রিয়া যদি সফল হয় তাহলে বাকি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে আউটসোর্সিং কার্যকর করা যেতে পারে। তবে ঢালাওভাবে সব খাতের সেবা আউটসোর্সিং না করে যে খাতগুলোতে উৎপাদনশীলতা কম এবং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি কর্মী নিয়োজিত আছে, সেরকম খাতে এবং রাজস্ব আয়ের তুলনায় অপ্রয়োজনীয় অনেক ব্যয় হচ্ছে সে খাতগুলোতে আউটসোর্সিং করতে হবে। তবে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলো অত্যন্ত স্বল্প বা নামমাত্র বেতনে দীর্ঘদিন ধরে বহু কর্মী তাদের জীবন নষ্ট করছে। তাই স্থানীয় সরকার সার্ভিসের মাধ্যমে গঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মীদের সম্মানজনকভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৪.১৬ উদ্বৃত্ত রাজস্বের একটি অংশ সঞ্চয় করতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানেগুলোর বেশিরভাগ অর্থ সংকটে থাকে। এর একটি কারণ স্থানীয় উৎস থেকে যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব বা সম্পদ সংগ্রহ করতে না পারা। আরেকটি কারণ সংগৃহীত রাজস্ব ও সম্পদের দক্ষ ও কৌশলী ব্যবস্থাপনার অভাব। দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে, কেননা তারা স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদান, ভবন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে কর ও ফি, এবং হাটবাজার, জলমহাল ইত্যাদি থেকে ইজারালব্ধ রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়া ঋণ কার্যক্রম, ভাড়া ও বিনিয়োগ থেকেও রাজস্ব আদায় হয়। রাজস্ব ব্যয়ের পরে যে উদ্বৃত্ত থাকে তা সাধারণত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়ন হিসেবে স্থানান্তর করে থাকে। কিন্তু জেলা পরিষদগুলোতে ব্যয়ের যথেষ্ট খাত না থাকায় তারা বড় ধরনের একটি তহবিল গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে কয়েকটি সিটি কর্পোরেশনের ব্যাংকে স্থায়ী হিসেবে কিছু অর্থ জমা থাকলেও তা তাদের মজবুত আর্থিক ভিত্তি তৈরির জন্য সহায়ক নয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তার রাজস্ব উদ্বৃত্তের অর্ধেক যাতে ব্যাংকে স্থায়ী হিসেবে সঞ্চয় করতে পারে সেজন্য আইনে একটি ধারা সংযুক্ত করতে হবে। সঞ্চয়ের মুনাফা থেকে তারা ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে। এতে করে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা বাড়বে। আর সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে উঠলে প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যয় সাশ্রয়ে ও স্থানীয় পর্যায় থেকে অধিক রাজস্ব সংগ্রহে আগ্রহী হবে।

৮.৪.১৭ হাটবাজারসহ স্থানীয় সম্পদ থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্য সম্ভাব্য ইজারা আয়ের মূল্যায়ন করতে হবে এবং সকল হাটবাজারের যথাযথ নিবন্ধন করতে হবে।

স্থানীয় সরকারের আয়ের একটি বড় উৎস হাটবাজার, জল মহাল, বালু মহাল ও পাথর মহালের ইজারালব্ধ রাজস্ব। এর মধ্যে হাটবাজার ইজারা থেকে সর্বাধিক আয় হয়। কিন্তু হাটবাজার থেকে সম্ভাব্য আয়ের অতি সামান্য অংশ অর্জিত হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তথ্যমতে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৯ হাজার হাটবাজার আছে, যার মধ্যে মাত্র ৮,৩৯১টি নিবন্ধিত। আরও প্রায় ৯,৩৫০ টি হাটবাজার চালু হয়েছে কিন্তু সেগুলো নিবন্ধিত নয়। ফলে হাট-বাজারগুলোর উন্নয়ন হয় না এবং এদের যেমন ইজারা হয় না, তেমনি স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার এ ইজারা মুল্যের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

দেশে নিবন্ধিত বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। বাজারকে নির্দিষ্ট এলাকায় সীমিত করতে হবে। সারাদেশে যত্রতত্র বাজারের অনুমতি দেওয়া যাবে না। হাট-বাজারের বিস্তারিত তথ্য-উপাত্তসহ একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করতে হবে যা ইজারামূল্য নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। এলজিইডি'র কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের হাট বাজার তথ্যভাণ্ডারটি প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে নিয়ে এটিকে সম্প্রসারিত ও বিশেষায়িত করা যেতে পারে।

অন্যদিকে হাটবাজারগুলোর ইজারা মূল্য নির্ধারণে পেশাদার মূল্যায়ন পরিচালিত হয় না। এ কারণে প্রকৃত ইজারা মূল্যের চাইতে অনেক কম মূল্যে এগুলো ইজারা দেয়া হয়, যে কারণে রাজস্বও কম অর্জিত হয়। মূল্যায়নের অভাবে জল মহাল, বালু মহাল ও পাথর মহাল থেকেও অনেক কম রাজস্ব অর্জিত হয়। তাই স্থানীয় সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে এসব সম্পদ যথাযথ নিবন্ধেনের মাধ্যমে ভৌত ও অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। অন্যদিকে পেশাদার প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতি বছর এদের প্রকৃত ইজারামূল্য নির্ধারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সরকারের আইনের মধ্যে একটি ধারা সংযুক্ত করে সম্পদের পেশাদার ইজারামূল্য নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

সারা দেশে বাজারগুলো সুনির্দিষ্ট একটি ভৌগলিক আয়তনে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সারাদেশ জুড়ে সড়ক, ফুটপাত, বাসস্ট্যান্ড, অফিস-আদালতের পাশে প্রতিদিন অস্থায়ী বাজার বসে। এগুলো নানা জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে। সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত স্থান ছাড়া যত্রতত্র বাজার বসানো বন্ধ করতে হবে।

অনিবন্ধিত বাজারগুলোর মধ্যে বেশ কিছু বাজার সরকারের অন্যান্য সংস্থার (যেমন সড়ক ও জনপথ) এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে গড়ে উঠেছে। এ কারণে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এগুলো নিবন্ধন করা ক্ষেত্রে আইনগত বাধা

রয়েছে। কিন্তু যেহেতু বাজারগুলো পরিচালিত হচ্ছে, তাই এগুলোকে এবং নিবন্ধনের বাইরে রাখা যেমন বেআইনি, তেমনি নিবন্ধন না হয় হওয়ায় এ বাজারগুলো থেকে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য মালিকানা (সরকারি ও বেসরকারি), স্থায়িত্ব (স্থায়ী ও অস্থায়ী), অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে হাট বাজারের পুনঃসংজ্ঞায়ন ও শ্রেণীকরণ করতে হবে। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে গড়ে ওঠা বাজারগুলো নিবন্ধিত করার জন্য জমির মালিকের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি করতে হবে যাতে করে হাট বাজারের মূল্য থেকে জমির মালিক একটি নির্দিষ্ট অংশ লাভ হিসেবে পান। এতে সরকার ও জমির মালিক উভয়েই লাভবান হবে। সড়ক ও জনপথের মালিকানাধীন জমিতে অস্থায়ী হাট বাজার থাকলে তা নিবন্ধন করা হলে সরকার নিবন্ধন ফি পাবে, অন্যদিকে যেন পথ বিভাগ সড়ক ও জনপদ বিভাগ ইজারামূল্যের একটি অংশ পাবে। এতে করে স্থানীয় সরকার এবং সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর উভয়ের জন্যই তা লাভজনক হবে।

৮.৪.১৮ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি সম্পদের আর্থিক মূল্যায়ন করে সম্ভাব্য কর নির্ধারণ করতে হবে।

স্থানীয় সরকারের রাজস্বের একটি বড় উৎস ব্যক্তিগত বসতবাড়ি, ইমারত ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত বেসরকারি ভবনের উপর কর। কিন্তু যথাযথভাবে মূল্যায়নের অভাবে এ সম্পদগুলো থেকে সম্ভাবনার তুলনায় অনেক কম রাজস্ব অর্জিত হয়। এর একটি বড় কারণ এসব সম্পদের প্রকৃত মূল্য নিরূপণে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব। এ সমস্যা দূর করতে নগর ও গ্রামসমূহে ইমারত, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, খামার ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য আধুনিক ড্রোন সার্ভে এবং মাঠ পর্যায়ে জরিপের সমন্বয়ে তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা যেতে পারে। এরপর এসব ভৌত অবকাঠামোর তথ্য পেশাদার মূল্যায়নকারী সংস্থাকে সরবরাহ করলে তারা এ তথ্য বিশ্লেষণ করে সম্পদের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করে সম্ভাব্য করের পরিমাণ মূল্যায়ন করতে পারবে। এ প্রক্রিয়ায় কর মূল্যায়ন করে তা আদায় করতে পারলে স্থানীয় সরকারের রাজস্ব আদায় অনেক গুণ বেড়ে যাবে। এজন্য স্থানীয় সরকারের আইনের মধ্যে একটি ধারা সংযুক্ত করে ব্যক্তিগত/বেসরকারি সম্পদের পেশাদার মূল্যায়নের মাধ্যমে কর নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। একই সাথে ইউনিয়ন পরিষদে কর মূল্যায়নকারী পদে জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে।

৮.৪.১৯ মধ্যমেয়াদে এনবিআরের আহরিত করের একাংশ স্থানীয় সরকারকে স্থানান্তর করতে হবে।

স্থানীয় সরকারকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করতে হলে আন্তঃসরকারি স্থানান্তারের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে। এজন্য স্থানীয় পর্যায় থেকে সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে আহরিত কর রাজস্ব স্থানীয় সরকারের মধ্যে ন্যায়সঙ্গাত বণ্টন জরুরি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকা। এ অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর ও উন্নয়ন সহায়তা এবং প্রধান বিভাগীয় শহরের চারটি ওয়াসা সহ মূলত পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন অর্থায়নে বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে থেকে প্রণীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় জনচাহিদাভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অর্থায়ন করা গেলে সারাদেশে উন্নয়নের চেহারা পাল্টে যাবে। আর এজন্য প্রয়োজন এনবিআর-এর রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ন্যায়সঙ্গাত বণ্টন।

প্রস্তাবিত এ পদ্ধতিতে স্থানীয় পর্যায়ে থেকে আদায়কৃত ভূমি হস্তান্তর ও ভূমি উন্নয়ন কর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পুরোপুরি জমা হবে। কার্যকর আর্থিক বিকেন্দ্রায়ন বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আদায়কৃত মোট রাজস্বের ন্যায়সঙ্গাত বন্টনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থায়ন করতে হবে।

একটি জেলার সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকবে জেলা পর্যায়ে। এজন্য সার্বিক বিকেন্দ্রায়নের অংশ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনকে জেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। জেলা পরিষদ জেলার সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগসমূহের মাধ্যমে দপ্তর সমূহের মাধ্যমে জেলার সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে) ও উপজেলা পরিষদের। ইউনিয়ন ও পৌরসভা পরিকল্পনা যেমন বাস্তবায়ন করবে,

তেমনি তারা সুবিধাভোগীও হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় পরিকল্পনাবিদ এবং অর্থ ও বাজেট কর্মকর্তার চাকরি পরিষদে ন্যস্ত থাকবে। শুধুমাত্র জাতীয় প্রকল্পগুলো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।
উল্লেখ্য যে, জাপানে সংগৃহীত কর রাজস্বের প্রায় ৫৯.২ শতাংশ জাতীয় কর থেকে এবং প্রায় ৪০.৮ শতাংশ স্থানীয় কর থেকে আসে। মোট সংগৃহীত রাজস্বের প্রায় ৩৫.৭ শতাংশ জাতীয় সরকারকে এবং প্রায় ৬৪.৩ শতাংশ স্থানীয় সরকারকে বরাদ্দ দেওয়া হয়।[২৬] মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংগৃহীত মোট রাজস্ব ছিল ৩,৪২,৬৭৮.৪১ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ১,৫৪,৪১০.৭৬ কোটি টাকা। মূসকের ৩০ শতাংশ স্থানান্তর করলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পাবে ৪৬,৩২৩ কোটি টাকা, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য মোট প্রস্তাবিত বাজেটের প্রায় সমান। এনবিআর-এর কর রাজস্বের ৩০ শতাংশ স্থানীয় সরকারকে প্রদান করলে পাবে ১,১৪,৮০৪ কোটি টাকা।

তাই প্রাথমিক পর্যায়ে মূসকের এক-তৃতীয়াংশ এবং দীর্ঘমেয়াদী এনবিআর এর মোট কর রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করতে হবে। এ পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকারের অর্থায়ন করলে প্রাথমিক পর্যায়ে জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা সহজেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে কার্যকর বিকেন্দ্রায়নের ব্যাপ্তি সম্প্রসারণ করার সাথে সাথে স্থানীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের বণ্টনকৃত অংশ বৃদ্ধি করতে হবে।

৮.৪.২০ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অর্থায়ন সূচক (financing index) তৈরি করে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে অর্থায়নের করতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থায়নের কোন সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নেই। 'ক' শ্রেণির পৌরসভায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে থেকে উন্নয়ন সহায়তা বেশি আসে। রাজনৈতিক বিবেচনায়ও পৌরসভাতে অর্থায়ন করা হয়। যার ফলে পৌরসভাগুলোতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিরাট আনুভূমিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যা পৌরসভাসমূহের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, সিটি কর্পোরেশনগুলোতেও অর্থায়নের একেবারেই কোন সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নেই। মূলত এডিপির মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প, বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগীদের আগ্রহে বাস্তবায়িত প্রকল্প এবং এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন গুলোতে অর্থায়ন করা হয়। এ কারণে সিটি কর্পোরেশনগুলোর উন্নয়ন বাজেটে বড় রকমের বৈষম্য দেখা যায়। উপজেলায় এডিপি বরাদ্দের জন্য আয়তন ও জনসংখ্যাকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। অর্থায়নের এ গতানুগতিক ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কারণে একই স্তরের স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আর্থিক সক্ষমতা ও উন্নয়নে মধ্যে বিপুল বৈষম্য টিকে থাকছে। এর নেতিবাচক প্রভাবে অঞ্চল ভেদে উন্নয়নের বৈষম্য দিন দিন প্রকট হচ্ছে।

তাই প্রচলিত এই অর্থায়নের বৃত্ত ভেঙে বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থায়নের সূত্র তৈরি করতে হবে। প্রস্তাবিত স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন এই কাজটি করতে পারে। অর্থায়নের সূচক তৈরিতে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত নির্দেশকগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:

- বিভিন্ন স্তরের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকার উন্নয়ন পরিস্থিতি
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা
- স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহে প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা
- স্থানীয় পর্যায়ে আহরিত সম্পদের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন
- মোট রাজস্বের মধ্যে সঞ্চয়ের অংশ
- সুশাসন
- তথ্য উন্মুক্তকরণ
- আর্থিক দুর্নীতির ঘটনা

---

[২৬] https://www.metro.tokyo.lg.jp/ENGLISH/ABOUT/FINANCIAL/financial01.htm#:~:text=However%2C%20the%20ultimate%20allocation%20of,64.3%25%20to%20the%20local%20governments.

- জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন
- পশ্চাদপদতা
- দুর্গমতা
- পাহাড়ি অঞ্চল
- উপকূলীয় এলাকা
- প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা

উপর্যুক্ত নির্দেশকগুলো বিবেচনা করে এগুলোর কোনটিকে কতটুকু গরুত্ব দেওয়া হবে তার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার কমিশন অর্থায়নের বিজ্ঞানভিত্তিক সূচক তৈরি করে কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কতটুকু অর্থায়ন করা হবে তা পরামর্শ আকারে স্থানীয় সরকার বিভাগ/সরকারের কাছে উপস্থাপন করবে। এভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকারের অর্থায়ন করা হলে তা আঞ্চলিক উন্নয়নের বৈষম্য ক্রমশ হ্রাস করতে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তির ওপরে দাঁড় করাতে সহায়তা করবে।

৮.৪.২১ স্থানীয় বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতা সুস্পষ্ট তথ্য থাকতে হবে এবং নারী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য আর্থিক ও নীতিগত উদ্যোগের বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর বাজেট বক্তৃতায় উপস্থাপন করতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সরকারি ব্যয়ের জেন্ডার সংবেদনশীলতা নির্ধারণ করার একটি পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যয়ের জেন্ডার সংবেদনশীলতা যাতে বৃদ্ধি পায় এজন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বাজেট সংসদে উপস্থাপনের সময় জেন্ডার বাজেট নামে আলাদা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে যেখানে সামগ্রিকভাবে বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিস্তারিত তথ্য থাকছে। মধ্যমায়েদী বাজেট দলিলে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বা বিভাগের ব্যয়ে নারীর ওপর প্রভাব কতটুকু তা জানা যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে স্থানীয় সরকারের কোনো স্তরের বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতা কতটুকু তা জানার উপায় নেই। এমনকি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে তাতে নারী ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর ওপর এর প্রভাব কতটুকু তা জানা যায় না। স্থানীয় বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার কোন উদ্যোগে লক্ষ্য করা যায় না।

এ কারণে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটে এবং প্রকল্প অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প অনুযায়ী জেন্ডার সংবেদনশীলতার সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ করতে হবে। উপরন্তু এ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য, বিশেষ করে নারী ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর জন্য কি ধরনের আর্থিক ও নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে বাজেট বক্তৃতায় উপস্থাপন করতে হবে। স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরে এটি নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৪.২২ স্থানীয় সরকারের বার্ষিক বাজেটে শিশুদের জন্য পৃথক অংশ বরাদ্দ করতে হবে

প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে তাদের বার্ষিক বাজেটে শিশুদের জন্য একটি পৃথক অংশ বরাদ্দ করতে হবে। শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, সুরক্ষা এবং বিকাশের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের মতামত ও চাহিদা বাজেটে প্রতিফলিত করার জন্য নিয়মিত সভা ও আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিশু বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট ও প্রকল্পের তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। জাতীয় শিশু বাজেট প্রণয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মতামত ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিশু বাজেট সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

৮.৪.২৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল স্তরের স্থানীয় সরকারের বাজেট বরাদ্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের চার স্তরের স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র জেলা পরিষদের অর্থ বরাদ্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ইউনিয়ন, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার স্থানান্তর ও উন্নয়ন সহায়তা আসে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা শহর বাদে সিংহভাগ অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম ও যাতায়াত অবকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। দু'একটা পর্যটন কেন্দ্র বাদে প্রত্যেকটি জায়গায় ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয় বললেই চলে। সম্প্রতি এ অঞ্চলে কয়েকটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সার্বিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা অত্যন্ত অনগ্রসর। পার্বত্য অঞ্চলে অনেক ইউনিয়ন পরিষদের ভৌগলিক আয়তন সমতলের ইউনিয়নের তুলনায় অনেক গুণ বড়। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষে একা এই অঞ্চলের বসবাসকারী বাঙালি সহ বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃব্যবস্থাপনা, কৃষি সম্প্রসারণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইত্যাদি মৌলিক সেবা প্রদান করা দুষ্কর। অন্যদিকে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে স্থানীয় জনগণের বিশেষ করে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নিবিড় সংযোগ থাকার কারণে জনচাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং মৌলিক সেবাসমূহ প্রদান ব্যয় সাশ্রয়ী ও সহজতর হয়। আর পশ্চাৎপদতা ও দুর্গমতার কারণে এ অঞ্চলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় পর্যায়ে থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ আহরণ করতে পারে না। এমন ইউনিয়ন পরিষদও রয়েছে যার স্থানীয় উৎস থেকে বার্ষিক হয় আয় এক লক্ষ টাকাও হয় না। ফলে তারা স্থানীয় অর্থ দিয়ে তাদের পরিচালন ব্যয়ও নির্বাহ করতে পারে না। এ কারণে তাদের আর্থিক সক্ষমতা অন্যান্য জেলার স্থানীয় সরকারগুলোর মত চেয়ে বহুলাংশে দুর্বল। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের জেলাগুলোতে স্থানীয় সরকারের হস্তান্তর ও উন্নয়ন সহায়তা যেহেতু অন্যান্য জেলার ইউনিয়ন, উপজেলা ও পৌরসভার মতো করে আসে, তাই পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গমতা ও স্থানীয় উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থেকে যায়।

এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার বাজেট বরাদ্দ অর্থ বিভাগ থেকে সরাসরি পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রদান করতে হবে। এতে তৃণমূলের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা যেমন বাজেটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনিভাবে সকল স্তরের স্থানীয় সরকারের সরকারের আর্থিক সক্ষমতা বাড়বে। পার্বত্য অঞ্চলের সকল জাতি-নৃগোষ্ঠীর জনগণকে স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের পক্ষে সেবা প্রদান করাও সহজ হবে।
বাজার ফান্ড ব্যবস্থাপনার নতুন ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাজারের আয় বৃদ্ধি পাবে। এটা ইউনিয়ন হেডম্যান, কারবারি, রাজার কার্যালয়, পৌরসভা ও উপজেলার মধ্যে বণ্টিত হবে।

৮.৪.২৪ প্রতিটি স্থানীয় পরিকল্পনা ও বাজেটের আর্থিক, কর্মসম্পাদন ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য পৃথক অধিদপ্তর গঠন করতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মূলত সারা দেশ জুড়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্প ভৌত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ পার্বত্য পার্বত্য এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে। কিন্তু যথাযথ নিরীক্ষার অভাবে প্রকল্পসমূহের গুণগত মান যেমন নিশ্চিত করা যায় না, তেমনিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক দুর্নীতি ও অর্থ অপচয়ের সুযোগ তৈরি হয়। আর প্রকল্পগুলো প্রয়োজনীয় ছিল কিনা এবং স্থানীয় জনগণের উপকারে আসছে কিনা তাও জানা যায় না। প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সামাজিক ও পরিবেশগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয় কিনা তা বলা যায় না।

এ কারণে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিটি স্থানীয় পরিকল্পনা ও বাজেটের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য পৃথক অধিদপ্তর গঠনের মাধ্যমে যথাযথ প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে হবে। এ অধিদপ্তরের মধ্যে আর্থিক (financial), কর্মসম্পাদন (performance) ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা (অডিট) ব্যবস্থা স্থাপিত হবে। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে সরকারের অনেক অনুৎপাদনশীল ব্যয় হ্রাস পাবে এসব অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে খরচ করতে পারবে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য অধ্যায় পনেরো দেখা যেতে পারে।

ভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রস্তাবিত অভিন্ন বাজেট কাঠামো

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নাম: ... ...

ঠিকানা: উপজেলা ও জেলা প্রযোজ্য (সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত): ... ...

ক. এক নজরে বাজেট

... ... (অর্থবছর)

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
প্রারম্ভিক স্থিতি						
রাজস্ব প্রাপ্তি ও অনুদান						
করসমূহ						
গৃহ কর						
ইমারত নির্মাণের ওপর কর						
ভূমি হস্তান্তর কর						
ভূমি উন্নয়ন কর						
অন্যান্য কর						
কর ব্যতীত প্রাপ্তি						
ফি						
পানির চার্জ						
ইজারা						
ভাড়া						
সেলামি						
মুনাফা						
অন্যান্য						
অনুদান (বেসরকারি)						
মোট						
স্থানান্তর ও উন্নয়ন সহায়তা						
স্থানান্তর						
উন্নয়ন সহায়তা						

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)						
উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প						
অন্যান্য						
মোট						
ব্যয়						
রাজস্ব ব্যয়						
পরিচালন ব্যয়						
আবর্তক ব্যয়						
তন্মধ্যে সুদ						
মূলধন ব্যয়						
অবচয়						
মোট						
উন্নয়ন ব্যয়						
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প						
এডিপি						
উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প						
বিএমডিএফ/এলজিডিএফ/এলজিটিএফ প্রকল্প						
মোট						
রাজস্ব ঘাটতি/উদ্বৃত্ত						
মোট ঘাটতি/উদ্বৃত্ত						
অর্থসংস্থান						
রাজস্ব উদ্বৃত্ত						
ঋণ (নীট)						
বন্ড (নীট)						
অনুদান (বেসরকারি)						
মোট						
সমাপনী স্থিতি						

খ. আয় ও ব্যয়ের সারসংক্ষেপ

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
প্রারম্ভিক স্থিতি						
মোট রাজস্ব আয়						
মোট অন্যান্য আয়						
সরকারি থোক ও বিশেষ বরাদ্দ						
মোট সরকারি ও বৈদেশিক উৎস থেকে আয়						
মোট পরিচালন ব্যয়						
মোট অন্যান্য ব্যয়						
নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন ব্যয়						
সরকারি ও বৈদেশিক সহায়তায় উন্নয়ন ব্যয়						
মোট উন্নয়ন ব্যয়						
সমাপনী স্থিতি						

গ. আয়ের খাতসমূহ

… … … … … **(অর্থবছর)** (অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
প্রারম্ভিক স্থিতি						
রাজস্ব আয়						
কর						
গৃহ কর						
ইমারত নির্মাণের ওপর কর						
অন্য কোন নির্মাণের জন্য আবেদনের পর কর						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
ভূমি/সম্পত্তি হস্তান্তর কর						
ভূমি উন্নয়ন কর						
প্রমোদ কর						
পেশা বা বৃত্তির (কলিং) ওপর কর						
হোটেল ও সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থানকারীদের ওপর কর						
পরিচ্ছন্নতা কর						
মোবাইল টাওয়ার কর						
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ট্রেনিং সেন্টার, প্রভৃতির উপর কর						
মেলা, নাটক, অপেরা, সিনেমা হল ও বাণিজ্যিক প্রদর্শনীর ওপর কর						
হাসপাতাল, ক্লিনিক, ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ওপর কর						
বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, দত্তক ও অন্যান্য ভোজ অনুষ্ঠানের ওপর কর						
ভোগ ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানির ওপর কর						
পণ্য রপ্তানির ওপর কর						
টোল জাতীয় কর						
পোষা প্রাণির ওপর কর						
পশুর ওপর কর						
সরকার কর্তৃক আরোপিত করের ওপর উপকর						
নগর শুল্ক						
অন্যান্য কর						
কর ব্যতীত প্রাপ্তি						
লাইটিং ফি						
সেলামি						
বাজার ভাড়া						
ট্রেড লাইসেন্স, রিক্সা লাইসেন্স ফি (নতুন ও নবায়ন)						
টিউটোরিয়াল, স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির ওপর ফি						
কম্পিউটার ইনস্টিটিউট ও কলেজসমূহের ওপর ফি						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইত্যাদির নিবন্ধন ফি[২৭]						
বাজারের ওপর ফি						
বিবাহ অনুষ্ঠানের উপর ফি						
এয়ারপোর্ট এবং রেলস্টেশন হতে প্রাপ্তি						
বিজ্ঞাপন						
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) হতে প্রাপ্তি						
বাস/ট্রাক টার্মিনাল হতে প্রাপ্তি						
স্মার্ট পার্কিং						
গরুর হাট (কোরবানির হাট সহ)						
টয়লেট ইজারা						
ঘাট ইজারা						
বাজার ইজারা						
জলমহল ইজারা						
বালু মহাল ইজারা						
পাথর মহল ইজারা						
অন্যান্য ইজারা						
পুরাতন মালামাল বিক্রয়						
জবাই খানা						
যন্ত্রপাতি ভাড়া						
সিডিউল/দরপত্র ও অন্যান্য ফরম বিক্রয়						
কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া						
জনসেবামূলক কার্য সম্পাদনের জন্য রেইট						
বেসরকারি বাজার নিবন্ধন ফি						
পেট্রোল পাম্প						
কবরস্থান, শ্মশান ঘাট						

[২৭] এর মধ্যে বেসরকারি মেডিকেল ইনস্টিটিউট, ক্লিনিক, প্যারামেডিকেল, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হোমিওপ্যাথ, ইউনানী-আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
বিদ্যুৎ						
বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, দত্তক গ্রহণ, বিবাহ বিচ্ছেদ						
পানি সরবরাহ						
পানির চার্জ/বিল/ট্যারিফ						
বকেয়া						
চলতি						
পানির লাইন সংযোগ/পুনঃসংযোগ ফি						
ভ্রাম্যমান পানি সরবরাহ						
গভীর/অগভীর নলকূপ ব্যবহারের অনুমোদন/বার্ষিক ফি						
নবায়ন ফি						
ফরম বিক্রয়						
সারচার্জ						
অন্যান্য						
দরপত্র বিক্রয়						
স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চার্জ						
সড়ক খনন ফি						
ইউটিলিটি প্রদানে সড়ক ব্যবহারের ফি						
পার্ক থেকে আয় (প্রবেশ ও রাইডার ইত্যাদি ব্যবহারের ফি)						
অন্যান্য ভাড়া						
অন্যান্য						
অনুদান (বেসরকারি)						
মোট রাজস্ব আয়:						
অন্যান্য আয়						
অপ্রয়োজনীয়/অব্যবহার্য সম্পদ বিক্রয়						
বন্ড ইস্যু বাবদ প্রাপ্তি						
ঋণ গ্রহণ - বিএমডিএফ						
ঋণ গ্রহণ - অন্যান্য						
ঋণ আদায়						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ						
মুনাফা/ঋণের সুদ - অন্যান্য						
জরিমানা থেকে প্রাপ্তি						
ক্ষতিপূরণ						
অন্যান্য						
মোট অন্যান্য আয়:						
স্থানান্তর ও উন্নয়ন সহায়তা						
স্থানান্তর						
নগর শুল্কের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরি						
উন্নয়ন সহায়তা						
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)						
উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প						
মোট স্থানান্তর ও উন্নয়ন সহায়তা:						
মোট আয়:						

ঘ. ব্যয়ের খাতসমূহ

... ... (অর্থবছর)

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
আবর্তক ব্যয়						
অফিসসারদের বেতন						
কর্মচারিদের বেতন						
মাস্টার রোল কর্মচারিদের মজুরি						
ভাতাদি						
মজুরি ও পারিশ্রমিক						
প্রশাসনিক ব্যয়						
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও পানি						
ফি, চার্জ ও কমিশন						
প্রশিক্ষণ ব্যয় (অভ্যন্তরীণ)						
প্রশিক্ষণ ব্যয় (বৈদেশিক)						
অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ						
বৈদেশিক ভ্রমণ						
পরিবহনের জ্বালানি						
সরবরাহ						
চিকিৎসা ব্যয়						
নিরাপত্তা সামগ্রী						
খাদ্য সরবরাহ						
মুদ্রণ ও মনোহারি						
সংবাদপত্র ও সাময়িকী, পুস্তক ক্রয় ও ফটোকপি						
সাধারণ সরবরাহ						
সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়						
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ						
সুদ প্রদান						
মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম						
কল্যাণমূলক ব্যয়						
ডাক, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ওয়াকিটকি ও কুরিয়ার						
কল সেন্টার ও জরুরি সেবা						
আতিথেয়তা ও উৎসব						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
কর্মচারিদের পোশাক						
বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা						
আলোকসজ্জা						
বিভিন্ন সংস্থার চাঁদা						
বীমা						
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা						
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যয়						
মোবাইল কোর্ট, উচ্ছেদ, ভেজাল বিরোধী অভিযান						
আউটসোর্সিং						
অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যয়						
ভর্তুকি						
নিরীক্ষা ফি						
পরামর্শক ফি						
নিবন্ধন/নবায়ন ফি						
সাধারণ অনুদান						
মূলধন অনুদান						
নিজস্ব সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা						
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যয়						
নিজস্ব ত্রাণ সামগ্রী						
পুনর্বাসন ব্যয়						
প্রণোদনা						
টিকাদার কর্মসূচি ব্যয়						
অবচয় ব্যয়						
অবসরকালীন সুবিধা/ভবিষ্য তহবিলের জন্য ব্যয়						
ব্যাংক ফি/চার্জ ও আবগারি শুল্ক						
কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতনের ওপর আয়কর						
আয়কর						
মূল্য সংযোজন কর (মূসক/ভ্যাট)						
কর আদায় ব্যয়						
অন্যান্য আবর্তক ব্যয়						
মোট আবর্তক ব্যয়:						
অন্যান্য ব্যয়						
ঋণ পরিশোধ						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
মামলা ও অন্যান্য						
জরিমানা প্রদান						
সালামী ফেরত						
গৃহ নির্মাণ, যানবাহন ও অন্যান্য অগ্রিম						
আওতাধীন এলাকার সম্পদের পেশাদার মূল্যায়ন						
জেন্ডার বিষয়ক কর্মসূচি ব্যয়						
মোট অন্যান্য ব্যয়						
মূলধন ব্যয়						
আবাসিক স্থাপনা						
অনাবাসিক স্থাপনা						
অন্যান্য স্থাপনা						
ভূমি উন্নয়ন						
সড়ক ও যোগাযোগ অবকাঠামো, ফুটওভার ব্রিজ/আন্ডারপাস, সেতু নির্মাণ						
জেন্ডার বিষয়ক কর্মসূচি ব্যয়						
অন্যান্য অবকাঠামো তৈরি						
গাড়ি ও পরিবহন সরঞ্জামাদি						
পরিবহন যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম						
অশ্রেণীকৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম						
জৈব সম্পদ						
পুরাকীর্তি, স্মৃতিসৌধ, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক স্থান ও ভবন						
শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী						
অগ্নি নির্বাপন সামগ্রী						
সরবরাহ						
খাদ্যদ্রব্য						
ত্রাণ সামগ্রী						
মূল্যবান দ্রব্যাদি						
ভূমি, উদ্যান, পার্ক, জলাশয় ও খেলার মাঠ উন্নয়ন						
চুক্তি, ইজারা ও লাইসেন্স						
সিএনজি প্লান্ট						
ডিপিপি তৈরিকরণ খরচ						
শুমারি/জরিপ/মূল্যায়ন/ইনভেন্টরি/ডাটা এন্ট্রি হালনাগাদ						
কুকুরে কামড়ানোর প্রতিষেধক						
প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
নবায়নযোগ্য বিদ্যুত/জ্বালানি প্রকল্প						
সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ						
খননকৃত সড়ক সংস্কার						
রাস্তায় বিদ্যুতায়ন/এলইডি বাতিস্থাপন						
বাস-ট্রাক টার্মিনাল, ভেহিকেল শেড						
ট্রাফিক অবকাঠামো উন্নয়ন						
রোড সাইন ও মার্কিং						
জলাবদ্ধতা দূরীকরণ						
সামাজিক কেন্দ্র ও মিলনায়তন স্থাপন						
শরীরচর্চা কেন্দ্র, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র/নাট্যশালা নির্মাণ						
হাসপাতাল-ক্লিনিক নির্মাণ						
শিশু কেন্দ্র, প্রবীণ শান্তিনিবাস ও বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ						
বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ ও স্থাপনা উন্নয়ন						
নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়ন						
বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন/সবুজায়ন						
গণশৌচাগার নির্মাণ						
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন						
পানি পরিশোধন প্রকল্প/পস্নান্ট নির্মাণ/উন্নয়ন						
নতুন সম্পত্তি অর্জন						
ভূমি অধিগ্রহণ ও নির্মাণ/উন্নয়ন						
সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণ/উন্নয়ন						
বাঁধ/স্লুইস গেট নির্মাণ						
দেওয়াল/প্রতিরোধ দেওয়াল						
পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা						
স্মৃতিস্তম্ভ/ফলক/ভাস্কর্য/শহীদ মিনার/তোরণ/ম্যুরাল নির্মাণ/উন্নয়ন						
ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ						
যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন						
জেনারেটর, লিফট ক্রয়/স্থাপন						
মশক নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি ক্রয়						
পানির পাম্প ক্রয় ও স্থাপন						
অন্যান্য ক্রয় ও স্থাপন						
সফটওয়্যার ক্রয়, কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ও অটোমেশন						
ডিজিটাল সেন্টার, ডিজিটাল হাজিরা মেশিন, ও সিসি ক্যামেরা						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
তথ্যভাণ্ডার তৈরি						
অপ্রত্যাশিত উন্নয়ন ব্যয়						
প্রকল্প মূলধন ব্যয়						
কর্মীদের ঋণ						
অন্যান্য ঋণ						
প্রকল্পের স্থায়ী জামানত (১০%)						
শিক্ষা ব্যয়						
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান/শিক্ষা সফর						
অবকাঠামো মেরামতের জন্য আর্থিক অনুদান						
পাঠাগার/দাপ্তরিক বই পুস্তক ব্যয়						
মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান তহবিল						
দরিদ্র মেধাবি ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বই বিতরণ ও অনুদান						
অন্যান্য মূলধন ব্যয়						
মোট মূলধন ব্যয়:						
মোট পরিচালন ও মূলধন ব্যয়:						
সমাপনী স্থিতি						

ঙ. উন্নয়ন ব্যয়ের খাতসমূহ

… … … … … (অর্থবছর) (অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
নিজস্ব উৎস থেকে ব্যয়						
বেসরকারি অনুদান						
বিএমডিএফ ঋণ						
অন্যান্য ঋণ						
বন্ড						
সরকারি উন্নয়ন সহায়তা						
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)						
উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প						
বিএমডিএফ অনুদান						
মোট:						

চ. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের খাতসমূহ

… … … … … **(অর্থবছর)** (অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ (অর্থবছর)
আবাসিক স্থাপনা						
অনাবাসিক স্থাপনা						
অন্যান্য স্থাপনা						
ভূমি						
সড়ক ও যোগাযোগ অবকাঠামো						
পরিবহন সরঞ্জামাদি						
পরিবহন যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম						
অশ্রেণীকৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম						
জৈব সম্পদ						
পুরাকীর্তি, স্মৃতিসৌধ, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক স্থান ও ভবন						
শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী						
অগ্নি নির্বাপন সামগ্রী						
মূল্যবান দ্রব্যাদি						
ভূমি, উদ্যান, পার্ক, জলাশয় ফোয়ারা (গ্রিন/ব্লু স্পেস)ও খেলার মাঠ						
নবায়নযোগ্য বিদ্যুত/জ্বালানি অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি						
সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ						
সড়ক বিদ্যুত ও বাতি						
বাস-ট্রাক টার্মিনাল, ভেহিকেল শেড						
সেতু						
সামাজিক কেন্দ্র ও মিলনায়তন						
শরীরচর্চা কেন্দ্র, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র						
বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র						
নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্যকেন্দ্র						
গণশৌচাগার						
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো						
সম্মেলন কেন্দ্র						
বাঁধ/স্লুইস গেট						
ধর্মীয় উপাসনালয়, ঈদগাহ, কবরস্থান, শ্মশান						
জেনারেটর, লিফট						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
মশক নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি						
পানির পাম্প ও পাম্প হাউজ						
অন্যান্য ক্রয় ও স্থাপন						
অপ্রত্যাশিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (দুর্যোগ-পরবর্তী)						
অন্যান্য অবকাঠামো						
অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি						
অন্যান্য						
মোট মূলধন ব্যয়:						

ছ. নিজস্ব হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যয়ের খাতসমূহ

… … … … … (অর্থবছর) (অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
ঔষধ						
শল্য চিকিৎসার দ্রব্যাদি						
রোগীর খাদ্য						
চিকিৎসা সরঞ্জাম						
রোগ নির্ণায়ক দ্রব্যাদি						
বিছানা পত্র ও পোশাক ধৌতকরণ						
যন্ত্রপাতির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ						
বিবিধ						
মোট মূলধন ব্যয়:						

জ. মূলধন হিসাব

… … … … … (অর্থবছর)

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
আয়						
গৃহীত ঋণ						
প্রদত্ত ঋণ ফেরত						
বিবিধ বিনিয়োগ/তহবিল হতে আয়						
অবচয় তহবিল						
আনুতোষিক তহবিল						
জামানত						
মোট						
প্রারম্ভিক স্থিতি						
সর্বমোট মূলধন আয়:						
ব্যয়						
ঋণ পরিশোধ						
ঋণ প্রদান						
বিবিধ বিনিয়োগ						
অবচয় তহবিল হতে ব্যয়						
আনুতোষিক ব্যয়						
জামানত/বায়না ফেরত						
মোট						
সমাপনি স্থিতি						
সর্বমোট মূলধন ব্যয়:						

ঝ. পানি সরবরাহ

… … … … … (অর্থবছর)

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
আয়						
পানির মাসিক বিল						
চলতি						
বকেয়া						
সংযোগ ফি (মিটার সহ)						
পুনঃসংযোগ ফি						
সারচার্জ						
নাম পরিবর্তন/পরিদর্শন ফি						
ফরম বিক্রয়						
অন্যান্য						
ব্যাংক হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ						
গৃহ সংযোগ মিটার বিক্রয়						
গৃহ সংযোগ যন্ত্রাংশ বিক্রয়						
নলকুপ বরাদ্দ হতে প্রাপ্ত চাঁদা						
কর্মচারিদেরকে প্রদত্ত ঋণ ফেরত						
অন্যান্য						
সংযোগ ফি এর উপর ভ্যাট						
মোট						
ব্যয়						
কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন ভাতা (ভবিষ্য তহবিল সহ)						
বেতন						
আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর						
উৎসব ভাতা						
ভ্রমণ ভাতা						
শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা						
গৃহ নির্মাণ ঋণ						
মনিহারি দ্রব্যাদি						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ (অর্থবছর)
টেলিফোন/ইন্টারনেট বিল						
মাস্টার রোল কর্মচারিদের মজুরি						
বেতন হতে আয়কর						
পাম্প/যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত						
ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টে সরবরাহ						
যানবাহন, জ্বালানি ও মেরামত						
মুদ্রণ						
বিজ্ঞাপন ও প্রচার						
কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়/রক্ষণাবেক্ষণ						
আসবাবপত্র						
সরঞ্জাম, কম্পিউটার ও প্রিন্টার						
বিদ্যুৎ বিল (পাম্প হাউজ)						
পানি লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ (O&M)						
উৎপাদক নলকুপ রক্ষণাবেক্ষণ (O&M)						
অবচয় তহবিলে স্থানান্তর						
মামলা খরচ						
ব্যাংক চার্জ						
গুদাম ঘর/পাম্প হাউজ রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার						
ঋণ পরিশোধ						
বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়/লাইট পোস্ট						
পানির গুণগত মান পরীক্ষা						
আপ্যায়ন খরচ						
আয়কর ও ভ্যাট						
অন্যান্য						
মোট						

ঞ. শিক্ষা ব্যয়

... ... (অর্থবছর)

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
বেতন, ভাতা ও মজুরি						
বেতন						
আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর						
উৎসব ভাতা						
ভ্রমণ ভাতা						
শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা						
গৃহ নির্মাণ ঋণ						
মনিহারি দ্রব্যাদি						
টেলিফোন/ইন্টারনেট বিল						
মাস্টার রোল কর্মচারিদের মজুরি						
বেতন হতে আয়কর						
ফি, চার্জ ও কমিশন						
ব্যবস্থাপনা ব্যয়						
প্রশিক্ষণ						
দেশে প্রশিক্ষণ						
বিদেশে প্রশিক্ষণ						
কল্যাণ অনুদান						
বিবিধ						
বই-পুস্তক বাবদ মঞ্জুরি						
কম্পিউটার, ইন্টারনেট						
অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ						
সাংস্কৃতিক/শিক্ষা সফর মঞ্জুরি						
বৃত্তি/মেধাবৃত্তি						
দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি						
অন্যান্য						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
মোট শিক্ষা ব্যয়:						

চ. প্রকল্প ব্যয়

চ১. প্রকল্পের নাম: ... ...

প্রকল্পের সময়সীমা: ... ...

... ... (অর্থবছর)

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
আবর্তক ব্যয়						
অফিসসারদের বেতন						
কর্মচারিদের বেতন						
মাস্টার রোল কর্মচারিদের মজুরি						
ভাতাদি						
মজুরি ও পারিশ্রমিক						
বিজ্ঞাপন						
পরামর্শকের সম্মানী						
প্রশাসনিক ব্যয়						
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানি						
ফি, চার্জ ও কমিশন						
প্রশিক্ষণ ব্যয় (অভ্যন্তরীণ)						
প্রশিক্ষণ ব্যয় (বৈদেশিক)						
অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ						
বৈদেশিক ভ্রমণ						
পরিবহনের জ্বালানি						
সরবরাহ						
চিকিৎসা ব্যয়						
নিরাপত্তা সামগ্রী						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
খাদ্য সরবরাহ						
মুদ্রণ ও মনোহারি						
সংবাদপত্র ও সাময়িকী, পুস্তক ক্রয় ও ফটোকপি						
সাধারণ সরবরাহ						
ভ্যাট						
আয়কর						
অন্যান্য আবর্তক ব্যয়						
মোট আবর্তক ব্যয়:						
মূলধন ব্যয়						
ডিপিপি তৈরি						
ভূমি অধিগ্রহণ						
ভূমি উন্নয়ন						
নির্মাণ						
কাঁচামাল ক্রয়						
মধ্যবর্তী পণ্য ক্রয়						
কম্পিউটার, সফটওয়্যার ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি ক্রয়						
গাড়ি ও পরিবহন সরঞ্জামাদি						
পরিবহন যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম						
অশ্রেণীকৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম						
জৈব সম্পদ						
শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী						
অগ্নি নির্বাপন সামগ্রী						
সরবরাহ						
প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন						
আসবাবপত্র						
চুক্তি						
জরিপ/শুমারি/মূল্যায়ন						
প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই						
সম্ভাব্যতা যাচাই						
পরিবেশগত মূল্যায়ন						

বিবরণ	প্রকৃত (অর্থবছর)	বাজেট (অর্থবছর)	সংশোধিত (অর্থবছর)	প্রস্তাবিত (অর্থবছর)	প্রক্ষেপণ	
					(অর্থবছর)	(অর্থবছর)
বেসলাইন মূল্যায়ন						
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন						
চূড়ান্ত মূল্যায়ন						
অন্যান্য						
প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী						
সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ						
খননকৃত সড়ক সংস্কার						
বিদ্যুতায়ন						
দেওয়াল/প্রতিরোধ দেওয়াল						
পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা						
যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন						
জেনারেটর, লিফট ক্রয়/স্থাপন						
তথ্যভান্ডার তৈরি						
অপ্রত্যাশিত উন্নয়ন ব্যয়						
কর্মীদের ঋণ						
অন্যান্য ঋণ						
প্রকল্পের স্থায়ী জামানত (১০ শতাংশ)						
জামানত ফেরত						
অন্যান্য মূলধন ব্যয়						
মোট মূলধন ব্যয়:						
সমাপনী স্থিতি						

দারিদ্র্য, জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্লেষণ

- দারিদ্র্য নিরসনের ওপর প্রভাব
- নারী ও তৃতীয় লিঙ্গের উন্নয়নের ওপর প্রভাব
- জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং প্রশমনের ওপর প্রভাব

উনিয়ন পরিষদের জন্য হালনাগাদকৃত মডেল কর তফসিল-২০২৫

ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের উপর কর।

ক্রমিক নং	ইমারতের	সর্বোচ্চ বাৎসরিক করের পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩
(ক)	বসবাস বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য অস্থায়ী কাঠামো	৪০.০০
(খ)	বসবাসের উদ্দেশ্যে এবং মূল্য পাঁচ হাজার টাকার অধিক মূল্য বিশিষ্ট কাঁচাঘর	৫০.০০
(গ)	বসবাসের উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রতিটি কাঁচাঘর	৬০.০০
(ঘ)	আধা-পাকা ইমারতের জন্য:	
	(অ) মেঝের পরিমাণ ১ হইতে ১২০০ বর্গফুট পর্যন্ত	১০০.০০
	(আ) মেঝের পরিমাণ ১২০১ হইতে ১৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত	১৫০.০০
	(ই) মেঝের পরিমাণ ১৫০১ বর্গফুটের উর্ধ্বে	৩০০.০০
(ঙ)	পাকা ইমারতের জন্য:	
	(অ) মেঝের পরিমাণ ১ হইতে ১০০০ বর্গফুট পর্যন্ত	৩০০.০০
	(আ) মেঝের পরিমাণ ১০০১ হইতে ১৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত	৫০০.০০
	(ই) মেঝের পরিমাণ ১৫০১ হইতে ২০০০ বর্গফুট পর্যন্ত	৬০০.০০
	(ঈ) মেঝের পরিমাণ ২০০১ বর্গফুটের উর্ধ্বে	৯০০.০০
	(১) মূলধন ১ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৩০০.০০
	(২) মূলধন ৩ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৫০০.০০
	(৩) মূলধন ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	২,০০০.০০
	(চ) ধান ভাঙ্গানো কল, আটা বা ময়দার কল বা মিল, তেলের কল (লিমিটেড কোম্পানী ব্যতীত):	
	(১) মূলধন ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	২০০.০০
	(২) মূলধন ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৪০০.০০
	(৩) মূলধন ১ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৫০০.০০
	(৪) মূলধন ৩ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৮০০.০০
	(৫) মূলধন ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	২,০০০.০০
	(ছ) স' মিল, বিদ্যুৎ চালিত অন্যান্য মিল (লিমিটেড কোম্পানী ব্যতীত):	
	(১) মূলধন ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	২০০.০০
	(২) মূলধন ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৪০০.০০
	(৩) মূলধন ১ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৫০০.০০
	(৪) মূলধন ৩ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৮০০.০০
	(৫) মূলধন ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	২,০০০.০০
	(জ) ইট ভাটা বা অন্যান্য সিরামিক প্রস্তুতকারক:	
	(১) মূলধন বা পরিশোধিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০,০০০.০০
	(২) মূলধন বা পরিশোধিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা হইতে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৩০,০০০.০০
	(৩) মূলধন বা পরিশোধিত মূলধন ৪০ লক্ষ টাকার অধিক	১০০,০০০.০০
২।	(ক) সিনেমা হল:	
	(১) সাধারণ	৬০০.০০
	(২) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	১,০০০.০০
	(খ) বিউটি পারলার, হেয়ার ড্রেসিং সেলুন:	
	(১) সাধারণ	২০০.০০
	(২) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	৫০০.০০
	(গ) লন্ড্রি:	
	(১) সাধারণ	১০০.০০
	(২) অটোমেটিক মেশিনযুক্ত লন্ড্রি	৫০০.০০
	(৩) লন্ড্রি শোরুম	৪০০.০০
৩।	ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা উহাদের কোন শাখা	১,০০০.০০
৪।	ঠিকাদারী ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান:	
	(১) তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	২,০০০.০০

ক্রমিক নং	ইমারতের	সর্বোচ্চ বাৎসরিক করের পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩
	(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	৪,০০০.০০
	(৩) প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	১০,০০০.০০
৫।	কৃষি পণ্যের আড়ত	১,০০০.০০
৬।	পেশা, বৃত্তি (কলিং):	
	(১) যে কোন ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম	১০,০০০.০০
	(২) কনসালটেন্সি ফার্ম	১০,০০০.০০
	(৩) সলিসিটর ফার্ম	১০,০০০.০০
৭।	আত্মকর্মে নিয়োজিত চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী:	
	(১) আয়করযোগ্য আয় না হইবার ক্ষেত্রে	৫০০.০০
	(২) আয়করযোগ্য আয় হইবার ক্ষেত্রে	১,০০০.০০
৮।	আবাসিক হোটেল বা মোটেল:	
	(১) মূলধন ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	২০০.০০
	(২) মূলধন ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৪০০.০০
	(৩) মূলধন ১ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৫০০.০০
	(৪) মূলধন ৩ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৮০০.০০
	(৫) মূলধন ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	৫,০০০.০০
৯।	রেসেস্তারা, খাবার দোকান, মিষ্টির দোকান:	
	(১) মূলধন ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	১০০.০০
	(২) মূলধন ১০ হাজার হইতে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত	২০০.০০
	(৩) মূলধন ২৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	৩০০.০০
	(৪) মূলধন ৫০ হাজার টাকার উর্ধ্বে	৪০০.০০
১০।	দোকানদার বা ব্যবসায়ী খোলা জায়গায় যে সকল হকার্সগণ কেনাবেচা করেন, তাহারা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না):	
	(১) মূলধন নির্বিশেষে যে কোন পাইকারী দোকান	২,০০০.০০
	(২) মূলধন ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	১০০.০০
	(৩) মূলধনের পরিমাণ ১০ হাজার টাকা হইতে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	২০০.০০
	(৪) মূলধনের পরিমাণ ৫০ হাজার উর্ধ্বে	৩০০.০০
১১।	ভাড়ায় চালিত যানবাহন:	
	(১) রিক্সার মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	৪০.০০
	(২) তিন চাকা বা দুই চাকা বিশিষ্ট যান্ত্রিক যানবাহনের মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	৪০০.০০
	(৩) টেম্পোর মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	৩০০.০০
	(৪) বাস, মিনিবাসের মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	৫০০.০০
	(৫) ট্রাক/কার্গোভ্যান (প্রতিটির জন্য)	৫০০.০০
	(৬) পরিবহন এজেন্সী বা পরিবহন ঠিকাদার (প্রতিটির জন্য)	৬০০.০০
	(৭) যাত্রী পরিবহনের যান্ত্রিক নৌযানের মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	২০০.০০
	(৮) মালামাল পরিবহনের যান্ত্রিক নৌযানের মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	৩০০.০০
	(৯) যাত্রী পরিবহনকারী লঞ্চ, স্টীমার (প্রতিটির জন্য)	৪০০.০০
	(১০) মালামাল পরিবহনকারী কার্গো (প্রতিটির জন্য)	৫০০.০০
	(১১) কার বা মাইক্রোবাসের মালিক/প্রতিষ্ঠার (প্রতিটির জন্য)	৪০০.০০
১২।	ভাড়ায় চালিত নয় এইরুপ যানবাহন:	
	(১) রিক্সার মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	২০.০০
	(২) তিন চাকা বা দুই চাকা বিশিষ্ট যান্ত্রিক যানবাহনের মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	১০০.০০
	(৩) টেম্পোর মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	১৫০.০০
	(৪) বাস, মিনিবাসের মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	২৫০.০০
	(৫) ট্রাক/কার্গোভ্যান (প্রতিটির জন্য)	২৫০.০০
	(৬) যান্ত্রিক নৌযানের মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	১০০.০০
	(৭) যাত্রী পরিবহনের যান্ত্রিক নৌযানের মালিক/প্রতিষ্ঠান (প্রতিটির জন্য)	২০০.০০
	(৮) কার বা মাইক্রোবাসের মালিক/প্রতিষ্ঠার (প্রতিটির জন্য)	২০০.০০

ক্রমিক নং	ইমারতের	সর্বোচ্চ বাৎসরিক করের পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩
১৩।	বিজ্ঞাপনের উপর কর:	
	(১) প্রতি বর্গফুট বা উহার অংশ বিশেষের জন্য	২০.০০
	(২) আলোক সজ্জিত বিজ্ঞাপন (যথা: নিউন সাইন, প্লাষ্টিক সাইন, ইত্যাদি)	৪০.০০

পশু জবাইয়ের উপর ফি।

ক্রমিক নং	পশুর বিবরণ	প্রতিটির জন্য ফি এর পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩
১)	ছাগল বা ভেড়া	২০.০০
২)	গরু	৪০.০০
৩)	মহিষ	৫০.০০

টিউটোরিয়াল, স্কুল, কোচিং সেন্টার, ইত্যাদির নিবন্ধন ফি।

ক্রমিক নং	বিবরণ	নিবন্ধন/নবায়ন ফি এর সর্বোচ্চ পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩
১)	টিউটোরিয়াল	৪,০০০.০০
২)	কোচিং সেন্টার	৫,০০০.০০
৩)	বেসরকারি কেজি স্কুল (বাংলা/ইংরেজি মিডিয়াম)	৬,০০০.০০

বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট ইত্যাদির ফি।

ক্রমিক নং	বিবরণ	নিব্ধবন/নবায়ন ফি এর সর্বোচ্চ পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩
১)	ক্লিনিক	৩,০০০.০০
২)	প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট	৩,০০০.০০
৩)	বেসরকারি হাসপাতাল	৫,০০০.০০

অধ্যায়-নয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের জাতিসত্তাবান্ধব স্থানীয় সরকার

ভূমিকা

স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও দেশের শাসন কাঠামোর নানা সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা কাটানো সম্ভব হয়নি। ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের জনগণ দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। সারাদেশের ৮টি বিভাগে ৬৪ জেলার সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন কাজ করছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার শুধু সমতলে সীমাবদ্ধ নয়। এ কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা এবং সমতলের সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহকে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সুশাসনের অংশ হিসেবে যথাযথ ভূমিকা প্রদানে আগ্রহী। সে লক্ষ্যে সারাদেশের নানা বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মত পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় সাতটি মতবিনিময় সভা করেছে এবং সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধিদের সাথেও অর্থবহ আলোচনা সম্পন্ন করেছে। সেসব মতবিনিময় সভায় প্রাপ্ত অংশীজনদের মতামত ও সুপারিশকে অন্যতম ভিত্তি ধরে কমিশন কতিপয় সুপারিশমালা তৈরি করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকারের পটভূমি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটির আয়তন প্রায় ১৩,১৮৪ বর্গ কিলোমিটার যা বাংলাদেশের মোট ভূ-ভাগের এক দশমাংশ। ভূ-প্রকৃতিগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এ অঞ্চলে আদিকাল থেকে বাঙালিসহ অন্যান্য আরও বারোটি জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করে আসছে। এ জাতি গোষ্ঠীসমূহের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও জাতিসত্তাগুলোর স্বাতন্ত্রের জন্য এ অঞ্চলটি বাংলাদেশের মূলধারার সংস্কৃতি থেকে অনেকটা ভিন্ন। ঐতিহাসিকভাবে এ অঞ্চলটি 'বিশেষভাবে শাসিত' এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এমনকি, ১৯৪৭ পরবর্তী পাকিস্তান আমলে পার্বত্য অঞ্চলটি সাংবিধানিকভাবে 'বিশেষ অঞ্চল' হিসেবে স্বীকৃত ছিল, যা ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকারের ইতিহাসও দেশের অন্যান্য স্থানীয় সরকারের ইতিহাসের থেকে একটু আলাদা। শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের অঞ্চলটিকে মৌজায় ভাগ করা হয়েছিল। সার্কেল চীফ বা রাজাদের অধীনে থেকে মৌজাপ্রধান হেডম্যানগণ সরকারের রাজস্ব আদায় করতেন। ১৯০০ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার রাজা বা সার্কেল চীফদের (চাকমা, মারমা ও বোমাং) নিয়ে জেলা উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করে দিয়েছিল। রাজাগণ রাজস্ব আদায়ের জন্য ডেপুটি কমিশনারের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রশাসন, শিক্ষা ও উন্নয়নে রাজাগণ ডেপুটি কমিশনারকে সহযোগিতা করতেন।

বাস্তবিক অর্থে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয় ১৯৬০ সালে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে বেসিক ডেমোক্রেটিক অর্ডার, ১৯৫৯-এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসহ সমগ্র দেশে বিভাগীয়, জেলা কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হয়। অর্থাৎ, ১৯৬০ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম, বিভাগীয়, জেলা কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, ইউনিয়ন কাউন্সিলের কার্যক্রম শুরু হয়। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামে সংবিধিবদ্ধ স্থানীয় সরকার পরিষদ ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, দেশের সমতলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কিছু আইনগত পার্থক্য ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে আছে সমতলের মতো ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং পার্বত্য এলাকার

জন্য বিশেষভাবে গঠিত জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা। এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ আবার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ দুটি পৃথক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও প্রথাগত বিচারব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে। অন্যদিকে খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ সমতলের অন্য ৬১টি জেলা পরিষদ আইন থেকে ভিন্ন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রক্রিয়াটি দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণে স্বতন্ত্রভাবে সুপারিশ প্রণয়নের দাবি রাখে। কারণ বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে অনেক অসঙ্গতি ও সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন সেসব সমস্যা ও অসুবিধাগুলোর বিশ্লেষণ করে সহজতর সমাধান অনুসন্ধানের চেষ্টা করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তার পরিচিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঞ্চল। এখানে ১২টি ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। যথা- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, খুমি, খিয়াং, চাক, পাংখোয়া, লুসাই ও গুর্খা। প্রতিটি জাতিসত্তার রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও রীতি-নীতি। ধর্ম বিশ্বাসেও তাদের রয়েছে ভিন্নতা। ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের অন্যান্য জেলাসহ ৫০টি জাতিসত্তার গুলোর মোট জনসংখ্যা ১৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫৯ জন। এর মধ্যে ৮ লাখ ২৫ হাজার ৪০৮ জন নারী এবং ৮ লাখ ২৪ হাজার ৭৫১ জন পুরুষ। বিভাগ অনুযায়ী দেখা যায়, চট্টগ্রাম বিভাগে ৯ লাখ ৯০ হাজার ৮৬০, বরিশালে ৪ হাজার ১৮১, ঢাকায় ৮২ হাজার ৩১১, খুলনায় ৩৮ হাজার ৯৯২, ময়মনসিংহে ৬১ হাজার ৫৫৯, রাজশাহীতে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৫৯২, রংপুরে ৯১ হাজার ৭০ ও সিলেটে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৫৯৪ জন। জেলার নিরিখে রাঙামাটি জেলায় সবচেয়ে বেশি ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের বসবাস রয়েছে। এখানে ৩ লাখ ৭২ হাজার ৮৬৪ জন ভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী আছে। এরপরেই রয়েছে খাগড়াছড়ি, এখানে ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৩৭৮[২৮] জন আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরেও সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ৫০টি জাতিসত্তাকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আরো অনেক জাতিসত্তা রয়েছে যাদেরকে সরকারিভাবে তালিকাভূক্ত করা হয়নি। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী সব জাতিসত্তাদের মধ্যে চাকমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৩৬৫ জন। দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১৬ শতাংশ লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে। অন্যদিকে, ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী দেশের ৫০টি ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার জনসংখ্যা সমগ্র দেশের মোট জনসংখ্যার ০.৯৯ শতাংশ।

নিচে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো

➢ **চাকমা**

চাকমারা তিন পার্বত্য জেলায় বসবাস করে। তবে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলায় তাদের সবচেয়ে বেশি বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, মায়ানমারসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাকমাদের বসবাস রয়েছে। ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তাদের মধ্যে চাকমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা জাতিসত্তার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৩৬৫ জন। তন্মধ্যে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৯২০ জন পুরুষ (৫০.৪৬ শতাংশ) এবং ২ লাখ ৩৯ হাজার ৪৪৫ জন নারী (৪৯.৫৪ শতাংশ)।

➢ **মারমা**

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জাতিসত্তাদের মধ্যে মারমা'রা দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। বান্দরবানে মারমাদের বসবাস সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও রাঙামাটি, খাগড়াছড়িতেও মারমাদের বসবাস রয়েছে। সর্বশেষ জনশুমারি অনুযায়ী মারমাদের সংখ্যা ২ লাখ ২৪ হাজার ২৯৯ জন। তন্মধ্যে ১ লাখ ১১ হাজার ৩৩৬ জন পুরুষ (৪৯.৬৪ শতাংশ) এবং ১ লাখ ১২ হাজার ৯৬৩ জন নারী (৫০.৩৬ শতাংশ)।

➢ **ত্রিপুরা**

ত্রিপুরারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী ত্রিপুরাদের সংখ্যা ১ লাখ ৫৬ হাজার ৬২০ জন। তন্মধ্যে ৭৮ হাজার ২১১ জন পুরুষ (৪৯.৯৪%) এবং ৭৮ হাজার ৪০৯ জন নারী (৫০.০৬শতাংশ)।

---

[২৮] প্রথম আলো, ২৭ জুলাই ২০২২।

➢ **তঞ্চঙ্গ্যা**

সর্বশেষ জনশুমারি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে মোট তঞ্চঙ্গ্যা জনসংখ্যা ৪৫ হাজার ৯৭৪ জন। তন্মধ্যে ২৩ হাজার ৩১৭ জন পুরুষ (৫০.৭২ শতাংশ) এবং ২২ হাজার ৬৫৭ জন নারী (৪৯.২৮ শতাংশ)। স্থানভেদে তঞ্চঙ্গ্যারা 'দাইনাক' নামেও পরিচিত।

➢ **ম্রো**

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী মোট ম্রো জনসংখ্যা ৫২ হাজার ৪৬৩ জন। তন্মধ্যে ২৬ হাজার ৭৪৮ জন পুরুষ (৫০.৯৮ শতাংশ) এবং ২৫ হাজার ৭১৫ জন নারী (৪৯.০২ শতাংশ)। ম্রো'রা পার্বত্য চট্টগ্রামের চতুর্থ বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। একমাত্র বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ম্রোদের বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও মায়ানমারের আরাকান রাজ্যে ম্রো জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।

➢ **বম**

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী মোট বম জনসংখ্যা ১৩ হাজার ১৯৩ জন। তন্মধ্যে ৬ হাজার ৬৫৯ জন পুরুষ (৫০.৪৭ শতাংশ) এবং ৬ হাজার ৫৩৪ জন নারী (৪৯.৫৩ শতাংশ)। বম জনগোষ্ঠী মূলত বান্দরবান জেলা ও রাঙামাটির বিলাইছড়ি উপজেলায় বসবাস করে।

➢ **খুমী**

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী খুমী জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ৩ হাজার ৭৮০ জন। তন্মধ্যে ১ হাজার ৯৫১ জন পুরুষ (৫১.৬১ শতাংশ) এবং ১ হাজার ৮২৯ জন নারী (৪৮.৩৯ শতাংশ)। খুমী জনগোষ্ঠীর লোকেরা মূলত বান্দরবানের রোয়াংছড়ি, রুমা ও থানচি উপজেলায় বসবাস করে। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের মিজোরাম রাজ্য এবং মায়ানমারের চিন প্রদেশে খুমী জনগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করে।

➢ **খিয়াং**

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী খিয়াং জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ৪ হাজার ৮২৬ জন। তন্মধ্যে ২ হাজার ৪৫৯ জন পুরুষ (৫০.৯৫ শতাংশ) এবং ২ হাজার ৩৬৭ জন নারী (৪৯.০৫ শতাংশ)। খিয়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা মূলত বান্দরবান জেলা ও রাঙামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলায় বসবাস করে।

➢ **চাক**

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী চাক জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ৩ হাজার ৭৭ জন। তন্মধ্যে ১ হাজার ৫৫৫ জন পুরুষ (৫০.৫৪ শতাংশ) এবং ১ হাজার ৫২২ জন নারী (৪৯.৪৬ শতাংশ)। বান্দরবান পার্বত্য জেলার সর্বশেষ দক্ষিণে অবস্থিত নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় চাক জনগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করে। এছাড়া ভারতের মনিপুর ও অরুণাচল প্রদেশে এবং মায়ানমারে চাক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।

➢ **পাংখোয়া**

রাঙামাটি জেলায় পাংখোয়া জনগোষ্ঠীর বাস রয়েছে। সর্বশেষ জনশুমারি অনুযায়ী পাংখোয়া জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ১ হাজার ৮৫৭ জন। তন্মধ্যে ৯৪৩ জন পুরুষ (৫০.৭৮ শতাংশ) এবং ৯১৪ জন নারী (৪৯.২২ শতাংশ)।

➢ **লুসাই**

লুসাই জনগোষ্ঠীর লোকেরা মূলত রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের উপত্যাকায় বসবাস করে। গত জনশুমারি (২০২২ সালের) অনুযায়ী লুসাই জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা মাত্র ৩৮০ জন। তন্মধ্যে ১৮৯ জন পুরুষ (৪৯.৭৪ শতাংশ) এবং ১৯১ জন নারী (৫০.২৬ শতাংশ)। তবে লুসাই জনগোষ্ঠীর মতে, তাদের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সহস্রাধিক হবে। মূলত ভারতের মিজোরাম রাজ্যে লুসাই জনগোষ্ঠীর বসবাস বেশি।

➢ **গুর্খা**

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী গুর্খা জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা মাত্র ১০১ জন। তন্মধ্যে ৫৮ জন পুরুষ (৫৭.৪৩শতাংশ) এবং ৪৩ জন নারী (৪২.৫৭ শতাংশ)। রাঙামাটি শহরেই এই গুর্খা সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। তাদের মতে, গুর্খার সংখ্যা ৩০০ থেকে ৫০০ হতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যাগত পরিবর্তন

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের পেছনে দুটি ইস্যু প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। প্রথমটি কাপ্তাই বাঁধ, দ্বিতীয়টি- আশির দশকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সমতল থেকে ছিন্নমূল দরিদ্র বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা। এছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অভিবাসন, বাস্তুচু তি ও ভূমি থেকে উচ্ছেদ, অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে অনেক পাহাড়ি পরিবারের দেশান্তরীত হওয়া এবং চাকরি, ব্যবসা, বিবাহ প্রভৃতির কারণেও দেশের অন্যত্র বসবাসের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ঘটেছে।

চট্টগ্রামের জনশুমারির একটা তুলনামূলক চার্ট দেওয়া হলো-

ব্রিটিশ আমল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমিতি বিশ্লেষণ (১৮৭২-১৯৯১)[২৯]

সারণি-৯.১

জাতিসত্তা	সাল											
	১৮৭২		১৯০১		১৯৫১		১৯৫৬		১৯৬১		১৯৭৪	
	নং	%	নং	%	নং	%	নং	%	নং	%	নং	%
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩
পাহাড়ি	৬১৯৫৭	৯৮.২৬	১১৬০৬৩	৯২.৯৮	২৬১৫৩৮	৯০.৯১	৩০০০০০	৯০.৯১	৩৩৫০৬৯	৮৭.০১	৪০৯৫৭১	৮০.৫
বাঙালি	১০৯৭	১.৭৪	৮৭৬২	৭.০২	২৬১৫০	৯.০৯	৩০০০০	৯.০৯	৫০০১০	১২.৯৯	৯৮৬২৮	১৯.৪

[২৯] Adnan, Shapan (2004) *Migration Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*. Dhaka, page. 57.

সারণি-৯.২

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমিতি বিশ্লেষণ: জনশুমারি ২০১১ ও ২০২২[৩০]

জেলাভিত্তিক পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার তথ্যচিত্র

জেলা	জনশুমারি	জনসংখ্যা	জাতীয়তা		ধর্মীয়				
			বাঙালি	অবাঙালি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	মুসলিম	বৌদ্ধ	হিন্দু	খ্রিস্টান	অন্যান্য
খাগড়াছড়ি	২০২২	৭১৪১১৯	৩৬৪৭৪১ (৫১.০৮ শতাংশ)	৩৪৯৩৭৮ (৪৮.৯২ শতাংশ)	৩৩২৪৯৪ (৪৬.৫৬ শতাংশ)	২৫৬৫১২ (৩৫.৯২ শতাংশ)	১১৯৬১৫ (১৬.৭৫ শতাংশ)	৪৪২৮ (০.৬২ শতাংশ)	১১৪৩ (০.১৬ শতাংশ)
	২০১১	৬১৩৯১৭	২৯৬৯৩০ (৪৮.৩৭ শতাংশ)	৩১৬৯৮৭ (৫১.৬৩ শতাংশ)	২৭৪২৫৮ (৪৪.৬৭ শতাংশ)	২৩১৩০৯ (৩৭.৬৮ শতাংশ)	১০৩১৯৫ (১৬.৮১ শতাংশ)	৪০৭০ (০.৬৬ শতাংশ)	১০৮৫ (০.১৮ শতাংশ)
রাঙ্গামাটি	২০২২	৬৪৭৫৮৭	২৭৪৭২৩ (৪২.৪২ শতাংশ)	৩৭২৮৬৪ (৫৭.৫৮ শতাংশ)	২৩৪৫৫৬ (৩৬.২২ শতাংশ)	৩৭০৭৪৪ (৫৭.২৫ শতাংশ)	৩৩০২৭ (৫.১০ শতাংশ)	৮৫৪৮ (১.৩২ শতাংশ)	৭১২ (০.১১ শতাংশ)
	২০১১	৫৯৫৯৭৯	২৩৯৮২৬ (৪০.২৪ শতাংশ)	৩৫৬১৫৩ (৫৯.৭৬ শতাংশ)	২০৯৪৬৫ (৩৫.১৫ শতাংশ)	৩৪৭০৩৮ (৫৮.২৩ শতাংশ)	৩০২৪৪ (৩.৪২ শতাংশ)	৮৬৬৩ (১.৪৫ শতাংশ)	৫৬৯ (০.১০ শতাংশ)
বান্দরবান	২০২২	৪৮১১০৯	২৮৩১৩৪ (৫৮.৮৫ শতাংশ)	১৯৭৯৭৫ (৪১.১৫ শতাংশ)	২৫৩৪৪৮ (৫২.৬৮ শতাংশ)	১৪২০২৩ (২৯.৫২ শতাংশ)	১৬৪৫৪ (৩.৪২ শতাংশ)	৪৭০৫২ (৯.৭৮ শতাংশ)	২২১৭৯ (৪.৬১ শতাংশ)
	২০১১	৪০৪০৯৩	২২৪৬৯৩ (৫৫.৬০ শতাংশ)	১৭৯৪০০ (৪৪.৪০ শতাংশ)	১৯৭০৮৭ (৪৪.৭৭ শতাংশ)	১২৩০৫২ (৩০.৪৫ শতাংশ)	১৩১৩৭ (৩.২৫ শতাংশ)	৩৯৩৩৩ (৯.৭৩ শতাংশ)	১৫৭২৬ (৩.৮৯ শতাংশ)

সারণি-৯.৩

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনংসংখ্যার তথ্যচিত্র[৩১]

পার্বত্য চট্টগ্রাম	জনশুমারি	জনসংখ্যা	জাতীয়তা		ধর্মীয়				
			বাঙালি	অবাঙালি/ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	মুসলিম	বৌদ্ধ	হিন্দু	খ্রিস্টান	অন্যান্য
খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান	২০২২	১৮৪২৮১৫	৯২২৫৯৮ (৫০.০৬ শতাংশ)	৯২০২১৭ (৪৯.৯৪ শতাংশ)	৮২০৪৯৮ (৪৪.৫২ শতাংশ)	৭৬৯২৭৯ (৪১.৭৪ শতাংশ)	১৬৯০৯৬ (৯.১৮ শতাংশ)	৬০০২৮ (৩.২৬ শতাংশ)	২৪০৩৪ (১.৩০ শতাংশ)
	২০১১	১৬১৩৯৮ ৯	৭৬১৪৪৯ (৪৭.১৮ শতাংশ)	৮৫২৫৪০ (৫২.৮২ শতাংশ)	৬৮০৮১০ (৪২.১৮ শতাংশ)	৭০১৩৯৯ (৪৩.৪৬ শতাংশ)	১৪৬৫৭৬ (৯.০৮ শতাংশ)	৫২০৬৬ (৩.২৩ শতাংশ)	১৭৩৮০ (১.০৮ শতাংশ)

পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন কাঠামো

১৮৬০ সালে ব্রিটিশরা প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ অঞ্চলের আলাদা নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি, ভৌগলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে ব্রিটিশেরা এ অঞ্চলের ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য আলাদা শাসনবিধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সেই লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০ প্রবর্তন করে। তখন থেকে এ আইনটি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র শাসন কাঠামোর মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

[৩০] সূত্র: পার্বত্য নিউজ

[৩১] প্রাগুক্ত

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে বান্দরবান ও ১৯৮৩ সালে খাগড়াছড়িকে জেলা ঘোষণা করার পরে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি জেলায় বিভক্ত হয়। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় ৩টি সংসদীয় আসন আছে।

৭০ দশকের প্রথমদিক থেকে সাংবিধানিকভাবে জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি না পাওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত হয়ে ওঠে। এ অশান্ত অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী একটি অঘোষিত যুদ্ধের রূপ নেয়। তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে এবং এ সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান না করে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। ফলে পাহাড়ের পরিস্থিতি চরম অশান্ত হয়ে পড়ে। সেসময় নিরাপত্তাজনিত কারণে কয়েক হাজার পাহাড়ি পরিবার পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ অশান্ত পরিস্থিতিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ এর আমল থেকে শুরু করে খালেদা জিয়া শাসনামল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে দফায় দফায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামীলীগ শাসনামলে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সম্মতিতে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।

এ চুক্তির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়' গঠিত হয়। এর আগে ১৯৮৯ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হয়। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে সংশোধনী এনে নতুনভাবে গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ'। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনেই তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদিকে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভাসমূহ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ফলে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো দুই মন্ত্রণালয়ের অধীন হওয়ায় সেখানকার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড ও প্রশাসনিক কাজের মধ্যে সমন্বয়হীনতা তৈরি হয়ে থাকে। এতে রাষ্ট্রের যেমন অর্থের অপচয় ঘটছে, তেমনি জনগণের দুর্ভোগ বেড়েছে। ফলে উন্নয়ন ও সেবা কাজে সমন্বয়ের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সব ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় আনয়ন করা খুবই জরুরি হয়ে পড়ে।

সুপারিশ:

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Rules of Bussiness–এর ৮ নং ক্রমিকে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভাসমূহের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং করার দায়িত্ব ইতোমধ্যে উল্লেখ করা আছে। কিন্তু সেটি আজ অবধি বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাই কমিশন মনে করে, প্রতিবছর স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় বাজেট থেকে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করে Rules of Bussiness এর এ ধারাটি অচিরে বাস্তবায়ন করবে।

২) সমতলের জাতিসত্তাদের জন্য আলাদা একটি অধিদপ্তর গঠন করে সেটাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে।

৩) তিন পার্বত্য জেলা ও সমতলের জন্য পরিচালিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ[৩২] সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে।

[৩২] ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-রাঙ্গামাটি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-বান্দরবান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-খাগড়াছড়ি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী, মনিপুরী ললিতকলা একাডেমি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, হালুয়াঘাট, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-দিনাজপুর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-নওগাঁ।

৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের জন্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় বাজেট থেকে পৃথক অর্থ বরাদ্দ করে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানসমূহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে ২৭ মে ১৯৯৯ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ' গঠিত হয়[৩৩]। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কাজ হলো পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সব উন্নয়ন কাজ ও এর আওতাধীন বিষয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা।

এক্ষেত্রে জেলা পরিষদগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে আইনের বিধান সাপেক্ষে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। এছাড়া পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা, পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়ন তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা, পার্বত্য এলাকার জাতিসত্তাগুলোর নিজস্ব রীতি-নীতি, প্রথা ও সামাজিক বিচার তত্ত্বাবধান করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক বিধি অনুসারে নির্বাচিত হবেন। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা ৫(১)(চ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত (৩ পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য)।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ৩ মার্চ ২০১১ সালে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়টি বহাল রাখে। বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন। ২০১৮ সালের ৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট উচ্চ আদালতের রায়টি স্থগিত করে। এমতাবস্থায় কমিশন আপাতত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করছে না। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার আশা করি এ বিষয়ে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সুপারিশ:
তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করা।

পার্বত্য জেলা পরিষদ

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পরে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ৩টি আইন যথাক্রমে-

১) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৯ নং আইন)
২) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ২০ নং আইন)
৩) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ২১ নং আইন)

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কাজ হলো জেলার যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরিষদের বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং

[৩৩] Roy, R.D., Chakma, P. and Lira, S.(2010) *Compendium on National and International Laws & Indigenous Peoples in Bangladesh*, pp. 415-436.

মানব সম্পদ উন্নয়ন করা। সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত দপ্তরের তদারকি ও সার্বিক উন্নয়ন, সমন্বয় সাধন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষে প্রকল্প গ্রহণ করা। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সহযোগিতায় উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাও অন্যতম একটি কাজ হিসেবে দেখা হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯ সালের ২৫ জুন তিন পার্বত্য জেলার তৎকালীন স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন অনুসারে পরিষদের চেয়ারম্যান ও সকল সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এ পরিষদসমূহ ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। তৎকালীন স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনানুযায়ী সরকারি বিভিন্ন বিভাগের ২২টি বিষয় ও সংস্থা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা এবং নির্বাহী ক্ষমতাও পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে ন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে।

একদিকে তিন দশক ধরে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর নির্বাচন না হওয়া, অন্যদিকে জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদসমূহের মধ্যে নির্বাহী ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কখনো কখনো জেলা আইনশৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ নানাবিধ কাজে সমস্যা তৈরি হয়। এছাড়া দীর্ঘদিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এ পরিষদগুলোতে যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে সেই সরকারের মনোনীত ব্যক্তিরাই পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য মনোনীত হন। ফলে জেলা পরিষদগুলো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে অগণতান্ত্রিকভাবে মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা জেলা পরিষদগুলো এভাবে পরিচালিত হতে থাকলে একসময় এ পরিষদগুলো গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। তখন এ প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। তাই পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে জনমুখী করে তোলার লক্ষে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর দ্রুত নির্বাচন সম্পন্ন করা আবশ্যক। এজন্য আইনগত ও বিধি মোতাবেক যা যা করণীয় এবং আইনের ত্রুটি ও দুর্বল দিকগুলোও দূর করা আবশ্যক।

১৯৮৯ সালে ‘পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ’ নামে তিন পার্বত্য জেলায় যাত্রা শুরু হয়। প্রথমদিকে স্থানীয় সরকার পরিষদে জেলা পর্যায়ের কয়েকটি দপ্তর হস্তান্তরিত হলেও ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি মোতাবেক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩০টি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩০টি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ২৯টি দপ্তর হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু উল্লেখিত দপ্তরগুলো হস্তান্তর করা হলেও এসব দপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর থেকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। অর্থাৎ জেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মচারিদের বেতন ও ভাতাদি প্রদান করে ঠিক, কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের উন্নয়ন কর্মকান্ড বা পরিকল্পনা কেন্দ্রীয়ভাবে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আমরা জানি, কোনো বিভাগ বা দপ্তর হস্তান্তরের অর্থই হলো উক্ত বিভাগের কার্যক্রম (Function) জনবল (Functionary) ও অর্থ (Fund) শতভাগ হস্তান্তর করা। কিন্তু পার্বত্য চুক্তির শর্ত মোতাবেক জেলা পরিষদসমূহে বিভিন্ন দপ্তর হস্তান্তর করা হয়েছে ঠিকই, তবে তা মুলত প্রতীকী। সেসব দপ্তরের কার্যক্রম ও অর্থ কোনটিই পূর্ণাঙ্গভাবে হস্তান্তর হয়নি এবং জনবলের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, জেলা পরিষদসমূহ শুধুমাত্র ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত কর্মচারী নিয়োগের ও বদলির ক্ষমতা রয়েছে। তাই পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩০টি দপ্তর হস্তান্তর করার কথা বলা হলেও প্রকৃত অর্থে কোনো দপ্তরই পূর্ণাঙ্গভাবে জেলা পরিষদসমূহের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।

তাই উক্ত দপ্তরগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ অন্যান্য কার্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের অধীন হওয়ায় এসব দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা পরিষদগুলোর কোনো ভূমিকা থাকে না। এতে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় চরম সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চুক্তির সর্বমোট ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার কর্তৃক দাবি করা হয়। কিন্তু জেলা পরিষদসমূহের কাছে হস্তান্তরিত দপ্তরগুলো প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ হস্তান্তর হয়নি। তাই স্ব-স্ব জেলার সার্বিক

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণে সমন্বয় সাধনের জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিকট সকল দপ্তরের সমস্ত ক্ষমতা (কার্যক্রম, জনবল ও অর্থ) হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশ:

১) পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক হস্তান্তরিত বিভাগগুলোর সার্বিক কার্যক্রম, জনবল ও অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিকট শতভাগ হস্তান্তর করতে হবে। বর্তমানে জেলার সার্বিক উন্নয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকায় স্ব-স্ব (হস্তান্তরিত বিভাগ) বিভাগগুলো নিজেদের মর্জিমাফিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে জেলা পরিষদের পক্ষে এসব বিভাগগুলোকে পরিবীক্ষণ করা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। তাই হস্তান্তরিত বিভাগগুলোকে শতভাগ (কার্যক্রম, জনবল ও অর্থ) হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে।

২) সমতলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও সংসদীয় পদ্ধতিতে জেলা পরিষদ নির্বাচন করলে অধিক সুফল পাওয়া যেতে পারে। আর এ নির্বাচন প্রক্রিয়াটি হবে জাতিভিত্তিক ভোট প্রদানের মাধ্যমে। অর্থাৎ জেলা পরিষদের সদস্যগণ স্ব-স্ব জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত সদস্যগণের গোপন ভোটের মাধ্যমে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন। উল্লেখ্য, আইন অনুযায়ী চেয়ারম্যান অবশ্যই একজন উপজাতি হবেন।

৩) জাতিভিত্তিক ভোটের জন্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সহজীকরণ করা এবং এ সংক্রান্ত নির্বাচন বিধিমালায় সংশোধনী এনে জাতিসত্তাভিত্তিক ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধি প্রণয়ন করা।

৪) পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন সংশোধন করে জাতীয় নির্বাচনের সর্বশেষ ভোটার তালিকা অনুযায়ী পার্বত্য তিন জেলা পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করা। এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করতে গেলে জেলা পরিষদ আইনে যেসব জটিলতা ও শর্ত রয়েছে সেসব আইন ও বিধিমালায় সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করে এবং প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিকদের সাথেও আলোচনা করে জেলা পরিষদ আইনে সংশোধনী এনে দ্রুত নির্বাচন করা যেতে পারে। ঐক্যমত্যের পর একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা যেতে পারে।

৫) সার্কেল চীফগণ স্ব-স্ব পার্বত্য জেলা পরিষদে সম্মানিত সদস্য বলে গণ্য হয়ে পরিষদের যেকোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান ও ভোট দানের অধিকারী হবেন।

উপরিল্লিখিত প্রস্তাবলির জন্য যেসব ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা রয়েছে সেগুলো সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও অংশীজন নাগরিকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে জাতিসত্তাভিত্তিক প্রার্থীর কথা বলা হলেও ভোট প্রদানের পদ্ধতি কেমন হবে তা স্পষ্টভাবে আইনে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে ভোটদানের একটি সূত্র প্রস্তাবিত সংশোধিত আইনে/অধ্যাদেশ সংযুক্ত করা হয়েছে।

আইনের সংশোধনীয় তিনটি খসড়া প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খন্ডে যুক্ত করা হয়েছে।

সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচনের পরে প্রস্তাবিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন কাঠামো নিম্নরূপ

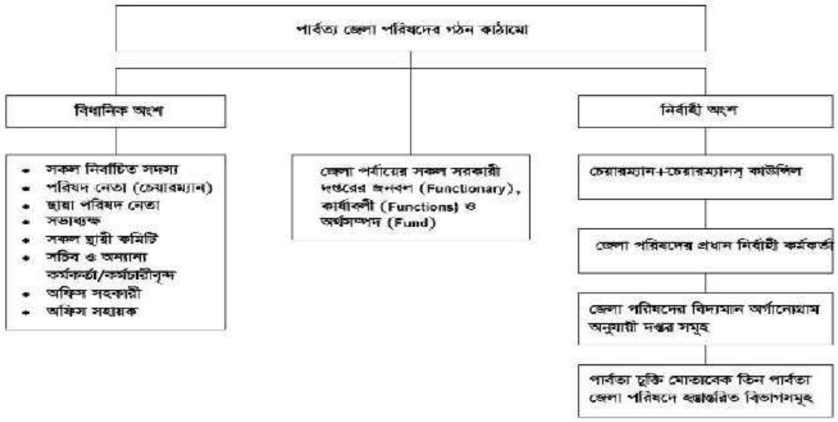

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

১৯৭৬ সালের ৭৭ নং অধ্যাদেশ[৩৪] বলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এ অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, যাতায়াত, অবকাঠামো নির্মাণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন এবং সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মোটকথা, এ বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কল্যাণমুখী কাজের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। আর ভিশন হলো, একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম গড়ে তোলা। এই বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় থাকা সমীচীন। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা পরিষদ পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত হলে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পুর্নগঠনের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর এ চারটি পরিষদ ব্যবস্থা বাস্তাবায়িত হলে এই বোর্ডের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নতুনভাবে বিন্যস্ত হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাজার ফান্ড

১৯৮১ সালে[৩৫] গঠিত বাজার ফান্ড স্বতন্ত্র একটি ব্যবস্থা হলেও ১৯৮৯ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের পর তা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জেলা পরিষদসমূহ একদিকে সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অর্থ সম্পদ পাচ্ছে। এমনকি বাজার ফান্ডের আহরিত সমূদয় অর্থও জেলা পরিষদের তহবিলে জমা হচ্ছে। অপরদিকে, তিন পার্বত্য জেলার ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভাসমূহ সমতলের ন্যায় ভূমি হস্তান্তর কর, বাজারের রাজস্ব অন্যান্য ইজারার কোন অর্থ পায় না। তাছাড়া গৃহ কর আদায় করতে পারে না। তাই এ প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থভাবে প্রায় অকার্যকর।

বাজার ফান্ড ব্যবস্থাটি অনেক সেকেলে ও বৈষম্যপূর্ণ। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষিজ, ফলজ ও বনজ সম্পদের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় হাট-বাজারসমূহ থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব বাজার ফান্ডে আসার কথা, তা আসলেও দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে আত্মসাৎ হচ্ছে। বাজারকে কেন্দ্র করে একটি কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। একদিকে প্রচুর রাজস্ব বেহাত হচ্ছে, অপরদিকে এ রাজস্ব আত্মসাতকারী একটি মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা উচ্চ হারে বাজার রাজস্ব প্রদান করলেও সে অর্থ কোন প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পকেটস্থ হচ্ছে।

---

[৩৪] Roy, R.D., Chakma, P. and Lira, S. (2010) *Compendium on National and International Laws & Indigenous Peoples in Bangladesh*, pp-২৬৭-২৭৫

[৩৫] Roy, R.D., Chakma, P. and Lira, S. (2010) *Compendium on National and International Laws & Indigenous Peoples in Bangladesh*, pp- ১৯১-২৪৪

তাই এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলো-

১) বাজার ফান্ড ব্যবস্থাটি বিলুপ্ত করা যেতে পারে।
২) বাজারগুলো মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ইজারা দেয়া যেতে পারে।
৩) ইজারালব্দ অর্থ ইউনিয়ন (৫০ শতাংশ), পৌর এলাকায় হলে পৌরসভা (৫০ শতাংশ), সার্কেল চীফ এর কার্যালয় ১০ শতাংশ এবং সরকার ২০ শতাংশ এবং জেলা ও উপজেলা পরিষদ ১০ শতাংশ হারে পাবেন।
৪) সরকার ২০ শতাংশ অর্থ থেকে পরবর্তীতে বাজার উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করবেন।
৫) বাজার ফান্ড সংস্থার কর্মচারীগণ জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে আত্মীকৃত হবেন বা নিলাম কারকদের কর্মচারী হিসেবে কাজ করবেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত ব্যবস্থা[৩৬]

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথাগত ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথাগত নিয়মে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বিচারিক বা সালিশ কার্যক্রম চলে। ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৩টি সার্কেলে বিভক্ত করা হয়। যথা- চাকমা সার্কেল, মং সার্কেল ও বোমাং সার্কেল। প্রতিটি সার্কেলে প্রধান হিসেবে একজন রাজা বা সার্কেল চীফ থাকেন। এ সার্কেলে ৩টি ধাপ থাকে, যথা- কার্বারী >হেডম্যান>রাজা। গ্রাম প্রধানকে 'কারবারী', মৌজা প্রধানকে 'হেডম্যান' বলা হয়। উল্লেখ্য, কয়েকটি গ্রাম মিলে একটি 'মৌজা' এবং কয়েকটি মৌজার সমন্বয়ে একটি 'সার্কেল' গঠিত হয়। রাজা, হেডম্যান ও কার্বারীরা খাজনা আদায়, জুমচাষ নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, সরকারি ভূমি বন্দোবস্ত, হস্তান্তর, বিভক্তি ও পুনঃইজারা প্রদানে সহায়তা করা ও স্থানীয়ভাবে গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিরোধ ও সালিশ নিষ্পত্তি করে থাকেন। প্রথাগত বিচারিক কাজে কোনো পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে তখন সেই পক্ষ কোন আদালতের শরণাপন্ন হবেন সেটার একটি বিকল্প বিচারিক ব্যবস্থার প্রথা চালু করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক প্রস্তবিত উপজেলাভিত্তিক বিচারিক ব্যবস্থায় প্রথাগত নেতা বা সংক্ষুব্ধ পক্ষ বিচার চাইতে পারবেন বলে কমিশন মনে করে।

সুপারিশ

১) পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সব স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনসমূহে উন্নয়নমূলক স্থায়ী ও অস্থায়ী কমিটিসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২) পার্বত্য এলাকার প্রথাগত সামাজিক রীতি নীতি ও বিধি ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩) প্রথাগত ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট অধিবেশন ও বাৎসরিক পরিকল্পনা সভায় স্থানীয় মৌজা প্রধান হেডম্যানদেরকে পদাধিকার বলে সদস্য করা ও যোগদানের সুযোগ দেওয়া।

৪) ইউনিয়ন পরিষদ ও প্রতিটি স্থায়ী কমিটিতে বিশেষ সদস্য হিসেবে হেডম্যানদের অন্তর্ভুক্ত করা।

৫) স্থানীয় সালিশের ক্ষেত্রে প্রথাগত ব্যবস্থায় বিচার কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। গ্রাম প্রধান কার্বারী বিচারের প্রতি কোনো পক্ষ (বাদী ও বিবাদী পক্ষ) অসন্তুষ্ট হলে সেই পক্ষ হেডম্যানের কার্যালয়ে পুনঃবিচার চাইতে পারে। এখানেও যদি কোনো পক্ষ অসন্তুষ্ট থাকে তাহলে রাজার দরবারে আপীল করতে পারেন। কিন্তু রাজার রায়ে যদি কোনো পক্ষ

[৩৬] Roy, R.D., Chakma, P. and Lira, S. (2010) *Compendium on National and International Laws & Indigenous Peoples in Bangladesh*, pp- ১৮৫-১৯০

সন্তুষ্ট না হন সেক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পক্ষ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যালয়ের বিচারক- কর্মকর্তার কাছে যেতে পারেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা বহুকাল ধরে চর্চিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানের চিত্র ভিন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ও বাঙালিদের বসতি বেড়ে যাওয়ায় প্রায়শ উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখা দেয়। এ ধরনের সংঘাতে উভয় পক্ষ যদি প্রথাগত বিচারে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে সেই মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ হেডম্যান-কার্বারীদের মাধ্যস্থাতায় সংঘাত নিষ্পত্তি হতে পারে। আর এ বিচার প্রক্রিয়ায় কোনো পক্ষ (বাঙালি-পাহাড়ি) অসম্মত থাকলে সেক্ষেত্রে উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যালয়ে নালিশ করতে পারবেন।

৬) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭, পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর সাথে ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তাই কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালত পার্বত্য তিন জেলায় কার্যকর রাখা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কাঠামোয়- পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে নারীদের জন্য মাত্র ৩টি করে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। তবে, অন্যান্য আসনে নারী অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোতে নির্বাচন না হওয়ায় নারীর সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এছাড়া উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় নারীর আসন বিন্যাস সাধারণ আইনে যা বিদ্যমান তা-ই আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হলে এসব স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রথাগত ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধি পেলেও পাহাড়ি নারী স্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকার প্রশ্নে এখনো পিছিয়ে রয়েছেন। তাই নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সামাজিক অনুশাসনেও অনেক অর্থবহ পরিবর্তন আনা জরুরি। এক্ষেত্রে পার্বত্য অঞ্চলের নাগরিক সমাজ পথ দেখাতে পারে।

সুপারিশ

১) নারীর অধিকার সুরক্ষার জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি ও পরিষদের সদস্যদের (নারী ও পুরুষ) সমন্বয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল/কমিটি গঠন করা;

২) পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য সমতল অঞ্চলের জাতিসত্তাভিত্তিক নারী আসন সংরক্ষণ করা;

৩) পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা

৪) ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নারী উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা।

৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীদের মধ্যে অধিকার সচেতনতা, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম ও শিক্ষা বিস্তারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন[৩৭]

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান সমস্যা ভূমি বিরোধ। তাই ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তির পরে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয় যা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন' নামে পরিচিত। ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের কয়েকটি ধারা পার্বত্য চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় আইন সংশোধনের দাবির প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালে কমিশনের আইন সংশোধনপূর্বক সরকারিভাবে গেজেট প্রকাশিত হয়। তবে উক্ত আইনের বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি, তাই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কাজ পুরোদমে শুরু করতে পারেনি। সূত্রে জানা যায়, এ আইনের খসড়া বিধিমালাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় কমিশনের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কাছে ২২ হাজার ৪৬৮টি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৯ হাজার ৯৪১টি রাঙামাটির, ৭ হাজার ৯৭৫টি খাগড়াছড়ির এবং ৪ হাজার ৫৫২টি বান্দরবান জেলা থেকে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে[৩৮]। উল্লেখ্য, ২০১৭ সাল থেকে ভূমি বিরোধ বিষয়ক আর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হয়নি।

সুপারিশ

১) ভূমি কমিশনকে কার্যকর করার জন্য দ্রুত এ আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং তা দ্রুত অনুমোদন ও কার্যকর করা;
২) একজন সৎ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ বিচারপতি (অব.) কে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা;
৩) ভূমি কমিশনের বাজেট ও জনবল বৃদ্ধি করা

সমতলের জাতিসত্তাদের পরিচিতি ও বর্তমান অবস্থা

'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' অনুযায়ী পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে বাংলাদেশে মোট ৫০টি পৃথক জাতিসত্তা রয়েছে। সর্বশেষ (২০২২) জনশুমারি অনুযায়ী প্রাপ্ত সমতলের জাতিসত্তাদের তালিকা ও জনসংখ্যা নিচে এক সারণিতে[৩৯] দেওয়া হলো। উল্লেখ্য যে, সমতলে বসবাসরত জাতিসত্তাদের মধ্যে সাঁওতাল জাতির লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যা সমগ্র বাংলাদেশে বসবাসরত জাতিসত্তাদেরগুলোর মধ্যে ৪র্থ বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যা ১২৯,০৫৬ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৬৩,৬৪৪ ও নারী ৬৫,৪১২ জন।

মূলত বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, উত্তরবঙ্গ, খুলনা, বরগুনা ও ঢাকা বিভাগে সমতলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করেন। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুসারে নিমোক্ত জাতিসত্তাসমূহের তালিকা পাওয়া যায়: ওরাঁও, গারো, সাঁওতাল, কোরা, কোচ, মনিপুরি, কোন্দ, কোল, খারোয়াড়, খাড়িয়া, খাসিয়া/খাসি, গোন্জু, গোরাইট, দালু/ডালু, তুরী, তেলী, পাত্র, পাহাড়ি, বোরাইক, বর্মণ, বাগদী, বানাই, বেদিয়া, ভিল, ভুইমালী, ভূমিজ, মালো, মাহাতো, মাহালি, মুন্ডা, মুশোর, রাখাইন, রাজোয়ার, লোহাড়, শবর, হাজং, হুদি, হো ও অন্যান্য।

[৩৭] Roy, R.D., Chakma, P. and Lira, S. (2010) *Compendium on National and International Laws & Indigenous Peoples in Bangladesh*, pp-৪৩৭-৪৪৩

[৩৮] প্রথম আলো ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২

[৩৯] জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী সমতলের জাতিসত্তাদের তালিকা ও জনসংখ্যা; পৃষ্ঠা-৩৬৫

সারণি -৯.৪

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী সমতলের জাতিগোষ্ঠীগুলোর[৪০] পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো						
জাতিসত্তার নাম	কোন কোন জেলায় বসবাস	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	প্রথাগত/ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানে নাম	সামাজিক নেতার পদবি
ওরাঁও	কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। এছাড়া গাজীপুর, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে বসবাস রয়েছে।	৮৫,৮৫৮	৪২,৫০২	৪৩,৩৫৬	পাঞ্চেস পাঁড়হা	হেডম্যান বা মহাতোষ রাজা
সাঁওতাল	দিনাজপুরের বীরগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট, ফুলবাড়ি, চিরির বন্দর, কাহাররোল। রংপুরের পীরগঞ্জে, নওগাঁ, বগুড়া	১২৯,০৫৬	৬৩,৬৪৪	৬৫,৪১২		মানঝি (গ্রাম প্রধান) পারানিক (মানঝির সহকারী) জগ মানঝি (বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করান)
কোরা/কড়া		৮১৬	৪১৬	৪০০		
কোচ	নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ	১৩,৭০৪	৬,৮৬৫	৬,৮৩৯	সামাজিক পরিষদ	মন্ডল
কোন্দ	সিলেটের শ্রীমঙ্গল উপজেলার উদনাছড়া, হরিণছড়া, পুটিয়া, খেজুরী, কুরূঞ্জী, নোয়াপাড়া, তেলিয়াপাড়া এবং কমলগঞ্জ উপজেলার কুমরিছড়া গ্রামের চা-বাগানে কোন্দ'রা বসবাস করেন।	১,৮৯৯	৯২১	৯৭৮	সামাজিক সংগঠন: *সামাজিক বিচার সালিশ করা ও প্রথানুযায়ী বিয়ে সম্পাদন করা *সিদ্ধান্তগ্রহণ *সাংগঠনিক কাজে সমাজপতিকে সহায়তা করা	বেহারা/রাজা সমাজপতি মন্ত্রী পরিচা ছাটিয়া(চৌকিদার)
কোল	চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলা ও গোমস্তাপুর উপজেলা, রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলা, নওগাঁর পোরশা ও সাপাহার উপজেলা, দিনাজপুরের কতোয়ালি সদর ও কাহারোল উপজেলা।	৩,৮২২	১,৮৪২	১,৯৮০		মোড়ল বা মাতব্বর
খারোয়াড়		৩১৪	১৭০	১৪৪		
খাড়িয়া	সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ। শ্রীমঙ্গল উপজেলার বর্মাছড়া, শিশিলবাড়ি, হুগলিছড়া। বাহুবল উপজেলারর বালুছড়া, চুনারুঘাট উপজেলা	৩,১০০	১,৫৫৮	১,৫৪২	খাড়িয়া পঞ্চায়েত	পাহান ডেহরী

[৪০] বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা: দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড; উৎস প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; ডিসেম্বর ২০১০।

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী সমতলের জাতিগোষ্ঠীগুলোর[৪০] পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো						
জাতিসত্তার নাম	**কোন কোন জেলায় বসবাস**	**মোট জনসংখ্যা**	**পুরুষ**	**নারী**	**প্রথাগত/ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানে নাম**	**সামাজিক নেতার পদবি**
খাসিয়া/খাসি	সিলেট জেলার জাফলং, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট উপজেলা, মৌলভীবাজার উপজেলার সবকটি উপজেলায়, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট ও বাহুবল উপজেলা, সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলা	১২,৪২২	৬,৩৫৭	৬,০৬৫	সামাজিক কাউন্সিল বা দরবার	মন্ত্রী বা ম্যান্ত্রী বা হেডম্যান
গোঞ্জু/গন্দ	নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, নওগাঁ, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলা, গাজীপুরের জয়দেবপুর, রাজবাড়ির পাংশা উপজেলা, ফরিদপুর সদর ও সিলেট	৪,১৩৭	২,০৩২	২,১০৫	দেহাতি	মোড়ল
গোরাইট/গড়াইট		২,৭৩০	১,৩৬৪	১,৩৬৬		
গারো	বৃহত্তর ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল, শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, সিলেটের সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার, গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা।	৭৬,৮৫৪	৩৭,৯০০	৩৮,৯৫৪		আখিং নকমা সংনি নকমা (গ্রাম প্রধান) চ্রা-পান্থে (গারোরা মাতৃসূত্রীয় হওয়ায় মায়েরদেও পক্ষের পুরুষ প্রতিনিধি)
দালু/ডালু	ময়মনসিং জেলার হালুয়াঘাট উপজেলা, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলা	৩৮৬	১৮০	২০৬		মোড়ল বা সরকার
তুরী	জয়পুরহাট ও উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় তুরীরা বসবাস করেন।	৩,৭৯৪	১,৯১১	১,৮৮৩		গ্রাম প্রধান মন্ডল। শ্রীবরদার: গ্রাম প্রধান মন্ডল হলেও শ্রীবরদার সমাজের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন এবং মন্ডলের সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
তেলী		২,০৮২	১,০৪২	১,০৪০		
পাত্র	সিলেট জেলা সদর, জৈন্ত ও গোয়াইনঘাট উপজেলা	৩,১০৩	১,৫৯৭	১,৫০৬	গ্রাম প্রধানকে বলে লার-মন্তানী। প্রতিটি গ্রামের 'লার মন্তানী নিয়ে গঠিত হয় 'বারগাইট'। লার-মন্তানীগণ গ্রামের সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। আর 'বারগাইট'	লার-মন্তানী বারগাইট

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী সমতলের জাতিগোষ্ঠীগুলোর[৪০] পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো						
জাতিসত্তার নাম	**কোন কোন জেলায় বসবাস**	**মোট জনসংখ্যা**	**পুরুষ**	**নারী**	**প্রথাগত/ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানে নাম**	**সামাজিক নেতার পদবি**
					সামাজিক নীতি প্রণয়ন করে	
পাহাড়ি	রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, নওগাঁ, দিনাজপুর, রংপুর ও গাইবান্ধা	৮,৮০১	৪,৪৪৪	৪,৩৫৭	পঞ্চায়েত অঞ্চল পঞ্চায়েত	মাতববর সরদার
বোরাইক/বড়াইক		৩,৪৪৭	১,৬৫১	১,৭৯৬		
বর্মণ	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর, গাজীপুর সদর, শ্রীপুর উপজেলা, ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলা, টাঙ্গাইলের সখিপুর ও মির্জাপুর উপজেলা	৪৪,৬৭১	২২,৯৯০	২১,৬৮১	২০-২৫ টি পরিবার মিলে একটি 'সমাজ' গঠিত হয়	সমাজ প্রধান 'মাতববর'
বাগদী	বাগেরহাট সদর ও শরণখোলা। খুলনা জেলার দাকোপ, কয়রা, পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা। যশোরের শার্শা ও মনিরামপুর। ঝিনাইদহের সদর, কালিগঞ্জ ও শৈলকূপা। কুষ্টিয়া সদর, দৌলতপুর, ভেড়ামারা। মাগুরা সদর, শালিখা, শ্রীপুর ও মোহাম্মদপুর। নড়াইলের লোহাগড়া ও কালিয়া। ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা, মধুখালি, বোয়ালমারী। রাজবাড়ি জেলার সদর, গোয়ালন্দ, পাংশা, বালিয়াকান্দি এবং সিলেটের চা বাগানে বাগদিদের বসবাস	১২,০৯৬	৬,০৪৭	৬,০৪৯		মাতববর। মাতববরের সহযোগীকে বলা হয় ছড়িদার।
বানাই	ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট, শেরপুর, নালিতাবাড়ি, ঝিনাইঘাটি, শ্রীবর্দি, নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা, দূর্গাপুর, বালুচড়া	২,৮৫১	১,৪৫৮	১,৩৯৩	বানাই সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রাম প্রধানকে 'গাঁওবুড়া' বলে।	গাঁওবুড়া
বেদিয়া	জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ জেলার পুংরল নওগাঁ গ্রামে বেদিয়াদের বসবাস	৭,২০৯	৩,৫৩৪	৩,৬৭৫		গ্রাম প্রধানকে মোড়ল বলা হয়
ভেল/ভিল		৯৫	৫০	৪৫		
ভুঁইমালী	জয়পুরহাট	১,৯৩০	৯৯৬	৯৩৪		
ভূমিজ	রাজশাহী, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ জেলার চা-বাগানে ভূমিজদের বসবাস	৯,৬৬৪	৪,৮১২	৪,৮৫২		
মনিপুরি	সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, বড়লেখা, কুলাউড়া, জুড়ী, মৌলভীবাজার সদর।	২২,৯৭৯	১০,৭১৮	১২,২৬১	গ্রাম পঞ্চায়েত	এ পঞ্চায়েতের প্রধান 'এইগা' বা 'ব্রাহ্মণ'রাও হতে পারেন।
মালো	রংপুর, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি, উচায়, পলিচাঁদপুর, চাঁদপুর, পাথরঘাটা, বীরনগর, বদলগাছী,	১৪,৭৯৭	৭,৬৪৩	৭,১৫৪	মন্ডল পরিষদ	মন্ডল চাকলাদার

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী সমতলের জাতিগোষ্ঠীগুলোর[৪০] পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো						
জাতিসত্তার নাম	কোন কোন জেলায় বসবাস	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	প্রথাগত/ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানে নাম	সামাজিক নেতার পদবি
	পাহাড়পুর, নওগাঁ, মহাদেবপুর, মানগাছি, সোনাপুর, হিলি, শাহজাদপুর, ধানজুরম্ম, দাউদপুর					
মাহাতো	জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহী, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, খুলনা, বগুড়া, ফরিদপুর ও সিলেটের চা-বাগানে মাহাতোদের বসবাস	১৯,২৭১	৯,৬৩৫	৯,৬৩৬		
মাহালি	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, ঠাকুরগাঁও, চট্টগ্রাম চা-বাগান এলাকা, সিলেট সদর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেটের চা-বাগান	৬,৬১৬	৩,২৪৯	৩,৩৬৫	মানঝি পরিষদ	মানঝি মানঝি'র সহকারী 'পারনিক' জগমানঝি- যুব সমাজের দেখভাল করে
মুন্ডা	খুলনা জেলার কয়রা থানা, সাতক্ষীরার তালা ও শ্যামনগর থানা এবং ঝিনাইদহ	৬০,২০১	২৯,৭৭৩	৩০,৪২৮	গ্রাম পঞ্চায়েত	মোড়ল
মুষহর/মুশোর	দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরের খোলাহাট, পীরগঞ্জ থানার ভাবকি, কবিরাজ হাট, বিরল থানার ধুকুরছড়ি, বাজনাহার, মোল্লাপাড়া, কড়িগাঁ কিষাণ বাজার, জয়দেবপুর। এছাড়া রাজশাহীর পবা থানা, পাবনার ঈশ্বরদী, নাটোরের সাতমাথা, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ	৪,৬০৩	২,২৪৮	২,৩৫৫	মুষহর প্রধানকে মাহাতো বলে। বর্তমানে নারীরাও মাহাতো নির্বাচিত হচ্ছেন।	মাহাতো
রাখাইন	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশালের বাকেরগঞ্জ, পটুয়াখালী, বরগুনা	১১,১৯৭	৫,৪৪৩	৫,৭৫৪		'মাতব্বর' বা তাদের ভাষায় 'রোওয়াসুগ্রী'
রাজোয়ার	রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি উপজেলার চৈতন্যপুর, দমদমা, সরাইপুর, বেণীপুর, মোলাপাড়া, রাহী, পোহাপুর, অভয়া গোপালপুর, কলিপুর, ফুলবাড়ি গ্রামে এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলা, বগুড়ার শেরপুর উপজেলা ও মাগুরার শ্রীপুর উপজেলায় রাজোয়ার জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।	২,৩২৭	১,১৯৩	১,১৩৪	সব রাজোয়াড়দের প্রধানকে 'বাইশি-প্রধান' বলে। গ্রাম সমাজের প্রধানকে মোড়ল। মোড়লের পরে 'প্রধান' ও 'টহলদার' আছে।	বাইশি-প্রধান মোড়ল প্রধান টহলদার
লোহাড়/লহরা	জয়পুরহাট সদর উপজেলার ভাদসা ইউনিয়নে, রাজশাহী ও নাটোর	৩,৪২০	১,৭২১	১,৬৯৯	সমাজ প্রধান	মন্ডল
শবর	মৌলভীবাজার চা বাগান	১,৯৮০	১,০১৯	৯৬১		
হাজং	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতি, শ্রীবর্দী উপজেলা। ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া,	৭,৯৯৬	৩,৮১৪	৪,১৮২	হাজংদের গ্রাম প্রধানকে বলা হয় 'গাঁওবুড়া' এবং	গাঁওবুড়া সড়ে মড়ল বা মোড়ল

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী সমতলের জাতিগোষ্ঠীগুলোর[৪০] পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো						
জাতিসত্তার নাম	কোন কোন জেলায় বসবাস	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	প্রথাগত/ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানে নাম	সামাজিক নেতার পদবি
	নেত্রকোণার সুসং দূর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলা, সুনামগঞ্জ সদর ও ধরমপাশা, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারা উপজেলা। এছাড়া গাজীপুর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, মির্জাপুর, সখিপুর, ভালুকা উপজেলায় কিছু কিছু হাজং বসবাস করেন।				চাকলা (মৌজা) প্রধানকে বলে ‘সড়ে মড়ল’। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ‘চাকলা’ বা ‘জোয়ার’ হয়। এই জোয়ার প্রধান হলেন ‘হেডম্যান’। আবার এই চাকলা বা জোয়ারের সমন্বয়ে গঠিত হয় ‘পরগনা’। এই পরগনা’র প্রধানকে হাজংরা ‘রাজা’ বলেন।	হেডম্যান রাজা
হুদি	শেরপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর	১,৫০৫	৭২৬	৭৭৯		
হো/হালাম	হবিগঞ্জ	২২৪	১০৫	১১৯	কাউন্সিল	চৌধুরী
অন্যান্য		৬৮,৫৮৮	৩৪,০১৭	৩৪,৫৭১		
সমতলের জাতিগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা		৬,৬০,৫৪৫				

[তথ্য সূত্র: ২০২২ সালের জনশুমারি ও বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা: দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড; উৎস প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; ডিসেম্বর ২০১০]

সুপারিশসমূহ

১) সমতলের জাতিসত্তাদের জন্য আলাদা অধিদপ্তর গঠন করে সেটা পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে।

২) উপজেলায় গঠিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নিয়োজিত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা সমতলের ইউনিয়ন পরিষদের ও ওয়ার্ডভিত্তিক সালিশ কমিটির পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের প্রথাগত সংগঠন ও প্রধানদের সাথেও যুক্ত থাকবেন। তাদের কোনো বিরোধ সমাজে মীমাংসা না হলে তিনি আপিল শুনবেন।

৩) সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের প্রথাগত নেতৃত্বকে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রশিক্ষণ ও বিচারকার্য তত্ত্বাবধান করবেন।

৪) সমতলের যেসব উপজেলায় ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষজনের বসবাস বেশি সেসব অঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদসমূহে সেসব জাতিসত্তাদের জন্য সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ রাখতে হবে।

৫) সমতলের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা অধ্যুষিত ইউনিয়ন পরিষদগুলো এসব জাতিসত্তার মানুষদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি পৃথক স্থায়ী কমিটির বিধান যুক্ত করে নিতে পারে।

৬) সমতলের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষজনের জানমাল, সম্পদ ও নিজস্ব সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সুরক্ষার জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ বিশেষভাবে নজরদারী করবে।

৭) দেশের সমতল অঞ্চলে বসবাসরত জাতিসত্তাগুলোর প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব বিকাশে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৮) সমতলের জাতিসত্তাগুলো ক্রমশ বিলুপ্তির কারণে কোনো কোনো পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সেসব জাতিসত্তার পরিবারগুলোর জন্য প্রশাসনিক ও স্থানীয় পরিষদসমূহের উদ্যেগে গুচ্ছগ্রাম তৈরি করা যেতে পারে। এতে তারা কয়েকটি পরিবার অন্তত একসাথে বসবাস করতে পারবে। তবে তাদের বসবাসের ভিটেমাটি থাকলে স্থানীয় প্রশাসন তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

অধ্যায়-দশ

গ্রামীণ বিরোধ নিষ্পত্তি: উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ আদালত স্থাপন, গ্রামীণ সালিশ ও এডিআর এর সংযোগ স্থাপন

ভারতীয় উপ-মহাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জনক জর্জ ফ্রেডেরিক স্যামুয়েল রবিনসন যিনি লর্ড রিপন নামে বেশি পরিচিত, তিনি ১৮৮০-১৮৮৪ সাল পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি Local Self-Government Act, ১৮৮২ এর মাধ্যমে ইন্ডিয়াতে মিউনিসিপালিটিস ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করেন। পরবর্তীতে ইহার ক্রম-বিকাশ ঘটতে থাকে এবং ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসন আমলেও বিভিন্ন আঙ্গিকে চলমান থাকে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার ধারা অব্যাহত থাকে। তবে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। অতঃপর সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের সাথে উক্ত অনুচ্ছেদসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎকালীন সরকার তৃণমূল পর্যায়ে বিচারের সুফল পৌঁছে দেয়ার জন্য The Village Court Ordinance, ১৯৭৬ and The Pourashava Ordinance, ১৯৭৭ পাশ করে যা পরবর্তীতে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ ও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ দ্বারা রহিত করা হয়। এছাড়া, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ভোটবিহীন নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। তার থেকে সফল উত্তোরণের জন্য অত্র কমিশন যুগোপযোগী জনবান্ধব ও কল্যাণমূলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনের নিমিত্তে সুপারিশ প্রেরণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক জনমত সংগ্রহ করেছে। পার্বত্য অঞ্চলসহ মাঠ পর্যায়ে মতামত গ্রহণ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলোর লিখিত প্রস্তাব এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া (Website: www.lgrc.gov.bd, WhatsApp, Facebook and E-mail) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন করা হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত তথ্য ও মতামত বিশ্লেষণে স্থানীয় সরকার এর বিচার ব্যবস্থায় যে সব দুষ্টক্ষেত/সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

(১) গ্রাম আদালতে বিচারের নামে প্রহসন (২) উপজেলা পর্যায়ে কোর্টের ব্যাপক চাহিদা (৩) গ্রাম পুলিশ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেনা (৪) বিচার প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত নারী প্রতিনিধিদের কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই (৫) স্থানীয় সরকারের উপর প্রশাসনের প্রভাব বিস্তার (৬) বিচারে দুর্নীতি ও স্বজন-প্রীতি (৭) গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় জনগণের আস্থা কম, ইত্যাদি।

উল্লেখিত সমস্যা সমাধানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার অত্যাবশ্যক। তৎপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার সংস্কারের জন্য আইনী কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করা আবশ্যক। আইনগত সংস্কারের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা যাচ্ছে-

ক) গ্রাম আদালত ও পৌর সালিশ আইন বিলুপ্ত করে আপোষ-মীমাংসা ব্যবস্থা প্রণয়ন

বিচার ব্যাবস্থার ক্রম-বিকাশ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আনুষ্ঠানিক বিচারালয় হিসেবে আদালতের যাত্রা ঔপনিবেশিক আমল থেকে এবং এর অব্যবহিত পূর্বে মুসলিম আমলে বিচারালয় হিসেবে বিভিন্ন শহরকেন্দ্রিক প্রধান মসজিদ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে কাজীর আবাসস্থলও ব্যবহৃত হতো। তখন বিচারব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিকতার বড় ব্যবধান ছিল না। সরকারের সদিচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাথমিক পর্যায়ের নিরানব্বই ভাগ বিচার স্ব-স্ব গ্রামে অনুষ্ঠিত সালিসে নিষ্পত্তি হতো। যেসব বিরোধ সেখানে নিষ্পত্তি হতো না, কেবল সেসব বিষয় নিষ্পত্তির জন্য নিকটতম শহরে কাজীর দরবারে যেতে হতো। কাজী মুসলমানদের বিচার যথাযথ ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক নিষ্পন্ন করতেন। হিন্দু-মুসলিম বা হিন্দুধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে পক্ষগণের ধর্মীয় পন্ডিতগণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতেন।

সরকারিভাবে গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠার একটি দীর্ঘ পথপরিক্রমা রয়েছে। সেটা একদিনে হঠাৎ করে হয়ে যায়নি। ব্রিটিশ আমলে বৈধতার আচ্ছাদনে প্রাতিষ্ঠানিক আদালত কার্যক্রম শুরু হবার পর থেকেই লক্ষ্য করা যায়, বিচার প্রার্থনার জন্য সাধারণ মানুষ সেখানে সহজ প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জনমত যাচাইয়ে গ্রাম আদালতের পক্ষে বিপক্ষে মতামত রয়েছে। বর্তমান গ্রাম আদালত ও পৌর সালিশ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক পক্ষ-প্রতিপক্ষ এর প্রভাব বলয় কাজ করে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন নিরপেক্ষ প্রতিনিধির চেয়ে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি মেম্বার, কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান ও মেয়র নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক নেতার পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব নয়, এছাড়া স্বজন-প্রীতি প্রচলন ব্যাপক। স্থানীয় প্রতিনিধিদের বিচার ও আইন বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ থাকেনা এবং গ্রাম আদালতের উপর বিচার বিভাগের সরাসরি তত্বাবধান থাকে না। এজন্যই আদালতের চেয়ে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রদত্ত আপোষ-মীমাংসা প্রথাকেই বিচারপ্রার্থীরা অধিক পছন্দ করছেন। এর কারণ হিসেবে কেউ শুরু থেকেই এর সাথে যুক্ত টাউট শ্রেণির দৌরাত্বকে দায়ি করেন; কেউ উকিল-মোক্তার আর প্রশাসনিক অশুভ তৎপরতাকে দায়ী করেন; কেউ আদালতের আনুষ্ঠানিকতা বুঝতে অপারগ, কেউ প্রক্রিয়াগত কারণে সৃষ্ট দীর্ঘসূত্রিতাকে দায়ী করেন; কেউ লাগামহীন দুর্নীতিকে দায়ী করেন। এসব কারণে শুরুতেই আদালতের প্রতি মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যায় পক্ষ সবল আর ন্যায়পক্ষ দুর্বল এটা চিরাচরিত সত্য। বিচার প্রার্থনার ক্ষেত্রে ন্যায়প্রার্থীরা আর্থিক সংকটের কারণে দীর্ঘদিন মামলা চালাতে সক্ষম হতেন না বিধায় অসাধু লোকেরা এর সুযোগ গ্রহণ করতো। ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থায় এ ধরনের অরাজকতার কারণেই বিচারপ্রার্থীরা সে পথ পরিহার করে তুলনামুলক কম খরচে, স্বল্প সময়ে অধিক ন্যায় লাভের আশায় সালিশ বিচারকের স্মরণাপন্ন হতেন। ব্রিটিশ সরকার যেহেতু তাদের শোষণনীতির ভিত্তিতে শাসন কাঠামো সৃষ্টি করে, সেহেতু বিচার কাঠামো তাদের সুবিধামতো ছিল সেটাই স্বাভাবিক। ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিচার প্রশাসনকে শুভঙ্করের ফাঁকির আদলে সাজায়। নৈতিকভাবে তা থেকে রক্ষার জন্য ঘুষ গ্রহণের বিরুদ্ধে আইন করা হয়। যেহেতু ঘুষ প্রমাণের জন্য ঘুষদাতার চাইতে বড় প্রমাণ আর কিছু নেই, সেহেতু দাতা-গ্রহীতা উভয়কে সমান দায়ী করে আইন করা হয়- যাতে কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে না পারে। গণতন্ত্র আজও আমলাতন্ত্রের অক্টোপাশে আত্মাহুতি দিয়ে বিকৃত সন্তুষ্টি খুঁজছে। বিচারপ্রার্থীকে সহজ ও নির্ঝঞ্ঝাট ন্যায়ভিত্তিক সালিশ বিচারের প্রতি নিরুৎসাহিত করে আদালতের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ানোর জন্য নানা রকম ফাঁকির সৃষ্টি করা হয়। তাতে মামলা-মোকদ্দমার জট ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে, নির্ঝঞ্ঝাটভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির একমাত্র সহজ উপায়ই হচ্ছে সালিশ বিচার।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পাশকৃত বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসন আইনে চৌকিদারি পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে উভয় ক্ষমতা একাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এই স্বায়ত্তশাসন আইনের আওতায় গ্রামভিত্তিক আদালত ও বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই আদালত ও বেঞ্চগুলোর দায়িত্ব ছিল গ্রাম পর্যায়ে ছোটখাট অপরাধ ও বিরোধের বিচার করা। সেই বিচারকার্য পরিচালিত হতো একই আইনে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত স্থানীয় কর্মকর্তা বা চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে।

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সরকার মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ও সালিশ আদালত অধ্যাদেশ জারি করে। সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশের আওতায় গ্রাম আদালত ও বেঞ্চগুলোর উপর বিবাহ, বহুবিবাহ, খোরপোশ, বাল্যবিবাহ, দখল-বেদখল, অধিকার ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ছোটখাট অপরাধের বিচার করার দায়িত্ব অর্পিত হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর মীমাংসামূলক সালিসি আদালত হিসেবে কিছু কিছু মামলা নিষ্পত্তি ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলীর বিচারের জন্য ‘গ্রাম

আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬' ও পৌর সালিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ প্রণীত হয়। এই প্রক্রিয়াটি নানা আইনি এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কখনও কার্যকর না হওয়ায় ভুক্তভোগীদের কাছে এর কোনো আবেদন সৃষ্টি হয়নি। ফলে এই আইনের সফলতা তেমনটি আসেনি। গ্রামবাংলায় আজও সিংহভাগ মানুষ প্রতিকারের জন্য সনাতন সালিশবিচার সম্পর্কিত রেওয়াজকেই অবলম্বন মনে করেন।

গ্রাম্য সালিশ বিচার-সংস্কৃতিকে আইনি প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসার তাগিদে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে 'গ্রাম আদালত আইন ২০০৬' শিরোনামে একটি আইন পাশ হয়। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর মানুষের ছোটখাট দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় এই আদালত সৃষ্টি করা হয়। এর লক্ষ্য সম্ভবত আনুষ্ঠানিক বিচারের প্রক্রিয়াগত জটিলতাকে সমন্বয় করে সালিশ কার্যক্রমের সর্বোত্তম সুফল নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। একে বিশেষজ্ঞগণ বিকল্প আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থায় রূপান্তর করতে চান।

উক্ত আইনে গ্রাম আদালতকে ফৌজদারি কার্যবিধি [Code of Criminal Procedure,1898 (Act No. V of ১৮৯৮)] এবং দেওয়ানি কার্যবিধি [The Code of Civil Procedure,1908] (Act No. V of ১৯০৮) অনুযায়ী কিছু বিধিনিষেধের আওতায় সীমিত বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আইনটি গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন ২০১৩ ও ২০১৮ দ্বারা সংশোধিত অবস্থায় কার্যকর। কোনো ব্যক্তি বা পক্ষ কোনো বিরোধীয় বিষয়ে বিচারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'গ্রাম আদালত' গঠনের আবেদন করলে চেয়ারম্যান তার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদকে নানারকম বিধি-বিধান ও আদালতের কাছে জবাবদিহিতার আওতায় গ্রাম আদালত গঠন করতে হয়। উক্ত আদালতের নানারকম বিধিবিধানের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য:

১. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন করে সদস্যসমেত মোট পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এই আদালত গঠিত হবে। প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুই জন সদস্যের মধ্যে একজন করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য থাকবেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কোনো সদস্য গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২. আনুষ্ঠানিক আদালত হলেও এতে কোনো আইনজীবীর থাকার বিধান নাই।

৩. ফৌজদারি মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অপরাধ সংগঠনের ৩০ দিন এবং দেওয়ানি বিষয়ে মামলার কারণ উদ্ভবের ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে হয়।

৪. আবেদন গ্রহণের পর বিধি মোতাবেক প্রতিপক্ষকে সমনের মাধ্যমে অবহিত করতে হয়।

৫. আদালত গঠিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রয়োজনবোধে সাক্ষীর উদ্দেশ্যে সমন জারি করার বিধান রয়েছে।

৬. উভয় পক্ষের শুনানির মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নির্ধারণপূর্বক পক্ষগণের মধ্যে আপোষ বা মীমাংসার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আপোষ নামায় উভয়ের স্বাক্ষরের পর ৩০ দিনের মধ্যে ইহা নিষ্পত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে এর বিরুদ্ধে আপিল বা রিভিশন করা যাবে না।

৭. শুনানি কার্য শুরু হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার কথা। যথাসময়ে নিষ্পত্তি না হলে আরও ৩০ দিন সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে।

৮. ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের আইনে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা মূল্যমানের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির বিধান ছিল। সর্বশেষ সংশোধন অনুযায়ী উক্ত আদালত অনধিক ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দিতে পারবে।

৯. সর্বসম্মত বা ৪:১ বা ৩:১ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। আদালতে ৩:২ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীতে সংক্ষুব্ধ পক্ষ এক্তিয়ার সম্পন্ন কোনো ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা সহকারী জজ আদালতে আপীল করতে পারবেন।

১০. কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে যদি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা জেলা জজ মনে করেন তা জনস্বার্থ ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে যথাযথ আদালতে বিচার হওয়া উচিৎ তাহলে তা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিতে পারবেন।
যেসব বিষয়ে উক্ত আদালত কাজ করতে পারে না, তা হল-

> কোনো আদালতে সংশ্লিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক কোনো মামলা চলমান থাকলে;

> অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো আদালত কর্তৃক দোষী হলে;

> কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্কের স্বার্থ জড়িত থাকলে;

> বিদ্যমান কলহের বিষয়ে কোনো সালিশি সিদ্ধান্ত হলে;

> বিরোধীয় পক্ষ কোনো সরকারি কর্মচারী হলে;

> বিরোধীয় ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ হলে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা সম্বলিত গ্রাম আদালত সর্বত্র কার্যকর না হওয়ার পেছনে অনেক কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হল প্রশাসনিক অমনোযোগিতা, অসহযোগিতা এমনকি প্রতিবন্ধকতাও। তাছাড়া যেহেতু এটি একটি আইনসম্মত বিষয়, সেহেতু এর বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত বিষয়াদির আইনি ভিত্তি থাকে। পক্ষদের মামলা মিথ্যা তথ্য নির্ভর হলে গ্রাম আদালতের এসব বিষয়াদি ফাঁস হওয়ার ভয় থাকে। তাই পক্ষরা এতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না। নির্ধারিত ফি জমাকরণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ইউনিয়ন পরিষদও গ্রাম আদালত গঠনের পরিবর্তে ঐতিহ্যবাহী সালিশ প্রক্রিয়াতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। তাই সালিশ সংস্কৃতি বর্তমানেও জনপ্রিয় এবং অপ্রতিরোধ্য।

প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে, ভুক্তভোগী সত্য বলার সাহস করে না, কারণ গ্রাম আদালত কিছুই অর্জন করতে পারে না। তারা প্রশাসনিক সংযোগ, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অযাচিত প্রভাব, পেশীশক্তি এবং দুর্নীতির কারণে পক্ষপাতদুষ্ট। স্থানীয় জনগণের মতামত অনুযায়ী এমনকি একটি আনুষ্ঠানিক আদালত যখন তার রায় ঘোষণা করেছে, তখনও এটি কার্যকর করা কঠিন সংস্কার সত্ত্বেও, গ্রাম আদালতগুলো যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের জন্য কতটা কাজ করে তা নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে ক্রমবর্ধমান কাজের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে, ইউপি সচিবের গ্রাম আদালতে সেবা দেয়ার জন্য ক্ষমতা ও সক্ষমতার অভাব রয়েছে যা মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় দেখা গেছে।

গ্রাম আদালতের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ন্যয়-অন্যায় নির্ধারণ করে বিরোধের একটা আপোষমূলক নিষ্পত্তি করা। কিন্তু স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর অমনোযোগিতা, অসহযোগিতা ও দুর্নীতির কারণে গ্রাম আদালতগুলো সক্রিয় হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছেনা। এ ব্যাপারে সরকারও সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ের এই বিচার প্রক্রিয়া অনেকটা স্থবির হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে আদালত ও থানার দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ অননুমোদিত গ্রাম্য সালিশ বিচারের প্রতি আরও নির্ভরশীল

হয়ে পড়ছে। গ্রাম্য সালিশ বিচারের সুবাদে সাধারণ মানুষ আদালত, থানা ও এসব প্রতিষ্ঠানের দালালদের খপ্পর থেকে বহুলাংশে নিষ্কৃতি পাচ্ছেন।

গ্রাম আদালত ব্যবস্থা বাতিলের জন্য আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে-

(ক) গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সংঘাত-ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি, প্রায়শই যাদের আর্থিক সামর্থ্য বেশি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে তাদের অগ্রগণ্যতা বেশি। দরিদ্র ও প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলো স্পষ্টতই সুবিধাবঞ্চিত। স্বজনপ্রীতি এবং দুর্নীতি অনিবার্যভাবে মসৃণ সংঘাত নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। ছোট আকারের সংঘাতের জন্য গ্রাম আদালতের পরিবর্তে ঐতিহ্যবাহী বিরোধ নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তি পদ্ধতি ভালো কাজ করবে। তবুও, বেশিরভাগ জমির মালিকানা-সম্পর্কিত বিরোধের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে সীমিত।

(খ) ঐতিহ্যবাহী অনানুষ্ঠানিক সালিশ (সালিশ, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সালিশের একটি প্রাচীন এবং প্রচলিত পদ্ধতি যা সামাজিক সংলাপকে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য সম্মত একটি সমাধানে পৌঁছাতে সক্ষম করে) ছোট আকারের দেওয়ানি এবং ফৌজদারি বিরোধের বিচারের প্রধান উপায় হিসেবে রয়ে গেছে।

(গ) গ্রাম আদালতগুলো জনসাধারণের মধ্যে নিয়মিত শুনানি নিশ্চিত করার জন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারণা চালাতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রাম আদালতের একজন চেয়ারম্যানের বিরোধের কোনও পক্ষের সাথে পারিবারিক বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকলে প্রত্যাখ্যানের নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য। স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার রূপান্তর ন্যায়বিচার এবং অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু এবং গ্রাম আদালতের পরিবর্তে ADR (Alternative Dispute Resolution) এর মতো ঐতিহ্যবাহী সালিশ গ্রামীণ এলাকায় ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(ঘ) ঐতিহ্যবাহী সালিশ বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক বিচার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে, যাতে ন্যায়বিচার এবং মানবিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য একটি সুষ্ঠু সালিশ প্রক্রিয়া প্রদান করা যায়। ঐতিহ্যবাহী সালিশের রায় পদ্ধতিতে ন্যায্যতার স্বার্থে ADR (Alternative Dispute Resolution) প্রয়োগ করতে পারে, সাধারণ আনুষ্ঠানিক আইনের মূল অংশটি অকার্যকর এবং অবিবেচক হতে পারে। তবে মৌলিক অধিকারের একটি মূল সেট নির্দিষ্ট করে ন্যায্যতা পরিবেশিত হতে পারে যার সাথে গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তের পরিবর্তে ADR (Alternative Dispute Resolution)-এর প্রচলন করা অত্যাবশক।

(ঙ) গ্রাম আদালত এর ধারণা সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি হওয়ায় বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ধারণার সাথে যায় না। এছাড়া, গ্রাম আদালত আইন বাতিল হলে বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক বিচার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে সাহায্য করবে, যাতে ন্যায়বিচার এবং মানবিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি ন্যায্য সালিশ প্রক্রিয়া প্রদান করা যায়।

(চ) পক্ষাশ্রিত জন-প্রতিনিধি, বিচারিক জ্ঞানের স্বল্পতা এবং লালসালুতে আবৃত বিচারিক কাঠামোতে সাধারণ বিচার প্রার্থীদের ভীতি গ্রাম আদালতের কার্যকারিতায় নানান প্রশ্নের উদ্ভব হওয়ায় গ্রাম আদালত আইন বাতিল করা এখন সময়ের দাবি। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) বাংলাদেশের গ্রামীণ ন্যায় বিচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আদালতের মামলার জট কমাতে সাহায্য করে এবং দ্রুত, সুলভ এবং সহজ সমাধান প্রদান করে। এডিআর পদ্ধতি উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছাতেও সাহায্য করতে পারে।

(ছ) সর্বোপরি, আইন সংস্কার এবং আপোষ-মীমাংসার এখতিয়ার সম্প্রসারণ, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের সাথে সাথে, মামলাকারীদের সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করে আদালতের উপর বোঝা হালকা করবে। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে আপোষ-মীমাংসা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করলে ভুক্তভোগী কেবল তার ওয়ার্ড এর সালিশকারীদের সাথে দেখা করতে পারবেন। সচেতনতা প্রচার এবং দেশব্যাপী এর ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত আইনের শাসন শক্তিশালী হবে এবং বিচার ব্যবস্থার জমে থাকা মামলার সংখ্যা কমাতে সাহায্য করবে। আইনের শাসন ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সময়োপযোগি, সহজলভ্য এবং সকলের জন্য সাশ্রয়ী করার জন্য গ্রাম আদালত বাতিল করা অত্যাবশ্যক। সালিশ প্রথার গুরুত্ব স্বীকার করে 'গ্রাম্য আদালত' সম্পর্কিত আইন পাশ হলেও তা কার্যত ব্যর্থ। অথচ চলমান সালিশ-প্রথার গতিময়তা স্তব্ধ বা স্থিমিত হয়ে যায়নি। ঐতিহ্যগত ভাবেই এর কর্মপ্রয়াস অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলমান ছিল, আছে এবং থাকবেও। বর্তমানে আক্ষরিক অর্থে যদিও এর সরকারি স্বীকৃতি নেই তবুও এর প্রভাব এবং অভিঘাত যে রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থার জন্য স্বস্তিদায়ক তা অনস্বীকার্য। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতও মামলা জট কিংবা অভিযোগের অন্তসারশূন্যতা বিবেচনায় সালিশ বিচারের মাধ্যমে আপোষ মীমাংসার প্রস্তাবকে উৎসাহিত করেন।

বর্তমানে 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর)' ব্যবস্থার প্রচলন এই ধারণা থেকেই উদ্ভুত। কিন্তু এর সাথে ঐতিহ্যগত সালিশ ব্যবস্থার পদ্ধতিগত দূরত্ব এবং প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

এছাড়া, 'গ্রাম আদালতের নামে যে আইন, তা বর্তমান সংবিধানসম্মত নয়।' মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রচারিত বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ রায়ের আলোকেও গ্রাম আদালতের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বিচার ও আইন-আদালত কোনো জনতুষ্টির বিষয় নয়। এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'গ্রাম আদালত' নামক যে প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় এবং প্রতিবার মেয়াদ শেষে কিছু কিছু সুপারিশ নিয়ে সরকারের দরজায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কড়া নাড়ানো হয়, তাতে বাংলাদেশের সংবিধান, বিদ্যমান ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো এবং গ্রামীণ সালিশ-বিচার সংস্কৃতির রূপান্তরের প্রেক্ষাপট পুরোপুরি বিচেনায় নেওয়া হয় না। এখানে তড়িঘড়ি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি বা নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আবহমানকাল ধরে প্রকল্প ছাড়াই গ্রামে একটি 'সালিশব্যবস্থা চলে এসেছে, এখন আর প্রকল্প ছাড়া তা কেন চলবে না। এখন গ্রাম আদালতের স্বার্থে প্রকল্প না প্রকল্পের স্বার্থে গ্রাম আদালত, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

উপজেলা আদালত ও গ্রামের সালিশব্যবস্থাকে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সমন্বয় করে গ্রামাঞ্চলের প্রথাগত সালিশ সংস্কৃতিকে নতুন আঙ্গিকে পুনর্গঠন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা অত্যাবশ্যক।

(খ) উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি/ফৌজদারি আদালত ও লিগ্যাল এইড কার্যক্রম চালু করণ

ব্রিটিশ আমল হইতেই তৎকালীন পূর্ববাঙলায় ১৭ টি চৌকি আদালত ছিল যেখানে দেওয়ানি আদালত ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে আরও ২টি চৌকি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছু চৌকি আদালতে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা চালু করা হয়। বাংলাদেশ আমলে অর্থাৎ ১৯৮২ সালে উপজেলা প্রশাসন চালু হওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত এর কার্যক্রম চালু করা হয়। তৎপর উপজেলা পর্যায়ে আদালত পরিচালনায় ভৌত অবকাঠামোর অভাব যেমন: বিচারকের বাসস্থান, যাতায়াতের জন্য গাড়ি ও অন্যান্য স্টাফ ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব এবং আসামী রাখার সাব-জেলের অভাব ও রাজনৈতিক বিবেচনা প্রসূত উপজেলা হইতে আদালত প্রত্যাহার করা হলেও চৌকি আদালতগুলো বহাল আছে এবং পরবর্তীতে উহার সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৪ টি জেলায় ৭১ টি চৌকি আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং সেগুলো অত্যন্ত সফলতার সাথে চলমান আছে। বর্তমানে ৬৪ জেলায় লিগ্যাল এইড অফিসসার নিযুক্ত আছেন এবং তারা অত্যন্ত সফলতার সাথে মামলাপূর্ব এবং চলমান মামলায় আপোষ মিমাংসা করে মোকদ্দমার জট কমাতে সমর্থ হয়েছেন। কাজেই জেলা লিগ্যাল

এইডের কার্যক্রম উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত করে এবং উপজেলা লিগ্যাল এইড অফিসসারের তত্বাবধায়নে ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে ওয়ার্ডভিত্তিক মিডিয়েশন সেন্টার বা আপোষ-মীমাংসা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করলে গ্রাম আদালত ও পৌর সালিশ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা সম্ভব। ওয়ার্ডভিত্তিক মিডিয়েশন সেন্টার বা আপোষ-মীমাংসা সেন্টার দ্বারা মানুষের দৌর-গোড়ায় বিচারিক সফলতা পৌঁছানো সম্ভব এবং সারা দেশের মামলা-মোকদ্দমার জট কমানোও সম্ভবপর হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতায় একটি আপোষ-মীমাংসা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন আবশ্যক হবে।

(গ) আপোষ-মীমাংসা বা সালিশ বিচারের বাস্তবতা

সালিশ বিচার ব্যবস্থা আইনজীবীর দ্বারা কোনো আর্জি লেখার প্রয়োজন নেই। এতে পক্ষদের অর্থনৈতিক ব্যয় কমে যায়। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ৮৯এ ধারার বিধানমতে আদালতের মামলা সালিশবিচারে নিষ্পত্তি করার জন্য খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া, আপোষ-নিষ্পত্তিকে অধিক গুরুত্ব প্রদানের জন্য বিচারকের নিষ্পত্তি দক্ষতায় দ্বিগুণ পয়েন্ট সংযুক্ত হয়। আপোষ-নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পাড়া-প্রতিবেশির উপস্থিতিতে কারো সহায়তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সরাসরি বক্তব্য রাখতে হয় বিধায় কেউই সর্বাংশে মিথ্যা কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। সাক্ষীর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

(ঘ) সালিশ বিচারের সুবিধাসমূহ

১. সালিশ বিচার মানেই উইন-উইন ব্যবস্থা। ইহা মূলত বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে পরিচালিত সামাজিক মীমাংসা।

২. সাজা প্রদান নয় মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে সামাজিক ও মানসিক দূরত্ব নিরসনের অভিপ্রায়ে বিচারকগণ ভূমিকা পালন করেন বিধায় বিরোধ নিষ্পত্তি সহজ ও কার্যকর হয়।

৩. আইনজীবী বা সরাসরি পক্ষ ব্যতীত অপর কোনো মাধ্যম অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা বা বিভ্রান্তির সুযোগ কম।

৪. স্থানীয় জনগনের অধিক সুবিধার জন্য গ্রামে হবে সালিশ, উপজেলায় হবে আদালত।

৫. সালিসের মাধ্যমে আপোষ-মিমাংসা সাধারণত পক্ষদের আশেপাশে হয় বিধায় সালিশকারগণ সরাসরি বাস্তব পরিবেশ ও অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন।

৬. সালিশকারগণ কেবল জবানবন্দি, জবাব ও সাক্ষীর উপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন মনে করলে বিশ্বস্ত তৃতীয়পক্ষের অভিমত গ্রহণেও সচেষ্ট হন।

৭. এতে তদন্ত পদ্ধতি অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় বিচারে দীর্ঘসূত্রিতা অসম্ভব। আবশ্যক ক্ষেত্রে বিচারকগণ তাৎক্ষণিক সরাসরি অকুস্থলে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় মূল্যায়ন করেন।

৮. কোনো অপরিহার্য কারণ না থাকলে সালিশবিচার এক বৈঠকেই সমাপ্ত হয়। তাই মামলা খরচ বলতে যা বুঝায় এখানে তার প্রয়োজন পড়ে না।

৯. কারো প্ররোচনায় লিখিতভাবে অভিযোগ গঠিত হলে তাতে মিথ্যা বা সত্য গোপনের প্রবণতা থাকে। সালিসের ক্ষেত্রে সর্বসমক্ষে পক্ষগণের পর্যায়ক্রমিক সরাসরি মৌখিক অভিযোগ, জবাব, সাক্ষী আদায় ও বাস্তবভিত্তিক জেরার মাধ্যমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বিধায় সত্য প্রকাশ সহজ হয়।

১০. বিচারসভায় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পাড়াপ্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষ ও সাক্ষীগণ মুখোমুখি অবস্থায় বক্তব্য প্রদান করায় সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে সাধারণত কেউ তেমন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। এ কারণে তুলনামূলক সহজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

১১. কোনো কারণে সালিশ বিচার অসফল হলে সেখানে পেশকৃত সত্যভাষণ যাতে আইনসম্মত কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশিত হয়ে কোনো পক্ষের যাতে ক্ষতির কারণ হতে না পারে সে ব্যাপারে বিচারকগণ নৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ বিষয়ে শতভাগ নিশ্চয়তা থাকায় সালিশবিচারে পক্ষগণ নির্দ্বিধায় তুলনামুলক সত্য কথা বলতে চেষ্টা করেন।

১২. সাধারণত সকল মুরব্বীর অভিমতের ভিত্তিতে সভাপতি রায় প্রদান করেন। তবে বিচারকের সংখ্যা অতিরিক্ত এবং সময় স্বল্পতার বিবেচনায় জুরিবোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রায় প্রদান হয়।

১৩. জুরিবোর্ড সাধারণত বেজোড় সংখ্যায় গঠিত হলেও আনুষ্ঠানিক আদালতের ন্যায় সংখ্যার অনুপাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। তাদের মতভিন্নতা সমন্বয়ের মাধ্যমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বিধায় তাতে তেমন অসন্তোষ স্থান পায় না।

১৪. আদালত কিংবা গ্রাম আদালতে বিচারকার্যের পরিবেশ অনুমোদিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সাধারণ মতামত নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে সালিশসভায় মতামত প্রকাশের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে। তাই অনেক সময় রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত প্রভাশালীদের আনুকূল্যে কোনো পক্ষ ন্যায় বিচার-বঞ্চিত হওয়ায় সম্ভাবনা দেখা দিলে নির্মূহ ও নিরপেক্ষ মুরব্বীগণ তার বিরুপ আচারণ করে অন্যায় রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৫. মীমাংসার সিদ্ধান্ত রায় হিসেবে ঘোষিত হলেও তা মূলত সামাজিক সিদ্ধান্ত হিসেবে সমাদৃত হয় বিধায় তা বাস্তবায়ন সহজ হয়।

১৬. প্রতিটি রায়ে বন্ধুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায় কোনো কারণে কোনো রায়ে কোনো পক্ষ অসন্তুষ্ট বা সংক্ষুব্ধ হলে তা তাৎক্ষণিক পূনর্মূল্যায়নেরও সুযোগ থাকে।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী সালিশবিচার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে সমাজসেবায় ব্রত। কোথায় কে কীভাবে সমালোচনা করছেন, তাতে এর গতি স্তব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক বিভ্রান্তি যখন দেশের ছাত্র-যুব-কিশোর মানসিকতাকে দানবীয় মুগ্ধতায় পথভ্রষ্ট করে সমাজকে ব্যঙ্গ করছে; নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষের আশার আলো ক্রমশ দাবানলের প্রকৃতিতে আবির্ভূত হচ্ছে, উচ্চশিক্ষার স্ফুলিঙ্গ যেভাবে সেবাবৃত্তিকে পদদলিত করে প্রশান্তি লাভ করছে; বিচার যেভাবে বির্বত-সংস্কৃতির অনুগত হয়ে শপথের অমর্যাদায় কুণ্ঠাবোধ করে না; সেখানে গ্রামীণ মানুষের ন্যায়প্রাপ্তির সহজ ও সস্তা মাধ্যম হিসেবে সালিশসংস্কৃতি নির্ভরতার প্রদীপ হাতে নিঃসংশয়ে চলমান। এ প্রদীপ স্বেচ্ছায় সামাজিক শৃঙ্খলার দায়বদ্ধতা নিয়ে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আস্থা ও ভরসার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে অবলীলায়।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে মামলা জট নিরসনে বিরাট ভূমিকা রাখার কথা, কিন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে এতে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

(ঙ) ‘বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি’ Alternative Dispute Resolution (ADR)

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি হচ্ছে, আদালত বা আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে মামলার পক্ষদের সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার আইনসিদ্ধ পন্থা। কোনো সন্দেহ নেই যে এটি সালিসে বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণাপ্রসূত। যেহেতু এটি আইনসিদ্ধ বিষয় সেহেতু তাতে আইনি মারপ্যাচ থাকবেই। তদর্থে বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার স্বার্থে নানা রকম নিয়ম-বিধির সমন্বয় করায় পক্ষরা কোনোভাবেই স্বস্তিবোধ করেন না বিধায় ‘কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না’। এর জন্য কোনো আইনের আবশ্যকতা নেই। বরং আইনি প্রলেপের কারণে পক্ষদের মনে একটি অস্পষ্ট ভীতি কাজ করে। কারণ তাদের মামলার আর্জিতে যে মিথ্যার আতিশয্য রয়েছে তা প্রত্যেক পক্ষেরই জানা। বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হলে প্রত্যেক পক্ষকে সেই আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। আইনসম্মত এই প্রক্রিয়ায় সেই বিষয়গুলো প্রকাশ হয়ে যেতে পারে সে ভয় থেকেই যায়। পক্ষান্তরে সালিশ বিচারে যেহেতু কোনো লিখিত অভিমতের সুযোগ নেই এবং সালিশকারগণও ব্যক্তিগতভাবে প্রকৃত সত্য প্রকাশ না করার নৈতিক শর্তে আবদ্ধ সেহেতু সে পরিবেশেই পক্ষরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাই শুধু পক্ষদের উপর নির্ধারিত সময়ে তাদের পছন্দমতো সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে আপোষনামা দিলেই তা কার্যকর হয়ে যাবে মর্মে আদালতের নির্দেশনা থাকলেই যথেষ্ট।

আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাবিত রূপরেখা

সারাবিশ্বে এখন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা দ্রুততম সময়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কম খরচে বিরোধ নিষ্পত্তির অন্যতম মাধ্যম বা পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে ২০০৩ সনে দেওয়ানি কার্যবিধিতে ৮৯এ(বি) ধারা প্রবর্তন করে বিচারিক আদালতে মধ্যস্থতা ও সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়।

অতঃপর ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০’ এ ২০১৩ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে ২১ক ধারা প্রতিস্থাপন মাধ্যমে প্রয়োজন নেই আইনের অধীন কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতাধীন এলাকায় কর্মরত লিগ্যাল এইড অফিসসারের নিকট বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোন বিষয় প্রেরণ করা হইলে উহা নিষ্পত্তির ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসসারের থাকবে এবং সংযুক্তক্রমে বাংলাদেশের ইতিহাসে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি আইনগত এখতিয়ারের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য লিগ্যাল এইড অফিসসার-কে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর সাথে পরামর্শক্রমে লিগ্যাল এইড অফিসসারের কার্যক্রমকে বিচারিক কর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। লিগ্যাল এইড অফিসসার একজন সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ পদমর্যাদার একজন বিচারক। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে বিচার বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত আপোষযোগ্য বিষয়সমূহ লিগ্যাল এইড অফিসসারের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে সফলতার সাথে নিষ্পত্তি হচ্ছে।

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে লিগ্যাল এইড অফিসসারগণ ২০১৫ সালের এপ্রিল হতে ডিসেম্বর ২০২৪ ইং পর্যন্ত সর্বমোট ১,৪৬,৪৯৪ টি এডিআর এর উদ্যোগ গ্রহণ করে ১,৩২,৪৪১ টি এডিআর নিষ্পত্তি করেছে অর্থাৎ সফলতার হার ৯০.৪১ শতাংশ। এর ফলে সর্বমোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২,৫০,৭১১ জন এবং এডিআর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়া হয়েছে সর্বমোট ২২৩,৭৫,৩৬,৬৪২/- টাকা। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ে জনগণ আপোষ-মীমাংসার বিষয়ে এতোটা অবগত ও তৎপর ছিল না। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি মানুষের একটি আস্থা ও ভরসার জায়গায় পরিণত হয়েছে।

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ৬৪ টি জেলায় কর্মরত লিগ্যাল এইড অফিসসারদের মেডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তা দ্বারা প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের জনগণ লিগ্যাল এইড অফিসসার (বিচারক) কর্তৃক

গৃহীত এডিআর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে এবং জনগণ এই সেবা নিতে আগ্রহী। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, মামলা মাধ্যমে এত স্বল্প সময়ে বিরোধীয় পক্ষগণ তাদের ক্ষতিপূরণ বা পাওনা বাবদ ২২৩,৭৫,৩৬,৬৪২/- টাকা (দুইশত তেইশ কোটি পচাঁত্তর লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশ) টাকা আদায় করতে পারত না। রাষ্ট্র লিগ্যাল এইড অফিস মাধ্যমে এ সুযোগ তৈরি করায় সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী সাধারণ অসহায় নাগরিক। এ বিকল্প বিরোধ ব্যবস্থায় একপক্ষ ও আরেকপক্ষ পরস্পর সমঝোতায় শান্তিপূর্ণভাবে যেভাবে আপোষ মীমাংসা করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সুতরাং, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বিচারককে এককভাবে মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতা বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে ফর্মাল জাস্টিস সিস্টেমে যে নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে, তা আরো শক্তিশালীকরণ করা প্রয়োজন এবং তৃণমূল পর্যায়ে এই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা গেলে মামলা দায়েরে হার ৪০% কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং এভাবে এ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাপক সুফল পাবে রাষ্ট্র। সুতরাং স্থানীয় সরকার পর্যায় অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে যেসকল ব্যক্তি আপসযোগ্য দেওয়ানি বা ফৌজদারি বিরোধ এর সম্মুখীন হবেন, তারা স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেডিয়েটর এর তত্ত্বাবধানে তাদের বিরোধ আপস মিমাংসা করতে পারে এবং উক্ত মিমাংসা চুক্তি উপজেলা পর্যায়ে বা জেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড অফিসসার কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হতে পারে। তাহলে একদিকে যেমন সাংবিধানিকভাবে এ কার্যক্রম বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে বিচারযোগ্য ছোটখাট বিরোধগুলো সহজেই নিষ্পত্তি হবে। এ লক্ষ্যে সামগ্রিক রূপরেখা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ওয়ার্ডভিত্তিক/গ্রাম ভিত্তিক আপস মীমাংসা কেন্দ্র:

এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ যেমন- শিক্ষক, চিকিৎসক, স্থানীয় প্রতিনিধি বা যেকোন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি “লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর” (বিচার বিভাগ সংস্কার কমিটির প্রস্তাবিত) এর অধীনে স্থানীয় আপোষ মীমাংসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জন করবে ও সার্টিফাইড মেডিয়েটর হিসেবে স্থানীয় সমাজে ভূমিকা রাখবে। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় আপোষ-মীমাংসা কেন্দ্র কার্যক্রমকে উৎসাহিত করবে। স্থানীয় পর্যায়ে আপোষ মীমাংসা সফল হলে তা চূড়ান্ত অনুমোদন উপজেলা লিগ্যাল এইড অফিসসার কর্তৃক হবে। এছাড়া কোনপক্ষ যদি মনে করে, তিনি স্থানীয় মেডিয়েটর এর মাধ্যমে মীমাংসা করবেন না তাহলে উপজেলা বা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসসারের তত্ত্বধানে রেডিয়েশন করতে পারবে। যদি স্থানীয় পর্যায়ে কোন মেডিয়েশন ব্যর্থ হয়, তাহলে উপজেলা লিগ্যাল এইড অফিসসার পুনরায় রেডিয়েশন এর চেষ্টা করবেন এবং যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে সার্টিফিকেট নিয়ে মামলা দায়ের করতে পারবেন অন্যথায় নয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র মামলাযোগ্য বিষয়গুলোই প্রাতিষ্ঠানিক আদালতে যাবে। বিপরীতক্রমে আদালত হতেও লিগ্যাল এইড অফিসসার বরাবর আপোষ-মীমাংসা জন্য মামলা-মোকদ্দমা প্রেরণ করতে পারেন।

আপোষ-মীমাংসার (নতুন) পদ্ধতি:

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে (এডিআর), বিশেষ করে মধ্যস্থতা বা সমঝোতা প্রক্রিয়া চলাকালীন দুটি অধিবেশন অর্থাৎ ককাস অধিবেধন এবং যৌথ অধিবেশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।

ককাস অধিবেশন (Caucus Sessions): ককাস অধিবেশন হল মধ্যস্থতাকারী এবং একটি পক্ষের (বা তাদের আইনী প্রতিনিধিদের) মধ্যে একটি ব্যক্তিগত, গোপনীয় বৈঠক যেখানে অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকবে না।

বৈশিষ্ট্য: প্রতিটি পক্ষের সাথে আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পক্ষগণ প্রকাশের অনুমতি না দিলে ককাসের আলোচনা গোপনীয় থাকবে। বিবাদীয় পক্ষের স্বার্থ, শক্তি, দুর্বলতা এবং সম্ভাব্য সমাধানগুলো অন্বেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। আলোচনায় অচলাবস্থা ভাঙতে সাহায্য করে। অন্য পক্ষের কাছ থেকে বিচার বা সংঘর্ষের ভয় ছাড়াই খোলামেলা আলোচনাকে উৎসাহিত করে।

উদ্দেশ্য: মধ্যস্থতাকারীকে অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলো বুঝতে সাহায্য করার জন্য সম্ভাব্য আপোষ প্রস্তাব আবেগ শান্ত এবং নিষ্পত্তিকে উৎসাহিত করা।

যৌথ অধিবেশন (Joint session):
যৌথ অধিবেশন হল একটি সভা যেখানে উভয়পক্ষ এবং তাদের একজন করে প্রতিনিধিরা বিরোধের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে মধ্যস্থতার জন্য একসাথে বসবে। মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারী ককাসের সম্মত বিষয়গুলো আলোচনায় উপস্থাপন করতে পারবেন এবং একটি ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন।

বৈশিষ্ট্য: উভয় পক্ষই তাদের মতামত তুলে ধরেন। মধ্যস্থতাকারী আলোচনা নিয়ন্ত্রণ করবেন। সংলাপ এবং সহযোগিতা প্রচার করবেন। কমন গ্রাউন্ড চিহ্নিত করার উপর ফোকাস করবেন। পক্ষগুলোর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগকে উৎসাহিত করে।
উদ্দেশ্য: ভুল বোঝাবুঝি পরিষ্কার করার জন্য আলোচনা। উন্মুক্ত যোগাযোগ উৎসাহিত করা। সম্ভাব্য সমাধান আলোচনা করা। একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ মীমাংসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সর্বোপরি, ককাস এবং যৌথ অধিবেশন উভয়ই গোপনীয়তা এবং খোলামেলা ভারসাম্যের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিস্থিতি বিবেচনায় যৌথ অধিবেশন সফল না হলে পুনরায় ককাস সেসনে যাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিগুলোর সংমিশ্রণে মামলা-মোকদ্দমার ক্ষতিকারক দিকগুলো বিবেচনা করে একটি পারস্পরিক উপকারী নিষ্পত্তিতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা বাড়ায়। এছাড়া সরকার বিধি প্রণয়ন বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা আপোষ-মিমাংসায় বিস্তৃত পদ্ধতি প্রদান করতে পারেন।

আপোষ-মীমাংসার অধিক্ষেত্র:
আইন কমিশন এর 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন- এ উল্লেখ করা হয় যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারা অনুসারে আমাদের দেশে ফৌজদারি মামলায় আপোষের যে বিধান আছে তা অপর্যাপ্ত, দণ্ডবিধিতে বর্ণিত অনেক মামলা পারিবারিক বা ভূমি বিরোধের কারণে দায়ের করা হয় যা পরবর্তীতে পক্ষগণ নিজেদের স্বার্থে তথা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আপোষ করেন, ঐ সমস্ত মামলায় সাক্ষীর অভাবে বছরের পর বছর বিচারাধীন থাকার পর শেষ পর্যন্ত আসামীকে খালাস দিতে হয়। এছাড়া দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ৮৯ এ ধারায় দেওয়ানী আদালতে বিচারাধীন মোদ্দমা নিষ্পত্তিতে এক যুগান্তকারী দিক নির্দেশনা রয়েছে। যার দ্বারা দেওয়ানী ও পারিবারিক আদালতের বহু মোকদ্দমা আপোষ-মিমাংসা সম্ভবপর হচ্ছে।
সুতরাং দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩, ৩০৭, ৩২৬, ৩৮৫, ৪০৪, ৪০৮, ৪১১, ৪১২, ৪২০, ৪৬৮, ৫০৬ (পার্ট-২) ধারাগুলো কেবলমাত্র আদালতের অনুমতিক্রমে আপোষযোগ্য করে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারার পরিধি বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে কতিপয় আইনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।
বুঝার সুবিধার্থে উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন থেকে ওয়ার্ড পর্যন্ত সালিশ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাপনার ছক নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

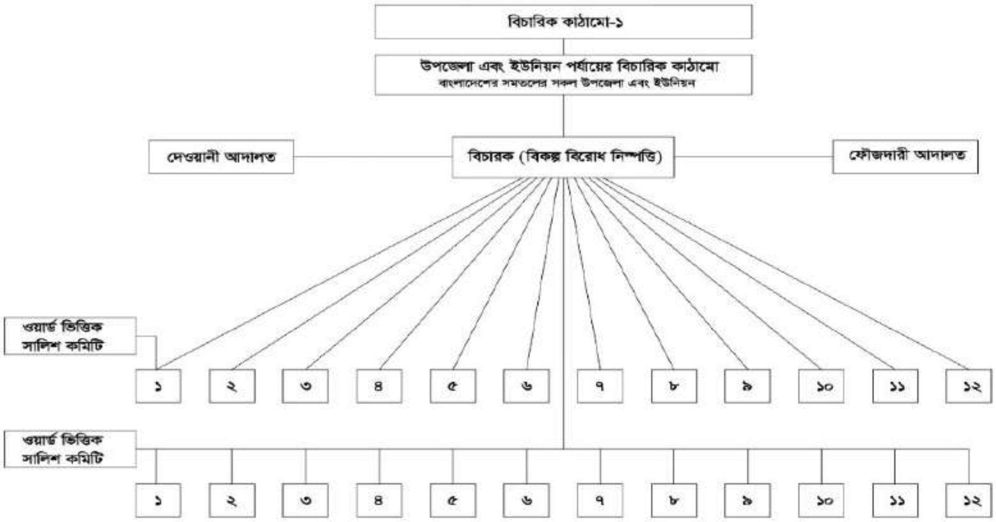
বিচারিক কাঠামো-১
উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিচারিক কাঠামো
বাংলাদেশের সমতলের সকল উপজেলা এবং ইউনিয়ন
দেওয়ানী আদালত
বিচারক (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি)
ফৌজদারী আদালত
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

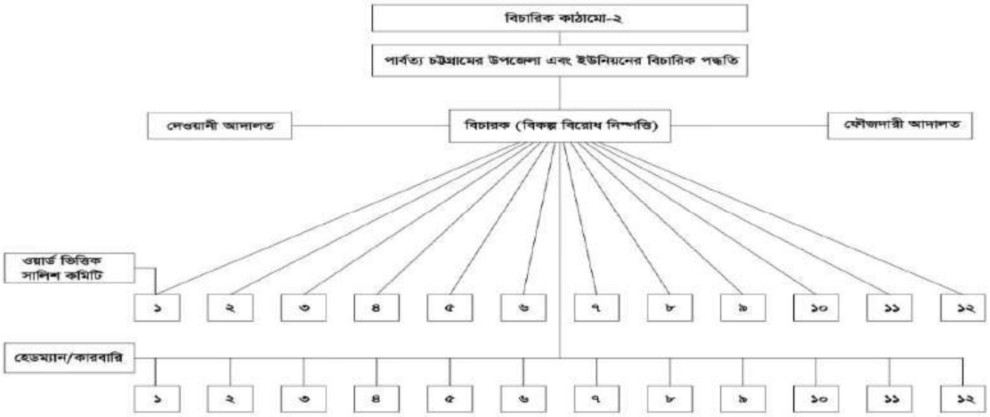
বিচারিক কাঠামো-২
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজেলা এবং ইউনিয়নের বিচারিক পদ্ধতি
দেওয়ানী আদালত
বিচারক (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি)
ফৌজদারী আদালত
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
হেডম্যান/কারবারি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

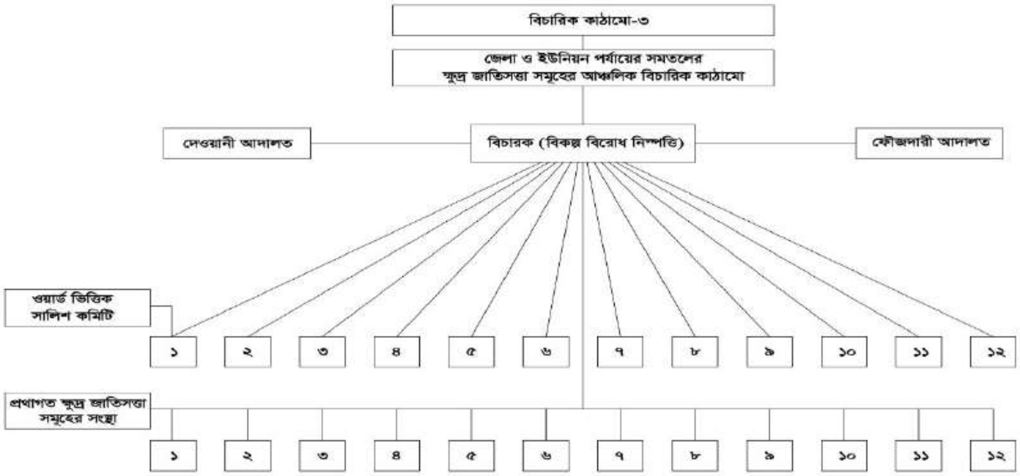
বিচারিক কাঠামো-৩
জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সমতলের
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের আঞ্চলিক বিচারিক কাঠামো
দেওয়ানী আদালত
বিচারক (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি)
ফৌজদারী আদালত
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
প্রথাগত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের সংস্থা
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

অধ্যায়-এগারো

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নারী

১. ভূমিকা

গণতন্ত্রের মূল মন্ত্রই হলো স্বাধীনতা ও সাম্য। নারী ও পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবস্থান থাকা প্রয়োজন। এরজন্য রাজনীতি ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা জরুরি। নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য, অর্থনৈতিক নির্ভরতা, নিরাপত্তাহীনতা, নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, পুরুষ নির্ভর ক্ষমতা কাঠামো নারীদের মূলধারার রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার বাইরে থাকতে বাধ্য করে। ফলে পৃথিবীর বহুদেশে রাজনৈতিক দল, সংসদ ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় আইনগতভাবে আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দল, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নারীর প্রবেশগম্যতা সৃষ্টি হয়েছে। সংরক্ষিত আসনের মূল লক্ষ্য হলো বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সমতা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পুরুষ প্রধান প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতা কাঠামোর কারনে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার কাঠামোতে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব কার্যকর হয় নাই। একই কারনে স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও প্রতিযোগিতামূলক সাধারণ নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখ করার মতো নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি, ৫০ শতাংশের বেশি নারীরা ভোট প্রদান করছে, রাজপথে মিটিং মিছিল করছে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নারী। এতদসত্বেও নারী সমাজের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী ২০০৮ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলই এ শর্ত পূরণে সক্ষম হয় নাই। শর্ত ছিল যে, “কোন রাজনৈতিক দল ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য তাদের দলীয় কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত না করলে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন নবায়ন করা হবে না”। কিন্তু এই শর্ত পূরণ না করেও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিবন্ধন নবায়ন করতে পারছে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। যা পুরুষ নিয়ন্ত্রিত এবং রক্ষণশীল। অনেক ইসলামী রাজনৈতিক দলে নারী সদস্য প্রায় নাই বললেই চলে। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটিতে ও নারী সদস্য খুবই কম। জুলাই আগস্টের আন্দেলনে রাজপথে নানা শ্রেণি পেশার নারীর স্বতঃস্ফূর্ত দৃশ্যমান অংশগ্রহণ ছিল। কিন্তু আন্দোলনে নারীর উপস্থিতি যত স্পষ্ট ছিল, অভ্যুত্থান পরবর্তী প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ দেখা যায় না। নারীদের জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নির্বাচিত হইতে রাজনৈতিক দলের সমর্থন একান্তভাবেই প্রয়োজন। যা বাংলাদেশে অনুপস্থিত। যাদিও রাজনৈতিক দলে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর অনেক প্রচেষ্টা হচ্ছে। তবুও নীতিমালা ও সংস্কারে খুব বেশি পরিবর্তন দেখা যায় না। নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের জন্য যে চ্যালেঞ্জগুলো বিরাজমান, তা প্রতিষ্ঠানগত সংস্কার, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজতৈক দল ও দলীয় প্রক্রিয়া মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। কাজেই রাষ্ট্র সংস্কারের মতো রাজনৈতিক দলগগুলোর সংস্কার ও অত্যান্ত গুরত্বপূর্ণ।

২. স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহনের সমস্যা

স্থানীয় সরকার হচ্ছে গণতন্ত্র চর্চার প্রাথমিক ধাপ। স্থানীয় সরকারকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টির আঁতুরঘর ও বলা হয়। বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। ৮৫ হাজার গ্রাম ও শহরসমূহে রয়েছে ৪৫৮৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৩৩০টি পৌরসভা, ৪৯৫টি উপজেলা, ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৬৪ জেলা পরিষদ, যা বিদ্যমান কাঠামো অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্রশাসনিক এককে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সকল মূলধারার সকল স্তরে সর্বমোট ৫০,৯৮৬ জন নির্বাচিত সদস্য প্রতি পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তন্মধ্যে ৫,৫৮০ জন নির্বাহী প্রধান, যারা সরাসরি নির্বাহী পদেই নির্বাচিত হয়ে কাজ করেন। এসকল নির্বাচিত সদস্যদের মাঝে নারী সদস্যদের সংখ্যা ১ শতাংশেরও নীচে। স্থানীয় শাসন কাঠামোতে নারী প্রতিনিধিত্বের অবস্থানের

ক্ষেত্রে এই সংখ্যা একটি ভয়াবহ চিত্র। তৃণমূল পর্যায়ে শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম সিঁড়ি হলো ইউনিয়ন পরিষদ। কিন্তু নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে এর সত্যতা নাই। তবে মনোনয়নের মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে ও ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিস্থানে নারীর প্রতীকী অংশগ্রহণ শুরু হয়। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠমোতে সর্বপ্রথম দুইজন নারীকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনয়নের ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়। কিন্তু নারীদের জন্য কোন দায়িত্ব নির্ধারিত ছিলনা। পরবর্তীতে কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে তিনটি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হয় এবং ১৯৯৭ সালে ৩টি সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে ইউপিতে ১২,৮২৮, পৌরসভায় ৯৯০ এবং সিটি কর্পোরেশনে ৩৬টি-সহ সর্বমোট ১৩৮৫৪টি অতিরিক্ত আসন নারীর জন্য যুক্ত হয়। কিন্তু আজ অবধি এর সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি মিলেনি যা অত্যান্ত হতাশাজনক। কিন্তু বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ ও ২৮-এ বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো শুধু শূন্য বচন নয়, বরং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারনাটি এই অধিকারগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সাম্যের এই অধিকার আদিম মানব সভ্যতা থেকেই বিকশিত হয়েছে এবং সভ্যতার বিবতর্নের মধ্য দিয়ে একে লালিত করা হয়েছে। কাজেই প্রচলিত বিকৃত লিঙ্গ সমতার মানসিকতা পরিবর্তন ও সংস্কার করা প্রয়োজন। লিঙ্গসমতার ধারণা অনুসরণ করতে গিয়ে যদি নারী-পুরষ উভয়ের জন্য একই মানদন্ড বজায় রাখা হয়, তাহলে হয়ত কেবলমাত্র গঠনতান্ত্রিক সমতা অর্জিত হবে, কিন্তু সংবিধানে লিঙ্গ সমতার যে মূলনীতি রয়েছে, তা পুরণ হবে না। ঐতিহ্যসম্পন্ন গণতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রচলিত গণতান্ত্রিক চর্চার সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং এটি কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয়। যেমন, সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা যেহেতু তাদের নিজস্ব কোন নির্বাচনী এলাকা নাই, তারা কাদের কাছে জবাবদিহি করবে? যদি তারা কেবলমাত্র তাদের নির্বাচিত সদস্যদের প্রতি অনুগত থাকেন, তাহলে এটি গণতন্ত্রবিরোধী হয়ে যায় । এই পদ্ধতিটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা কিংবা নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার পরিবর্তে নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা ও জনগোষ্ঠী ছাড়া নির্বাচন ছিল নামমাত্র বা প্রহসনমূলক। একইভাবে সংসদে নির্বাচিত নারীরা প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিত না হয়ে মনোনীত হন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের জন্য এটি একটি কৌশলগত সুবিধা এনে দেয়। যা প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে বিরল।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউপি, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও মেয়রগণ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় ক্ষমতার কোন বিকেন্দ্রীকরণ নাই। চেয়ারম্যানগণ সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, যা নারীর ক্ষমতায়নে বাধা হিসেবে কাজ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচিত পুরুষ সদস্য, মেয়র ও চেয়ারম্যান সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন। এছাড়া বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সামাজিক বাধার কারনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাহী পদে নারী সদস্যরা ব্যাপকভাবে পিছিয়ে আছেন। ১৯৯৭ সালে প্রণিত ইউনিয়ন পরিষদ আইনের দ্বিতীয় সংশোধনী আইন নারীদের প্রান্তিক অবস্থা থেকে মূল ধারায় আনার ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন মাত্রার উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এ সময় আশা করা হয়েছিল যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ আসনে এবং চেয়ারম্যান পদে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়বে। ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারী চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন ১১০ জন। বিজয়ী হয়েছিলেন ২০ জন। ২০০৩ সালে নারী চেয়ারপার্সনপদে প্রার্থী ছিলেন ২৩২ জন এবং বিজয়ী হয়েছিলেন ২২ জন। একই নির্বাচনে সাধারণ আসনে ১১০ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশের পেছনে ছিলেন তাদের পিতা, স্বামী বা অন্য কোন পুরুষ আত্মীয়ের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও প্রভাব। এভাবে, স্থানীয় সরকার আইন এবং অধ্যাদেশ সময়ে সময়ে সংশোধিত হলেও আইনগুলোতে প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ চেতনা এবং জেন্ডার সমতা আন্তরিকভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। পুরুষশাসিত ও পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় সরকার, নীতির্নিধারক ও নির্বাচিত পুরুষ সদস্যগণের লিঙ্গ সমতা সচেতনতার অভাব এবং তাদের রক্ষণশীল মনোভাবের কারনে নারীর ক্ষমতায়নের পথ রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। অথচ, জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ কমিটির সমাপনী অভিমত (২০১১) অনুযায়ী ধারা-৭: নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ফলোআপ সুপারিশমালা ছিল নিম্নরুপ:

- ৭/(১৪)জাতীয় সংসদে সব রাজনৈতিক দল থেকে সরাসরি নির্বাচনের জন্য ন্যূনতম শতকরা ৩৩ভাগ নারী মনোনয়নের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা,
- ৭/১৫)স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, আর্থিক বরাদ্দ এবং সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা,
- ৭/১৬) জাতীয় সংসদে রীর জন্য সংরক্ষিত ১০০ টি আসন বরাদ্দের জন্য সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়া।

ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মত উপজেলা ও জেলায় কোন ওয়ার্ড ব্যবস্থা নাই। উপজেলায় চেয়ারম্যান ছাড়াও ২ জন ভাইসচেয়ারম্যানের মধ্যে সংরক্ষিত আসনে একজন নারী ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন। কিন্ত উপজেলায় সংরক্ষিত আসনে নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের বিধান থাকলেও তাও কার্যকর নয়। কেননা, স্থানীয় সরকারের অন্যান্য স্তরের ন্যায় সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত নারী ভাইস চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনের পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান উভয়ের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন বা কার্যাবলি নির্ধারিত না থাকায় পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ উপজেলা চেয়ারম্যান এবং একই নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে থাকেন। স্থানীয় সরকারের অন্যান্য স্তরগুলোতে সংরক্ষিত আসনের অকার্যকারিতা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হওয়ার পর এবং শওকত আলী কমিশন কর্তৃক বর্তমান ধারায় সংরিক্ষত নারী আসনের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ ওয়ার্ড সংরক্ষণের সুপারিশকে অস্বীকার করে ২০০৮ সালে উপজেলা পরিষদে সংরক্ষিত আসনে একজন নারী ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা ছিল রহস্যজনক।

উপজেলা ও জেলা স্তরে চেয়ারম্যান ছাড়া কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা নাই। পদাধিকার বলে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা থেকে পরোক্ষভাবে সদস্য পদ নেওয়া হয়। যেহেতু উপজেলা এলাকার সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ পরিষদের সদস্য হন, উভয় স্তরে চেয়ারম্যান পদে নারী না থাকার কারনে সমমানের ও যোগ্য নারী নেতৃত্ব উপজেলায় অনুপস্থিত। এমতাবস্তায়, উপজেলা পরিষদে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ইউপি ও পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের নারীরা সদস্য হয়ে থাকেন। ফলে এই সকল নারী সদস্যগণ পরিষদসমূহের গুরুত্বপুর্ণ কাজে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। এই কারণে তাদেরকে পরিষদের সভায়ও ডাকা হয়না এবং উভয় পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে।

প্রস্তাবিত নতুন স্থানীয় সরকার কাঠামোতে উপজেলা ও জেলাকে ওয়ার্ডে ভাগ করা হলে সদস্যগণ উপজেলা ও জেলা পরিষদের জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে কমিশন উপজেলা ও জেলায় প্রত্যক্ষ ভোটে ওয়ার্ড সদস্য নির্বাচনের বিধান প্রস্তাব করছে। প্রস্তাবিত উপজেলা কাঠামোতে ওয়ার্ড সৃষ্টি করা হলে ওয়ার্ড সদস্যদের মধ্য হতে ওয়ার্ড সদস্যদের ভোটে যেহেতু পরিষদ গঠিত হবে, উপজেলা নির্বাহী পরিষদ চেয়ারম্যানের নির্বাহী পরিষদে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উপজেলা ও জেলাসহ স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে একীভুত নির্বাচনী আইনের অধীনে চেয়ারম্যানদ্বয়ের নির্বাচন সংসদীয় পদ্ধতিতে করা হলে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে নারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তবে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুরুষ নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা বেশি বলে প্রত্যাশিত হারে নারী চেয়ারম্যান নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে দেশের মোট ইউপি, পৌরসভা, সিটি, উপজেলা ও জেলা পরিষদসহ নির্বাহী পদের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) নারীদের জন্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাতে উপজেলা ও জেলা পরিষদে যোগ্য নারী নেতৃত্বের সৃষ্টি হবে এবং পরিষদের মধ্যে নারী পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে পারেনা। এটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য নারীদের সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা নিজেই কোন লক্ষ্য নয়, বরং এটি লিঙ্গাসমতা অর্জনের একটি মাধ্যম। যখন সাধারণ আসনগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌছাবে, তখন সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না।

৩. শাসন কাঠামো ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তা:

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের মূলভিত্তি। নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে ও সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ ও ক্ষমতা অর্জন করা। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব দেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। জাতিসংঘের “Women in politics and Decision making in the late twentieth Century” শীর্ষক গবেষণা রিপোর্টে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের পক্ষে যে পাঁচটি কারণ দেখানো হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ গণতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন। এটি নাগরিক অধিকারেরও প্রশ্ন। সুতরাং গণতন্ত্র, সমতা ও নাগরিক অধিকারের দিক থেকে জনসংখার অনুপাতে রাজনীতিতে নারীর সমপ্রতিনিধিত্বের দাবি অনস্বীকার্য।

২. নারীর দুর্বল উপস্থিতি রাজনীতির অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় নারীর অসম উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহণের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রয়ে যায়।

৩. নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি নারী-পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারী তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকেবহাল। কিন্ত রাজনীতিতে যদি নারীর যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তাহলে তাদের স্বার্থের উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. রাজনীনিতে নারীর আনুপাতিক উপস্থিতি রাজনীতির মূল ফোকাসে প্রভাব ও বিস্তৃতি ঘটায়। কেননা, নারীর সমস্যা তার জীবনের সাথে সম্পর্কিত। যা রাজনীতির আওতাবর্হিভূত বলে বিবেচিত হয়। সেগুলোকে রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয় বলে বিবেচনায় আনতে হবে।

৫. দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হিসেবে রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর শক্তিশালী উপস্থিতি অত্যাবশ্যক।

আরও কিছু গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও শাসন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণের ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন, রাজনৈতিক সংঘাত ও দুর্নীতি হ্রাস হয় এবং নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশের উন্নয়ন এবং নারীদের কর্মসংস্থান অধিকতর উৎসাহিত হয়। ‘ক্রিটিক্যাল মাস থিওরি’ ব্যাখ্যা করে যে, রাজনীতিতে নারীদের কম আংশগ্রহণ ও কম উপস্থিতি সব কিছুর উপর বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে। রাজনীতিতে নারীর উপস্থিতি নারীদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রগুলোতে শুধুমাত্র দৃশ্যমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে না, এটি নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত ও অবস্থানগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর জন্য উপকারী নয়। পুরো সমাজ নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি দ্বারা সুষম উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতসহ পৃথিবীর ৮৮টি দেশ নারীদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাদূর করতে লিঙ্গভিত্তিক কোটা সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। প্রণয়নকৃত এই লিঙ্গভিত্তিক কোটা প্রমাণ করেছে যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ[৪১] প্রক্রিয়ায় ও নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে এটি কার্যকর। কিন্তু বাংলাদেশে নারীর কোটা প্রবর্তিত হলেও ক্রুটিপূর্ণ আসন বিন্যাস ও নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণের ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে এর কার্যকর বাস্তবায়ন হয়নি। কারণ বিদ্যমান আইনের অধীনে মূলধারার নির্বাচনী এলাকার বাইরে শূন্যস্থানে সংরক্ষিত নারী আসন তৈরি করা হয়েছে, যা ইউনিয়ন পরিষদের পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে তিনজন সাধারণ আসনের নির্বাচিত প্রতিনিধির একক নির্বাচনী এলাকা। ফলে আইনগত এই ত্রুটির কারণে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নারীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব চর্চা সম্ভব হয়ে উঠেনি। কেননা, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটির ক্ষেত্রে প্রতিটি সংরক্ষিত আসন তিনটি সাধারণ আসনের সাথে ওভারল্যাপ হওয়ার কারনে সংরক্ষিত আসনের নারীদের কোন ক্ষমতায়ন

---

[৪১] Women’s representation in Local Governmnet: A Global Analysis, UN Women, December 2021.

হয়নি। এছাড়া, স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের পুরুষ জনপ্রতিনিধিরা সংরক্ষিত আসনের পক্ষে নন। তাদের অনেকে সরাসরি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। কমিশনের বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় তারা প্রকাশ্যে সংরক্ষিত নারী আসনের বিলুপ্তি চান। কিন্তু এর বিকল্প কোন প্রস্তাবনা দেননি। কারন তাদের ধারণা, সকল নির্বাচনী এলাকাই পুরুষদের। নারীদের জন্য কোন নির্বাচনী এলাকা নেই।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ও এখতিয়ার বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষিত নারী আসনের বিদ্যমান আইন সংশোধন করে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে এক তৃতীয়াংশ একক নির্বাচনী আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীদের জন্য সংরক্ষণ করার জন্য সংস্কার কমিশন প্রস্তাব করছে।
ভারতে ১৯৯৩ সাল থেকে গ্রামীণ শাসন কাঠামোর পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহে এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে প্রতি নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হন। এর ফলে ২০২৩ সাল নাগাদ স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিত্বকারী নারীর অংশগ্রহণ ৪৪.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

৩. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ও নারীদের জন্য সাংবিধানিক বিধান

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ হলেও এর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে লিঙ্গ সমতার পথে কোন আইনগত বাধা সৃষ্টি করে না। বাংলাদেশের সংবিধান গণতান্ত্রিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ বিধান রেখেছে। নারীর অধিকার ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের সংবিধান একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে, যেখানে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সংবিধানের ৯ম অনুচ্ছেদ রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠনে উৎসাহিত করে এবং এসব প্রতিষ্ঠানে যথাসম্ভব কৃষক, শ্রমিক ও নারীদের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে। এছাড়া ও নারীদের জন্য বিশেষ এবং কিছু প্রাসঙ্গিক সাংবিধানিক ধারা রয়েছে। ১০ অনুচ্ছেদ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেবে। ১৯(১) অনুচ্ছেদ সকল নাগরিকের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির ভিত্তি গঠন করে। ১৯(২) অনুচ্ছেদ নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এবং সম্পদ ও সুযোগের ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র জুড়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিন্ন স্তর সৃষ্টি করে। ২৮(১) অনুচ্ছেদ ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থান এর ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে। ২৮(২) অনুচ্ছেদে নারীদের রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৮(৪) অনুচ্ছেদে নারীদের ক্ষতায়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের সংবিধানে নারীকে প্রজাতন্ত্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মূলধারায় নিয়ে আসার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধিত্ব

সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং আইনী সুযোগ থাকলেও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার নীতি ও ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণ একটি দীর্ঘ অবহেলিত বিষয়। এই দেশে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা হলো স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে শত বছরেরও পুরনো প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার স্তরের বিভিন্ন পরির্তন সাধিত হলেও এর নির্বাচিত সসদ্য সংখ্যা ও নির্বাহী পদগুলোতে মূলত পুরুষ প্রধান্য বিদ্যমান। এগুলোতে নারীদের আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে খুবই সম্প্রতি। কিন্তু সে অংশগ্রহণ বাস্তব অর্থে প্রতীকী অংশগ্রহণ।

গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ও শহরাঞ্চলে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন উভয় ক্ষেত্রেই গত দশকের শেষভাগে নারীরা কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ন্যূনতম অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। ১৯৭৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ এবং ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ শুরু হয়। এসময়

প্রথমবারের মতো প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন নারী মনোনয়ন পেতেন মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক। ১৯৮৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী মনোনীত নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ২ থেকে বাড়িয়ে ৩ জন করা হয়। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সংশোধন করে মনোনীত ৩ জন নারী সদস্যকে মনোনয়নের দায়িত্ব দেয়া হয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত পুরুষ সদস্য ও চেয়ারম্যানদের ওপর। এভাবে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্য বা প্রতিনিধিগণ পুরুষ নির্বাচক দ্বারা নির্বাচিত হতেন। কিন্তু মনোনীত নারী সদস্যরা কোন ভূমিকা বা দায়-দায়িত্ব পালন করতেন না।

জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাটির বিধান করা হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। সংসদের নারী সদস্যরা আজ পর্যন্ত নির্বাচিত এমপিদের দ্বারা নির্বাচিত হন। তাদের জন্যও কোন নির্বাচনী এলাকা ও কার্যাবলি নির্ধারিত নেই। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলো কেবল সংসদের শোভাবর্ধনকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৩ সন পর্যন্ত ২০ বছরের মধ্যে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৫-৫০ এ উন্নীত হওয়া ছাড়া আর কোন পরিবর্তন হয়নি। বিগত ১২টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদের ৩০০ সাধারণ আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নারী এমপি এর সংখ্যা মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন। নারী সমাজের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। ১৯৭৩ সালে প্রবর্তিত ১৫টি সংরক্ষিত আসন ১০ বছরের জন্য নির্ধারিত হলেও তা নবায়ন করে করে আজ ৫৪ বছর পর্যন্ত চলছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নেতা (Leader of the House), বিরোধীদলীয় নেতা (Leader of the Opposition) ও জাতীয় সংসদের স্পিকার ছিলেন নারী। তারা নারী হলে ও তাদের মননে নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব লাভ করেনি।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের এই বৈষম্যমূলক, অগণতান্ত্রিক ও অকার্যকর ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায়ও একই ধারা চাপিয়ে দেয়া হয়। স্থানীয় সরকারে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনী ব্যবস্থায় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যাবস্থা থেকে একধাপ এগিয়ে থাকলেও এর সুফল স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ ত্রুটিপূর্ণ আসন বিন্যাস ও দ্বৈত প্রতিনিধিত্বের কারণে তাদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার ভোগ করতে পারেনি।

৫. স্থানীয় সরকারে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন ও এই আইনের সীমাবদ্ধতা

ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর উপর ভিত্তি করে বর্তমান কাঠামোর ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় এবং এর কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা তিনবার সংশোধিত হয়। ১৯৯৭ সালে অ্যাডভোকেট রহমত আলী কমিশনে স্থানীয় সরকার স্তর গঠন প্রক্রিয়ায় উল্লেখ করা হয় যে, **"ইউনিয়ন পরিষদে ৩টি সংরক্ষিত আসন থাকবে, নারী সদস্যগণ প্রতি তিন ওয়ার্ডে একজন, এই ভিত্তিতে পুরুষ ও নারী সকলের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন''**। ১৯৯৭ সালের সংশোধিত অধ্যাদেশের ধারা ৫-এ নারীদের প্রবেশাধিকার যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে- উপধারা(১): "একটি ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান এবং ১২ জন সদস্য থাকবেন, যার মধ্যে ৩টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে''। উপধারা(৩): প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হইবেন নারীরা''। যারা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই একজন নারীকে উপধারা (১) তে প্রদত্ত অন্যান্য সাধারণ আসনের কোন একটিতে নির্বাচিত হতে বাধা দিবে না। ধারা-: ২০(এ)'' সংরক্ষিত আসনের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের জন্য থানা নির্বাহী অফিসসার ৯টি ওয়ার্ডকে ৩টি ওয়ার্ডে পুর্নগঠন করবেন এবং পরবর্তীতে গেজেটে এর তালিকা প্রকাশিত হবে। ভবিষ্যতে ওয়ার্ড সংখ্যা জনসংখ্যা ও আয়তনের নিরিখে বৃদ্ধি পেলে একই নিয়মে এক তৃতীয়াংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত হবে।

এই আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহে মনোনয়নের পরিবর্তে ৩টি সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি জনগনের ভোটে নির্বাচনের বিধান প্রচলিত হয়। এর ফলে প্রথম নির্বাচনে ৪,২৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদের ১২,৮২৮টি সংরক্ষিত আসনে ৪৫,০০০ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন। ইউএন ওমেন-এর ডিসেম্বর ২০২১ এর বৈশ্বিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী স্থানীয় সরকারে ঐতিহাসিক লিঙ্গ বৈষম্য রোধে ও নারীদের প্রতিনিধিত্ব দ্রুততর করার জন্য বিশ্বের প্রায় অর্ধেকেরও

বেশি দেশ আইন দ্বারা র্নিধারিত লিঙ্গ কোটার ব্যবহার করে। বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সরাসরি নির্বাচনে নারীর প্রবেশ নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে করা হয়েছিল এবং এটাকে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের একটি অধ্যায় হিসেবেও ধরা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে এই ব্যবস্থা বিকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়। যার ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর এক-তৃতীয়াংশ অংশগ্রহণ বাহ্যিকভাবে সংখ্যাগত দিক থেকে দৃশ্যমান হলেও কার্যত তাদের কোন ক্ষমতায়ন হয়নি। বিপুল-উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নারী সদস্যরা নির্বাচিত হয়েও মুলধারার একক নির্বাচনী এলাকা না পাওয়ায় তাদের পক্ষে কার্যকরী ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়নি। কারন নির্বাচিত হওয়ার পর নারী সদস্যগণ দেখতে পেলেন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত কার্যাবলি, অফিসস, ভাতা ও বাজেট কিছুই নাই। তাদের জন্য ধার্যকৃত নির্বাচিত এলাকায় আরও তিনজন সাধারণ আসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন যাদের তুলনায় তাদের দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, সম্পদ, এবং মর্যাদা ভিন্ন। এমনকি, সাধারণ আসনের সাথে তাদের কার্যাবলির বিভাজন বা সমন্বয়ের ও কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়া, বড় তিনটি ওয়ার্ডে সাধারণ আসনের প্রতিনিধিগণ তাদের নির্বাচনী এলাকার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব করেন। যদিও অনুশীলনে এটি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায়। এছাড়া, সংরক্ষিত আসনগুলো অন্য তিনটি সাধারণ আসনের সাথে দ্বৈততা সৃষ্টি করে, যার ফলে একই আসনের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য ২ জন। এই কারণে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কাজেই স্থানীয় সরকারের তিনটি স্তরে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিত্বের অন্তর্ভুক্তির কাঠামোগত সমস্যার মধ্যে সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ এবং সাধারণ আসনগুলোর সংগে সংরক্ষিত আসনের দ্বৈততা সৃষ্টি হওয়া ছিল এই আইনটি বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায়। এর ফলে নারীরা চরম বৈষম্যের শিকার হয়। এই আইনটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অনেক অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়। যেমন, ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে নারীদের তিনটি নিয়মিত আসনের সমান একটি আসন সংরক্ষণ করা, তিনটি সাধারণ আসনে সংরক্ষিত নারী আসনে দ্বৈততা সৃষ্টির বিধান। নারীর প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আইনের দুর্বলতা নারী সদস্যদের ভূমিকা নির্দিষ্ট না করায় নারীর অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার অধিকারে কাঠামোগতভাবে বাধা সৃষ্টি করে। সংরক্ষিত আসনে প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার পর পরই এই আইনটি যে ক্রটিপূর্ণ তা বুঝা গেল। এর ফলে পুরুষ সদস্যরা ও নির্বাহী পদের চেয়ারম্যান, মেয়রগণ সংরক্ষিত আসনের নারীদের বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে কার্যত অস্বীকার করে বসেন। এর ফলে পুরুষ শাসিত পরিষদ ও কাউন্সিলে নারীদের যে কোন ধরনের অংশগ্রহণ সত্যিকার অর্থে অবমূল্যায়িত হয়। সাধারণ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য, চেয়ারম্যান ও মেয়রগণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের নিয়ে বিব্রতবোধ করেন। তাদেরকে পরিষদের সভায় নারীদের শোভাবর্ধণকারী অলংকার বলে ব্যঙ্গ করা হয়। অনেক নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যগণ এই আইনটির মাধ্যমে নারী সদস্যদেরকে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করে দিয়েছেন বলেও কমিশনের কোনো কোনো মতবিনিময় সভায় বিশেষ করে রাজশাহী, মানিকগঞ্জ ও রংপুরে উল্লেখ করেছেন। তারা নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বিলুপ্তি দাবি করেন। কিন্তু এর বিকল্প কোন সুপারিশ তাদের কাছ থেকে আসেনি। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীদের অংশগ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের পুরুষশাসিত সমাজে বসবাসকারী নারী সমাজের জন্য এই বিধানটি প্রথমবারের মতো ছিল বলে তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। এই ধারণাগুলো একজনকে ভাবতে বাধ্য করে যে, একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীদার হতে সক্ষম করার প্রকৃত চেতনার চেয়ে প্রতীকীকরণ প্রকৃত অর্থে দৃশ্যমান হয়েছে। তাই বিগত দিনের অভিজ্ঞতাসমূহ মূল্যায়ন করে বিদ্যমান প্রথার প্রতীকী অংশগ্রহণকে কার্যকর অংশগ্রহনে রুপান্তর করা একান্ত প্রয়োজন।

৬. খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত কশিনারদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্বলিত পরিপত্র এর বিরুদ্ধে রীট পিটিশন ও এর রায়

সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সাথে সাধারণ আসনের সদস্যদের দ্বন্দ্ব নিরসনে ২৩-০৯-২০০২ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের (পৌর-১) যুগ্মসচিব কর্তৃক একটি গেজেট প্রকাশিত হয়। যেখানে সংরক্ষিত ও সাধারণ আসনের সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যা স্থানীয় সরকারের তিনটি

স্তরে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন) প্রযোজ্য হয়। গেজেটে সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের কার্যাবলির ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় যে, স্ব-স্ব পরিষদের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি কেবল সাধারণ আসনের সদস্যগণ পরিচালনা করতে পারবেন। সংরক্ষিত আসনের সদস্যগনের জন্য নারী ও শিশুদের সহিংসতা প্রতিরোধ, যৌতুক ও এসিড-সন্ত্রাস প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিবাহ নিবন্ধনে জনগনকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এর ফলে সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের ভূমিকাকে আরও সংকুচিত করা হয় বলে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা ধরে নেন এবং তারা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। এই পরিপত্র জারির প্রতিবাদে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নারী কমিশনারগণ ০৩.০৫.২০০৩ ইং তারিখে হাইকোর্টে একটি রীট পিটিশন দায়ের করে (রীট নং-৩৩০৪/২০০৩)। এই রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট উক্ত পরিপত্রের কার্যকারিতা বন্ধ করে দেন। রায়ের পর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় পূর্বের জারিকৃত পরিপত্রটি বাতিল করে ৬.১.২০০5 ইং তারিখ একটি নতুন পরিপত্র জারি করে যা স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো নুতন পরিপত্রগুলো ওয়ার্ড কমিশনারদের নামে সরাসরি না পাঠানোর কারণে সচিব ও চেয়ারম্যানগণ এটাকে গোপন করে রাখেন। পরিপত্রের বিষয়ে সংরক্ষিত আসনের কমিশনারগণ ব্যক্তিগতভাবে কিছুই জানতে পারেনি। ফলে নতুন পরিপত্র পাঠানো হলেও তার বাস্তবায়ন হয়নি। উল্লেখ্য যে, এই রায়টি হয়েছিল নারীর সমধিকারের সাংবিধানিক বিধানের ভিত্তিতে। কিন্ত রায়ে বিদ্যমান আইনটি পরির্তনের কোন নির্দেশনা না থাকায় উক্ত আইনের অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতা কাঠামোর কোন পরিবর্তন না করায় রায়টি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই।

রায়টিতে খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৪,ধারা ৪ ও ২০(ক) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, “পুরো অধ্যাদেশের কোন ধারায় সাধারণ আসনে নির্বাচিত কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত কমিশনারদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আরো উল্লেখ করা হয় যে, এই মামলায় যেহেতু অধ্যাদেশের কোথাও সাধারণ আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনারদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি এবং ১৯৯৯ সালের সংশেধনী আইন দ্বারা পুরো অধ্যাদেশের মূল লক্ষ্য ছিল নারীদের কর্পোরেশনের নেতৃত্বে নিয়ে আসা, তাই প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে যে কৃত্রিম ও অপ্রয়োজনীয় পার্থক্যের যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তার কোন ভিত্তি নাই’’।

রায়টিতে আরও উল্লেখ ছিল যে, প্রত্যাখ্যাত বিজ্ঞপ্তিটি একটি পরিষ্কার বৈষম্যের উদহারণ। কেননা, প্রতিপক্ষ নং-১ সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারদের ‘অসম’ হিসেবে বিবেচনা করেছে,যা তাদের জবাব ও সওয়ালে উল্লেখ করা হয়েছে। এটর্নি জেনারেল ও একই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাদের যুক্তি অনুসারে, অসমদের সবসময় অসম হিসেবেই থাকতে হবে। যা সংবিধানের ১০,২৭,২৮(২) ও ২৮(৪) এর পরিপন্থি।

এই রায়টিতে স্পষ্টত প্রমাণিত হয়েছিল যে, সংরক্ষিত নারী আসনের বিধানটি শুরু থেকেই বৈষম্যমূলক ও ত্রুটিপূর্ণ। যার জন্য সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের সমান অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি, তারা সর্বদা নিম্ন অবস্থানেই রয়ে যায়।

৭. সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের ক্ষমতা ও বিশেষ কার্যাবলি বিধিমালা, ২০১৬

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কমিশনারদের রীটের প্রেক্ষিতে ২০০5 সালে নতুন পরিপত্র কার্যকর না হওয়ার ১০ বছর পর ২০১৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ৬১ নং ধারা সংশোধন করে **সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা ও বিশেষ কার্যাবলি)** বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করে (সূত্র: তারিখ: ১৪ আশিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ)। উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের ওয়ার্ড সভায় উপদেষ্টার দায়িত্ব, এক-তৃতীয়াংশ স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব এবং এক-তৃতীয়াংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব প্রদান সদস্যদের বিধানিক ভূমিকার সাথে সাংঘর্ষিক। সভাপতির দায়িত্ব প্রদানসহ আইনের ৩৮ ধারা অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে আরো বেশ কিছু দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু মূল সমস্যার (প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতা কাঠামোর) কোন পরিবর্তন হয়নি বিধায় কিছু দায়িত্ব ভাগাভাগি করার পরও সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণের অবস্থানগত কোন পরিবর্তন হয়নি। বিশ্বের অন্যান্য দেশে জেন্ডার কোটা আইনটি

বাস্তবায়নের জন্য প্রায় সকল রাষ্ট্রই কোন না কোন সহায়ক আইন, নীতি বা চুক্তি তৈরি করে সফলতা লাভ করেছে। দুঃখজনক বিষয় হলো যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে[৪২] সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকার পরও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এর কোন প্রতিফলন ঘটে নাই।

৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি, শওকত আলী কমিশন সংরক্ষিত নারী আসন বিধান সংশোধনের ব্যর্থ পদক্ষেপ-২০০৭

সংরক্ষিত আসনটির অকার্যকারিতা প্রথম নির্বাচনের পর পরই প্রমাণিত হলেও এই আইনটির সংশোধনের জন্য কোন মহলই এগিয়ে আসেনি। যা নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতি নারী প্রধান সরকার থাকার পরও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও অকার্যকর আইনটির পরিবর্তন করা হয়নি। তবে ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্বাবধায়ক সরকারের সময় **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি, যা শওকত আলী কমিশন নামে পরিচিত, "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর সদস্য সংখ্যা''** শিরোনামে নারী প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত কমিটিতে সকল স্তরের সংরক্ষিত আসনে 'নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের জাতীয় ফোরাম' ও নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯টি সুপারিশ কমিটির কাছে দাখিল করা হয়। কমিটি বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নারী সদস্যদের অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাগত কাঠামো কি হবে তা নির্ধারনের জন্য বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে জানতে পারেন যে, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, মেয়র ও সদস্য যাদের সিংহভাগই পুরুষ, এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষণের বিধানটির কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করেন না। তারপরও কমিটি সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের কর্তৃক তাদের জন্য একক কোন নির্বাচনী এলাকা বা ওয়ার্ড না থাকায় তারা দায়িত্ব পালনে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে অভিযোগ করার প্রেক্ষিতে কমিটি সার্বিক দিক বিবেচনা করে "পরবর্তী তিনটি নির্বাচনের জন্য প্রতি স্তরের স্থানীয় পরিষদে প্রথম র্নিবাচনে শতকরা ৪০ ভাগ, দ্বিতীয় নির্বাচনে শতকরা ৪০ ভাগ ও তৃতীয় নির্বাচনে ২০ শতাংশ নারী আসন এককভাবে নির্ধারণ করার সুপারিশ করেন''। কমিটি এককভাবে নারীদের জন্য আসন নির্ধারণ করা সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি হবে কিনা তাও যাঁচাই-বাছাই করেই এই সুপারিশে উপনীত হন। এই সুপারিশ মোতাবেক স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজলা পরিষদ, জেলা পরিষদ), পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ-২০০৭ তৈরি করা হয়। এই বিধানটি ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশের ধারা (৩); ওয়ার্ড গঠনের উপধারা(৩) এ মোট ওয়ার্ড সংখ্যার শতকরা ৪০% মহিলা সদস্যদের জন্য নির্ধারিত থাকবে, যাহা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান(Rotation) পদ্ধতিতে পূরণ করতে হবে; সরকার নির্বাচন কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসনের ঘূর্ণায়মান(Rotation) পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে। শর্ত থাকে যে, মহিলা সদস্যদের জন্য উক্তরুপ নির্ধারিত আসন ব্যবস্থা পরবর্তী তিনটি সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত বহাল থাকবে। তবে শর্থ থাকে যে, নির্ধারিত আসন বহির্ভূত আসনে মহিলা প্রার্থীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই বিধানটি পৌরসভা অধ্যাদেশ ধারা(৯), সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ধারা ২৮এ মহিলা আসনের শতকরা ৪০% নির্ধারিত আসন পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে রাখতে হবে এবং ঘূর্ণায়মান(Rotation) ব্যবস্থা সরকার নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে গেজেটে প্রকাশ করবে।

সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ধারা-৮ (মহিলা আসনে ওয়ার্ড সংখ্যা নির্বাচন), উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ ধারা-(১০)(২)(ঙ), জেলা পরিষদ অধ্যাদেশ ধারা-(১০)(৩)(ঙ) এ মোট ওয়ার্ড সংখ্যার শতকরা ৪০% মহিলা সদস্যদের জন্য নির্ধারিত থাকবে বলে উল্লেখ রয়েছে। তারপর ও রহস্যজনকভাবে স্থানীয় সরকারের এসকল অধ্যাদেশগুলোতে উল্লেখিত ৪০শতাংশ নারী

[৪২] CEDAW, MDG, SDG, Gender Budgeting

প্রতিনিধিত্বের নুতন বিধানটি বাস্তবায়ন করা হয় নাই। বরং অদ্যবধি বিদ্যমান প্রথাই বহাল রাখা হয়। বিদ্যমান প্রথাটি সংবিধান বিরোধী এবং বে-আইনী।

এভাবে বিগত ২৭ বছর (১৯৯৭-২০২৪) যাবৎ অর্থাৎ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে ৫টি নির্বাচনকালীন সময়ে নারী প্রতিনিধিদেরকে এই প্রহসনমূলক নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কোন সরকারই এই বিষয়ে নজর দেয় নাই। এক্ষেত্রে সরকার ও নীতি নির্ধারকদের জেন্ডার সচেতনতার অভাব, রক্ষণশীল মনোভাব, জনপরিসরের ভূমিকায় নারীদের জন্য উদ্ভুত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নীতিনির্ধারক ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদেরও কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে দেখা য়ায়নি। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় গোটা বিশ্বে অর্ধেকের ও বেশি দেশে আইনসিদ্ধ লিঙ্গভিত্তিক কোটার ব্যবহার এবং স্থানীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তবে পৃথিবীর কোন দেশেরই বাংলাদেশের নারীদের মত কোটা নিয়ে এধরনের বিকৃত পিতৃতন্ত্র ও বৈষম্যমূলক আইনের শিকার হতে হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, যেমন: লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলোতে নারীদের জন্য গৃহীত লিঙ্গ কোটা ব্যবস্থা কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। যেমন-কুইটো কনসেনসাস-২০০৭, স্যান্টো ডোমিঙ্গো কনসেনসাস-২০১৩, সান্টিয়াগো কমিটমেন্ট-২০২০[৪৩]। এই চুক্তিগুলো রাজনীতিতে সমতা নিশ্চিত করার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে এবং এটি গণতন্ত্রের জন্য একটি পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। যার ফলে এই সকল আইনের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয় নাই। নারীর অংশগ্রহণের কাঠামোগত বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীদের স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধির জন্যও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে।

৯. সকল স্তরের সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় নারী প্রতিনিধিত্বের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও বৈশ্বিক অবস্থান

নারী উন্নয়ন টেকশই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। যা নারী-পুরুষের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করে। এটি নারীদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ প্রদান করে। সংবিধানের রাষ্ট্রের মূলনীতি অধ্যায়ে নারীদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এই সংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, সরকারি নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা হয় এবং বাস্তবায়নে জেন্ডার সংবেদনশীলতা কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ নারীর অধিকার ও উন্নয়নের জন্য একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রদান করে। এর মূল লক্ষ্য হলো জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। এই নীতির মধ্যে ২২টি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ এবং নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতি সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি বাস্তবায়নের উপর প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের কৌশল ব্যক্ত করা হয়।

উইড ফোকাল পয়েন্ট নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি বিশেষ ব্যবস্থা। মূলত জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এবং নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির প্রয়োজনসমূহের সমন্বয় নিশ্চিত সকরার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতীয় মন্ত্রণালয়ে উইড ফোকাল পয়েন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যুগ্নসচিব বা স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের যুগ্নপ্রধান পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা উইড ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নকারী এজেন্সীগুলো সহকারী প্রধান ও সহকারী সচিব পর্যায়ে উপ-উইড ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

[৪৩] EU এর আর্থিক সহয়তায় UNDP কর্তৃক পরিচালিত স্থানীয় সরকারগুলোর সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্পের-২০২০-২০২৪ এর প্রতিবেদন।

নারীর রাজীনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাংবিধানিক নিশ্চয়তার পাশাপাশি, বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের সকল স্তরের সরকারে নারীদের সমান রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের কাঠামোতে স্বীকৃত রয়েছে, যেমন নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত (জাতিসংঘের) আন্তর্জাতিক সনদ ১৯৫২, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডও ১৯৭৯, বেইজিং ঘোষণা এবং কর্মপরিকল্পনা-১৯৯৫ ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG), ২০০০-২০১৫, এবং পরবর্তীতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG)- ২০১৫-২০৩০ এ অনুমোদিত হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক কাঠামোগুলো লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রতি দেশের প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করে। জাতীয়ভাবে সরকার নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকেল্পনা (২০২০-২০২৫), এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর মাধ্যমে সংহত করেছে। এছাড়া ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) বাংলাদেশে নারীদের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে, যেখানে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এই কৌশলপত্রগুলো একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপের রূপরেখা প্রদান করে। অর্থাৎ, নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত সকল আইন, নীতি ও সনদসমূহ বাংলাদেশের সংবিধানিক ধারা মতে জাতীয় জীবনে ও উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছে।

বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), বিশেষ করে SDG-5 (নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গাসমতা) বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ এবং সকল স্তরের সরকারে নারীর সমান রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি অতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং জনজীবনের সকল স্তরে নারীদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে''। এই লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি নিরীক্ষণের জন্য দুটি সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে: ১) SDG সূচক ৫.৫.১a যা সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নির্দেশ করে; ২) SDG সূচক ৫.৫.১b. স্থানীয় সরকারে নারীদের প্রতিনিধিত্ব পরিমাপের জন্য একটি নতুন সূচক, যার মাধ্যমে সকল স্তরের স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীদের নেতৃত্ব এবং মতামত প্রদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা UN Women, একমাত্র অভিভাবক সংস্থা হিসেবে স্থানীয় সরকারে নারীদের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বৈশ্বিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে থাকে। তাদের মতে, সরকার জাতীয় থেকে স্থানীয় স্তরে আইন প্রণয়ন, নির্বাহী এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উন্নতি এবং জনসাধারণের সরাসরি অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। তাদের বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে, স্থানীয় সরকারে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে বিশ্বে অর্ধেকের মত দেশ আইন দ্বারা নির্ধারিত লিঙ্গভিত্তিক কোটা ব্যবহার করে সফলতা লাভ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকারে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে আইন দ্বারা নির্ধারিত লিঙ্গ কোটাই একমাত্র কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আইন দ্বারা নির্ধারিত এই লিঙ্গভিত্তিক কোটা স্থানীয় সরকারে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি কার্যকর উপায় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এর ইতিবাচক প্রভাব বিশেষত আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে বেশি কার্যকর হয়েছে, যেখানে দীর্ঘস্থায়ী পুরুষ প্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারা পরিবর্তনে এ ব্যবস্থা গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।[৮৮] গবেষণা অনুযায়ী স্থানীয় সরকারে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ধরনের আইন দ্বারা নির্ধারিত কোটার বাস্তবায়ন করেছে। অধিকাংশ দেশে স্থানীয় নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণত নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ করা হয়।

নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লিঙ্গাভিত্তিক কোটার প্রভাব শুধুমাত্র উন্নয়নশীল অঞ্চলেই নয়, উন্নত দেশগুলোতেও এর ইতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়। গবেষণায় দেখো গেছে যে, লিঙ্গাভিত্তিক কোটা বাস্তবায়নের পর নির্বাচিত নারী সদস্যদের হার

[88] UN Women's Women in Local government Database:Quota and Electroal System

উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদহারণস্বরুপ, ফ্রান্সে ২০০০ সালে সমতা আইন চালুর পর ২০০১ সালের নির্বাচনে পৌরসভার নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব ২৬ শতাংশ থেকে ৪৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্পেনে ২০০৭ এবং ২০১১ সালে লিঙ্গাভিত্তিক কোটা বাস্তবায়নের ফলে নারীদের অংশগ্রহণ ২৬ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালের নির্বাচনে ৩৫ শতাংশে পৌছেছে। উল্লেখিত গবেষণায় আরো লক্ষ্য করা গেছে যে, স্থানীয় সরকারের মধ্যে নারীদের প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মনীতি এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্তরের উপর নির্ভর করে। সাধরণত দেশের রাজধানী বা বড় শহরগুলোতে দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিক মাত্রায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব বজায় থাকে।[৪৫]

এক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থানীয় সরকারে ভারতের আইনসিদ্ধ লিঙ্গ কোটা ও তাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। কারণ সমসাময়িক কালে ভারত ৭৩তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন (১৯৯৩) এর মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় পুরুষ-নির্ভর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রচলিত ঐতিহ্যগত কাঠামো শিথিল করে নারীদের অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। এর মাধ্যমে ভারতের গ্রামীণ শাসন কাঠামোর পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান এর স্থানীয় সরকারের এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ঘুর্ণায়মান পদ্ধতিতে প্রতি নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হন। এই আইন বাস্তবায়নের ৩০ বছরের মধ্যে ভারত ১.৪৫ মিলিয়ন নারীকে স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তুলে নিয়ে আসে। জানুয়ারি ২০২৩ সালে নারীদের স্থানীয় শাসনে অন্তর্ভুক্তির ফলে ভারতের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্টে ৮টি স্থান উন্নীত হয়েছে স্থানীয় শাসনে নারীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি নতুন সূচক যুক্ত করার কারনে। বর্তমানে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী ৪৪.৪% নারীদের অংশগ্রহনের কারনে ভারত স্থানীয় শাসনে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী প্রতিনিধি অংশগ্রহনের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

বর্তমানে ভারতের ২০টি রাজ্যে নারীদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাড়িয়ে ৫০শতাংশ করা হয়েছে। কিছু রাজ্যে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান (PRIs) এ নারীরা এই সীমা ছাড়িয়ে ৫০ শতাংশের ও বেশি নারী প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে। যাতে বুঝা যায় যে, নারীরা এখন সাধারণ ওয়ার্ডে ও সফল হচ্ছে, যা বিশেষভাবে তাদের জন্য সংরক্ষিত ছিলনা। যেমন: কেরালা ৫২.৪১৫, আসামে ৫৪.৬%, ছত্রিশগড়ে ৫৪.৭৮%, মহারাষ্ট্রে ৫৩.৪৭%। তন্মধ্যে ১০টি রাজ্যে, বিশেষকরে উত্তরাখন্ড কর্নাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, ছত্রিশগড়, আসাম, বিহার তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা ও ঝাড়খন্ড পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানে নারীরা ৫০ শতাংশেরও বেশি প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছেন। এটা নির্দেশ করে যে, ভারতে স্থানীয় সরকারে আইনসিদ্ধ লিঙ্গাভিত্তিক কোটা নিখুঁতভাবে বাস্তবায়ন করার ফলে নারীরা এখন সাধারণ নির্বাচনী ওয়ার্ডে সফল হচ্ছেন। স্থানীয় সরকারে নারীদের সক্রিয় উপস্থিতি ভারতের লিঙ্গসমতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল পদক্ষেপ।

এছাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কুলতিকড়ি নামে একটি সর্ব-মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচিত ১৩ জন সদস্যের সকলেই নারী ছিলেন। যার মধ্যে প্রধান ও উপ-প্রধান ও অন্তর্ভুক্ত। কুলতিকড়ি সর্ব-মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে এর উত্থান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, যা রাজ্যের গ্রামীণ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এক নতুনমাত্রা যোগ করেছে। এছাড়া, এটি ভারতের ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য ‘গ্রামীণ নারীদের রাজনৈতিক ক্ষতায়ন’ বাস্তবায়নে প্রকৃতই সাহায্যতা করেছে।

কিন্তু বাংলাদেশের জন্য দুঃখজনক বিষয় হলো ভারতের সমসাময়িক সময়ে বাংলাদেশে আইনসিদ্ধ লিঙ্গাভিত্তিক কোটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও দীর্ঘদিন যাবত অবমূল্যায়ন হওয়ায় বিগত ৩০ বছরেও নারী প্রতিনিধিত্ব র্কাযকরী হয়নি এবং সাধারণ আসনে নির্বাচণ ব্যবস্থায় নারীরা ব্যর্থ হয়। এছাড়াও পিতৃতান্ত্রিক মুল্যবোধের স্থায়িত্বের কারণে, পুরুষপ্রধান রাজনৈতিক কাঠামো, নারী-পুরুষের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, পুরুষ সহকর্মীদের বাধা ও অসহযোগিতা, নারীর কর্মসহায়ক পরিবেশের

[৪৫] UN Women’s Representation in Local Government: A Global Analysis, December-2021.

অভাব, নারীদের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, নারী নেতৃত্বের প্রতি পরিবার, সমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় বাধা বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ যেই কূলে ছিল সেই কুলেই রয়ে গেছে।

১০. লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেটিং

লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেটিং (জেন্ডার বাজেটিং) ১৯৮০—১৯৯০ এর দশকে সরকারি নীতি ও ব্যয়ে লিঙ্গ বৈষম্যদূর করার একটি কৌশল হিসেবে শুরু হয়। সরকারগুলো বুঝতে শুরু করে যে, নারী ও পুরুষের উপর বাজেটের প্রভাব ভিন্ন হয় এবং এই পার্থক্যগুলোর মধ্যে সমতা বিধানে লক্ষ্য দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। অস্ট্রেলিয়া ১৯৮০-এর দশক থেকে নারী বাজেট বিবৃতি (Women's Budget Statement) চালু করার মাধ্যমে পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করে। তবে ১৯৯০-এর দশকে এই ধারণাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

জেন্ডার বাজেট দেশে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে আছে বলে বাজেটে নারীদের জন্য বরাদ্দের উপর জোড় দেওয়া হয়েছে। তবে এটি নারীদের জন্য আলাদা বরাদ্দ নয়। বরং এটি শুধুমাত্র নারীদের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সরকারি বরাদ্দের পরবর্তীকালের বিশ্লেষণ। বাংলাদেশে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে প্রথমবারের মতো বার্ষিক বাজেটের সাথে 'নারীর অগ্রগতি ও অধিকার' শীর্ষক জেন্ডার বাজেট বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুরু হয়, যা আর্থিক সংস্কার ও মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাথমিকভাবে এটি কেবল চারটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, সমাজকল্যাণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। ২০১৬-১৭ অর্থবছর নাগাদ ৪৩টি মন্ত্রণালয় তাদের বাজেটে লিঙ্গসমতা বিষয়ক বরাদ্দ নিশ্চিত করে। বাংলাদেশে লিঙ্গ-সংবেদনশীল বাজেট শুধুমাত্র সামগ্রিক বাজেট কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বিভিন্ন খাত ও প্রকল্প পর্যায়ে ও এটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রকল্প এবং কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যায়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। 'জেন্ডার বাজেট' নিশ্চিত করে যে, লিঙ্গাসমতা আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রতিটি স্তরে বিবেচনায় নেয়া হয়, যা সরকারকে লিঙ্গ সংবেদনশীল আর্থিক নীতিমালা এবং ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ণের সহায়তা করে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জেন্ডার বাজেটিং এ 'শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীদের উন্নয়ন' নামে একটি নতুন থিম্যাটিক ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ২২টি কর্মসূচি/নীতি লিঙ্গ সংবেদনশীলতা জেন্ডার বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাবিত কর্মসূচির মধ্যে **'সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাজনৈতিক কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যম ক্ষমতায়ন'**কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো:

- সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশসহ রাজনৈতিক কাঠামোতে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হলে নারীর ক্ষমতায়ন আরও বেগবান হবে এবং তাতে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক সমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে;
- জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন জোরদার করা;
- নারীদের মতামত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করা;
- নারী সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- নারী জনপ্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণে বাড়াতে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- নাগরিক সংস্থার মাধ্যমে দলের নেতা হিসেবে কাজ করা নারী রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা[৪৬]। উপরোল্লেখিত প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আসন্ন নির্বাচনের পূর্বে ও পরে, স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য জেন্ডার বাজেটের মাধ্যমে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন প্রস্তাব করছে।

[৪৬] *Progress Toeards Equality:*Gender Budget Report,2024-25.Finance Division,Ministry of Finance,Governmnet of peopl'es Republic of Bangladesh.

১১. সুপারিশমালা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে সংরক্ষিত নারী আসনে বর্তমান ও প্রস্তাবিত কাঠামো।

বর্তমান কাঠামো

প্রস্তাবিত কাঠামো

স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ

১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রস্তাবিত নতুন কাঠামোতে ওয়ার্ড ব্যবস্থা থাকবে এবং ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মোট ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ (একক আসন) ঘূর্ণায়মান(Rotation) পদ্ধতিতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় প্রথম নির্বাচনে প্রতিটি পরিষদে ও কাউন্সিলের এক তৃতীয়াংশ, দ্বিতীয় নির্বাচনে এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয় নির্বাচন বছরে সর্বশেষ ওয়ার্ডসমূহ নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ঘূর্ণায়মান(Rotation) পদ্ধতিতে ওয়ার্ড সংরক্ষিত হবে। এখানে কেবল নারীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সকল সময় দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ার্ড সাধারণ আসন হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। এক্ষেত্রে তিনটি নির্বাচনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ১/৩ অংশ ওয়ার্ডেই নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। তবে বাকী ২/৩অংশ ওয়ার্ডে পুরুষদের সাথে নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা থাকবে না। এই ব্যবস্থায় ০৩ (তিন)টি নির্বাচনকে একটি গুচ্ছ হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং পুরো পরিষদ এলাকায় নারীগণ পর্যায়ক্রমে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। এই ব্যবস্থার ফলে সংরক্ষিত নারী আসনের সঙ্গে সাধারণ আসনের দীর্ঘদিনের যে দ্বৈততা ও সাংঘর্ষিক অবস্থা বিরাজমান ছিল তার অবসান ঘটবে। এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য ৫ বছরের পুরো কার্যকালীন সময়ে একটি একক নির্বাচনী এলাকায় কাজ করার সুযোগ পাবেন এবং জনগণের উন্নয়নে বাধাহীনভাবে দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারবেন। এছাড়া এই ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যরা নির্বাচিত হলে সরকারের খরচও কমে যাবে।

২. প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকারের নতুন কাঠামো অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ পদাধিকার বলে চেয়ারপার্সন ও মেয়র কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ লাভ করবে, এবং স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থায়ী কমিটিগুলোতে আনুপাতিক হারে চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তাছাড়া, দক্ষ নারী সদস্যগণ চেয়ারপার্সন ও মেয়র, সভাধ্যক্ষ ও ছায়া পরিষদ নেতা ইত্যাদি পদে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পেতে পারবেন।

৩. তিনটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে ও বিভিন্ন জাতিসত্তা অধ্যুষিত এলাকার নারীরা এই সংরক্ষিত নারী আসনের বিশেষ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

৪. ক্রমবর্ধমান জনসংখার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অথবা বৃহত্তর আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্য ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হতে পারে এবং সে মোতাবেক নারী সদস্যদের আনুপাতিক কোটা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৫. প্রস্তাবিত ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ৩টি নির্বাচন শেষে একটি গবেষণা ও মূল্যয়নের ফলাফল অনুযায়ী সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি অথবা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এক্ষেত্রে ৩টি নির্বাচনকালীন সময়ে সাধারণ আসনে আনুপাতিক হারে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৬. নির্বাচিত নারী সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে তারা জনগনের সেবার চাহিদা যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে এবং পরিষদের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে করতে পারে ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারে।

৭. নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের প্রতি পুরুষ প্রতিনিধিদের অশালীন উক্তি, বৈষম্যমূলক আচরন ও যৌনহয়রানি প্রতিরোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আচরনবিধি প্রবর্তন করতে হবে।

<u>মধ্য মেয়াদী সুপারিশ</u>

৮. সংরক্ষিত নারী আসনে সংস্কার প্রস্তাবনার বিধানটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য বিশেষ ও যথাযথ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কৌশলগত দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

১০. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কোর্সে জেন্ডার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা।

১১. মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তা ও বিকাশের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ সেল গঠন, নিরাপদ খেলার মাঠ ও পার্কের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিক্ষা ও বিকাশের জন্য বিশেষ শিক্ষা সুবিধা, অধিকার ও সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রচার প্রচারণা, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ, নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা, সহিংসতা প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রয়োগ, অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও, স্থানীয় প্রশাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে মেয়ে শিশুদের প্রতি সহিংসতা ও অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

১২. রাজনৈতিক দল, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তিমূলক ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন নীতি, সিডও, বেইজিং পরিকল্পনাও সর্বশেষ SDG-এর নির্দিষ্ট দুটি সূচক এর নির্দেশনাগুলো বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩. ‘রাজনৈতিক দল নিবন্ধন’ আইন অনুসারে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের সকল কমিটিতে ৩৩শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলকভাবে নিশ্চিত করা।

১৪. জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতিতে বৈষম্য দূরীরকরণে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্ব-স্ব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জেন্ডার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও গাইডলাইনের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এর জন্য স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের জন্য লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট নির্ধারিত রাখা।

১৫. স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার কমিশনে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ/সক্রিয় করা;

১৬. স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অবশ্যই জেন্ডার বাজেট পদ্ধতি অনুসরণ করা। জেন্ডার বাজেটিং একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি যা নিশ্চিত করে যে, বাজেট বরাদ্দগুলো লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়ক সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধান প্রদান করে।

১৭. জনস্বার্থে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ও এর কর্মপরিধি অন্তর্ভুক্ত করা।

১৮. নারী সমাজকে পুরুষের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের এজেন্ডা বা কর্মসূচি নিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এগিয়ে আসার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা।

১৯. বর্তমানে নির্বাচিত এবং ভবিষ্যতে যারা নির্বাচত হয়ে আসবে তাদের সংগঠিত করে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা এবং নারী সদস্যদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এই নির্দেশনা সম্পর্কে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২০. স্ব-স্ব স্তরের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের নারী সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অংশগ্রহণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে, এবং এই নির্দেশনা সম্পর্কে সকল প্রতিনিধিদের অবগত করতে হবে।

২১. স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি এর পরিচালনাকারী বিদ্যমান আইনগুলোকে নারীবান্ধব করার জন্য নতুনভাবে লিখতে হবে এবং নির্ধারিত আইন বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক বিধি ও প্রণয়ন করতে হবে।

২২. সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ছাড়াও সাধারণ আসন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাহী পদে নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কার্যকর ব্যবস্থা করা।

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

২৩. প্রাথমিক পর্যায়ে ও দীর্ঘমেয়াদে নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে স্বাধীন/স্বায়ত্তশাসিত (Women's leadership Institute) প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। যা নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক হবে।

২৪. নারী প্রতিনিধিদের নেতৃত্বের বিষয়ে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গঠনের জন্য সুশীলসমাজ ও নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিগণকে ধারাবাহিক প্রচারভিযান চালাতে হবে।

২৫. সংশোধীত আইনে পরিষদ/কাউন্সিলের সকল কার্যাবলি পরিচালনায় নারী প্রতিনিধির সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে কার্যাবলিসমূহ: বাজেট, পরিকল্পনা, স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ, উন্নয়ন কাজ, সালিশি কার্যাবলি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর উপর নজরদারি, প্রতিবেদন করা, নাগরিক ও চরিত্র সনদ প্রদান ইত্যাদি।

২৬. নারী প্রতিনিধিদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য যথাযথ দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারীদের জন্য নির্বাচনী ব্যয়ের উপর নীতিমালা প্রণয়ন করা।

২৭. মিডিয়ার মাধ্যমে নারীর প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও এর ভূমিকা প্রচার করা। যা জনপরিসরে নারী নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।

২৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে, রাজনৈতিক দল ও সার্বিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় লিঙ্গ-সংবেদনশীল কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

২৯. বিগত ২৭ বছরে স্থানীয় সরকারে ৫টি নির্বাচনকালীন সময়ে সংরক্ষিত আসনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব কার্যকর না হওয়ার উপর গবেষণা করে নির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি করা।

অধ্যায়-বারো

স্থানীয় সরকার কমিশন

ভূমিকা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর তদারকি সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের প্রচলন রয়েছে, যা প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দে ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রশাসনিক জটিলতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং আইনি অস্পষ্টতার কারণে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রায়শই বাধাগ্রস্ত হয়। এ ধরনের সংকট নিরসনে, একটি স্থায়ী ও কার্যকর স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ, এবং সেবার মান বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ, কানাডার নিউ ব্রান্সউইক প্রদেশ এবং ভারতে সকল রাজ্যস্তরে তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামোর আলোকে 'স্থানীয় সরকার কমিশন' ও স্থানীয় সরকার অর্থ কমিশন পরিচালনা করে থাকে। প্রতিটি দেশের স্থানীয় সরকার কমিশন তাদের অনন্য কাঠামো ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। কারও মূল লক্ষ্য প্রশাসনিক পুনর্গঠন, কারও উদ্দেশ্য বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা, আবার কেউ দুর্নীতি দমন ও নীতি নির্ধারণে কাজ করছে। আবার অনেকে আর্থিক বরাদ্দের ন্যায্যতা নিশ্চিত করে থাকে।

বাংলাদেশের জন্য কেরালা ও নিউজিল্যান্ডের মডেল অনুসরণ করে একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা হলে এটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও জনমুখী করতে সহায়তা করতে পারে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন বহুদিনের দাবি।

স্থানীয় সরকার (বিষয়ে) গঠিত পূর্ববর্তী কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদনেও একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে একটি স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে একটি দ্বন্দ্বময় কাঠামোর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। একদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জনগণের নিকট জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কথা, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাদের কার্যকর সমন্বয় রক্ষা করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা প্রায়শই প্রশাসনিক জটিলতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের আধিক্য এবং আইনি অস্পষ্টতার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে, একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা হলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

স্থানীয় সরকার কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করতে পারে। বর্তমান ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে কাজ করলেও,

তারা প্রায়শই আইনি অসঙ্গতি, প্রশাসনিক বাধা এবং স্বচ্ছতার অভাবে কাঙ্খিত মাত্রার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে না। ফলে, স্থানীয় সরকারগুলোর সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর কমিশনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তা'ছাড়া 'স্থানীয় সরকার' সরকারের ভিতরের সরকার। এটি কোন সরকারি দপ্তর নয়। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মাঝখানে একটি সাংবিধানিক সংস্থা প্রয়োজন যারা এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে আইনগত, প্রশাসনিক ও অর্থ বরাদ্দ ভারসাম্য ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে।

একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান, যা তাদের সংবিধান স্বীকৃত স্বায়ত্তশাসনকে বাধাগ্রস্ত করে। বিশেষ করে, তহবিল বণ্টন, উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন এবং প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। ফলে, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও কার্যক্রম সীমিত হয়ে যায়। এই অবস্থায়, একটি স্বাধীন কমিশন গঠিত হলে এটি স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর জন্য একটি ন্যায্য ও স্বচ্ছ অর্থায়ন কাঠামো তৈরি করতে সহায়ক হবে।

স্থানীয় সরকার কমিশন শুধু অর্থায়নের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবেই না, বরং এটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনি জটিলতা নিরসন এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতেও সহায়তা করতে পারে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অন্যতম বড় সমস্যা হলো, বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার আইন ও বিধিবিধান পরিবর্তন করা হলেও, সেগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অস্পষ্ট থেকে যায়। অনেক সময় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। এক্ষেত্রে, একটি শক্তিশালী কমিশন গঠিত হলে, এটি স্থানীয় সরকার আইনগুলোর সমন্বয় সাধন ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়াতে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন একটি অপরিহার্য বিষয়। বর্তমানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত। এই ঘাটতি পূরণে স্থানীয় সরকার কমিশন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করতে পারে। বিশেষ করে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) বার্ড কুমিল্লা, আরডিএ, বগুড়া এবং জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) -এর কার্যক্রম সমন্বয় ও উন্নয়নে কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

অন্যদিকে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তারা স্থানীয় সরকার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলেও, এতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কা থেকে যায়। ফলে, সঠিকভাবে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় না। একটি স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন থাকলে, এটি স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারবে।

একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার কমিশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এটি কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করবে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করতে গিয়ে নানা ধরনের প্রশাসনিক জটিলতায় পড়ে। এই ধরনের সমস্যা নিরসনে একটি স্থায়ী কমিশন গঠিত হলে, এটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের অনুরোধে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২৫-এর জানুয়ারী মাসে দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৬,০৮০টি থানায় একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেন ৮৩.৭ শতাংশ উত্তরদাতা।

বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন এখন সময়ের দাবি। এটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে একমাত্র কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। কমিশন গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা, আইনি সমন্বয়, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং জনগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরে সংগঠিত দুর্নীতি, অনিয়ম, আইন ও নীতি কাঠামোর বাইরে কাজ করা অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছে। তাই, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদে শক্তিশালী করতে হলে এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আনতে হবে স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণতা।

স্থানীয় সরকার কমিশন: বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হয়েছে। প্রতিটি দেশ তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো, রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এই কমিশন গঠন করেছে এবং পরিচালনা করছে। নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ, কানাডার নিউ ব্রান্সউইক প্রদেশ এবং ভারতের সকল রাজ্যের স্থানীয় সরকার কমিশনগুলোর গঠন, কার্যকারিতা এবং ভূমিকার পার্থক্য বিচার করলে এই ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নিউজিল্যান্ড: প্রশাসনিক পুনর্গঠনের পথপ্রদর্শক

নিউজিল্যান্ডে স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। মূলত, দেশটির সরকার এই কমিশন গঠন করে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো এবং স্থানীয় সরকারগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্য সামনে রেখে। দেশটি একসময় প্রায় ৮৫০টি ছোট ছোট স্থানীয় সরকার সংস্থার ভারে জর্জরিত ছিল, যা প্রশাসনিক অকার্যকারিতা ও অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি করেছিল। ১৯৮০-এর দশকে, লেবার সরকার ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার শুরু করলে এই কমিশনের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত হয়। কমিশন তখন ৮৫০টি সংস্থাকে একীভূত করে মাত্র ৮৬টি কার্যকর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করে। এটি স্থানীয় সরকারগুলোর সীমা পুনঃনির্ধারণ, সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০২ সালে কমিশনের ক্ষমতা আরও বাড়ানো হয়, যেখানে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়, যার অমন্মত একজন মাওরি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত থাকবেন। নিউজিল্যান্ডের স্থানীয় সরকার কমিশনকে প্রশাসনিক সমন্বয়ের একটি সফল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি শুধুমাত্র তদারকি ও পুনর্গঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং স্থানীয় সরকারগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

ইংল্যান্ড: নির্বাচনী সীমানা ও প্রশাসনিক সংহতি নিশ্চিতকরণ

ইংল্যান্ডে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মূল তদারকি ও পুনর্গঠনের দায়িত্বে বেশ কয়েকটি কমিশন রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম Local Government Boundary Commission for England (LGBCE) এবং Commission for Local Administration। LGBCE প্রধানত স্থানীয় সরকারগুলোর নির্বাচনী সীমানা পুনঃনির্ধারণ এবং প্রশাসনিক কাঠামোর দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। এটি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চলের সীমানা পরিবর্তন এবং পুনর্গঠনের জন্য পরামর্শ প্রদান করে। অন্যদিকে, Commission for Local

Administration স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ন্যায়পাল (Ombudmen) পরিষেবা প্রদান করে। এটি নিরপেক্ষভাবে স্থানীয় সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

পাকিস্তান (খাইবার পাখতুনখোয়া): সরকারের তত্ত্বাবধানে তদারকি ব্যবস্থা

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে স্থানীয় সরকার কমিশন ২০১৩ সালে গঠিত হয়, যা মূলত স্থানীয় সরকারগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এটি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি সরকারনির্ভর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পরিচালিত হয়। এই কমিশনের প্রধান স্থানীয় সরকার, নির্বাচন ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং এতে দুইজন প্রাদেশিক সংসদ সদস্য (সরকার ও বিরোধীদলের প্রতিনিধি) অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এছাড়াও, দুটি টেকনোক্র্যাট পদ সংযোজন করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্তত একজন নারী। কমিশনটি বাজেট ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সরকারের বার্ষিক পরিদর্শন, নিরীক্ষা এবং সীমানা পরিবর্তন ও প্রশাসনিক বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব পালন করে। তবে এটি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে পরিচালিত নয়, বরং প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কাজ করে, যা কিছু ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতাকে সীমিত করতে পারে।

কানাডার নিউ ব্রান্সউইক: স্বতন্ত্র ও স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন

কানাডার নিউ ব্রান্সউইক প্রদেশে ২০২৩ সালে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। এটি সরকারের প্রভাবমুক্ত একটি সংস্থা, যার প্রধান কাজ হলো প্রশাসনিক সংস্কার, নিরীক্ষা পরিচালনা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং স্থানীয় সরকারের কার্যকারিতা উন্নত করা। এই কমিশনটি স্থানীয় সরকারগুলোর জন্য নিরীক্ষা কর্মকর্তা, তদারকি কমিটি, ট্রাস্টি এবং কৌশলগত উপদেষ্টা নিয়োগ করে, যা প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। এটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম নিরীক্ষণ করে এবং সংবিধান সংশোধনের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। এটি অন্যান্য দেশের তুলনায় আরো বেশি বিকেন্দ্রীকৃত ও স্বায়ত্তশাসিত, যা এটিকে একটি কার্যকর মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।

ভারতের কেরালা: বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণ

কেরালার স্থানীয় সরকার কমিশন মূলত বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কাজ করে। এটি People's Plan Campaign নামে একটি উদ্যোগ পরিচালনা করছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারগুলোর উন্নয়নে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এই কমিশন স্থানীয় সরকার আইন পর্যালোচনা, প্রশাসনিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং স্থানীয় সরকারগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। এছাড়া, এটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে গবেষণা পরিচালনা করে এবং দেশি-বিদেশি সেরা অনুশীলনগুলো বিশ্লেষণ করে। ভারতের সংবিধানে প্রতিটি রাজ্যের জন্য স্থানীয় সরকার অর্থ কমিশন গঠনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের পর থেকে এ পদ্ধতি বলবত আছে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকার কমিশনের গঠন ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি দেশ তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী কমিশন পরিচালনা করছে।

- নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড মূলত প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণে কাজ করে।
- পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া কমিশন সরকারের অধীনে তদারকি ও পর্যালোচনা পরিচালনা করে।
- কানাডার নিউ ব্রান্সউইক কমিশন একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে প্রশাসনিক কার্যকারিতা উন্নত করে।
- কেরালার কমিশন বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেয়।

- ভারতের সকল রাজ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অর্থ বন্টণ ব্যবস্থা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের জন্য কেরালা ও নিউজিল্যান্ডের মডেল অনুসরণ করে একটি শক্তিশালী, স্বাধীন এবং বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যা স্থানীয় সরকারের ন্যায়পাল হিসেবেও কাজ করবে। এটি দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও জনমুখী করতে সহায়তা করবে।

দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও জনমুখী করতে স্থানীয় সরকার কমিশনকে নিম্নের কয়েকটি মৌলিক কাজ দৃঢ়ভাবে সম্পন্ন করতে হবে:

১) স্থানীয় সরকার কমিশন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ন্যায়পাল হিসেবে পরিগণিত হবে এবং সংবিধানসম্মতভাবে ন্যায়পালের যা কাজ তা এই কমিশন করবে।
২) স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়ের কাজে একটি সঙ্গতি ও সমন্বয় আনয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।
৩) স্থানীয় সরকারের জন্য জাতীয় বরাদ্দ ও বাজেট গ্রহণের পূর্বে সরকার কমিশনের মতামত গ্রহণ করবে।
৪) স্থানীয় সরকারের সকল আইন, বিধিবিধান প্রণয়ন, সংশোধন, পরিমার্জন ইত্যাদিতে মন্ত্রণালয কমিশনের মতামত গ্রহণ করবে।
৫) স্থানীয় উন্নয়ন, সেবা-সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় জড়িত যেকোন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার উপর দিক নির্দেশনা দেওয়ার অধিকারী হবে।
৬) নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবিধান ও আইন, অনুযায়ী প্রতিকার ও প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অবিভাবক হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা প্রদান করবে।

স্থানীয় সরকার কমিশনের অন্যান্য কার্যাবলি

(ক) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়মিত পর্যালোচনা ও সময়োপযোগী সংস্কারের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
(গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ এবং অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;
(ঙ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ মানবসম্পদ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' গঠন এবং তা পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা দান;
(চ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা দান;
(ছ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত আর্থিক বরাদ্দ, সম্মানী/বেতন-ভাতা পর্যালোচনা ও নির্ধারণের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
(জ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কার্যক্রম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অসদাচরণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত পরিচালনা এবং তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
(ঝ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন হাট-বাজার, জলমহাল, খেয়াঘাট, ফেরিঘাট ইত্যাদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(ঞ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;

(ট) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা;

(ঠ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন;

(ড) সরকার কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

"স্থানীয় সরকার ন্যায়পাল" এর যৌক্তিকতা

স্থানীয় সরকার ন্যায়পাল এমন একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ যা স্থানীয় সরকারের সেবা সম্পর্কিত অভিযোগগুলো তদন্ত করতে পারে। যদি কেউ মনে করেন যে স্থানীয় সরকার বা পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রমের কারণে তিনি অবিচারের শিকার হয়েছেন, তাহলে তিনি স্থানীয় সরকার ন্যায়পালের কাছে অভিযোগ করতে পারেন।

ন্যায়পাল নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে ক্ষমা প্রার্থনা, ক্ষতিপূরণ বা নীতিমালার পরিবর্তনের মতো পদক্ষেপের সুপারিশ করতে পারে। সাধারণত, এটি সরাসরি সংশ্লিষ্ট পরিষদের সঙ্গে সমাধান করার চেষ্টা করার পরের পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

স্থানীয় সরকার ন্যায়পালের উদাহরণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

১. যুক্তরাজ্য:

ইংল্যান্ডে Local Government and Social Care Ombudsman (LGSCO) রয়েছে, যা স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবার অভিযোগগুলো তদন্ত করে। এখানে সফলতার হারও প্রশংসনীয়।

২. ভারত:

ভারতে **লোকায়ুক্ত** (Lokayukta) নামে স্থানীয় সরকার ন্যায়পালের ব্যবস্থা আছে। এটি রাজ্য স্তরের দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করে।

৩. বাংলাদেশ:

বাংলাদেশে সরাসরি স্থানীয় সরকার ন্যায়পালের মতো কোনো স্বতন্ত্র সংস্থা নেই। তবে, সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বিশেষ করে দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে স্থানীয় পরিষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায়।

ইংল্যান্ড ও ভারতের অভিজ্ঞতা আমরা অনুসরণ করতে পারি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে এর অন্যান্য কার্যাবলির সাথে ন্যায়পালের দায়িত্বও প্রদান করা যেতে পারে।

স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের জন্য একটি পৃথক অধ্যাদেশের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এ খসড়া অধ্যাদেশটি প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খন্ডে যুক্ত করা হয়েছে।

উপসংহার: বাংলাদেশে ইতোপূর্বে গঠিত সকল স্থানীয় সরকার কমিটি ও কমিশন একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার গঠনের সুপারিশ করেছে। অন্তর্বর্তি সরকারের আমলে গঠিত প্রথম পর্যায়ের ৬টি সংস্কার কমিশনের তিনটি কমিশনও স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে। ২০০৮ সালে শওকত আলী কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করে একটি কমিশন গঠিত হয়। ২০০৯ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত না করায় কমিশনটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্তবর্তীকালীন সরকার এ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত আইনটি অধ্যাদেশ আকারে জারি করলে স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন পুনরায় গঠিত হতে পারে।

অধ্যায়-তেরো

স্থানীয় সরকার সার্ভিস

স্থানীয় সরকারের বর্তমান জনবল

ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এ তিনটি প্রতিষ্ঠানে সাধারণত দুই ধরনের জনবল রয়েছে আর একইভাবে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোতে নিজস্ব কর্মচারী ছাড়া ও প্রেষণের কিছু জনবল কর্মরত আছে।

স্থানীয় সরকারের প্রতিটি ইউনিটের নিজস্ব কর্মচারী আছে। তাদের নিয়োগ কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছু ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই নিয়োগসমূহ করে থাকে। এই কর্মচারীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্ন পদমর্যাদার এবং তারা প্রায়শ পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার ঘাটতি নিয়ে কাজ করে। অনেক সময় এ নিয়োগসমূহ রাজনৈতিক বা দলীয় নিয়োগ হয়ে থাকে। এ অব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামপুলিশ/চৌকিদার থেকে সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকারের একটি সাধারণ সার্ভিসের আওতায় এনে শৃঙ্খলা বিধান প্রয়োজন। এই স্থানীয় সরকার সার্ভিসে বিরাজিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের নানা দপ্তর ও বিভাগসমূহ রয়েছে। এর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের ‘স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯’ এর ধারা ৬৩ এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ৭টি মন্ত্রণালয়ের ৯টি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সার্ভিস ইউনিয়ন পরিষদে “হস্তান্তর করিতে পারিবে” বলা আছে। কিন্তু ২০০৯ সালে আইন করা হলেও হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত এখনও কার্যকর করা হয়নি। এই কর্মচারিদের সার্ভিস হস্তান্তর হলে তারা প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার সার্ভিসের বহির্ভূত জনবল হিসেবে চিহ্নিত হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিভিন্ন সামাজিক সেবা ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিস্তৃত পরিসরে নানাবিধ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান কর্মীবাহিনী এ দায়িত্বগুলো কার্যকরভাবে পালনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। প্রায় ৬২,০০০ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে প্রায় ৭৫,০০০ কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করে থাকে, যার মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়োগকৃত (নিজস্ব) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আমলা ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থা থেকে প্রেষণে নিয়োজিত উভয় ধরনের কর্মী রয়েছে। প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মকর্তারা আর্থিক সুবিধা, পদমর্যাদা, পদোন্নতি ইত্যাদি পান না। যার ফলে তাদের মধ্যে অদক্ষতা ও মনোবলে মারাত্মক রকমের ঘাটতি থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় ও স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন কর্তৃক জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অংশীজনদের সাথে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান সার্ভিস কাঠামোর বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হল কর্মীর ঘাটতি, দক্ষ জনবলের অভাব এবং কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা ও অসন্তুষ্টি।

কমিশনের সাথে অংশীজনদের পরামর্শ সভায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর অর্পিত কার্য সম্পাদনে দক্ষতা এবং কার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে মানব সম্পদের অভাবকে তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে, ১৯৯৭ ও ২০০৭ সালে গঠিত পূর্ববর্তী স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিটি/কমিশনগুলোও স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মানব সম্পদের অভাবকে একটি অন্যতম বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং একটি ‘স্থানীয় সরকার সার্ভিস’ গঠনের সুপারিশ করেছিলেন।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোত মানব সম্পদের ঘাটতি অনেক বেশি প্রকট। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আবার ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) এবং

উপজেলা পরিষদে তাদের নির্ধারিত কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের তীব্র অভাব রয়েছে। উভয়েরই খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিষেবা প্রদানের জন্য কোনো কর্মীই নেই। সাধারণত, উপজেলা পরিষদের কর্মীদের মধ্যে কেবল মুষ্টিমেয় নিম্ন স্তরের সহায়তা কর্মী (এমএলএসএস) থাকে, যেমন: চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহকারী এবং ড্রাইভার। উপজেলা পরিষদের কোনো হিসাবরক্ষণ কর্মী নেই, কারণ সমস্ত অর্থ একক ট্রেজারি সিস্টেম ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সিএন্ডএজি অফিসসের উপজেলা স্তরের কর্মীদের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয়।

অন্যান্য গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন ইউপি ও উপজেলা পরিষদের মত জেলা পরিষদে কোনো সরকারি বিভাগ হস্তান্তরযোগ্য বা হস্তান্তরিত হয়নি। পরিষদে একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সাধারণত সিইও বলা হয়) এবং চেয়ারপারসনের সচিব থাকেন, যারা স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) দ্বারা নিযুক্ত এবং বেতনভুক্ত হন। সাধারণত, একটি জেলা পরিষদে দুটি বিভাগ থাকে: একটি প্রশাসনিক এবং অন্যটি কারিগরি বিভাগ। সাধারণত, প্রশাসনিক বিভাগে একজন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও অনেক অফিসস সহাকারী বা নিম্নস্তরের কর্মী থাকেন যারা প্রশাসন ও হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে, একজন সহকারী প্রকৌশলী কারিগরি বিভাগের প্রধান হন, যাকে সহায়তা করার জন্য একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী থাকেন। ফলে, জেলা পরিষদের কর্মী সংখ্যা সীমিত, কারণ সব কারিগরি কর্মী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জেলা অফিসসেই সাধারনত পদায়িত হয়।

ইউপি ও উপজেলা পরিষদের পরিস্থিতির বিপরীতে, পৌরসভার কার্যকর পরিষেবা প্রদানের জন্য মানসম্মত সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে। পৌরসভার প্রতিটি শ্রেণীর (ক, খ, গ) জন্য একই রকম সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে, এখানে একমাত্র পার্থক্য হল কর্মী সংখ্যা। সব পৌরসভার প্রশাসনিক বিভাগে একটি শিক্ষা বিভাগও রয়েছে; একটি প্রকৌশল বিভাগ যা পানি সরবরাহের পাশাপাশি নগর অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, সড়ক বাতি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত; এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য একটি বিভাগ রয়েছে যার মধ্যে স্যানিটেশন ও কসাইখানা পরিদর্শক, টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক এবং রাস্তা পরিষ্কার পরিছন্নতা তত্ত্বাবধায়ক থাকেন। এই বিভাগগুলোতে প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং নগর পরিকল্পনাবিদ এর মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি পদও রয়েছে। ইউপি ও উপজেলা পরিষদের বিপরীতে, পৌরসভাগুলোতে একটি হিসাব বিভাগ, কর নির্ধারণকারীর পাশাপাশি কর আদায় বিভাগও রয়েছে। 'ক' শ্রেণির পৌরসভার জন্য কমপক্ষে ১৫৬ জন, 'খ' শ্রেণির জন্য প্রায় ৯০ জন এবং 'গ' শ্রেণির জন্য ৬৯ জন কর্মী রয়েছে। স্থায়ী পদগুলোর অনেকগুলো তুলনামূলকভাবে নিম্ন-স্তরের অদক্ষ কর্মী। কিন্তু বেশির ভাগ পৌরসভায় আর্থিক সংকটের কারণে অনেক পদ শূন্য থাকে। পদোন্নতি ও অবসর সুবিধা কম থাকার কারণে নিয়োগের জন্য সঠিক দক্ষতা সম্পন্ন জনবল পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনগুলোকে অর্পিত দীর্ঘ দায়িত্বের তালিকা দেওয়া হয় এবং এতে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের কর্মী সংখ্যা তাদের আকার-আয়তন আর্থিক সক্ষমতা ও জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। তবে, বিভিন্ন গবেষণায় সিটি কর্পোরেশনগুলোতেও মানব সম্পদের ঘাটতির কথা উল্লেখ রয়েছে।

নিচের সারণিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান কর্মী ও তাদের প্রধান কার্যাবলি ও দায়িত্বের তুলনা করা হয়েছে।

সারণি ১৩.১: বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অর্পিত কার্যাবলির তুলনায় মানবসম্পদ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	কার্যাবলি ও দায়িত্ব	বিদ্যমান মানবসম্পদ
জেলা পরিষদ	রেজিস্ট্রি ও প্রশাসন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, মৌলিক সেবা প্রদান, জনসাধারণের স্থান/জনসাধারণের ইউটিলিটি ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো ও টেকসই স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন (এলইডি), সমাজকল্যাণ, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রম।	মোট: ২২ জন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কারিগরি শাখা মোট ৮ জন ১ জন সহকারী প্রকৌশলী, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ১ জন সার্ভেয়ার, ১ জন আপার ডিভিশন ক্লার্ক, ১ জন লোয়ার ডিভিশন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	কার্যাবলি ও দায়িত্ব	বিদ্যমান মানবসম্পদ
		ক্লার্ক কাম স্টেনোটাইপিস্ট, ১ জন ইলেকট্রিশিয়ান, ২ জন এমএলএসএস। প্রশাসনিক শাখা: মোট ১৩ জন। ১ জন সচিব, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১ জন প্রধান সচিব, ১ জন আপার ডিভিশন ক্লার্ক, ১ জন হিসাবরক্ষক, ১ জন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক কাম স্টেনোটাইপিস্ট, ১ জন ড্রাইভার, ১ জন মেশিন অপারেটর, ১ জন প্রহরী, ১ জন পিয়ন, ২ জন এমএলএসএস, ১ জন ঝড়ুদার
উপজেলা পরিষদ	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিভিন্ন সরকারি বিভাগের কর্মসূচির তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় এবং ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিতকরণ, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ উন্নতকরণ, শিক্ষার প্রচার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সহায়তা প্রদান। শিল্প, এবং কৃষি ও পরিবেশগত উদ্যোগ বৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সমাজকল্যাণ কর্মসূচি সহজতর করা এবং ই-গভর্নেন্সকে উৎসাহিত করা।	মোট: ৭ (১ জন অফিস সহকারী, ১ জন কম্পিউটার অপারেটর, ১ জন ড্রাইভার, ২ জন এমএলএসএস, ১ জন ঝাড়ুদার, ১ জন মালী)
ইউনিয়ন পরিষদ	আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা; রেজিস্ট্রি কার্যাবলি (জন্ম, জাতীয়তা এবং মৃত্যুর জন্য সনদ প্রদান); নিয়ন্ত্রক কার্যাবলি (যা জনগণকে কী করতে দেওয়া হবে) পাবলিক স্পেস পরিচালনা (রাস্তার আলো, আবর্জনা অপসারণ, এবং কবরস্থান ও অন্যান্য পাবলিক স্পেস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ)	১ জন কর্মী: ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১ জন সহকারী হিসাবরক্ষক কাম কম্পিউটার অপারেটর (AACO) ১০ গ্রাম পুলিশ
পৌরসভা	পৌরসভাগুলোতে প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে যার মধ্যে একটি শিক্ষা বিভাগ; একটি প্রকৌশল বিভাগ যা পানি সরবরাহের পাশাপাশি নগর অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, রাস্তার আলো ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা; এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য একটি বিভাগ, যার মধ্যে রয়েছে স্যানিটেশন এবং কসাইখানা পরিদর্শন, টিকাদান তত্ত্বাবধান, রাস্তা পরিষ্কারের তত্ত্বাবধায়ক।	**শ্রেণি 'ক': ১৫৬** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌশল বিভাগ: (৬৮) প্রশাসনিক বিভাগ: ৫৪ স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও সংরক্ষণ বিভাগ (৩৩) **শ্রেণি 'খ': ৯০** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌশল বিভাগ: (৩২) প্রশাসনিক বিভাগ: ৩৫ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও সংরক্ষণ বিভাগ (২২) **শ্রেণি 'গ': ৬৯** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌশল বিভাগ: (২৭) প্রশাসনিক বিভাগ: ২৬ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও সংরক্ষণ বিভাগ (১৬)৫
সিটি কর্পোরেশন	সিটি কর্পোরেশনগুলোকে দীর্ঘ কার্যাবলি প্রদান করা হয় যার মধ্যে রয়েছে গণপূর্ত (রাস্তাঘাট, কালভার্ট ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি); জননিরাপত্তা (অগ্নিনির্বাপণ, রাস্তার আলো ইত্যাদি), জনস্বাস্থ্য (পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্যানিটেশন ইত্যাদি); জনকল্যাণ (শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদির জন্য গণ অবকাঠামো); উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (নগর পরিকল্পনা এবং বাণিজ্যিক বাজারের উন্নয়ন ইত্যাদি); এবং নিয়ন্ত্রণ (আইন দ্বারা ভবন নির্মাণ, সরকারি জমি দখল ইত্যাদি)	১২টি সিটি কর্পোরেশনে সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার পদ রয়েছে।

জনবলের অভাব ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর তাদের ওপর অর্পিত কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতারও (যেমন, প্রকৌশল, স্থানীয় পরিকল্পনা ও বাজেট, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন) তীব্র অভাব রয়েছে। সিপিডি'র একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে দক্ষ মানব সম্পদের অভাব এমন একটি বিষয় যা স্থানীয় সরকারের কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে[৪৭]। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রচুর অর্থায়নে অসংখ্য প্রকল্প গ্রহণ করে, কিন্তু প্রায়শই প্রকল্পগুলো সময়মতো সম্পন্ন করতে বাধার সম্মুখীন হয়[৪৮]। অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে দক্ষ কর্মীর অভাব এ ব্যর্থতার অন্যতম একটি কারণ। উদাহরণস্বরূপ, ইউপিগুলোতে কারিগরি ও প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ কর্মীর অভাব রয়েছে, যার কারণে তাদের পর্যাপ্তভাবে বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সঠিক রেকর্ড বজায় রাখা, উন্নয়ন প্রকল্প পর্যবেক্ষণ এবং নথি ডিজিটালাইজেশন করা সম্ভব হয় না। যদিও জেলা পরিষদ প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তবুও সেখানে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কারিগরি মানব সম্পদের অভাব রয়েছে। উপজেলা পরিষদের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন কোন কর্মকর্তা নেই। উপজেলা পরিষদ প্রেষণে নিয়োজিত ১৭টি সরকারি দপ্তরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এখানে প্রেষণ নীতি সঠিকভাবে কার্যকর নয়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিযুক্ত কর্মীরা পদোন্নতির সুযোগ ও আর্থিক এবং অন্যান্য সুবিধার অভাবে মনোবলহীনতা ও কর্ম অসন্তুষ্টিতে ভোগেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মীরা সারা কর্মজীবন জুড়ে তাদের প্রাথমিক পদে সীমাবদ্ধ থাকেন, পদসোপান না থাকার কারণে উর্ধ্বমুখী পদোন্নতির কোন সুযোগ পান না। কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির (Career progression) সম্ভাবনা ও পর্যাপ্ত প্রণোদনা ছাড়াই তারা প্রায়শঃ স্থবির এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। ফলে তাদের মধ্যে উৎসাহ, কর্ম সন্তুষ্টি হ্রাস পায় এতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সামগ্রিক দক্ষতা এবং কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

২. স্থানীয় সরকার সার্ভিস: ভবিষ্যত পরিকল্পনা

২.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কর্মীবাহিনীর ঘাটতিপুরণ, দক্ষ ও কারিগরি কর্মীর সমাবেশ ঘটানো এবং কর্মীদের মধ্যে সঠিক নৈতিক মনোবল সৃষ্টি ও সঠিক কর্মপ্রণোদনার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মানব সম্পদ কাঠামোকে শক্তিশালী ও কার্যকর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে, কমিশন স্থানীয় সরকারের জন্য একটি সুগঠিত 'সার্ভিস' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে, যা "স্থানীয় সরকার সার্ভিস" নামে অভিহিত হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে সারা বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলায় মতামত গ্রহণের জন্য ৪৬,০৮০ খানার ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সমন্বিত সার্ভিস কাঠামো (স্থানীয় সরকার সার্ভিস) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৪.৫ শতাংশ) উত্তরদাতা।

---

[৪৭] Bhattacharya,D. Monem, M. and Rezwana S. (2013) *Finance for Local Government in Bangladesh: An Elusive Agenda.* Dhaka: Centre for Policy Dialogue.

[৪৮] Jabbar, A. (2024) 'Delays in Local Government Development Projects in Bangladesh: Causes and Impacts', *Bangladesh Journal of Administration Management*, Volume 37 (1).

সারণি ১৩.২: স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৬৩.২	২৭.৮	৮.৩	০.৭	১০০.০
শহর	৬৭.২	২৬.৬	৫.৫	০.৮	১০০.০
মোট	**৬৪.৫**	**২৭.৪**	**৭.৪**	**০.৭**	**১০০.০**

২.২ স্থানীয় সরকার সার্ভিস

প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার নিজস্ব কর্মীদের মধ্যে বৈষম্য কমাতে এবং স্থানীয় সরকার কর্মীদের মনোবল ও গতিশীলতা বৃদ্ধির করার জন্য, একটি নিবেদিতপ্রাণ স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এই সার্ভিসে বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী থাকবে এবং একই সাথে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের বিদ্যমান কর্মীদের একীভূত করা সম্ভব হবে। এই বিশেষায়িত সার্ভিসকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো টেকসই কর্মকাঠামো, পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার এবং সকল কর্মীর জন্য ন্যায়সঙ্গত সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে। বর্তমানে বিদ্যমান গ্রাম (ইউপি) ও শহর (পৌরসভা) পুলিশের সদস্যদের একটি নির্দিষ্ট বেতন স্কেলের অধীন "স্থানীয় সরকার সার্ভিস" এর সাথে একীভূত করা প্রয়োজন হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার (মানবসম্পদ) মধ্যে কর্মরত একজন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (এআইজি) পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তা স্থানীয় সরকারের অধিনে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের (নবগঠিত বা প্রস্তাবিত 'স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান' বিভাগ) একটি বিশেষ শাখা দ্বারা 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' পরিচালিত হতে পারে, যাকে 'কর্মী'/'মানবসম্পদ' শাখা বলা যেতে পারে এবং এর ফলে এই শাখাটি স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রীয় কর্মী ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

প্রস্তাবিত 'স্থানীয় সরকার কমিশন' স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) সহায়তায় স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় পদ, কর্মকর্তা এবং কর্মী নিয়োগের জন্য একটি চাহিদা মূল্যায়ন করবে যা পরবর্তীতে "স্থানীয় সরকার সার্ভিস"-এ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অধিকন্তু, এ সার্ভিসের নিয়োগ, পদোন্নতি, শাস্তি এবং পুরস্কার, সেই সাথে অবসরকালীন সুবিধা নিয়ন্ত্রণকারী নীতি ও বিধিমালা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রণয়ন করবে। প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কমিশন ও মন্ত্রণালয় পরস্পরের যৌথ উদ্যোগে পুরো কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

বর্তমানে বিদ্যমান ইউপি ও পৌরসভার এলাকার গ্রাম ও পৌর পুলিশ সদস্যদের একটি নির্দিষ্ট বেতন স্কেলের অধীনে "স্থানীয় সরকার সার্ভিস"-এর সাথে একীভূত করা হবে। গ্রাম ও শহর পুলিশ সম্পূর্ণরূপে সংগঠিত হয়ে গেলে, "কমিউনিটি পুলিশ" নামে পরিচিত বাহিনীটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হতে পারে।

স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তায় স্থানীয় সরকার কমিশন একটি উপযুক্ত আইনি কাঠামো তৈরি করবে। এ নতুন কাঠামোর অধীনে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হবে।

মহল্লাদার/দফাদার গ্রাম পুলিশগণের
দায়ের করা চাকুরি সংক্রান্ত মামলার কিছু উদ্ধৃতি

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)
রীট পিটিশন নং ১৭২৫৮/২০১৭

লাল মিয়া ও অন্যান্য

………. দরখাস্তকারীগণ।

-বনাম-

বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য

………. প্রতিপক্ষগণ।

দফাদার ও মহল্লাদারদের জাতীয় বেতন স্কেল প্রদানে বিগত ইংরেজী ০৯.০৭.২০০৮ তারিখ প্রদত্ত সরকারের অঙ্গীকারঃ

সরকার ও গ্রাম পুলিশ আলোচনা অন্তে বিগত ইংরেজী ০৯.০৭.২০০৮ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ গ্রাম পুলিশ তথা দফাদার মহল্লাদারগণের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সমস্কেল প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। অতঃপর বিগত ইংরেজী ০৫.০৮.২০০৮ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজাদি সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে প্রেরন করে। অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণকে সহ সকল মহল্লাদার ও দফাদারগণ সরকারি কর্মচারী হিসেবে জাতীয় বেতন স্কেলে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ তথা সরকার বিগত ইংরেজী ২০০৮ সনে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সে হিসেবে সকল দফাদার, মহল্লাদারগণ ২০০৮ সাল থেকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে তথা ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী হিসেবে গণ্য হয়ে সকল সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার হকদার।

এমনকি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ সকল মহল্লাদার ও দফাদারদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী গণ্য করে তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতির পদ্ধতি এবং তাদের বেতন ও ভাতা জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর আলোকে নির্ধারণ করে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১০ প্রনয়ন করে খসড়া প্রজ্ঞাপণ প্রস্তুত পূর্বক ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করে সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০১০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবগত করানো হয়। যা পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১১ হিসেবে এস.আর.ও নং-১৩৯-আইন/২০১১, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১নং আইন) এর ধারা:৯৬ এর দফা (৬) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রণয়ন করে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৯ জৈষ্ঠ্য ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/০২ জুন ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করে।

অর্থাৎ উক্ত দিন তথা ০২ জুন ২০১১ হতে আইনগত ভাবেই ইউনিয়ন পরিষদের সকল মহল্লাদার ও দফাদারগণ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী হিসেবে গণ্য হয়ে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর আওতাভূক্ত হন। অর্থাৎ অত্র দরখাস্তকারীগণ আইনগত ভাবে উক্ত তারিখ হতে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী এবং জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর অন্তর্ভূক্ত হন।

এমনকি এক অবস্থায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনী গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫ কেন প্রণয়ন করা হলো তা বোধগম্য নয়। রহস্যজনক ভাবে প্রতিপক্ষগণ বিগত ইংরেজী ০৫.০৮.২০০৮ তারিখের তাঁদেরই সিদ্ধান্ত ও অঙ্গীকার এবং পরবর্তীতে বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০১০ তারিখের পত্রের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিরবতা পালন করেন। এমনকি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী বিধিমালা, ২০১১ মোতাবেক মহল্লাদার ও দফাদারগণ কারা, সে বিষয়ে প্রতিপক্ষগণ কোন বক্তব্য প্রদান করেন নাই।

সাধারন মানুষের সবচেয়ে নিকটতম, সবচেয়ে আপন, বন্ধু, আত্মীয়ের মত প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীগণ হলো মহল্লাদার এবং দফাদারগণ। বিপদে আপদে, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাংলার সাধারন মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে সবচেয়ে কাছের সরকারী কর্মচারীটি হল মহল্লাদার এবং দফাদারগণ। দূর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার কাকে বলে এরা জানে না। সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েও জনগণকে বেশী সেবা প্রদানকারী সরকারী কর্মচারী। সহজ, সরল ও নিরহংকারী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর প্রতীক এই দফাদার ও মহল্লাদারগণ।

স্থানীয় সরকার বিভাগ যেখানে মহল্লাদার ও দফাদারগণের সহিত আলাপ আলোচনা করে তাদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভূক্তকরণ বিষয়টি সংশ্লিষ্টতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মহল্লাদার দফাদারগণের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে ২০০৮ সালে এবং উক্ত অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে বিধিমালা ২০১১ করে যেটির চুড়ান্ত আইনীরুপ প্রদান করা হলো। অথচ তা কেনো বাস্তবায়ন হলো না সে ব্যাপারে প্রতিপক্ষগণ নিরব। দীর্ঘদিনের আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে যে বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হল তা কার্যকরী না করে বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন বেআইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত।

রাষ্ট্র নিজের আইন নিজে মেনে চলবে। রাষ্ট্র কখনও নিজের প্রণীত আইন ও বিধি ভংগ করবে না। আইন সকলের জন্য সমান। রাস্ট্র ও নাগরিকের কোন পার্থক্য নাই। আইন মোতোবেক চলা যেমনি নাগরিকের জন্য কর্তব্য তেমনি রাস্ট্রের জন্যও তা সমভাবে প্রযোজ্য। আইন মানা না মানার ক্ষেত্রে রাস্ট্র নাগরিকের থেকে কোন অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে না। এটাই আইনের শাসন। বর্তমান মোকদ্দমায় রাস্ট্র নিজের প্রণীত বিধিমালা ২০১১ ভংগ করে দরখাস্তকারীগণকে সহ বাংলাদেশের সকল মহল্লাদার ও দফাদারগণকে তার আইনত প্রাপ্যতা থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করে আসছে।

যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ চাকুরী বিধিমালা ২০১১ মোতাবেক দরখাস্তকারীগণসহ সকল দফাদার ও মহল্লাদার জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ এর আওতাভূক্ত সেখানে তাদেরকে জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভূক্ত না করা। স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) চাকুরী বিধিমালা ২০১১ এর পরিপন্থী।

নিয়োগ
স্থানীয় সরকার সার্ভিস মূলত নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত হবে। ক্যাডার পদের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এই সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বিসিএস পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ এবং নন-ক্যাডার পদের জন্য বিবেচিত প্রার্থীদের মধ্য থেকে স্থানীয় সরকার সার্ভিসে নিয়োগ করা হবে। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে সরকার নির্ধারিত পন্থায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/উইং কর্তৃক তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের নিয়োগ করা হবে।

প্রয়োজনের ভিত্তিতে 'স্থানীয় সরকার কমিশন' বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য পদ সৃষ্টির সুপারিশ করতে পারে এবং সরকার তা বিবেচনা করতে পারে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে প্রেষণের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে, সময়ের সাথে সাথে, প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তার সংখ্যা হ্রাস করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো (যেমন, সিইও) সাভির্সের মধ্যে থাকা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে পূরণ করা হবে। এ স্থানান্তর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরিতে স্থানীয় শাসনে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

পদসোপান,পেশাগত গতিশীলতা ও পদোন্নতি
স্থানীয় সরকার পরিষেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের কর্মীদের পদোন্নতি এবং অভ্যন্তরীণ পেশাগত কাজে গতিশীলতা আসবে। এতে করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে আরও নিজস্ব দক্ষ এবং গতিশীল কর্মীবাহিনী তৈরি হবে।

এই সার্ভিসে কর্মীদের জন্য পেশাগত গতিশীলতা ও পদসমূহ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন জুড়ে বিস্তৃত হবে। গ্রামীণ ও নগর এলাকার মধ্যে অথবা সমমানের পদে নিম্ন ও উচ্চ স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর্মী স্থানান্তরে বদলী, পদায়ন ও পদোন্নতির সুযোগ থাকবে। একই গ্রেডের কর্মীদের ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উচ্চতর স্তরে, যেমন উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, অথবা সিটি কর্পোরেশনে স্থানান্তরও করা যেতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে একইভাবে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও জেলা পরিষদ থেকে নিচের দিকের কর্মী বদলি বা পদায়ন হতে পারবে। শূন্যপদ, যোগ্যতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে, এই কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ তৃতীয় গ্রেড পর্যন্ত পদোন্নতি দেওয়া যেতে পারে।

বেতন প্রদান
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের (বেতন এবং পেনশন সুবিধা) প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে একটি 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস তহবিল' প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই) তার প্রাসঙ্গিক আইন দ্বারা নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ এই তহবিলে জমা রাখতে বাধ্য করা হবে। তহবিলের কমপক্ষে ৭০ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রদান করবে এবং বাকি অংশ সরকার প্রদান করবে। সরকার এই তহবিল থেকে স্থানীয় সরকার সার্ভিসের কর্মীদের বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা (অবসর) প্রদানের একটি মানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করবে। পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদ নিজস্ব কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন ভাতা এখনও নিজস্ব তহবিল থেকেই দিয়ে থাকে। এই অর্থ এখন সরকারের স্থানীয় সরকার সার্ভিস তহবিলে জমা হবে। সরকারের দায়িত্ব হবে রাজস্ব খাতের কর্মীর নিয়মে এ সার্ভিসের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা এবং স্থানীয় কর্মী ব্যবস্থাপনার উপর নজরদারি করা।

অবসর সুবিধা
স্থানীয় সরকার সার্ভিসের কর্মীরা গ্র্যাচুইটি, ভবিষ্য তহবিল বা পেনশনের মাধ্যমে (যা যেখানে প্রযোজ্য) অবসর সুবিধা পাবেন। তাদের আর্থিক নিরাপত্তা ও বৃহত্তর সরকারি রাজস্ব খাতের কর্মচারীর সুবিধার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত সরকারের পেনশন প্রকল্পে তালিকাভুক্ত করা হবে। এ জন্য নিয়মানুযায়ী বেতন থেকে নির্দিষ্ট হারে অর্থ কর্তনযোগ্য হবে।

আইনি কাঠামো

প্রস্তাবিত 'স্থানীয় সরকার কমিশন' নিয়োগ, পদোন্নতি, শাস্তি, পুরস্কার এবং অবসরকালীন সুবিধা সম্পর্কিত নিয়ম ও নীতি প্রণয়ন করবে। এই বিধিগুলো "স্থানীয় সরকার সার্ভিস বিধিমালা" হিসেবে বিবেচিত হবে। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ২৪ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৬৩ এর অধীনে প্রণীত উপজেলা পরিষদ কর্মী (সার্ভিস) বিধি, ২০১০ এ কাঠামোর জন্য একটি রেফারেন্স হিসেবে কাজ করতে পারে।

২.৩ "স্থানীয় সরকার সার্ভিস" এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত স্থানীয় সরকারের নিজস্ব কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় সংস্থাগুলোর (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ) সরকারি বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও প্রেষণকালে এ সার্ভিসের অধীনে থাকবে। তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়নে বিভাগীয় নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। তবে প্রেষণে থাকা কর্মকর্তা/কর্মচারিদের তত্ত্বাবধান স্ব স্ব পরিষদ করলেও তাদের চাকুরি প্রচলিত সরকারি নিয়মানুযায়ী চলবে।
ইউপি ও উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা (যারা কর্মস্থলে আছেন), তারা তাদের কার্যাবলি এবং তহবিল সহ স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট স্তরের এখতিয়ারে থাকবে। তদনুসারে, উপজেলা পরিষদে নিযুক্ত ১৭টি বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এবং ইউনিয়ন পরিষদে নিযুক্ত ৭টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৩টি বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণ করে তাদের নিজ নিজ স্থানীয় সরকার স্তরের কর্মী হিসেবে কাজ করবেন।

তবে, তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, শাস্তি এবং পুরস্কার তাদের মূল বিভাগের সার্ভিস বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রতিটি স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রধান তাদের বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন (Annual Performance Report) প্রস্তুত করবেন, যা তাদের অফিসসিয়াল ক্যারিয়ারের রেকর্ডের অংশ হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে এবং ভবিষ্যতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
সমতলের সকল জেলা পরিষদ সংস্কারের আওতায় পুনর্গঠিত হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমতলের জেলা সমূহের জেলা পর্যায়ের অন্তত: ৩০টি সরকারি দপ্তর জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা যেতে পারে। প্রতিবেদনের জেলা পরিষদ অংশে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার সার্ভিস বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃ পর্যালোচনা করে নতুন স্থানীয় সরকার সার্ভিসের বিভিন্ন গ্রেড ও দক্ষ কর্মী সংখ্যা নির্ধারিত হবে। এ সার্ভিসের অতিরিক্ত প্রতিটি প্রশাসনিক এককে কর্মরত সরকারি দপ্তরসমূহে প্রদত্ত কর্ম, নিয়োজিত কর্মী ও বরাদ্দকৃত অর্থ তহবিল সংশ্লিষ্ট পরিষদে স্থানান্তরিত হবে। স্থানীয় সরকার সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত কর্মীগণ ঐ সার্ভিসের নিয়ম অনুসরণ করবে এবং প্রেষণে নিয়োজিত কর্মীগণ প্রেষণকালীণ সময়ে সরকারি নিয়ম এবং প্রেষণের শর্ত অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

দ্বিতীয় অংশ

অধ্যায়-চৌদ্দ

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পুর্নগঠন: মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সরকারি দপ্তর/অধিদপ্তর সমূহের সংস্কার ও স্থানীয় সরকার সংস্থা, সমবায় ও এনজিও কর্মের সংযোগ, সমন্বয় ও পুনর্গঠনের সুপারিশ

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ৪৪টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। স্বাধীনতা পরবর্তী অর্থাৎ ২৯-১২-১৯৭১ খ্রি. তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এ মন্ত্রণালয়টি বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে স্থানীয় সরকার কাঠামোর বিকাশে নীতি প্রণয়ন, সময় সময় সরকারের গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, গ্রাম উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সামষ্টিক উন্নয়ন ও সমবায় কার্যক্রম সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় শূন্যতা হ্রাস এবং নগর সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় দুটি বিভাগ যথা: স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভাগ দুটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কাঠামো ও পরিচালন পরিস্থিতি নিম্নরূপ:

স্থানীয় সরকার বিভাগ

১. স্থানীয় সরকার বিভাগ ‘জন অংশগ্রহণে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা’-র লক্ষ্যে:

- **গ্রাম ও শহরের** অবকাঠামো উন্নয়ন;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সুশাসন সংহতকরণ;
- নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; এবং
- নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি পরিচালনা করছে।

১.১ কার্যবিধিমালা অনুসারে বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে এ বিভাগ নীতি সহায়তা প্রদান এবং আওতাধীন নিম্নবর্ণিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, দপ্তর/সংস্থা পরিচালনের সাথে সম্পৃক্ত:

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	দপ্তর	সংস্থা
সিটি কর্পোরেশন (১২)	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	ঢাকা ওয়াসা
পৌরসভা (৩৩০)	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	চট্টগ্রাম ওয়াসা
জেলা পরিষদ (৬১)	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনষ্টিটিউট	খুলনা ওয়াসা
উপজেলা পরিষদ (৪৯৫)	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দপ্তর	রাজশাহী ওয়াসা
ইউনিয়ন পরিষদ (৪৫৮০)	মশক নিবারণী দপ্তর	

১.২ স্থানীয় সরকার বিভাগের কাঠামোভুক্ত দেশব্যাপী বিস্তৃত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যাদিসহ বর্ণিত দপ্তর/সংস্থা আওতাধীন থাকায় একক মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে এটি সবচেয়ে বড় বিভাগ/মন্ত্রণালয়। বিভাগের দক্ষতা, কার্যক্রম সুসংহত করা, পরিবর্তনশীল চাহিদা ও অগ্রাধিকারের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া, উন্নত স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সর্বোপরি মানসম্মত পরিষেবা নিশ্চিতে বিভাগ ও সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থার পুনর্গঠন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি এবং দুটি প্রকৌশল সংস্থার একীভূতকরণ পুনর্গঠন কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

- পল্লী উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা
- অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয়-বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
- পল্লী উন্নয়নে যুগোপযোগি কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি পরিচালনা করছে।

১.১ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত অভিলক্ষ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহ পরিচালনের সাথে সম্পৃক্ত:

- সমবায় অধিদপ্তর;
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি);
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লা
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া;
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ;
- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ);
- ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ);
- বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্ক ইউনিয়ন);
- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: (বিএসবিএল) এবং
- বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন।
- অধিকন্তু ৩টি সমজাতীয় যথা:-(১) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর (২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর এবং (৩) শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর এর কার্যক্রম পরিচালনার অপেক্ষায় রয়েছে। এক্ষেত্রে পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় সংগঠন একীভূতকরণ, নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা/বিলুপ্তির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

নোট: সামষ্টিক উন্নয়ন (Community Development) বেসরকারি, উন্নয়ন সংস্থা, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ ছোট ছোট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যেগুলো সমাজ সেবা বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানী আইনে নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত তাদের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.২. কার্যপরিধি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এ সিডিউল-১ এ বর্ণিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দপ্তর সংস্থা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত কার্যাদি স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য নির্ধারণ করেছে:

- সকল দপ্তর, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার জন্য আইন-বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্থাপন ও প্রশাসনিক বিষয়াবলি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন;
- সকল দপ্তর/সংস্থার প্রশাসনিক বিষয়াদি, অর্থায়ন এবং এ প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত কর্মসূচি/প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- পল্লী এলাকার ব্রিজ, কালভার্টসহ সড়ক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- গ্রোথ সেন্টার ও অন্যান্য হাট-বাজার উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা;
- শহর ও পল্লী এলাকায় সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা নিরসন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- উপজেলা, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার মাস্টার প্ল্যানের প্রস্তুতি, অনুমোদন এবং সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রদান, তবে সে সকল শহর ব্যতীত যেখানে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে।

** প্রস্তাবিত পুনর্গঠন কার্যক্রমে কার্যবিধিমালায় উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি, অবকাঠামো সেবা সরবরাহে পিপিপি ধারণা এবং প্রকৌশল সার্ভিস ক্যাডার সংক্রান্ত কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্থাপন ও প্রশাসনিক বিষয়াবলি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাদি অনুমোদন করতে হবে।

১.৩. বিভাগের কাঠামো: বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদনে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদিত জনবল কাঠামোর আওতায় ৬টি অনুবিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। এছাড়া ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর, গ্রাম পুলিশ, কমনওয়েলথ স্থানীয় সরকার ফোরাম এবং আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম সংশ্লিষ্ট কার্যাদি এ বিভাগের আওতাধীন এবং রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

অতিরিক্ত সচিবের অনুবিভাগ	প্রশাসন অনুবিভাগ	নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ	উন্নয়ন অনুবিভাগ	পানি সরবরাহ অনুবিভাগ	পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও ম্যল্যায়ন অনুবিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১.২. কার্যপরিধি: বর্ণিত সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা পরিচালনের লক্ষ্যে সরকার কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এ সিডিউল-১ এ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যাদি নির্ধারণ করেছে:

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সমিতি গঠন এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- পল্লী উন্নয়নভিত্তিক নীতিমালা, সমবায় আইন ও বিধি এবং তৎসংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন;
- ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, সমবায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন, সমবায় ব্যাংকিং, সমবায়ী কৃষি খামার সৃষ্টি;
- ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ;
- পল্লী উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরি, সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ;
- প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন কৌশল ও মডেল উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ; এবং
- পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।

** প্রস্তাবিত পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্থাপন ও প্রশাসনিক বিষয়াবলি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন এবং স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর সংক্রান্ত কার্যাদি প্রতিস্থাপিত হবে।

১.৩. বিভাগের কাঠামো: বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুমোদিত জনবল কাঠামোর আওতায় ৩টি অনুবিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে।

প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ	আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ

অনুবিভাগ সমূহের অধীনে ০৫টি অধিশাখা, ১৬টি শাখা, ১টি আইসিটি শাখা এবং ১টি হিসাব কোষ রয়েছে। পুনর্গঠনের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তদারকির জন্য জনপ্রতিষ্ঠান শিরোনামে একটি অনুবিভাগ সৃজন করা প্রয়োজন হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.৪. জনবল: ৬টি অনুবিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিম্নরূপ:

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত (কর্মকর্তা/কর্মচারী)	সংযুক্তিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
১ম শ্রেণী (গ্রেড ১-৯)	৭০	৬১	-
২য় শ্রেণী (গ্রেড ১০)	৬৬	৪৮	-
৩য় শ্রেণী (গ্রেড ১১-১৬)	৫৪	৪৯	২২
৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড ১৭-২০)	৬৬	৫৩	২৫
মোট জনবল	**২৫৬**	**২১১**	**৪৭**

জনবল কাঠামোর আওতায় ৪৭ জন কর্মচারী সংযুক্তিতে নিয়োজিত রয়েছেন। কাজের পরিধির তুলনায় জনবল কম থাকায় এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যা পুনর্গঠনের আওতায় নিরসন করা প্রয়োজন। এছাড়া পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগের জনবল পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন হবে।

১.৫. বাজেট: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দ ৪৯৩৪২ কোটি টাকা (৬.৫%) যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ১০.৪% বেশি। স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যাদি ও কর্মপরিসর বিবেচনায় মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য ৪৫,২০৫,৫৫,০০,০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার দুইশত পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে; তন্মধ্যে পরিচালন বাজেট ৬৩৯৬,৬৭,০০,০০০ (ছয় হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই কোটি সাতষট্টি লক্ষ) টাকা এবং উন্নয়ন বাজেট ৩৮৮০৮,৮৮,০০,০০০ (আটত্রিশ হাজার আটশত আট কোটি আটাশি লক্ষ) টাকা। রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭০০,০০,০০,০০০ (সাতশত কোটি) টাকা। দপ্তর/সংস্থার এবং জনচাহিদা বিবেচনায় সরকার প্রতি বৎসর পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট ক্রমাগত বৃদ্ধি করে আসছে। উল্লেখ্য, উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের হার ৯০-৯৭%।

১.৬ প্রকল্প: স্থানীয় সরকার বিভাগ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) সেবা, শহরে স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সুশাসন উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের কার্যক্রম ও উদ্যোগ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগসহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ২৯১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। (তালিকা সংযুক্ত)

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	মোট প্রকল্প	মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)
স্থানীয় সরকার বিভাগের নিজস্ব প্রকল্প	১২টি	**৫৭৬৬.৬৭৬৮**
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	১১৭টি	**১৭০৯৮৭.৩৯**
• স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮২টি	১৩০৪১৪.১৭
• গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী	৩০টি	৩৪৮৪৭.০৮
• কৃষি (উপখাত: সেচ)	৪টি	৫৬১৯.৩০
• পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ	১টি	১০৬.৮৪
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৪৫টি	**২৪৪৪৫.৫৭**
মোট	**২৯১**	**২০১১৯৯.৬৩৬৮**

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১.৪ জনবল: ৩টি অনুবিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিম্নরূপ:

প্রথম শ্রেণি	৩১	-
দ্বিতীয় শ্রেণি	২৬	-
তৃতীয় শ্রেণি	৩০	১০
চতুর্থ শ্রেণি	৩০	১৪

এ বিভাগের মোট জনবল ১১৭ জন। বিভাগের অধীন ন্যস্তকৃত কার্যাদির ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক জনবল কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, অনুবিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং একটি অধিদপ্তরের জনবল আওতাভুক্ত হবে। এছাড়া সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা হিসেবে যথাক্রমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর আওতায় রাজস্বভুক্ত ৩৪০৬ এবং বিভিন্ন প্রকল্পে ৭৫০০ জনবল এবং সমবায় অধিদপ্তরের ৩৭২৩ জনবল রয়েছে।

** নতুন অনুবিভাগ সৃজন এবং প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল পর্যায়ক্রমে হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন হবে।

১.৫ বাজেট: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের মূল বাজেটে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ১৬৪৫ কোটি ৪৩ লক্ষ (পরিচালন বাজেট ৬৮১ কোটি ও উন্নয়ন বাজেট ৯৬৪ কোটি ৪৩ লক্ষ) টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ১৪৬৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৫ হাজার (পরিচালন বাজেট ৬২১ কোটি ২১ লক্ষ ৫৫ হাজার ও উন্নয়ন বাজেট ৮৪৭ কোটি ২৪ লক্ষ) টাকা যা স্থানীয় সরকার বিভাগের তুলনায় বহুলাংশে কম। এছাড়া পরিচালন বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেটের আয়তন প্রায় সমান, যা সমন্বয়ের প্রয়োজন।

** প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের আওতায় কার্যাদি, জনবল এবং সংস্থা পুনর্বিন্যাসের প্রেক্ষিতে পরিচালন ব্যয় হ্রাস এবং উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধিসহ জনবল হ্রাস ও বাজেটের নতুন খাত সৃজনের প্রয়োজন হবে।

১.৬ প্রকল্প: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন, পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। (তালিকা সংযুক্ত)

	মোট প্রকল্প	মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিজস্ব প্রকল্প	১টি	২৯৯.৯৮
সমবায় অধিদপ্তর	২টি	২১৩.৪৪
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	২টি	১৩১৪.৭৮
পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া	৫টি	৬৮৩.৭৯
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	১টি	১৪৯.০০
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)	১টি	৩৮৭.৪৯

	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	১টি	৫২৯.৬১
	মোট	১৩টি	৩৫৭৮.০৯
স্থানীয় সরকার বিভাগ	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ**		
মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ নয়। এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার পরিপন্থি। পুনর্গঠনের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের নিজস্ব জনবলে ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিজস্ব জনবলে কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন সমীচীন হবে না। প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা ও লজিস্টিক্স দপ্তর/সংস্থায় ন্যস্ত করা প্রয়োজন।			

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ পুনর্গঠনের যৌক্তিকতা ও প্রভাব

২.১ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগ দুটির কিছুকিছু ক্ষেত্রে সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যসম্পাদনে ব্যর্থতা দূরীকরণ, দক্ষতা নিশ্চিত, উল্লেখকৃত কার্যক্রম সুসংহত করা, পরিবর্তনশীল চাহিদা ও অগ্রাধিকারের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া, উন্নত স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সর্বোপরি মানসম্মত পরিষেবা নিশ্চিতে মন্ত্রণালয়টির পুনর্গঠন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সুসংহত ও স্বচ্ছ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে এ মন্ত্রণালয়ের কাঠামোগত এবং পরিচালন বিষয়ে নিম্নরূপ কৌশল, যৌক্তিকতা ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আমলে নেয়া সমীচীন বলে কমিশন বিবেচনা করেছে:

- **দুটি বিভাগের কার্যাদি ও জনবলের ভারসাম্য নিশ্চিত:** পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিভাগ দুটোর কার্যাবলি বা দায়িত্বের দ্বৈততা সনাক্ত করে দুটি বিভাগের কার্যাবলি ও জনবল কাঠামোয় ভারসাম্যতা আনায়ন জরুরি। এছাড়া জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিষ্প্রভ, নিম্নঅগ্রাধিকার এবং দুর্বল অর্থায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান অপরিহার্য মর্মে বিবেচিত হয়েছে। সমবায় দীর্ঘদিন ধরে সরকারের উন্নয়ন কৌশল ও প্রাতিষ্ঠনিক অর্থায়নে যথাযথ মনযোগ পায়নি। জন পরিসরে কার্যকরভাবে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ(এনজিও) এর সাথে অন্যান্য জনসংগঠনের কোন সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয়নি। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও বিভাগ দুটির নাম পরিবর্তনসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের কাঠামোর আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং অন্য সকল প্রতিষ্ঠান যথা সমবায় ও এনজিও এবং এদের পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন।
- **অবচয়ী, দুর্বল ও সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান বিলোপ:** বিভাগ দুটির আওতায় অপচয়ী, দুর্বল এবং সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হ্রাস/বিলুপ্তি ও একীভূতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরস্পর সম্পর্কিত খাত, যেমন নিরাপদ পানি সরবরাহ, নিরাপদ স্যানিটেশন, হাইজিন এবং গ্রামীণ অবকাঠামো (সড়ক, সেতু, কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, বাজার, সেচ অবকাঠামো ইত্যাদি) উন্নয়নে তথা স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দুটি প্রকৌশল সংস্থা একীভূত করা হলে সংগঠনটি কার্যকরভাবে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে এবং সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন, সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি, ক্ষেত্রপর্যায়ে সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সহজ হবে। অনুরুপভাবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও সমবায় অধিদপ্তর একীভূতকরণ এবং উক্ত বিভাগের আওতাধীন ৩টি সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান যথা:-(১) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর (২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর এবং (৩) শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর সমজাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর ব্যবহার সূচক, ভৌত ও আর্থিক কার্যকারিতা ও ফলাফল বিবেচনায় ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। তাদের ভৌত অবকাঠামোসমূহ কীভাবে ব্যবহার হবে তার নীতি হিসেবে বিলুপ্তির নীতিমালা তৈরি হতে পারে। একইভাবে বিআরডিবির পল্লী দরিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন একীভূত করে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবির মধ্যে আত্মীকৃত হতে পারে।

বর্তমান সমবায়ের অর্থায়নের কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নাই। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকসমূহও সমবায়কে ঋনদান করে না। সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমবায় মালিকানার দ্বিতীয় খাত। ১ম খাত সরকারি খাত এবং তৃতীয় খাত বেসরকারি খাত। এ দুই খাতে ব্যাংক রয়েছে। কিন্তু সমবায় খাতে কোন ব্যাংক নাই। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ও জাতীয় সমবায় ব্যাংক নামক দু'টি ক্ষুদ্র পরিসরের ব্যাংক রয়েছে। যা সাধারণ সমবায়ীদের সেবা দিতে পারে না। এ খাতে একটি পূর্ণাঙ্গ তফসিলি বাংক স্থাপন করে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এখানে সরকারের ভূমিকার প্রশ্ন আসবে না। এই বিভাগের উদ্যোগে সমবায়, পল্লী উন্নয়ন সংগঠন ও এনজিওদের অর্থে একটি পূর্ণাঙ্গ তফসিলি ব্যাংক হলে বর্তমানের জাতীয় সমবায় ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রভৃতি এখানে একত্রিভূত (merge) হতে পারে।

- **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ:** পুনর্গঠনের আওতায় বিভাগ দুটির কাঠামো এবং কার্যাবলি সর্বোত্তম করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেবা নিশ্চিত করা জরুরি যা মন্ত্রণালয়কে অধিকতর শক্তিশালী করবে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগের ৬টি অনুবিভাগের মধ্যে পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুবিভাগ। অনুবিভাগের জনবল কাঠামো, কাজের পরিধি এবং কাজের পরিমাণ বিবেচনায় সম্পাদিত কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মী নিয়োগ, সমন্বয় কার্যাদি দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা সরবরাহ, সাফল্য ও দক্ষতাকে বাধাগস্ত করে। এ পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগের কার্যাদি অধিকতর সুসংহত করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত জন প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় শক্তিশালী পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর কার্যাবলির সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি একীভূত করার মাধ্যমে স্থানীয় শাসন কাঠামো সমবায় এবং গ্রামীণ ব্যবস্থার মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ তৈরি করা সম্ভব হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন উদ্যোগের আওতায় এই পুনর্গঠনের ফলে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সহজ হবে।
- **উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও উন্নয়ন অগ্রাধিকার:** মন্ত্রণালয়/বিভাগ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব, দায়িত্বের স্পষ্ট রেখা প্রদানসহ পরিবর্তিত পরিস্থিতি, উন্নয়ন অগ্রাধিকার ও উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অধিকতর মনোনিবেশ প্রদান জরুরি। এক্ষেত্রে বর্তমানে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অধীনে নিবন্ধিত ২৩৩৬টি দেশীয় এবং ২৭৪টি বিদেশী এনজিও কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা সমীচীন। অনন্য জনপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিস্তৃত কার্যক্রম বিশেষভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়-বিচার, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন করছে। এনজিওগুলো দেশব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রশাসনিক এবং পরিচালনাগত চ্যালেঞ্জসমূহের সম্মুখীন হচ্ছে। এ সকল এনজিও কার্যক্রম বহুলাংশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলির এবং পরিষেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রস্তাবিত পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে স্থানীয় সরকারের জনসংগঠন বিভাগে জনবলসহ কার্যাদি স্থানান্তরিত হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে এনজিওসমূহের কার্যকর তদারকি, কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও একীভূত স্থানীয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনার আওতায় এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট বিধিতে এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ অন্তর্ভুক্তির বিধান যুক্ত করা হয়েছে।
- **বিকেন্দ্রীকরণের বিকাশ:** পুনর্গঠনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার বিভাগ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ১২টি ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ ১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ নহে। এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়ের রুলস অফ বিজনেসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পুনর্গঠনের আওতায়

স্থানীয় সরকার বিভাগের নিজস্ব জনবলে ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। অনুরূপভাব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিজস্ব জনবলে কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন সমীচীন হবে না। বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দুটি বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়িত ১৩টি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও লজিস্টিক্‌স দপ্তর/সংস্থায় ন্যস্ত করা প্রয়োজন।

- **কার্যাদির বর্ধিত সমন্বয় ও সহযোগিতা (Enhanced Coordination and Cooperation):** স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়নে নিযুক্ত জনবল কাঠামো পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া ২৯১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাদি নিয়োজিত জনবলের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার বিভাগের জন-অংশগ্রহণে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ব্যহত হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা নিরসন, কার্যকর সমন্বয়ের লক্ষ্যে বর্তমান দুটি বিভাগের কার্যাদি সমন্বয় করার মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন, স্থানীয় শাসন এবং সমবায় কার্যক্রম ও বেরসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে দক্ষ ও উন্নত সমন্বয় করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে প্রকৌশল সংশ্লিষ্ট কার্যাদি এবং স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কার্যাদি প্রস্তাবিত দুটি বিভাগের আওতায় তালিকাভুক্ত করা হলে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন উদ্যোগের কার্যকর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করা সহজ হবে।
- **সুবিন্যস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Streamlined Decision Making):** মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুটি বিভাগের কার্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ কর্মবিভাজন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক বিলম্ব হ্রাস এবং কার্যকর ক্ষেত্রে (Functional Area) অনুভূত চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধানে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- **সামগ্রিক উন্নয়ন পদ্ধতি (Holistic Development Approach):** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, এবং সমবায় প্রায়ই আন্তঃসংযুক্ত বিষয়। স্থানীয় সরকার গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় অত্যাবশ্যক। এজন্য জনপ্রতিষ্ঠান ও সমবায় কার্যাদি একটি বিভাগের আওতায় ন্যস্ত করা হলে এ সংক্রান্ত নীতি-সহায়তা প্রদান এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।
- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর (এনিজিও) বিপুল কর্মকান্ড ও অর্থায়নে এ বিভাগের মূল কর্মকান্ড ও বাজেটে বেসরকারি অবদান হিসেবে স্বীকৃত হবার সুযোগ পাবে। বর্তমানে তা কোথাও প্রতিফলিত হয় না।
- সরকারি কোন বিভাগ ও সংস্থা সরাসরি কোন ঋণ কার্যক্রমে যুক্ত হবে না। সমবায়, এনজিও, এমএফআই এবং সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের নবগঠিত তফসিলি ব্যাংক এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও মাঝারী ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সাধারণ ব্যাংক ঋণ পরিশোধে যেমন আইনী বাধ্যকাধকতা রয়েছে, সমবায়, এনজিও, এমএফআই এর ঋণ অনুরূপ আইনের সুরক্ষা লাভ করবে। এ বিশেষ ব্যাংক পিকে এস এফ এর মত সমবায়কে ব্যবস্থাপনাগত সহায়তাও প্রদান করবে। ক্ষেত্র বিসেষে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে সমিতিগুলো এজেন্ট ব্যাংক হিসাবে কাজ করবে। নেদারল্যান্ডের রাবো ব্যাংক ও সুইজারল্যান্ডের ব্যাংক রাইফিসান এর উজ্জল দৃষ্টান্ত হতে পারে।
- **যৌক্তিক সম্পদ বরাদ্দ ও বিতরণ (Better Resource Allocation):** স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য ৪৫,২০৫,৫৫,০০,০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার দুইশত পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকা এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের জন্য ১৬৪৫ কোটি ৪৩ লক্ষ (পরিচালন বাজেট ৬৮১ কোটি ও উন্নয়ন বাজেট ৯৬৪ কোটি ৪৩ লক্ষ) টাকা ২০২৪ -২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়েছে। দুটি বিভাগের কার্যাদি, জনবল-এর ভারসাম্যের পাশাপাশি পরিচালন খাতে অর্থ বরাদ্দ হ্রাস এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ বিবেচনা করে বিভাগ পুনর্গঠন তরান্বিত করা জরুরি। উল্লেখ্য, এর ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অর্থ বরাদ্দসহ স্থানীয় সরকার প্রকল্প, গ্রামীণ উন্নয়ন উদ্যোগ এবং সমবায় উদ্যোগগুলোতে আর্থিক এবং মানব সম্পদ দক্ষতার সাথে বিতরণ ও পরিবীক্ষণ সহজ হবে।
- **উন্নত দায়বদ্ধতা এবং পরিবীক্ষণ (Improved Accountibility and Monitoring):** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভুক্ত। এ কার্যক্রম শক্তিশালী করার

জন্য পৃথক অধিদপ্তর গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি একক বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচিগুলোর কার্যকারিতা নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ পুনর্গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, উন্নয়ন উদ্যোগের প্রভাব এবং ফলাফলের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে দায়বদ্ধ করা সহজ হবে।

- **ব্যয় দক্ষতা বৃদ্ধি (Cost Efficiency):** বিভাগসমূহের দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের ব্যয় হ্রাসে সহায়ক। মন্ত্রণালয়ের আওতায় দুটি বিভাগের কার্যাদির ভারসাম্যতা প্রশাসনিক কার্যাবলি সুসংহত করার পাশাপাশি কার্যক্রমের দ্বৈততা হ্রাস এবং ওভারহেড খরচ কমিয়ে সরকারের বিপুল ব্যয় সাশ্রয়ে সহায়ক হবে।
- **নীতি সামঞ্জস্যকরণ (Policy Alignment):** স্থানীয় শাসন, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় সম্পর্কিত বিদ্যমান নীতি ও কৌশল কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য নীতি সামঞ্জস্যকরণের লক্ষ্যে দুটি বিভাগের কার্যাদি পুনর্গঠন করা জরুরি। উল্লেখ্য, এর মাধ্যমে দারিদ্র্য, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একীভূত পদ্ধতি প্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩. অনুভূত চ্যালেঞ্জসমূহ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুটি বিভাগ তাদের উপর অর্পিত কার্যাবলী বাস্তবায়নে নিম্নেবর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহের সম্মুখিন হচ্ছে:

স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনবল ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা সংকট

স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও আর্থিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় বর্তমান কাঠামোর আওতায় দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩৩১টি পৌরসভা, ৬১টি জেলা পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ এবং ৪৫৭৯টি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসহ অন্যান্য দপ্তর সংস্থা এ বিভাগের আওতাধীন এবং উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহে মোট ৪৫,২০৫,৫৫,০০,০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার দুইশত পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কারণে স্থানীয় সরকার বিভাগ দেশের একক বৃহৎ মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে বিবেচিত এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক, উন্নয়ন ও ক্রয় কার্যক্রম তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কার্যাদি বাস্তবায়ন এবং সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যাদির পরিসর ও ভারসাম্যহীনতা, পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে জনবল ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা সংকট পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হওয়ায় অনেক বিষয় নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। বর্তমান স্থানীয় সরকার বিভাগের কাঠামোতে ৫৪৭৮টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় সংযুক্ত দপ্তরসমূহ ও সংস্থা থাকার পরেও অনেক পরিচালন বিষয়ক সিদ্ধান্ত স্থানীয় সরকারি বিভাগে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় দপ্তর ও সংস্থাসমূহে বিভিন্ন পরিচালন সংক্রান্ত বিষয় নিস্পত্তিতে বিলম্ব হয়। এ কারণে মন্ত্রণালয়ের বিভাগসমূহের কার্যাদি পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন, নতুন দপ্তর সংস্থার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ অনুভূত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বিদ্যমান দপ্তর/সংস্থা একীভূতকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৩.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব আয়/সম্পদ আহরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি

বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার হলো অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। অপর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বাধ্যতামূলক সেবা সরবরাহ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে কার্যকর সম্পদ আহরণ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন এবং তার স্থায়িত্বের সঙ্গে আর্থিক সক্ষমতা নিবিড়ভাবে যুক্ত। স্থানীয় সরকার

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম জনপ্রত্যাশা অনুসারে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে অধিক্ষেত্রে সম্পদ আহরণের পরিধি যৌক্তিকভাবে সম্প্রসারণ ও সম্পদ আহরণ সংশ্লিষ্ট বিধি প্রয়োগের সক্ষমতা চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৩.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আন্তঃসংস্থাসমূহের মধ্যে বাজেট স্থানান্তর ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষভাবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে আর্থিক স্থিতিশীলতা টেকসই করার জন্য বর্ধিত হারে রাজস্ব সংগ্রহ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। চাহিদার আলোকে অর্থ সরবরাহ, আর্থিক সক্ষমতা এবং সরকারি উদ্যোগ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে বাজেট বৈষম্য রয়েছে তা কমিয়ে আনতে প্রেষণে নিয়োজিত বিভাগীয় ও আন্তঃসংস্থাসমূহের মধ্যে অর্থ স্থানান্তর জরুরি। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণের জন্য বাজেট বরাদ্দ, জনবল, যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য সামগ্রী বিভাগীয় কর্মকর্তার পরিবর্তে সরাসরি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে স্থানান্তরিত হবে। বর্তমান অবস্থায় আন্তঃসংস্থাসমূহের বাজেট স্থানান্তর না করা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য দৃশ্যমান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৩.৪ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম কার্যাদি গ্রামীণ ও শহুরে প্রবৃদ্ধি সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং জরুরি পরিষেবা ও সরবরাহ অপরিহার্য। সামাজিক বসবাসের অবস্থাকে সক্ষম, টেকসই ও অভিঘাত সহনশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। ক্ষেত্র পর্যায়ে জনচাহিদা অনুসারে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যে অর্থায়ন করা হয়, তা অপ্রতুল এবং বিনিয়োকৃত অর্থের দৃশ্যমান অব্যবস্থাপনার জন্য প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল না পাওয়া এ বিভাগের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত। এক্ষেত্রে অর্থের অভাবের চেয়েও নীতি কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা অধিকতর দায়ী। যেমন রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট বৃদ্ধি না করে অহেতুক নতুন রচনার অসুস্থ প্রবণতা এক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধক।

৩.৫ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জনঅংশগ্রহণ, ই-গভার্নেন্স, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ও সমবায় কার্যক্রম পরিচালনা, অবকাঠামো, পরিবীক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে সরকারের নির্দেশনা থাকার পরেও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য-প্রযুক্তি অবকাঠামো বিনির্মাণ ও দক্ষ জনবলের অভাবে প্রত্যাশা অনুযায়ী সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বিশেষভাবে প্রত্যন্ত হাওড়, চরাঞ্চল ও অফ-গ্রিড এলাকার ইউনিয়ন/উপজেলা পরিষদে দুর্বল নেটওয়ার্ক, কার্যকর নেতৃত্ব ও জনবলের অভাবে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের আওতায় সেবা প্রদান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

৩.৬ পরিকল্পিত, নিরাপদ ও টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়ন

বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। প্রায় ১৭ কোটি ৯৮ লক্ষ মানুষের এ দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ ভূমির পরিমাণ সীমিত। ভূমির তুলনায় অধিক জনসংখ্যার কারণে দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমি পরিকল্পিতভাবে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিগত কয়েক দশকে সামষ্টিক ও ব্যক্তি প্রয়োজনে দ্রুত গ্রামীণ এলাকার ভূমির রূপান্তর ঘটেছে। অপরিকল্পিত শিল্প কল-কারখানা স্থাপন অথবা রাস্তা-ঘাট নির্মাণের মাধ্যমেও প্রতিনিয়ত ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেণিগত পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে বছরে বছরে মূল্যবান কৃষি ভূমি, জলাশয়, বনভূমি, পাহাড়সহ প্রাকৃতিক সংবেদনশীল এলাকা হারাচ্ছে। এই প্রবণতা আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশের সমন্বিত জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার জন্য কোনো আইন ও নীতিমালা নেই। স্থানীয় সরকারের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের যে আইন আছে তা সঠিকভাবে কার্যকর করার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। এ কারণে পরিকল্পিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিমালার আলোকে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ন করা জরুরি বিষয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কাঠামো ও ভূমি ব্যবহারসহ স্থানীয় পরিকল্পনা না থাকায় নিরাপদ টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত (আঠারতম অধ্যায় ও সংশ্লিষ্ট খসড়া অধ্যাদেশ দেখুন)।

৩.৭ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসন

গ্রামীণ এবং নগর উভয় ক্ষেত্রেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জলাবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট কার্যাদি স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভুক্ত। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন কাউন্সিল) আইন, ২০০৯,স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯, বায়োমেডিকাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০০৮, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় নীতি, ১৯৯৮, জাতীয় ৩R কৌশল ২০১০, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) ২০৩০ অর্জন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কার্যাদি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ। পৌরসভার অর্গানোগ্রামে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জনবল রয়েছে। পৌরসভাগুলোতে ক্রমশ বর্জ্যবাহী গাড়ি, যন্ত্রপাতি স্থাপিত হচ্ছে, কিন্তু সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন এবং বড় শহরগুলোর জলাবদ্ধতা নিরসনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

৩.৮ মহানগরী ও পৌর এলাকায় ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীকে আধুনিক জনবান্ধব নাগরিক সেবা প্রদান এবং শতভাগ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাদিভুক্ত বাধ্যতামূলক নগরসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। স্থানীয় কার্যকর নেতৃত্ব, রাজস্ব আহরণ, জনবল সংকট, আন্তঃসংস্থার সমন্বয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ অনুভূত হয়েছে। এছাড়া নাগরিকদের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের কার্যাদি স্থানীয় পর্যায়ে নিষ্পন্নের ক্ষেত্রে জনবল, প্রযুক্তিগত সমন্বয় এবং শতভাগ জনসহযোগিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

বর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহ সর্বাধিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আওতাভুক্ত বিষয় যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে এবং পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে (অধ্যায় চার এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)।

৩.৯ নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন

অনুভূত চ্যালেঞ্জ

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কাভারেজে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টের পানি সরবরাহ সংক্রান্ত লক্ষ্য বাংলাদেশ অর্জন করেছে। বর্তমানে মৌলিক খাবার পানি সরবরাহের কাভারেজের হার ৯৮%, বাংলাদেশের মৌলিক স্যানিটেশন কাভারেজ ৫৪% এবং মৌলিক হাত ধোয়ার সুবিধার কাভারেজ ৫৮%। দেশব্যাপী বহু পানির পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও, দুর্বল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কারণে এই সমস্ত পানির পয়েন্টের কার্যকারিতা এবং দূষণমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে গড়ে শতকরা ১৩ ভাগের বেশি সরকারি পানি সরবরাহ অবকাঠামো অকার্যকর। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবকাঠামো ও ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলো অকার্যকর ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি টয়লেটের ক্ষেত্রে একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওয়াশ অবকাঠামোসমূহের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও টেকসইকরণে মানসম্মত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) এর জন্য জনবল ও কারিগরি সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃশ্যমান সমস্যা।

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে গ্রামীণ পানি সরবরাহ মূলত ভূগর্ভস্থ উৎস নির্ভর। সুপেয় পানি ছাড়াও ভূগর্ভস্থ পানি কৃষিকাজেরও মূল উৎস। বাংলাদেশে জমিসমূহ ক্রমশ: তিন ফসলি জমিতে রুপান্তরিত হচ্ছে, ভূগর্ভস্থ, কৃষি উৎপাদন বাড়ছে। ফলে পানির স্তর ক্রমশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভ কমছে, পানি উত্তোলনও বাড়ছে। একই সাথে পানি ব্যবস্থা, নীচে নামছে। এই প্রেক্ষিতে একটি দীর্ঘ মেয়াদি টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করেই এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৭ জনের জন্য একটি সরকারি নিরাপদ পানির উৎস রয়েছে এবং পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭ শতাংশ। কিন্তু আর্সেনিক প্রবণ এলাকা, উপকূলীয় এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হচ্ছে। এ সব অঞ্চলে বিশেষত: লবণাক্ততাপ্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলে গ্রামীণ নারীদের এক কলসী পানির জন্য দুই কিলোমিটার হাঁটতে হয় । দেশের অধিকাংশ পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতে বিভিন্ন উদ্যোগ থাকার পরেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাত্র ৭০০ কিলোমিটার পাইপ লাইন স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা নেই এমন উপজেলা পরিষদের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য উপযুক্ত জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা না থাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আশানরূপ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশে খোলা জায়গায় মলত্যাগের হার প্রায় শূন্য। তবুও, স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তেষজনক নয় । এর কারণ দুইটি। প্রথমত: উন্নত স্যানিটেশনের অভাব। অধিকাংশ গ্রামীণ বসতিতে সিঙ্গেল পিট ল্যাট্রিন ব্যবহৃত হচ্ছে। সিঙ্গেল পিট ল্যাট্রিন থেকে চুঁইয়ে যাওয়া পানি গ্রামে খাল, ছোট নদী বা পুকুরের পানি দূষণের অন্যতম উৎস। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর উন্নত স্যানিটেশনের জন্য 'টুইন পিট ল্যাট্রিন' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও গ্রামে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠি, অসচেতনতা ইত্যাদি কারণে এর অগ্রগতি খুবই কম। অন্যদিকে, গ্রামে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় উম্মুক্ত জলাশয়েই লেট্রিনের পয়ঃবর্জ্য ফেলা হচ্ছে। ফলে, শেষ পর্যন্ত বদ্ধ জায়গায় মলত্যাগের সুফল পাওয়া যাচ্ছেনা। এ সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর জরুরি বলে বিবেচনা করা হচ্ছে ।
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, দূষণ প্রতিরোধ এবং জলজ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে জনস্বাস্থ্য, কৃষি উৎপাদনসহ সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকারের উদ্যোগ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বাসযোগ্য দেশ গঠন এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের এ বিষয়ে জরুরি সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং সেইসাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসনের কারণে চলমান সেবা কার্যক্রমের ওপর চাপ তৈরি হচ্ছে, বিশেষ করে নিম্ন-আয়ের কমিউনিটিগুলোতে এ চাপ আরও বেশি সৃষ্টি হচ্ছে।

ওয়াশ পরিষেবা নিশ্চিতকল্পে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত/দুর্গম এলাকাসমূহে (যেমন: উপকূল, বরেন্দ্র ইত্যাদি) **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের** (যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন) এবং স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের জন্য এই সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। এতদ্ব্যতীত, যে কোনো উদ্যোগই (যেমন: স্থাপিত টিউবওয়েল, রিভার অসমোসিস [আর-ও], পন্ড স্যান্ড ফিল্টার [পিওএসএফ] বা অন্য যেকোনো স্থাপনা) সফলজনক এবং স্থায়ী হবে না।

উপোরক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত বাস্তবায়নের সুপারিশ করা যাচ্ছে।

১. ২৮ জুলাই ২০১০-এ জাতিসংঘ ওয়াটার, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (ওয়াশ) পরিষেবাকে মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করে[৪৯]। বাংলাদেশেও ওয়াশ পরিষেবাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে **মানবাধিকার হিসেবে** সাংবিধানিক এবং আইনগত স্বীকৃতি দিতে হবে। ওয়াশ-কে একটি পৃথক সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এই পরিষেবাকে আরো শক্তিশালী এবং সহজলভ্য করার জন্য ওয়াশ এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে একীভূত করে স্থানীয় সরকার, জনসংগঠন ও জনপ্রকৌশল সেবা মন্ত্রণালয় (Ministry of Local Government, People's Institution and Public Services Engineering(MOLGPI & PSE) মন্ত্রণালের অধীনে ভবিষ্যতে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

২. পানির উৎসকে দূষণমুক্ত ও টেকসই করার জন্য নিরাপদ পানি, সমন্বিত **পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা** এবং এযাবৎ সফল উদ্যোগসমূহের প্রসারের জন্য, সরকারি এবং বেসরকারি, উভয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এই ক্ষেত্রে উপকূলীয়, বরেন্দ্র এবং অন্যান্য প্রত্যন্ত/দুর্গম অঞ্চলসমূহের অগ্রাধিকার থাকতে হবে। আর্সেনিক প্রবণ এলাকা, বরেন্দ্র, উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণসহ বিশেষ কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। এসব অঞ্চলে নিরাপদ পানির উৎসের সংকট সমাধানের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি ও সমাধান প্রয়োগ করা প্রয়োজন । এর পাশাপাশি অঞ্চল নির্বিশেষে মিনি পাইপড পানি সরবরাহ, কমিউনিটি পানি সরবরাহ, কমিউনিটি টয়লেট ও পাবলিক টয়লেটের জন্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ সব ক্ষেত্রে ডিপিএইচই এর পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদকেও পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

৩. শহরগুলোতে পরিচালিত **অন-সাইট স্যানিটেশন** পরিষেবাগুলো এবং গ্রামীণ এলাকায় পানি দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি পল্লী এবং প্রত্যন্ত/দুর্গম এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শক্তিশালী করতে হবে।

৪. **স্বাস্থ্যবিধিতে বাজেটের অগ্রাধিকার** ফিরিয়ে আনার এবং শুধুমাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর না করে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ, সমস্ত স্তরের সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি অংশীজনদের সহ একটি মাল্টি-এজেন্সি পদ্ধতিতে স্থানান্তর করতে হবে। নন ষ্টেট এ্যাক্টরদের সম্পৃক্তির যথাযথ সুযোগ ও পরিসর সৃষ্টি করতে হবে।

৫. **নারী, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী** বিশেষ করে প্রত্যন্ত/দূর্গম অঞ্চলসমূহে (যেমন: লবনাক্ত উপকূল, ক্ষরাপ্রবন বরেন্দ্র) বসবাসরত জনগণ যেন তাদের পানি ও স্যানিটেশনের প্রয়োজনে জলবায়ু দ্বারা বিরূপভাবে প্রভাবিত না হয় তার জন্যে এবং তাদের এই পরিষেবাসমূহ সঠিকভাবে প্রদানের জন্য একটি সুচিন্তিত বৈচিত্র্য-কেন্দ্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ নিতে হবে।

৬. বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে **সকল প্রকার বৈষম্য** (যেমন: আন্তঃওয়াসা, আন্তঃনগর কর্পোরেশন এবং গ্রামীণ-শহর) **দূর করে** সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগ এবং তার জন্য বরাদ্দ পর্যালোচনা করে যথাযথ সুপারিশ এবং মনিটরিং সিস্টেম শক্তিশালী করতে হবে।

৭. **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের** (যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন) এবং স্থানীয় প্রশাসনের এই সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে মেকানিকাল ও টেকনিক্যাল দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

বাংলাদেশে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কৃষি জমিতে সেচ প্রদানে ডিজেল চালিত পাম্প ব্যবহার করা হয়। এতে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং তা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি তৈরি করে। আবার বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করা হয় বলে বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প ব্যবহারও পরোক্ষভাবে পরিবেশের ক্ষতি এবং

---

[৪৯] UN General Assembly Resolution A/RES/64/292
https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। বাংলাদেশ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা শীর্ষ দেশগুলোর একটি। কৃষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার এ ঝুঁকি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে (Durham University et al., 2024)। এ কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকায় কৃষি কাজে, বিশেষ করে সেচ প্রদানে তুলনামূলক ব্যয় সাশ্রয়ী সৌর চালিত পাম্প ব্যবহার সম্প্রসারিত করতে পারে। এজন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় করে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ তাদের নিজ নিজ এলাকায় সৌর চালিত সেচ পাম্প ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করবেন। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে অনেকে ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত পাম্প ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে সৌর চালিত পাম্প ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৪. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (পুনর্গঠনের ফলে এ বিভাগের নাম ও কার্যাদি সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনে ক্ষেত্র পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহের সম্মুখীন হয়েছে:

- বিভিন্ন সমবায় সমিতি এবং বিআরডিবি এর আওতাভুক্ত সমিতির ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের কার্যকর বাস্তবায়ন;
- অতি দরিদ্র ও দরিদ্র শ্রেণির একটি বড় অংশকে দারিদ্র্য মুক্তি কার্যক্রমের আওতায় আনা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সঠিক জীবিকায়নে নিয়োজিত করা;
- সৃজিত উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ (Market Linkage) তৈরি; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ও মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

বর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক এবং দক্ষতাকেন্দ্রিক।

৫. মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহ পুনর্গঠন কাঠামো রুপরেখা

৫.১ পুনর্গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: পুনর্গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে জন অংশগ্রহণে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও জনঅংশগ্রহণে টেকসই উন্নয়ন উৎসাহিত করা। এছাড়া পুনর্গঠন কাঠামোর আওতায় নিম্নরুপ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে:

উদ্দেশ্য:

- স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও সেবা প্রদানকে সহজতর করা।
- স্থানীয় সরকার, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী এবং সমবায়ের একীকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকাশ সাধন।
- স্থানীয় সরকার, গ্রামীণ জনগণ এবং সমবায়সহ বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বরাদ্দ উন্নত করা।

৫.২ মন্ত্রণালয়ের শাসন ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরিবর্তন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের (MOLGRDC) পরিবর্তে স্থানীয় সরকার, জনসংগঠন ও জনপ্রকৌশল সেবা মন্ত্রণালয় (Ministry of Local Government, Public Institutions and Public Services Engineering(MOLGPI & PSE) হিসেবে যথাক্রমে নীতি প্রণয়ন, সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধানের জন্য কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ (২ছ) অনুসারে সর্বাধিক প্রশাসনিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। নবসৃজিত মন্ত্রণালয়ের অধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পরিবর্তে বিভাগের নাম **"স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ"** (Local Government and People Institution Division) হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং পুনর্গঠিত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কার্যাদি হিসেবে নিম্নবর্ণিত বিষয় বিচেনা করা যেতে পারে:

- স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি) প্রশাসন ও উন্নয়ন তত্ত্বাবধান সংশ্লিষ্ট কার্যাদি; স্থানীয় শাসন ও সেবা প্রদানকে শক্তিশালী করা; সম্পদ পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ সহজতর করা এবং স্থানীয় সরকার সংস্কার এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির তদারকি করা।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্থাপন ও প্রশাসনিক বিষয়াবলি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।
- দেশের সমবায়, পল্লী উন্নয়ন ও সকল সমষ্টিক উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল তথা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এজিওসমূহ এই বিভাগের অধীনে থাকবে। সমবায়ের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা, আর্থিক পরিষেবা এবং সক্ষমতা-নির্মাণ প্রদান।
- সমবায় সংশ্লিষ্ট কার্যাদি অর্থাৎ অর্থনৈতিক সনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে গ্রামীণ এলাকায় সমবায়ের প্রচার, উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণের কার্যাদি সম্পাদন।
- স্থানীয় সরকারের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, আর্থিক, কার্যক্রম ও কমপ্লায়েন্স অডিট অধিদপ্তর এই বিভাগের অধীনস্থ একটি অধিদপ্তর হবে। এছাড়া এ বিভাগের অধীন নিম্নবর্ণিত দপ্তর/সংস্থা সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে প্রশাসনিকভাবে আওতাধীন থাকবে:
    - বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
    - জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
    - পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া ও বাপার্ডসহ অন্যান্য সকল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
    - বিআরডিবি
    - সমবায় অধিদপ্তর
    - এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
    - মিল্ক ভিটাসহ অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও কৌশল অনুবিভাগ: এ বিভাগের আওতায় নতুন একটি অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে যেখানে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে বিভিন্ন উদ্যোগ কর্মসূচি সমন্বয় করতে পারে।

৫.৩ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং সমবায় অধিদপ্তর একীভূত সংগঠন হিসেবে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) আইন ২০১৮ এর উদ্দেশ্য অর্জনে গ্রামের দরিদ্র প্রান্তিক কৃষক ও নারীকে সমাবায়ভিত্তিক এবং আনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠী হিসেবে সংগঠিত করে তাদেরকে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য গ্রামীণ এলাকায় সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বৃহত্তম সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Body Corporate) হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বিআরডিবি অর্ডিনেন্স (১৯৮২) এর আওতায় গঠিত বোর্ড জাতীয় স্তর, বিভাগীয় স্তর, উপজেলা স্তর বা থানা স্তরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় কার্যাদি সম্পন্ন করছে। এক্ষেত্রে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ সমিতি নিবন্ধন, উন্নয়ন ও পরিচালনায় প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সমবায় অধিদপ্তর:

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর আওতায় বাংলাদেশ সমবায় সমিতিসমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে (১৯০৪ সালে) সমবায় অধিদপ্তর কাজ করে থাকে। সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় প্রশাসনিক স্তর উপজেলা পর্যন্ত বিআরডিবি এর অনুরূপ বিস্তৃত। এ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোয় ৫০৯০টি বিভিন্ন শ্রেণীর পদ রয়েছে তন্মধ্যে ১৯৬টি পদ বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারভুক্ত। সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) অনুযায়ী ৩৫ ধরনের কথিত ১৮২০৭১টি সমবায় সমিতি এ অধিদপ্তরের আওতাধীন। উল্লেখ্য, বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত দ্বি-স্তর সমবায় সমিতিগুলো নিরীক্ষা ও তদারকির অভাবে বর্তমানে অচল

এবং বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অধিকন্তু বিআরডিবি'র কথিত ১,৭৬,০০০ সমিতিও আইনভিত্তিক সমবায় সমিতিতে রূপান্তরে সমবায় অধিদপ্তরের সহায়তা প্রয়োজন হয়। বর্ণিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন বোর্ড ও সংযুক্ত সংস্থা একীভূতকরণের সপক্ষে উল্লেখযোগ্য কার্যকরণ উল্লেখ করা হলো:

- অধ্যাদেশ বা আইন অনুযায়ী বিআরডিবি'র সকল কাজ সমবায়ভিত্তিক হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকলেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এখানে সমবায় ভিত্তিক শক্তিশালী হওয়ার চাইতে ক্রমশ ক্ষীণতর হচ্ছে এবং আইনভিত্তিক সমবায় সংগঠনের বাইরে অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন ভিত্তিক কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটছে। বিস্তৃতি ঘটলেও গুণগত মান নিম্নমুখি।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন হলেও এর মাধ্যমে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নের নামে যেসকল কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তা কমবেশি সমবায় অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত সকল সমবায় সমিতিই কোন না কোনভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অর্থাৎ বিআরডিবি অপ্রাসঙ্গিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠণগুলো প্রকৃতপক্ষে সমবায়ের ভিত্তিতে গড়া আছে।
- বিআরডিবি সমবায় সংগঠন ও সমবায় সংগঠন নির্বিশেষে সরকারি ফান্ড তথা Rural Development Fund এবং Special Project Fund ব্যবহার করে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন সমবায় সংগঠনগুলো শতভাবে নিজেদের শেয়ার, সঞ্চয় ও আমানত সূত্রে জমানো অর্থ দিয়েই তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করছে। বর্তমানে তাদের নিজস্ব তহবিল একটি বড় অংশের কোটায় চলে এসেছে। অন্যদিকে বিআরডিবি'র আওতাধীন সমবায় সংগঠনগুলোর নিজেদের তহবিলের পরিমাণ খুবই কম এবং সম্পূর্ণভাবে সরকারি ফান্ডের মুখাপেক্ষী।

৫.৪ একীভূতকরণের প্রভাব

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং সমবায় অধিদপ্তর একীভূত করা হলে গ্রামীণ উন্নয়নকে শক্তিশালী করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর উভয়ই সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু একীভূত সংগঠন সমবায় সমিতি গঠনের প্রচেষ্টাকে সহজতর করতে এবং বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। একীভূতকরণের ফলে নিম্নরূপ প্রভাব দৃশ্যমান হবে:

- গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায়ের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি: উভয় সংস্থাই গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচারে কাজ করে, তবে তাদের পদ্ধতি ভিন্ন। বিআরডিবি গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবিকা উন্নয়নের মতো প্রকল্পে কাজ করে, অন্যদিকে সমবায় অধিদপ্তর প্রধানত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতিগুলোর প্রসারে কাজ করে। এই দুটি সংস্থা একীভূত হলে, উভয়ের শক্তি একত্রিত করে আরও সংহত গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- সম্পদের আরও ভালো ব্যবহার: বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর উভয়ই গ্রামীণ ও শহরে সমবায়কেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, এবং তাদের লক্ষ্য প্রায় একই-পুঁজি একত্রিকরণ করে জীবিকা উন্নয়ন করা, গ্রামীণ ও শহরের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। যদি একটি একীভূত প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তাহলে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন আরও কার্যকর হবে, দ্বৈত কার্যক্রম এড়িয়ে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- সামগ্রিক গ্রামীণ উন্নয়ন: গ্রামীণ উন্নয়ন বহুমুখী একটি প্রক্রিয়া, যেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অবকাঠামোগত চাহিদার প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হয়। বিআরডিবি অবকাঠামো ও গ্রামীণ উন্নয়নে কাজ করে এবং সমবায় অধিদপ্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে কাজ করে। দুটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক কিন্তু কর্মসূচি ছিল ভিন্ন। একটি একীভূত সংগঠন হলে, এই দুটি দিককে একত্রিত করে আরও সমন্বিত উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের

পাশাপাশি সমবায় গঠন ও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে, যাতে স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজ ও শহরে স্ব-নিয়োজিত অর্থায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

- আরও বিস্তৃত নীতি প্রণয়ন: একটি একীভূত সংস্থা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত পরিধি প্রদান করবে, যার মাধ্যমে সরকার আরও সংহত ও সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন নীতিমালা তৈরি করতে পারবে। দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণের আরও কার্যকর কৌশল বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে, যেখানে সমবায় আন্দোলনকে অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদনশীলতা, কৃষি পণ্য বিপনন, ভোক্তা সহায়ক কার্যক্রম ও স্থানীয় অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সাথে সংযুক্ত করা যাবে।
- প্রশাসনিক কার্যক্রম সহজকরণ ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস: বিআরডিবি ও সমবায় অধিদপ্তর পৃথকভাবে পরিচালিত হওয়ার ফলে প্রশাসনিক ব্যয় ও কার্যক্রমের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। একীভূত হলে প্রশাসনিক ব্যয় কমবে, উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সময় বাঁচবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে। একটি একক প্রতিষ্ঠান হলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন, এবং পর্যবেক্ষণ আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যাবে।
- উন্নত সমন্বয় ও সহযোগিতা: একটি একীভূত প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্প, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সেবা কার্যক্রম ও সমবায় আন্দোলনের মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় করতে পারবে। বিআরডিবি-এর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম সমবায়ের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পুনর্জাগরণ ঘটবে।
- দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি: একীভূত হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হবে। সমবায়ের সদস্য, উদ্যোক্তা, ও স্থানীয় নেতাদের জন্য আরও কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যার মাধ্যমে সমবায় পরিচালনার দক্ষতা বাড়বে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে টেকসই উদ্যোগ গড়ে উঠবে।
- অর্থায়ন ও টেকসই অর্থনৈতিক সহায়তা বৃদ্ধি: বিআরডিবি ও সমবায় অধিদপ্তর উভয়ই গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। একটি একীভূত প্রতিষ্ঠান হলে আরও টেকসই অর্থনৈতিক মডেল তৈরি করা সম্ভব হবে, যেখানে ক্ষুদ্রঋণ, ঋণ সুবিধা ও অনুদান আরও ভালোভাবে পরিচালনা করা যাবে। এর ফলে সমবায় সমিতির জন্য আরও কার্যকর অর্থায়ন মডেল তৈরি হবে এবং গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য আরও ভালো বাজেট ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হবে।
- উন্নয়ন কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সহজ হবে: একটি একীভূত প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করা সহজ হবে এবং সমবায় ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রভাব মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে, যার মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে।
- সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন বৃদ্ধি: একটি একীভূত প্রতিষ্ঠান হলে গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায়ের জন্য আরও শক্তিশালী সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন পাওয়া সম্ভব হবে। সরকারি নীতি ও বাজেট বরাদ্দ আরও কার্যকর হবে এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায় উদ্যোগের মধ্যে সুসংহত পরিকল্পনা তৈরি হবে।

৫.৫ গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায়ের বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং সমবায় অধিদপ্তরকে একীভূত করে একটি নতুন অধিদপ্তর গঠনের রূপরেখা

বাংলাদেশ সামষ্টিক উন্নয়ন ও সমবায় কর্তৃপক্ষ Bangladesh Community Development and Cooperative Development Directorate (BCDD) শিরোনামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এবং কার্যপরিধিতে কর্তৃপক্ষের দ্বৈত ভূমিকা নির্দেশ করে এবং গ্রাম শহর উভয় কমিউনিটির উন্নয়ন এবং সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

সংশ্লিষ্ট কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ সামষ্টিক উন্নয়ন ও সমবায় অধিদপ্তর (BCDDA) এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ হতে পারে:

১. নির্বাহী পর্ষদ

- চেয়ারপার্সন (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) - সার্বিক নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং কৌশল নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।
- উপ-চেয়ারপার্সন - চেয়ারম্যানকে সহায়তা করেন এবং অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করেন।
- পরিচালনা পর্ষদ – মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর, এবং সামষ্টিক উন্নয়ন ও সমবায় খাতের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত।

২. কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক অনুবিভাগ

- মহাপরিচালক - দৈনন্দিন কার্যক্রমের তদারকি করা।
- উপ-মহাপরিচালকগণ - সামষ্টিক উন্নয়ন এবং সমবায় বিষয়ক পৃথক বিভাগ পরিচালনা করা।
- মানবসম্পদ বিভাগ - নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন পরিচালনা করা।
- আইন ও অনুবিধি বিভাগ - সামষ্টিক উন্নয়ন ও সমবায়ের আইনি কাঠামো নিশ্চিত করা
- অর্থ ও বাজেট বিভাগ - বাজেট প্রণয়ন, অর্থ পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা করা।

৩. বিভাগীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন অনুবিভাগ

- প্রতিটি বিভাগ বা অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক বিভাগ থাকতে পারে।
- গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ - অবকাঠামো, কৃষি প্রকল্প, এবং দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- সমবায় উন্নয়ন বিভাগ - সমবায় সমিতির প্রসার ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

৪. বিশেষায়িত ইউনিট

- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ - উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।
- জনসংযোগ ও প্রচার অনুবিভাগ – BCD&CA-এর কার্যক্রম প্রচারে সহায়তা করা।
- আইটি ও উদ্ভাবন অনুবিভাগ - তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ডিজিটাল সমাধান প্রদান করা।

৫. পরামর্শ কমিটি

- গ্রামীণ উন্নয়ন পরামর্শ প্যানেল - কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ও দারিদ্র্য বিমোচন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত।
- সমবায় পরামর্শ প্যানেল - সমবায় ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণ, ও সামাজিক উদ্যোক্তাদের নিয়ে গঠিত।
- লিঙ্গ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি পরামর্শ কমিটি - প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি।

এই কাঠামো বাস্তবায়ন করা হলে, বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায় খাতে আরও কার্যকর এবং টেকসই পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

৫.৬ এনজিও (NGO) বিষয়ক ব্যুরো স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ এর আওতায় ন্যস্ত

১৯৯০ সালে সরকারের এক প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যুরোর মূল লক্ষ্য বিদেশী সহায়তায় পরিচালিত এবং ১৯৭৮ সালের বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যকলাপ) নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের অধীনে নিবন্ধিত এনজিওগুলোকে তত্ত্বাবধান পরিষেবা প্রদান করা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক ২৫ নভেম্বর ২০২১ইং তারিখ জারিকৃত

০৩.০৭০.০২২.০৩.০০.০১৩. ২০২১-২১৮ নং পরিপত্রের ২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে:

- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের নিবন্ধন, নিবন্ধন নবায়ন, নাম পরিবর্তন, গঠনতন্ত্র অনুমোদন এবং নিবন্ধন বাতিল;
- ব্যাক্তি/এনজিও কর্তৃক দাখিলকৃত বৈদেশিক অনুদানে গৃহীত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন ও অর্থছাড়করণ;
- এনজিওসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট প্রতিবেদন পরীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও গ্রহণ;
- ব্যাক্তি/এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং এনজিওসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;

বর্তমানে ব্যুরোর অধীনে নিবন্ধিত ২৩৩৬টি দেশীয় এবং ২৭৪টি বিদেশী এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিস্তৃত কার্যক্রম বিশেষভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচার, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন করছে। এনজিওগুলো দেশব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রশাসনিক এবং পরিচালনাগত চ্যালেঞ্জসমূহের সম্মুখীন হচ্ছে। এ সকল এনজিও কার্যক্রম বহুলাংশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বাধ্যতামূলক কার্যাবলির এবং পরিষেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত । প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর আওতায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে জনবলসহ কার্যাদি স্থানান্তরিত হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে এনজিওসমূহের কার্যকর তদারকি, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ও একীভূত কর্মপরিকল্পনার আওতায় এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হবে।

৫.৭ জনপ্রকৌশল সেবা বিভাগ

মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় বিভাগটি হতে পারে জনপ্রকৌশল সেবা বিভাগ। এ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এ নিম্নবর্ণিত কার্যাদি অন্তর্ভুক্তির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

- অধিনস্ত সকল দপ্তর, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার জন্য আইন-বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ;
- এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও দেশের সকল ওয়াসা কার্যালয়সমূহের কার্যাদি;
- বড় ও মাঝারি শহরের অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরের বাইরের সারাদেশের ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- পল্লী এলাকার ব্রিজ, কালভার্টসহ সড়ক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি; গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি সহায়তা, পানি, স্যানিটেশন এবং শিক্ষার জন্য নীতি বাস্তবায়ন;
- উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভূমি ব্যবহার ও ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি, অবকাঠামো সেবা সরবরাহে পিপিপি ধারণা এবং প্রকৌশল সার্ভিস ক্যাডার সংক্রান্ত কার্যাদি;
- ভূমি ব্যবহার আইন ২০২৫ বাস্তবায়নে সকল কার্যাদি গ্রহণ ও সহায়তা দান;
- ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দালান ও ইমারত নির্মাণ পরিকল্পনা ও নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাসমূহকে কারিগরি সহায়তা দান এবং গ্রাম শহর রূপান্তর প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করা;
- নিরাপদ পানীয় জল, ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের সংরক্ষণ উন্নয়ন ও ব্যবহার;
- আঞ্চলিক ও স্থানীয় সড়ক ও নৌ যোগাযোগ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

- শহর ও পল্লী এলাকায় স্থানীয় বন্যা, সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃবর্জ্যনিস্কাশন পরিকল্পনা, বাজার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জলাবদ্ধতা নিরসন ব্যবস্থার উন্নয়ন; এবং
- ভূমির প্রকৃতি অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার, প্রস্তাবিত জাতীয় ভৌত অবকাঠামো আইন ও ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা অনুয়ায়ী স্থানীয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা।

৫.৮ অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক

- কেন্দ্রীভূত সমন্বয় (Centralised Coordination): বিভাগ দুটির কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উক্ত কমিটিতে কার্যাদি সংশ্লিষ্ট তথ্য বিনিময়, উত্তম চর্চার বিকাশ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত/প্রস্তাব আলোচনা হতে পারে।
- আঞ্চলিক ও জেলা সমন্বয় (Regional and District Coordination): প্রকৌশল দপ্তর/সংস্থার বিভাগীয় প্রধানের কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয় সকল ধরণের প্রকৌশল ও ভূমি ব্যবহার বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয় করবে। জেলা পর্যায়ে পরিচালক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের নেতৃত্ব প্রদান করবে। আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে বৈষম্য মোকাবেলায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গৃহীত নীতি, উদ্যোগ/কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা (Inter-Ministerial Collaboration): বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অনুমোদিত বাস্তবায়িত প্রকল্প/গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী এবং সমবায় উদ্যোগগুলোকে বাস্তবায়ন, জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আন্তঃবিভাগীয় বরাদ্দ নিশ্চিতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি/প্ল্যাটফর্মকে অধিকতর কার্যকর করা যেতে পারে।

৫.৯ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (DPHE) জন্য একটি একীভূত অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) এর জন্য একটি একীভূত অধিদপ্তর গঠন করা জরুরি, কারণ উভয় সংস্থা স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, তারা পরস্পর সম্পর্কিত খাত যেমন নিরাপদ পানীয় সরবরাহ, নিরাপদ স্যানিটেশন, এবং স্থানীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মতো কাজ পরিচালনা করবে, যা সমন্বিতভাবে পরিচালনার প্রয়োজন হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে ইতোপূর্বেকার অধিদপ্তর পরিচালনার মানদন্ড বিবেচনায় ক্যাডার সার্ভিস হওয়ার যোগ্যতা ইতোপূর্বেই পূরণ করেছে। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, প্রস্তাবিত একীভূত অধিদপ্তরের একটি অংশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিদ্যমান অবস্থার ক্যাডার সার্ভিস, সেক্ষেত্রে এলজিইডি অংশ ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত না করা হলে তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তাছাড়া এলজিইডি'কে ক্যাডার সার্ভিস করতে সরকারের কোনো বাড়তি ব্যয় হবে না। একীভূত সংগঠন/অধিদপ্তরের পূনঃগঠিত নাম হবে জনপ্রকৌশল সেবা অধিদপ্তর (Public Service Engineering Department)।

একটি একীভূত প্রকৌশল অধিদপ্তর গঠনের যৌক্তিকতা নিম্নরূপ

- সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন: উভয় সংস্থাকে একত্রিত করা হলে জনবল, অর্থায়ন এবং প্রযুক্তির আরও ভালো ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন সম্ভব হবে। এটি কর্মক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি রোধ করবে এবং নিশ্চিত করবে যে সম্পদগুলো সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং প্রকৃতপক্ষে যেসব এলাকায় প্রয়োজন, সেখানে পৌঁছাচ্ছে।
- সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি: অবকাঠামো প্রকল্প যেমন: গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, এবং স্যানিটেশন একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, একটি গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পে পানি সরবরাহ এবং ড্রেনেজ

ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হতে পারে। একীভূত প্রতিষ্ঠান থাকলে, এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে, ফলে কাজের বিলম্ব, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা এবং অকার্যকারিতা দূর হবে।

- সমগ্রিক উন্নয়ন: একটি একীভূত সংস্থা স্থানীয় উন্নয়নকে আরও সংহত ও বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালনা করতে পারবে। যেমন, একটি গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে একইসাথে রাস্তা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের উন্নয়ন করা সম্ভব হবে, যা সামগ্রিকভাবে আরও ভালো ফলাফল বয়ে আনবে।
- ব্যয় সাশ্রয়: উভয় সংস্থার প্রকল্পগুলো একত্রিত করা হলে প্রশাসনিক খরচ হ্রাস করার সম্ভাবনা তৈরি হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রশাসনিক ব্যয়, লজিস্টিক ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় দুটি খাতে ভাগ করার পরিবর্তে একটি একক খাতে ব্যবহার করা যাবে, যা পুনরাবৃত্তি কমিয়ে উন্নয়নমূলক খাতে আরও বেশি তহবিল ব্যয় করা সম্ভব করবে।
- উন্নত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন: একটি একীভূত সংস্থা থাকলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আরও ভালোভাবে করা সম্ভব হবে, যেখানে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং অবকাঠামোগত প্রয়োজনগুলোর সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে। এর ফলে, আরও কার্যকর উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একইভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
- জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ: একটি একক, একীভূত সংস্থা থাকলে দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা আরও সুসংগঠিত হবে, যা প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি নিরীক্ষা, কর্মদক্ষতা পরিমাপ এবং নির্ধারিত সময়ে পরিষেবা সরবরাহ নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। এটি স্বচ্ছতা বাড়াবে এবং দুর্নীতি বা অব্যবস্থাপনার ঝুঁকি কমাবে।
- আরও কার্যকর নীতি প্রণয়ন: LGED এবং DPHE-এর শক্তিগুলো একত্রিত করা হলে তা একটি শক্তিশালী নীতি-প্রণয়নকারী অধিদপ্তর গড়ে উঠতে পারে, যা অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে আরও বিস্তৃতভাবে সেবা প্রদান করতে পারবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য আরও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।
- পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি: একীভূত সংস্থা থাকলে এটি উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলোর সাথে আরও কার্যকরভাবে মানিয়ে নিতে পারবে, যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বা অভিবাসন প্রবণতার পরিবর্তন, যেখানে অবকাঠামোগত ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে একসাথে পরিচালনা করা প্রয়োজন হয়।
- দক্ষতা বৃদ্ধি: একটি একীভূত সংস্থা থাকলে এর কর্মীরা একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে, যেখানে প্রকৌশল, জনস্বাস্থ্য এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দক্ষতা অর্জন করা যাবে। এটি আরও দক্ষ ও বহুমুখী জনবল তৈরি করবে, যারা জটিল প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারবে।

৫.১০ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের একীকরণ ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে

৫.১০.১ সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রযোজ্য আইনগত ভিত্তি

সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৫ ধারায় বর্ণিত প্রজাতন্ত্রের কর্ম এবং কর্মবিভাগ সৃজন ও পুনর্গঠন বিষয়ে আইনগত নির্দেশনা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে (পরিশিষ্ট-ক)। উল্লেখ্য, নতুন ক্যাডার সৃজন/বিলুপ্তি এবং প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন/বিলুপ্তির ক্ষেত্রে উক্ত আইনে সরকারের গেজেট আদেশ দ্বারা, প্রজাতন্ত্রের যে কোনো কর্ম বা কর্মবিভাগ সৃজন, সংযুক্তকরণ, একীকরণ বা বিলুপ্তকরণসহ অন্য যে কোনোভাবে পুনর্গঠন করার এখতিয়ার রয়েছে। উক্ত আইনের ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীর কর্মের শর্তাবলির তারতম্য করা বা রদ করা যাবে এবং জারিকৃত আদেশের ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতাও প্রদান করা যাবে।

৫.১০.২. ক্যাডার সৃজন ও বিলুপ্তির জন্য সংশোধনযোগ্য বিধিসমূহ

৫.১০.২.১. বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী (নিয়োগ) বিধিমালা ১৯৮১

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল সার্ভিস হিসেবে নতুন ক্যাডারের অন্তর্ভুক্তি এবং বিসিএস জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ক্যাডার বিলুপ্তির ক্ষেত্রে উক্ত বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া নতুন ক্যাডার সংবিন্যাস বিধি প্রণয়নসহ বর্ণিত বিধিতে অর্গানোগ্রাম অনুসারে ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যোগ্যতা, নিয়োগ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তি এবং সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৫.১০.২.২ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৯

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৯ (পরিশিষ্ট-খ) অনুসারে যথাক্রমে (ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; (খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; (গ) বদলীর মাধ্যমে; এবং (ঘ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। উক্ত বিধিমালায় তফশিলে বর্ণিত পদসমূহ ক্যাডার পদ হিসেবে ঘোষনা এবং সে অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যোগ্যতা নির্ধারণপূর্বক বিধিমালা সংশোধন করার প্রয়োজন হবে। এছাড়া পদোন্নতি, বদলী এবং প্রেষণে পদসমূহ ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুসারে মোট জনবল ১৩,৩৯৪, তন্মধ্যে প্রস্তাবিত নতুন ক্যাডার কম্পোজিশন বিধিমালায় ক্যাডারভুক্ত পদে ১,৪৪৯ জনবল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বর্তমান মোট জনবল ৭,০৫২, তন্মধ্যে ক্যাডারভুক্ত পদে নিযুক্ত ৪৪৪ জনবল সমন্বয় হবে। ফলে একীভূত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল সার্ভিসের মোট জনবল হবে ২০,৪৪৬, তন্মধ্যে ক্যাডারভুক্ত পদে জনবল হবে ১,৮৯৩ জন।

৫.১০.২.৩ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৪

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৪ (পরিশিষ্ট-গ) অনুসারে নিয়োগ যথাক্রমে (ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; (খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং (গ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। উক্ত বিধিমালায় তফশিলে বর্ণিত পদসমূহ ক্যাডার পদ হিসেবে বিলুপ্ত ঘোষণা এবং মোট পদসমূহ পুনর্গঠন পরবর্তী স্থানীয় সরকার প্রকৌশল সার্ভিস এ অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এক্ষেত্রে বিধিমালার আওতায় নিযুক্ত কর্মকর্তাদের চাকুরির শর্তাবলি ও জ্যেষ্ঠতার হেফাজত করার প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুসারে মোট জনবল ৭,০৫২, তন্মধ্যে ক্যাডারভুক্ত পদে নিযুক্ত ৪৪৪ জনবল সমন্বয় হবে।

৫.১০.২.৪ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত কাঠামো

কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এ সিডিউল-১ এ প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার জনসংগঠন ও জনপ্রকৌশল সেবা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্তি এবং উক্ত বিধিমালার ২ (বি) বিধি অনুসারে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ এখতিয়ার প্রদান করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর একীভূত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত উপযুক্ত জনবল ক্যাডারভুক্ত পরবর্তী জনবল বিন্যাস নিম্নরূপভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের রূপরেখা অধ্যায়ে বর্ণিত পরিকল্পনা অনুবিভাগের জনবল এখানে সংযোজিত হবে।

৫.১০.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা পুনর্গঠন ও একীভূতকরণের নীতি-নির্দেশনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা পুনর্গঠন ও একীভূতকরণের ক্ষেত্রে চাকুরি বিধি, আইনি কাঠামো পরিবর্তনের সময় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রতি ন্যয্যতা এবং প্রতিষ্ঠিত চাকুরি বিধিমালার সাথে সঞ্জাতিপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুনর্গঠনের আওতাভুক্ত সংগঠনসমূহের চাকুরি বিধিমালাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে পুনর্গঠনের জন্য নিম্নরূপ নীতি-নির্দেশনা অনুসরণ করা যেতে পারে:

৫.১০.৩.১ চাকুরি বিধি এবং আইনি কাঠামো মেনে চলা

আইনি চ্যালেঞ্জ এড়াতে এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য পুনর্গঠন সম্পর্কিত সমস্ত পদক্ষেপ বিদ্যমান চাকুরি বিধি, সরকারি নীতি এবং শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। পুনর্গঠন প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ করার ক্ষেত্রে কর্মচারিদের বিজ্ঞপ্তি প্রদান, পুনর্গঠন পরিকল্পনা এবং এর প্রভাব সম্পর্কে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আগে থেকেই অবহিত করতে হবে। বর্ণিত চাকুরি বিধি সংশোধন, প্রয়োজনে, নতুন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিধি সংশোধন (যেমন: দায়িত্বের পরিধি, পদবি, পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা ইত্যাদি) এবং কর্মচারিদের বিদ্যমান অধিকারগুলো (যেমন: বেতন, মেয়াদ, পেনশন অধিকার) বিধি অনুসারে সুরক্ষিত করা যেতে পারে।

৫.১০.৩.২ জ্যেষ্ঠতা সুরক্ষা এবং স্থানান্তর ব্যবস্থা

পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বর্তমান কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বর্তমান জ্যেষ্ঠতা বজায় রাখার নীতি মেনে চলার প্রয়োজন হবে। এলজিইডি এবং ডিপিএইচই স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত জ্যেষ্ঠতা অনুসরণ এবং যোগদানের তারিখ বিবেচনায় জ্যেষ্ঠ্যতা নির্ধারিত হবে। তবে, বর্তমান পদের নিচে কাউকে পদায়ন করা যাবেনা। পুনর্গঠিত বিভাগগুলোতে জ্যেষ্ঠতা-ভিত্তিক পদোন্নতি নিশ্চিত করার প্রয়োজন হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে পদোন্নতি এবং দায়িত্ব হস্তান্তরের জন্য জ্যেষ্ঠতা অন্যতম নির্দেশক হিসেবে অব্যাহত রাখা যেতে পারে। উল্লেখ্য, নতুন প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জনবল কাঠামোতে যথাযথ স্বীকৃতি দেয়ার প্রয়োজন হবে।

৫.১০.৩.৩ ক্লাস্টার ভিত্তিতে অভিজ্ঞতা অর্জন

প্রস্তাবিত সার্ভিসে উপজেলা পর্যায়ে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন ডাইমেনশনের কাজ রয়েছে। যেমন: গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নগর উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ইত্যাদি। উক্ত কাজসমূহে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ এবং তৃণমূল পর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, অর্জিত জ্ঞান জনস্বার্থে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত সার্ভিসে ক্লাস্টারভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন এবং তাতে উচ্চতর পদে যাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। ক্লাস্টারভিত্তিতে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর পদে পদায়ন প্রকৌশলীদের বিশেষায়িত বিষয়সমূহে অর্ন্তদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা অর্জনে উৎসাহিত করবে। মাঠ পর্যায়ে ন্যূনতম পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা লাভের পর সিনিয়র সহকারি প্রকৌশলী হিসেবে পদায়নের সময় কর্মকর্তারা ক্লাস্টার পছন্দ করতে পারবেন। সম্ভাব্য ক্লাস্টারসমূহ নিম্নরুপ: গ্রামীণ অবকাঠামো, নগর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সুপেয় পানি সরবরাহ, গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ক্লাস্টার ভিত্তিতে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং পরবর্তী পদায়ন বিষয়ে একটি পৃথক গাইডলাইন তৈরি করা যেতে পারে।

৫.১০.৩.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ক্রান্তিকালীন ভূমিকা এবং বিশেষ বিধান তৈরি

ক্যাডার বহির্ভুত পদসমূহে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পুনর্গঠনের কারণে তাদের দায়িত্ব বা মর্যাদা হ্রাসের সম্মুখীন হলে এমন কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বিশেষ বিধানের মাধ্যমে যথাযথ ক্ষতিপূরণ সহ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সুযোগ প্রদান অথবা পুনর্গঠিত কাঠামোতে নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন বা পুনঃপ্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.১০.৩.৫ চাকরির নিরাপত্তা এবং নতুন পদে নিয়োগ

নতুন পুনর্গঠিত বিভাগের মধ্যে সমস্ত বর্তমান কর্মচারীর জন্য চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নতুন পদ সৃষ্টি করা বা বিদ্যমান পদগুলোকে একীভূত করা সহ বিদ্যমান কর্মকর্তা-কর্মচারিদের যোগ্যতা, দক্ষতা

এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নতুন বিভাগ বা স্থানে পদায়নের ক্ষেত্রে তাদের পছন্দ বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.১০.৩.৬ অভিযোগ এবং বিরোধ নিষ্পত্তির নীতি

পুনর্গঠনের ফলে চাকরির পরিবর্তন, পদোন্নতি, অথবা অনুভূত অন্যায্য আচরণ সম্পর্কিত বিরোধ বা অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অভিযোগ সমাধানের প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট, সহজলভ্য এবং পক্ষপাতমুক্ত হতে হবে।

৫.১০.৪ প্রশাসনিক কার্যক্রম

সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে:

ক. সরকার কর্তৃক সংস্কার কমিশনের স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়নে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন;

খ. স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর একীভূতকরণের লক্ষ্যে সরকারি চাকুরি আইন ২০১৮ এর ৫ ধারা অনুসারে জনবল কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ;

গ. স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর(LGED) ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর(DPHE) একীভূত হয়ে জনপ্রকৌশল অধিদপ্তর(PED) করার বিষয়ে সার্ভিস ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস এর খসড়া, একীভূত অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগ বিধিমালার খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠন ও কার্মপরিধি নির্ধারণ;

ঘ. কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ অনুসারে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর একীভূতকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগের সুপারিশসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৫.১১ নীতি সংশোধন, পরিমার্জন এবং মূল্যায়ন

সমন্বিত নীতি উন্নয়ন (Integrated Policy Development): কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এর সিডিউল (১) এ সৃজিত মন্ত্রণালয়ের আওতায় বর্ণিত দুটি বিভাগ অন্তর্ভুক্তি ও নাম পরিবর্তন এবং নীতি কাঠামোয় দুটি বিভাগের কার্যাদি বিভাজনপূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য আইন, বিধি, ম্যনুয়েল সংশোধন ও পরিমার্জন। এছাড়া এ কার্যক্রমে প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রণীত নীতি-কর্মসূচিতে যথাক্রমে গ্রামীণ উন্নয়ন, স্থানীয় শাসন, এনজিও কার্যক্রম এবং সমবায় কার্যক্রমকে এক সামগ্রিক নীতি এজেন্ডায় একীভূত করা যেতে পারে।
প্রকল্প/কর্মসূচি সামঞ্জস্যকরণ: প্রকল্প/কর্মসূচি এবং প্রকল্পগুলো তিনটি বিভাগের ইনপুট নিয়ে প্রণয়ন করা উচিত, যাতে গ্রামীণ উন্নয়ন, সামষ্টিক উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার এবং সমবায়গুলো অনুশীলনে একসাথে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, অবকাঠামো প্রকল্পে স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সমবায় মডেল অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন: নতুন কাঠামোর অধীনে পুনর্গঠিত বিভাগের সকল কার্যক্রম/কর্মসূচির/প্রকল্পের অগ্রগতি/কর্মসম্পাদনের মান ট্র্যাক করার জন্য একটি ইউনিফাইড পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) সিস্টেম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যে এই সিস্টেমের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা/রাজস্ব

আহরণ/সেবা সম্প্রসারণ/অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সমবায় কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত ডেটা সংগ্রহের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.১২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

সক্ষমতা বৃদ্ধি: সৃজিত দুটি বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কার্যকরভাবে দক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশল, সমবায় ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিষয়ে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলী এবং প্রণোদনার বিষয়সমূহ বিভাগের কার্যাদি কেন্দ্রিক ও শর্তাধীন করা যেতে পারে।
ক্রস-ডিভিশনাল টিম বিল্ডিং: নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলোতে কাজ করার জন্য ক্রস-ফাংশনাল টিম গঠন এবং প্রতিটি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা প্রয়োগ করার সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে।

৫.১৩ সম্পদ সংগ্রহ এবং তহবিল গঠন

সমন্বিত বাজেটিং: মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুটি বিভাগের জন্য জনচাহিদা পূরণে দুটি পৃথক বাজেট প্রণয়ন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে অধিকতর বরাদ্দ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি): গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সমবায় প্রচারে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, সমবায়ের জন্য আর্থিক পরিষেবা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য পিপিপি কাঠামো বিভিন্ন প্রকল্প কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৫.১৪ জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ: সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণ, এনজিও, সমবায় এবং সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করে নীতি প্রণয়ন, চাহিদা নিরুপন এবং প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরামর্শমূলক ফোরাম: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের সাথে বিভাগসমূহের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য পরামর্শমূলক ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ ফোরামের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার, গ্রামীণ ও শহর উন্নয়ন অনুশীলনকারী, সমবায় এবং অন্যান্য অংশীজন সমস্যা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

৫.১৫ পুনর্গঠন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

পর্যায় ১: মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বিভাগগুলোর একটি সাংগঠনিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা।
- বর্তমান অবস্থা ও প্রত্যাশিত অবস্থার ব্যবধান চিহ্নিতকরণ (Gaps), দ্বৈততা এবং উন্নতির ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।
- নতুন সাংগঠনিক কাঠামো সংজ্ঞায়িত করা।

পর্যায় ২: কাঠামোগত পরিবর্তন

- নতুন অনুবিভাগ/দপ্তর/সংস্থার লক্ষ্য/কৌশলগত উদ্দেশ্য, ভূমিকা এবং দায়িত্ব পুনঃনির্ধারণ।
- প্রোগ্রাম এবং নীতি একীকরণের জন্য একটি বিশদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

পর্যায় ৩: সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ

- নতুন ব্যবস্থা, নীতি এবং সাংগঠনিক কাঠামোর উপর কর্মীদের অবিহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

পর্যায় ৪: সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন

- পুনর্গঠিত জনপ্রকৌশল ও সেবা বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ পুনর্গঠনের ফলে বিভাগীয় ও জেলা কাঠামো প্রবর্তন করা।

- ক্রমাগত অগ্রগতি এবং প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো সামঞ্জস্যতা নিরীক্ষণ।

৬. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থার গুর্নগঠনের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা গুর্নগঠনের যৌক্তিকতা ও বর্তমান পরিচালন প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়সহ মন্ত্রণালয়ের বিভাগসমূহ ও সংযুক্ত দপ্তর সংস্থাসমূহের পুনর্গঠনে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করছে:

৬.১ কার্যাদি পুর্নবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তিত হয়ে **'স্থানীয় সরকার, জনসংগঠন ও জনপ্রকৌশল সেবা'** মন্ত্রণালয় করা যেতে পারে। উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি নতুন বিভাগ যথাক্রমে স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং জনপ্রকৌশল সেবা বিভাগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পুনর্গঠন ও নামকরণ করা যেতে পারে:

৬.২. কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এর ৩(IV) অনুসারে মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি পরিসর বিবেচনায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব যথাক্রমে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.৩ বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যাদিভুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ এর আওতায় নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

৬.৪ দেশের সমবায়, পল্লী উন্নয়ন ও সকল সমষ্টিক উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল তথা এনজিও সংশ্লিষ্ট কার্যাদি পুনর্গঠিত স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ এর আওতাধীন করা যেতে পারে।

৬.৫ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভুক্ত পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগের জনবল ও কার্যাদি বিলুপ্ত ও পুনর্বিন্যাস করে পুনর্গঠিত স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ এর আওতায় সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা হিসেবে নতুন স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর গঠন করা যেতে পারে। সৃজিত অধিদপ্তরের আওতায় আর্থিক নিরীক্ষা, পারফরমেন্স অডিট, পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প কর্মসূচি মূল্যায়নের কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.৬ দেশের বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (NGO) এর কার্যাবলি সমন্বয় ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট কার্যাদি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথোরিটি (MRA) এর আওতাধীন। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত সংস্থা এবং বিদেশী রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন সংস্থা তাদের নিবন্ধন এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত রেখে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট এনজিও কার্যক্রম তদারকির কার্যাদি পুনর্গঠিত করে স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কমিশন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের আওতাধীন থাকার চেয়ে স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য পুনর্গঠিত নতুন বিভাগ অর্থাৎ স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ এর আওতাভুক্ত করা যেতে পারে।

৬.৭ কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এর সিডিউল ১-এ পুনর্গঠিত স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে:

- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট;
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কুমিল্লা;

- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া;
- তফশিলী ব্যাংক (প্রস্তাবিত সমবায় ব্যাংক);
- বাংলাদেশ গ্রাম উন্নয়ন ও সমবায় কর্তৃপক্ষ (প্রস্তাবিত);
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো;
- মিল্ক ভিটাসহ অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান; এবং

৬.৮ পুনর্গঠিত স্থানীয় সরকার, জনসংগঠন ও জনপ্রকৌশল সেবা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রস্তাবিত দুটি বিভাগের জন্য বর্তমান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট জনবল অপরিবর্তিত রেখে কার্যাদি অনুসারে পুনর্বিন্যস্ত করা যেতে পারে। কার্যকর জনবল ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কর্মরত জনবলের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক নিরীক্ষা পরিচালনা করে জনবল পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত বিভাগ দুটির জনবল ও কর্মবিভাগের সমতা নিশ্চিতে নিম্নরূপভাবে জনবল ও কর্মবিভাগ সৃজন করা যেতে পারে:

৬.৯ বর্তমানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে দুটি ব্যাংক এবং কতিপয় ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প রয়েছে। ব্যাংক দুটি হচ্ছে সমবায় ব্যাংক ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। আর ঋণদানের প্রকল্প পদাতিক ও ক্ষুদ্র কৃষক ফাউন্ডেশন। এসব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে সমবায়ী ও এনজিওদের পুঁজি সহকারে একটি বৃহত্তর তফসিলি ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে । যে ব্যাংক সমবায় ও এনজিওদের অর্থায়নে করবে।

স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ	জনপ্রকৌশল ও সেবা বিভাগ
• সিনিয়র সচিব-১ • অতিঃসচিব-৩ • যুগ্মসচিব-৫ • উপ-সচিব-১০ • সিনিয়র সহকারী সচিব-১০ • সহকারী সচিব-১০	• সিনিয়র সচিব-১ • অতিঃ সচিব-৩ • যুগ্মসচিব-৫ • উপ সচিব-১০ • সিনিয়র সহকারী সচিব-১০ • সহকারী সচিব-১০
অনুবিভাগ • প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ • পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ • জনপ্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ • আইন অনুবিভাগ • এনজিও বিষয়ক অনুবিভাগ	অনুবিভাগ • প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ • নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ • অবকাঠামো উন্নয়ন অনুবিভাগ • পানি সরবরাহ অনুবিভাগ • ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার অনুবিভাগ

এতদসত্ত্বেও পুনর্গঠিত বিভাগসমূহের কার্যাদি পুনর্বিন্যাস ও সাংগঠনিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অনুবিভাগ সৃজন, আইনি কাঠামো সংশোধন, কার্যাদি সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত জনবল নির্বাচন এবং নবসৃজিত অধিদপ্তরে আর্থিক নিরীক্ষা, কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনার জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা পদায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.৯ পুনর্গঠিত প্রকৌশল সার্ভিস ক্যাডার নিয়ন্ত্রন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সৃষ্ট বিশেষায়িত বিভাগ হিসেবে জনপ্রকৌশল ও সেবা বিভাগের জন্য অনুচ্ছেদ ৯.৩ এ উল্লেখকৃত কার্যাদির সাথে বিশেষভাবে নিম্নরূপ কার্যাদি অন্তর্ভুক্তি র বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে:

- একীভূত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং দেশের সকল ওয়াসা সংশ্লিষ্ট কার্যাদি।
- বড় ও মাঝারি শহরের অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহর এলাকা বহির্ভূত সারাদেশের ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- দালান ও ইমারত নির্মাণ পরিকল্পনা ও নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা দান এবং গ্রাম শহর রূপান্তর প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করা।
- জলাবদ্ধতা, স্থানীয় বন্যা, পয়ঃবর্জ্যনিস্কাশন পরিকল্পনা, বাজার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- নিরাপদ পানি সরবরাহ, নিরাপদ স্যানিটেশন, ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের সংরক্ষণ উন্নয়ন ও ব্যবহার।
- আঞ্চলিক ও স্থানীয় সড়ক ও নৌ যোগাযোগ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ভূমির প্রকৃতি অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার, প্রস্তাবিত জাতীয় ভৌত অবকাঠামো আইন ও ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা অনুয়ায়ী স্থানীয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা।

৬.১০ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে অনুভূত প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সেবা সম্প্রসারণে বর্তমান জনকাঠামো পর্যালোচনা, নিজস্ব সম্পদ আহরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি, আন্তঃসংস্থাসমূহের মধ্যে বাজেট স্থানান্তর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দ বৃদ্ধি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং শতভাগ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সহজীকরণের উদ্যোগ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৭. প্রতিষ্ঠান পুর্নগঠন সংক্রান্ত সুপারিশ

৭.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন ২০১৭ এবং বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন ১৯৯০ এর আওতায় গঠিত যথাক্রমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া এর পরিচালন পদ্ধতি ও কার্যক্রম অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।

৭.২ গোপালগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধা, শেরপুর জেলায় প্রতিষ্ঠিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমিসমূহকে বিলুপ্ত করে অবকাঠামোসমূহ ব্যবহারের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ বা উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ মেয়াদে লিজ প্রদান করা যেতে পারে। সরকারের পক্ষে এসব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন পরিচালনা করা সম্ভব না হলে বাজার মূল্যে ভবন/অবকাঠামো বা ভূমি বিক্রি করে দেয়া যেতে পারে।

৭.৩ এনআইএলজি'র ব্যাপক পুনর্গঠন ও সংস্কারের বিষয়ে পৃথক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সংযুক্ত হয়েছে।

৭.৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা হিসেবে পরিচালিত সমবায়ের নিবন্ধন, উন্নয়ন ও সমবায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ও সমবায় অধিদপ্তর পৃথক দুটি প্রতিষ্ঠান সরকারি রাজস্বের অধীনে পরিচালনা করা যথাযথ হবে না।

৭.৫ এছাড়া সমবায় সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য ক্যাডার সার্ভিসের কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়ায় সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কে একীভূত করে সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর আওতায় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সৃজিত আইনি কাঠামোয় জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একই প্রশাসনের অধীনে এনে সমবায়কে গুরুত্ব দিয়ে এ একীভূত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

৭.৬ বর্তমান সমবায় ক্যাডারভুক্ত জনবল অন্য কোন প্রাসঙ্গিক ক্যাডার সার্ভিসের সাথে একীভূত করে সমবায় ক্যাডার ও ক্যাডারভুক্ত পদসমূহ বিলুপ্ত করা যেতে পারে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর চাকুরী কাঠামোর যৌক্তিক সুষমকরণ করে একটি নতুন নাম দিয়ে সমবায় কার্যক্রম বিকাশে একটি পেশাদার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যেতে পারে। এ প্রতিষ্ঠানের নাম হতে পারে সমবায় ও সমষ্টিক উন্নয়ন সংস্থা বা অধিদপ্তর (Cooperative and Community Development Board/Department)

৭.৭ সমবায় সংগঠনকে সহায়তার জন্য সমবায় সেক্টরের একটি পূর্ণাঙ্গ তফসিলী ব্যাংক স্থাপন করা যায়। এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এ দুটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষিত করে নবগঠিত সমবায় ব্যাংকে আত্মীকরণ করা যেতে পারে।

৭.৮ প্রস্তাবিত সমবায় ব্যাংক এর কার্যক্রম এনজিও সমবায়ীদের পুঁজি ও ইকুয়িটি সমন্বয়ে পরিচালনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক আইনের আওতায় প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক ১০ বছর মেয়াদী স্বল্পসুদে ঋণ দিয়ে সমবায় ব্যাংক পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করতে পারে। আবশ্যিকভাবে প্রস্তাবিত সমবায় ব্যাংক পেশাদার ব্যাংকার নিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে হবে। অধিকন্ত ক্ষুদ্রঋণ দানকারী এনজিওসমূহকে ব্যাংক স্থাপনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' ও জাতীয় সমবায় ব্যাংক ও কিছু ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এ প্রস্তাবিত ব্যাংকের সাথে একীভূত করা যেতে পারে।

৭.৯ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুভূত চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে যথাক্রমে সমবায় সমিতিসমূহকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা, অতি দরিদ্রদের দারিদ্র্য মুক্তি কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, প্রশিক্ষণ পরবর্তী জীবিকায়নে নিয়োজিত করা এবং উদ্যোক্তাদের বাজার সংযোগ স্থাপনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সংযোজনী-১

একীভূত জন প্রকৌশল অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো

ক. শীর্ষ নির্বাহী পর্যায় (Top Executive Level)

- সিনিয়র প্রধান প্রকৌশলী/চিফ অব ইন্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস/মহাপরিচালক -১ / (এলজিইডি ও ডিপিএইচই এর জন্য);
- প্রধান প্রকৌশলী-২ (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)
- মূখ্য পরিকল্পনাবিদ- ১

খ. সদর দপ্তরের নির্বাহী পর্যায় (HQ Executives Level)

- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী-১২ (গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ, নগর উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ)
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী-৫ (নিরাপদ গ্রামীণ পানীয়, জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন, নিরাপদ নগর পানি সরবরাহ, নিরাপদ স্যানিটেশন নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অডিট)
- অতিরিক্ত মূখ্য পরিকল্পনাবিদ-১
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সদর দপ্তর/প্রকল্প পরিচালক (২০)
- নির্বাহী প্রকৌশলী ও অন্যান্য জনবল-

গ. আঞ্চলিক/বিভাগীয় পর্যায় (Divisional/ Regional Level)

- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী - ৮
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী - ২৫ (প্রস্তাবিত ২৫ অঞ্চল)
- নির্বাহী প্রকৌশলী - ১১৬ (অঞ্চল/বিভাগে সংযুক্ত- বিভিন্ন ক্লাস্টারের দায়িত্বে। যেমন: পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ, নগর উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)
- আঞ্চলিক পরিকল্পনাবিদ - ২৫

ঘ. মাঠ পর্যায় (Field Level)

জেলা:

- নির্বাহী প্রকৌশলী - ৬৪

- জেলা পরিকল্পনাবিদ - ৬৪ (জেলা পরিষদের সাথে সংযুক্ত)
- সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী -১২৮ (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল উইং-১ , বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জনস্বাস্থ্য উইং-১)
- সহকারী প্রকৌশলী - ২০০
- সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) - ৬৪

উপজেলা:

- উপজেলা প্রকৌশলী - ৪৯৫
- উপজেলা পরিকল্পনাবিদ - ৪৯৫
- উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী- ৯২০ (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল উইং-১, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জনস্বাস্থ্য উইং-১)

ঙ. সংরক্ষিত প্রেষণ

- নির্বাহী প্রকৌশলী - ৫০
- সহকারী প্রকৌশলী - ১০০
- পরিকল্পনাবিদ (পরিকল্পনা কমিশনের আওতাভুক্ত বিষয়)-৫০
- জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ -৫০
- পরিবেশ বিশেষজ্ঞ -৫০
- জিআইএস বিশেষজ্ঞ -৩০
- পরিসংখ্যানবিদ -১০
- পিপিপি বিশেষজ্ঞ -১০
- মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ -৫০

সংযোজনী-২
এনআইএলজি'র পুনর্গঠন ও স্থানীয় সরকারের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

সুশাসন, জনসেবা উন্নয়ন এবং স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকারের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা জরুরি। দক্ষতা ও পর্যাপ্ত গবেষণালব্ধ জ্ঞানের অভাবে কর্মকর্তারা নীতি বাস্তবায়ন, বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সেবা প্রদান করতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। গবেষণার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং কার্যকর সমাধান বের করা সম্ভব হয়। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন, নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতো নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্থানীয় সরকারকে আরও সক্ষম করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া গবেষণার ফলাফল ক্রমাগতভাবে প্রশিক্ষণ ও স্থানীয় সরকারের নানা সৃজনশীল কর্মসূচি ও কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করবে।

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত মানব সম্পদের উন্নয়নে নিয়োজিত একটি স্বনামধন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৯ সালের ১ জুলাই তৎকালীন East Pakistan Government Educational and Training Institutions Ordinance, 1961 অনুসারে স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এলজিআই) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত একমাত্র প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯২ দ্বারা পরিচালিত এবং এটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। প্রতিষ্ঠানটি বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার উদ্দেশ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) প্রতিষ্ঠিত। প্রশিক্ষণ প্রদান ও পারস্পরিক

সহযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যমান আইন ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রচলিত নীতিমালার উন্নয়নে কাজ করা এনআইএলজি'র মূল লক্ষ্য।

তবে এনআইএলজি যে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল, তার প্রকৃত বাস্তবায়ন হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনআইএলজি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কারণ, এর সাংগঠনিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। ১৯৯২ সালের যেই আইন অনুসারে এনআইএলজি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই আইন এনআইএলজিকে মূলত অনেকটা সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানে নেই কোন একাডেমিক কার্যক্রমের আয়োজন, নেই পর্যাপ্ত গুণ ও মানসম্পন্ন গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বিত প্রয়াস। একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃত একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি ও সক্ষমতা মত একাডেমিক অনুষদ অনুপস্থিত। এছাড়াও বার্ড, কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়া, বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করলেও এনআইএলজি তা করতে সক্ষম নয়। এক্ষেত্রেও এনআইএলজি অনেক পিছিয়ে আছে। এখানে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কিছু কর্মকর্তার মাধ্যমে পুরো এনআইএলজি পরিচালিত হয়। যা প্রশিক্ষণকে একটি রুটিন কাজ হিসেবে গতানুগতিকভাবে চালানো হচ্ছে।

অপরদিকে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সফলতার সাথে কাজ করছে। সার্ভিস বিভাগের অধীনে প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রকল্প বিভাগ এবং একাডেমিক বিভাগের অধীনে পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পল্লী সমাজতত্ত্ব ও জনমিতি বিভাগ, পল্লী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন বিভাগ, কৃষি ও পরিবেশ বিভাগ সুচারুরূপে কাজ করছে। বার্ডের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা পরিচালনার দক্ষ জনবল রয়েছে। এখানে প্রায় ৩৬৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত। মহাপরিচালক, অন্যান্য পরিচালক ও অন্যান্য স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে অধিকাংশের রয়েছে উচ্চশিক্ষা ও বিদেশি ডিগ্রী এবং তাদের অধিকাংশ প্রকৃত অর্থেই একাডেমিক কাজ ও গবেষণায় নিরন্তর নিয়োজিত থাকে।

আবার, দারিদ্রপীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র, বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে এটি কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ এবং কৃষি বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, পল্লী প্রশাসন ও জেন্ডার, খামার প্রযুক্তি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে এটি সুচারুরূপে কাজ করে যাচ্ছে। একাডেমিটির পরিষেবার মান অত্যন্ত চমৎকার। নিজেদের জনবলের জন্য ছাড়াও মাস্টার্স ও পিএইডির ডিগ্রী প্রদানের জন্য কাজ করছে প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু এনআইএলজিতে উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা নেই বললেই চলে। এখানে রয়েছে ২১ জন অনুষদ সদস্য যার মধ্যে ৯জন অনুষদ সদস্য এনআইএলজি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত, বাকি ১২ জন প্রেষণে অনুষদ সদস্য হিসেবে কর্মরত। ৯ জন সদস্যের মধ্যে রয়েছে ২ জন উপ-পরিচালক, ৩ জন সহকারী পরিচালক ও ৩ জন গবেষণা কর্মকর্তা। প্রেষণ নির্ভর অনুষদ সদস্য (উপ-পরিচালক থেকে মহাপরিচালক পর্যন্ত) সদস্য দিয়ে এনআইএলজি প্রকৃত অর্থে একটি একাডেমিক ইনিস্টিটিউট হিসেবে ভেবে নেয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকে না। অধিকাংশ কাজই প্রশাসনিক, দাপ্তরিক ও সাচিবিক প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই রিসোর্সপুল সীমিত ও একাডেমিক কাঠামোর অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রশাসন ক্যাডার সার্ভিসের জনবল দিয়ে এটি পরিচালিত হচ্ছে। জনগণের যেই প্রত্যাশা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করার যে প্রয়াস, তার প্রতিফলন দেখা যায় না।

এনআইএলজি হবে একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত ও পেশাদার প্রতিষ্ঠান। এনআইএলজি বর্তমান আইন সংশোধন করে স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উপযোগী নতুন আইন করতে হবে। এ আইনের অধীনে একটি বোর্ড থাকবে এবং বোর্ডের নির্দেশনায় এ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে।

এনআইএলজির প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে করণীয়

আধুনিক একাডেমিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনা জরুরি। একাডেমিক বিভাগের অর্গানোগ্রামে কমপক্ষে ৬ থেকে ৭টি অনুবিভাগ থাকবে। একাডেমিক বিভাগের মধ্যে থাকবে,

১. সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে থাকবে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, লোকপ্রশাসন, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ১০জন অনুষদ সদস্য।

২. ব্যবসায় শিক্ষার অধীনে থাকবে একাউন্টিং, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ব্যবসায় প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৮/১০ জন অনুষদ সদস্য।

৩. প্রকৌশল বিভাগের অধীনে থাকবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবেশ প্রকৌশল, স্থপতি, পরিকল্পনাবিদ, ভূগোলবিদ নিয়ে ১০জন অনুষদ সদস্য।

৪. রিসার্চ মেথডলজির অধীনে থাকবে স্ট্যাটিস্টিকস এন্ড ডাটা সায়েন্স এবং সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলোর ৬ জন সদস্য।

৫. পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর একটি বিভাগ থাকবে।

৬. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ থাকবে।

৭. এনআইএলজিতে বিষয়ভিত্তিক প্রায় ৫০ জন অনুষদ সদস্য প্রয়োজন হতে পারে।

২.১ এনআইএলজির প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম

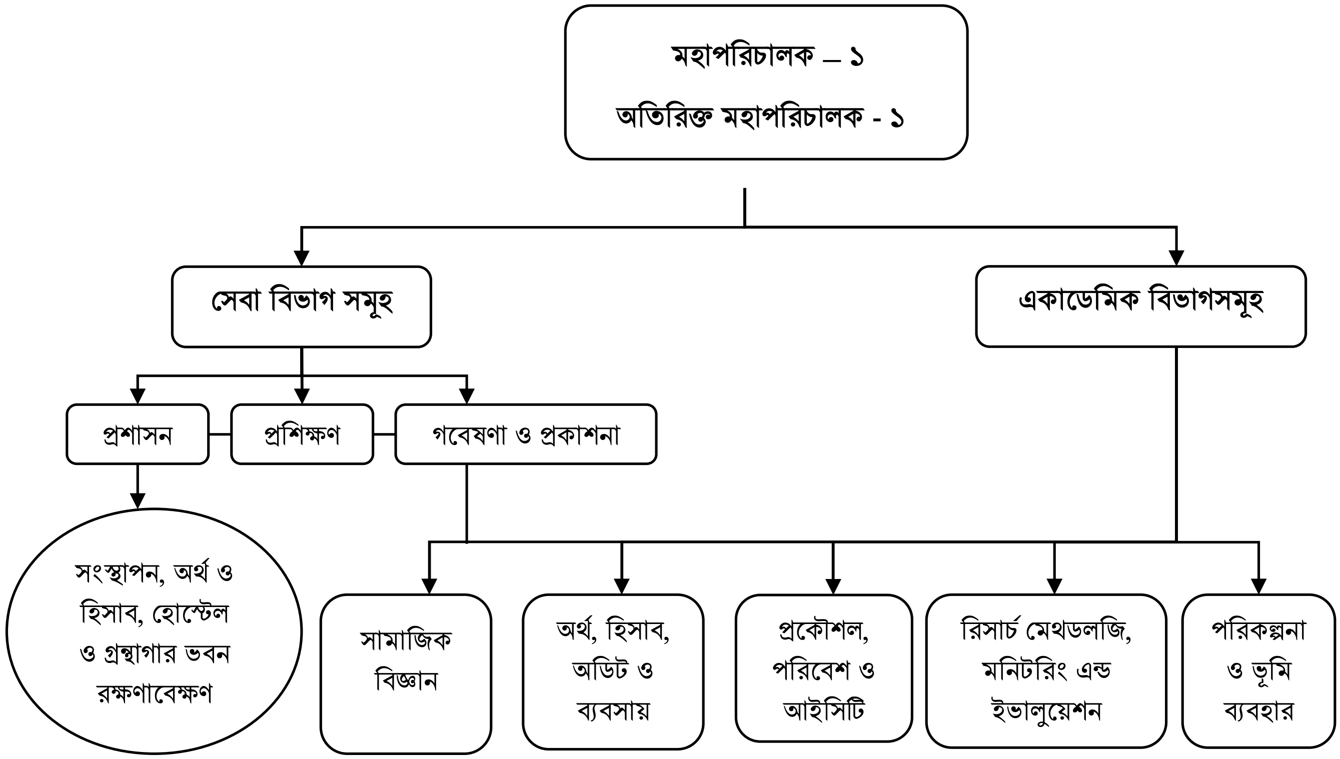

৫০ জন অনুষদ সদস্য হবে।

২.২ জাতীয় স্থানীয় সরকার গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কাউন্সিল

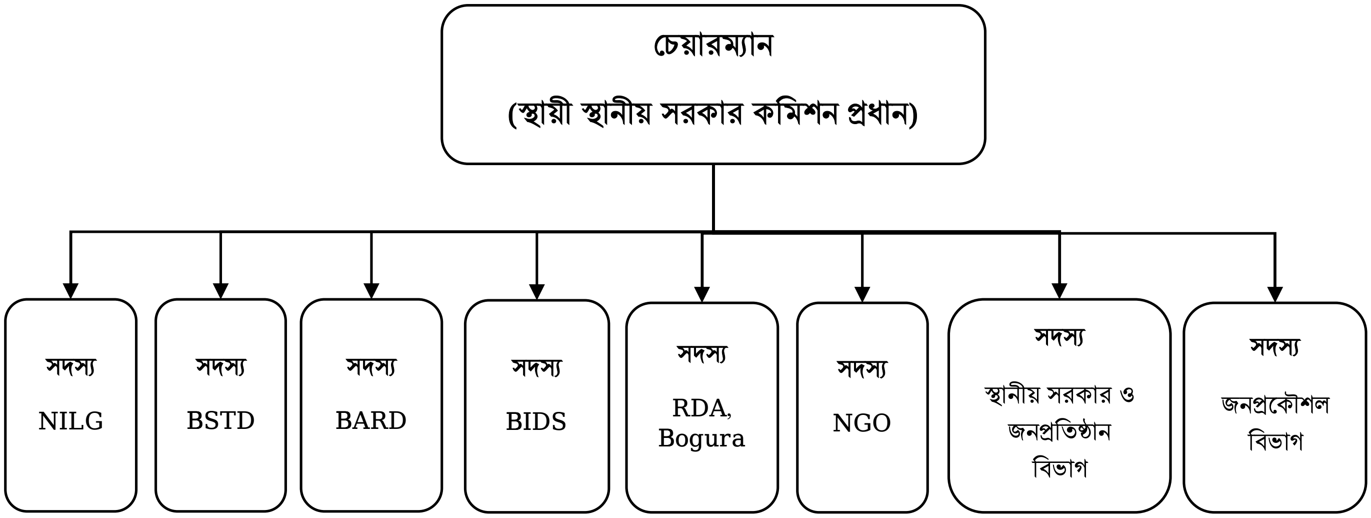

পরিষেবা বিভাগ ও একাডেমিক বিভাগ

প্রশাসন বিভাগ

মহাপরিচালক এনআইএলজির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও ০৯ জন পরিচালকসহ এনআইএলজির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা হতে পারে ৩৬৫ জন। এনআইএলজির প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পরিচালক (প্রশাসন) এর নেতৃত্ব প্রশাসন বিভাগ প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং পরিষেবা প্রদান করবে। এছাড়া, এ বিভাগ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা, কর্মচারী কল্যাণ, ইনস্টিটিউটের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা হোস্টেল প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

এনআইএলজির মহাপরিচালক প্রশাসন ক্যাডার থেকে আসবে, অতিরিক্ত মহাপরিচালক একাডেমিক অর্থাৎ এনআইএলজির নিজস্ব নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব ব্যক্তি কাজ করবেন, তাদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে পদন্নোতির মাধ্যমে এই পদে যাবে। তবে, সাময়িকভাবে এডিজি পদে একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যক্তিকে (শিক্ষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা দক্ষ গবেষক) প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। অন্যান্য পদগুলোতে প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত হবে। প্রতিটি ডিসিপ্লিনে দুইজন করে অনুষদ নিয়োজিত হবে। তাদের জন্য দেশে বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও ডিগ্রী অর্জনের ব্যবস্থা থাকবে।

প্রশিক্ষণ বিভাগ

এনআইএলজি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাংলাদেশের একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এনআইএলজির নয়টি বিভাগের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম একটি সেবামূলক বিভাগ হিসেবে কাজ করবে। এনআইএলজি প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচিকে আরও কার্যকর করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে সবসময় সন্নিবেশ করে কাজ করবে। ইনস্টিটিউট মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা এবং পল্লী উন্নয়নের কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই বিভাগ কাজ করবে। তাছাড়া, ইনস্টিটিউট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীদের জন্য একটি উপযোগী প্রশিক্ষণ পরিবেশ তৈরি করবে। ইউএনডিপি, ফাও, ডব্লিউএফপি, আইএলও, সিরডাপ, সার্ক, আরডো, কৈইকা, কমসেক এবং জাইকা এর আর্থিক সহযোগিতায় এনআইএলজি এশিয়া প্যাসিফিক ও আফ্রিকা অঞ্চলের দেশসমূহ থেকে আগত কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করবে। এ বিভাগে একজন পরিচালক, একজন যুগ্ম-পরিচালক, একজন উপ-পরিচালক ও দুইজন সহকারী পরিচালকের পদ থাকবে। পরিচালক বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া এনআইএলজির অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এ বিভাগে একজন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ সহকারী) এবং বারোজন কর্মচারীর অনুবিভাগ থাকবে। যেহেতু এনআইএলজির পক্ষে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করা সম্ভব নয় বিধায় স্থানীয় সরকার সকল প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থার সমন্বয়ে ন্যাশনাল ট্রেনিং কাউন্সিল (এনটিসি) গঠিত হবে। এনটিসি'র মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার বা ইনিস্টিটিউটকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে এসে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কমিশনের চেয়ারম্যান এনটিসির চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করবে।

গবেষণা বিভাগ

ইনস্টিটিউটের গবেষণা বিভাগের প্রধান হিসেবে একজন পরিচালক থাকবেন। তিনি একজন যুগ্ম-পরিচালক, একজন উপ-পরিচালক, এবং একজন সহকারী পরিচালকের সহায়তা নিয়ে গবেষণা বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এছাড়া গবেষণা বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য একজন গবেষণা সহকারী, ৪ জন গবেষণা সুপারভাইজার, ৪ জন গবেষণা টেবুলেটর, ৮ জন তথ্য সংগ্রহকারী, একজন ব্যক্তিগত সহকারী (একজন স্টেনো-টাইপিস্ট/কম্পিউটার অপারেটর), একজন নিম্নমান সহকারী-কাম-কম্পিটার অপারেটর, এবং একজন পিয়ন/এমএলএসএস কর্মরত থাকবেন। এছাড়াও, বার্ড, ও বগুড়ার একাডেমির মত যেসব গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে তাদের সাথে ট্রেইনিং ও রিসার্চ নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। তাদের রিসোর্সপুল এনআইএলজির সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকবে। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিওর ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট ও ডোনার এজেন্সির সাথে একই নেটওয়ার্কে সংযুক্ত থাকবে। এসব প্রতিস্থানের সাথে কোঅর্ডিনেশন, কোলাবরেশন ও কমিউনিকেশনের মাধ্যমে কাজ করবে। বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে এনআইএলজির অফিস থাকার প্রয়োজন নেই। এতে সম্পদের অপচয় হবে। এর পরিবর্তে প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর থাকবে। প্রত্যেক জেলায় অধিদপ্তরের দশ (১০) জন করে লোকবল থাকবে। তাদেরকে এনআইএলজির টিওটি'র মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করতে হবে। বর্তমানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভৌত অবকাঠামোগত প্রশিক্ষণ বা গবেষণা একেবারে নেই বললেই চলে। এই বিষয়গুলো দেখতে হবে। অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হবার পর ব্যাপকভাবে সহকারী পরিচালক ও গবেষক নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে এনআইএলজি অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা এবং উন্নয়ন খাতের বিশেষজ্ঞদের অতিথি বক্তা হিসেবে course related lecture দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

পূর্নাঙ্গ অনুষদ পুর্নগঠন

এনআইএলজিতে অন্তত: নিম্নোক্ত নয়টি বিভাগের অধীনে ৫০ জন সাবজেক্ট ম্যাটার স্পেশালিস্ট নিয়োগ দিতে হবে। তাদের সাধারণ পদবি হবে অনুষদ সদস্য। তবে প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালক পদ মর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হবে। প্রতিটি বিষয় বার্ড এবং আরডিএর মত যুগ্মপরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকের পদ সোপান থাকবে। নিম্নোক্ত একাডেমিক বিষয় নিয়ে একাডেমিক বিভাগসমূহ গঠিত হবে। প্রশাসন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সেবা বিভাগ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু এ জন্য পৃথক কোন নিয়োগ হবে না। একাডেমিক ডিসিপ্লিনগুলো থেকে প্রতি ২/৩ বছরের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য দায়িত্ব পালন করবে। একাডেমিক ডিসিপ্লিন নিমোক্ত বিষয়ের জনবল থাকবে।

চাকুরি বিধি – নিয়োগ ও পদোন্নতি

সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা সর্বপ্রথম নিয়োগ হবে। প্রতিটি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর স্নাতক ও স্নাতোত্তর ডিগ্রী থাকতে হবে। প্রতিটি ডিসিপ্লিনে কমপক্ষে দুইজন করে নিয়োগ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থায় পদ না থাকলে সুনির্দিষ্ট চাকুরীকাল, গবেষণা, প্রকাশনা ও ক্লাস পারফরমেন্স এর দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগের প্রথম ৫ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় স্তর তথা উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি পাবেন। তখন সাময়িকভাবে সহকারী পরিচালকের পদসহ তিনি উপ-পরিচালক পদে অভিষিক্ত হবেন। এভাবে এ নিয়ম উচ্চপদ না থাকলে পরবর্তি পদোন্নতির একটি নীতিমালা তৈরি হবে।

প্রতিজন অনুষদ সদস্যের তিনটি কাজ পদ ও ডিসিপ্লিন নির্বিশেষে করবেন যথা এনআইএলজির প্রশিক্ষণে অবদান রাখা, স্থানীয় সরকারের তার ডিসিপ্লিন সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও প্রকল্প পরিচালনা এবং পদায়ন সাপেক্ষে প্রশাসন, গবেষণা ওপ্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার কাজ করা।

এনআইএলজির নতুন আইন ও সংগঠন কাঠামো তৈরির সময় বার্ড কুমিল্লা ও আরডিএ বগুড়ার আইন, নিয়োগবিধি ও সংগঠন কাঠামো অনুসরনযোগ্য হতে পারে।

সংযোজনী-৩

বাংলাদেশের সমবায় অধিদপ্তরের হালচাল

প্রেক্ষাপট

উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ ভারতে চরম দুর্ভিক্ষ থেকে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুর্বিপাককালে সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ১৮৭৫ সালে ভারতের দাক্ষিণাত্যে খাতক ও মহাজনদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা দেখা দেয়। ইংরেজ সরকার উক্ত দাঙ্গা ও অসন্তোষের কারণ খুঁজতে গিয়ে গ্রামীণ কৃষকদের অর্থনৈতিক দূরাবস্থাকে চিহ্নিত করেন, এবং নিজেদের স্বার্থে কৃষকদের সমস্যাগুলো দূরীকরণে উপযুক্ত পন্থা বের করার জন্য কয়েকটি কমিশন ও কমিটি গঠন করেন। এ সকল কমিটি ও কমিশনের মধ্যে ভারতের ভাইস রয় লর্ড কার্জনের নির্দেশে ১৯০১ সালে স্যার এডওয়ার্ডন্ন' এর নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে এবং ইংল্যান্ডের ইংলিশ ফ্রেন্ড সোসাইটি এ্যাক্টের আদলে ১৯০৪ সালে The Credit Cooperative Societies Act-1904 প্রণীত হলে এদেশে সমবায় সমিতিগুলো আইনগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করে।

১৯০৪ সালের উক্ত আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য কৃষকদেরকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে সার, বীজসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা এবং ঋণ প্রদান করা। আবার কৃষক সমবায় সমিতিকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রদত্ত ঋণের অর্থ আদায় করার জন্য। সরকার কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া এসব কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনটি সফল হতে পারেনি। অথচ তখন পর্যন্ত ইউরোপে স্বীকৃত সমবায় নীতিমালার আলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠা সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক আন্দোলন সফল হয়েছিল। এজন্য ১৯০৪ সালের আইনের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯১২ সালে ব্রিটিশদের হাতেই The Cooperative Societies Act-1912 নামীয় নতুন সমবায় আইন জারি হয়। এই আইনের আওতায় বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে অনেকগুলো উল্লখযোগ্য সমবায় সমিতি গড়ে উঠে। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালে তৃতীয় পর্যায়ে The Bengal Cooperative Societies Act-1940 জারি করা হয়। এই আইনের আগে ও পরে যেমন ব্যাংক ও সমবায় সমিতি বিধি প্রণীত হয় তেমনি আরও উল্লেখযোগ্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থায় স্বাধীন বাংলাদেশ সময়ে ১৯৮৪ সালে The Cooperative Societies Ordinance-1984 জারি করা হয়। অত:পর সর্বশেষে ২০০১ সালে সমবায় সমিতি আইন পাশ হয়; যা ২০০২ এবং ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়। এই সংশোধিত আইনটিই বর্তমানে চালু আছে। অন্যদিকে, ১৯৮৪ সালের অধ্যাদেশের সূত্রে ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা প্রণীত হয় এবং ২০২০ সালে সর্বশেষ সংশোধিত আকারে এখন অবধি বলবৎ আছে।

সমবায় অধিদপ্তর

বর্তমান বলবৎ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অতীতের ন্যায় সমবায় অধিদপ্তর নামীয় একটি অধিদপ্তর পূর্বের আইনের ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান রয়েছে। এই অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন নিবন্ধক ও মহা পরিচালক। তার নিয়ন্ত্রণাধীনেই দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় সমবায় কার্যালয় রয়েছে। এই অধিদপ্তরে বর্তমানে ৫,০৯০ টি বিভিন্ন শ্রেণির পদ সংবলিত একটি অনুমোদিত জনবল কাঠামো রয়েছে। উক্ত জনবল কাঠামোতে সমবায় অধিদপ্তরের জন্য ১৯৬টি পদ সমবায় ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত। বাকিগুলো ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তা-কর্মচারী। উল্লেখ্য, জেলা পর্যায় হতে ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদায়ন শুরু। উপজেলা পর্যায়ের (দ্বিতীয় গ্রেডভুক্ত) প্রধান কর্মকর্তা হচ্ছে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা। জেলা, বিভাগ, প্রশিক্ষণ একাডেমি পর্যায়ে ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও পদায়ন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের হাতে ন্যস্ত। কিন্তু প্রধান কার্যালয়ের পদায়নকৃত ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পদায়নসহ নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতির কর্তৃত্ব নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের হাতে ন্যস্ত। সমবায় অধিদপ্তর হচ্ছে আইন বলে নিবন্ধিত সকল

সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রক সংস্থা। নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবেই সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতির আইনানুগ ও বিধিসম্মত কাজগুলো করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে:

(১) দেশের সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠিকে সমবায় আদর্শ/দর্শনে উদ্বুদ্ধকরণ;

(২) নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা;

(৩) বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ী ও সমবায় কর্মকর্তাদের দক্ষতার মানোন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা সৃজনে সহায়তা প্রদান;

(৪) সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধ প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার-কর্মশালার আয়োজনসহ সমবায়ী ও সমবায় প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান;

(৫) পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সমবায়ীদেরকে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা; এবং

(৬) গ্রামীণ নারী ও সাধারণ জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

সমবায় পদ্ধতি

সমবায় হচ্ছে বিশ্বব্যাপী একটি আর্থ-সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা; যার মাধ্যমে স্বল্প পুঁজির মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ ও বিনিয়োগ সহায়ক একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সমবায় পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানদণ্ড বজায় রেখে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকে উৎসাহিত করা হয়। এজন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান একটি লাভজনক জনসংগঠন। এ ব্যবস্থা বর্তমান সমাজে বৃহৎ পুঁজির একচেটিয়া আধিপত্য এবং অসম্পূর্ণ বা অসম বাজার ব্যবস্থার ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে স্বল্প আয়ের মানুষদেরকে রক্ষা করতে পারে। সমবায়ের মাধ্যমে সাধিত ব্যাপক সামাজিক উদ্যোগ ও সামাজিক পুঁজির বিকাশ এবং সর্বোপরি প্রাথমিক উৎপাদনকারীর ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি ও মুনাফা নিশ্চিত করা যায়। ফলে একদিকে স্বল্প পুঁজির লোকদের দক্ষ বিনিয়োগ সুবিধা এবং অন্যদিকে, ভোক্তাদের ন্যায্য মূল্যে পণ্য ও সেবা পাওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির একটি উপায় সারাবিশ্বে সফলতার সাথে কাজ করে।

বাংলাদেশের সমবায় সমিতি

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০০৩) অনুযায়ী পর্যায়গত দিক থেকে তিন পর্যায়ের সমবায় সমিতি রয়েছে। যেমন-

(১) জাতীয় সমবায় সমিতি;
(২) কেন্দ্রীয় সমায় সমিতি;
(৩) প্রাথমিক সমবায় সমিতি;

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অর্থাৎ বিআরডিবি এর নিয়ন্ত্রণে ৪৮৯টি উপজেলায় বর্তমানে ১৪০৮ জনবল সমন্বয়ে রয়েছে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি। দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়ের বিদ্যমান কমপক্ষে দশটি প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতির প্রতিনিধি সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ে আছে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ)। এ সকল ইউসিসিএ এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বিদ্যমান রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক নামক সমবায় সমিতি সমন্বয়ে রয়েছে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক। সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে পয়ত্রিশ ধরনের সমবায় সমিতি বিদ্যমান। উক্ত পয়ত্রিশ ধরনের সমবায় সমিতির মধ্যে একটি

ধরন হচ্ছে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক। সমবায় সমিতি আইন ও বিধি অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রতিটি সমবায় স্বতন্ত্র অইনগত স্বত্ত্বাবিশিষ্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (body corporate) এবং আইন, বিধি এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত উপআইনের (by laws) শর্তানুযায়ী প্রতিটি সমিতির সাধারণসভা বা এজিএমই হচ্ছে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ।

সমবায় সমিতির পরিসংখ্যান;

২০২৪ সালের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বিদ্যমান সমবায় খাতের পরিসংখ্যান নিম্নরুপ:

(১) সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮২,০৭১ টি।

(২) ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২৪,৩০,৮৫৮ জন।

(৩) মোট কার্যকরী মূলধন ২,৯২,৪০৪.১৩ কোটি টাকা।

(৪) মোট সম্পদ (টাকায়) ১৩,২১০.৪৯ কোটি টাকা।

(৫) সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ১১,৩৭,৮৯৬ জন।

(৬) উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার আর্থিক মূল্য ৩,৫৬৭ কোটি টকা।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে বিআইডিএস কর্তৃক সম্পাদিত একটি গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী জিডিপিতে সমবায় খাতের অবদান ১.৮৮%।

সমবায় অধিদপ্তরের বাজেট ২০২৪-২০২৫

রাজস্ব খাতে = ৩০৭,১৭০০০০০.০০ টাকা

উন্নয়ন খাতে = ৮২,৪৬,০০০০০.০০ টাকা

মোট =৩৮৯,৬৩,০০,০০০.০০ টাকা

আগারগাঁওস্থ সমবায় ভবন নির্মাণের জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ৬২,১৫,২৯,০০০.০০ টাকা

সমবায় সমিতির কাজ :

(ক) আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতির উন্নয়ন;

(খ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজির সমন্বয়ে বিনিয়োগের জন্য বৃহদাকার মূলধন আকারে সৃষ্টি; এবং

(গ) কর্মসংস্থান ও মানব সম্পদ সৃষ্টি।

সদস্যদের নিজেদের জীবন মানোন্নয়ন আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিই জিডিপিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে সমবায় সমিতির প্রধান প্রধান কাজ হচ্ছে :

জাতীয় সমবায় নীতি

জাতীয় সমবায় নীতিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমবায় চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমবায়ী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে হবে। অন্যদিকে, সমবায় কার্যক্রমকে উৎপাদন পর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানীমুখী করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী সমবায়

বিশ্বব্যাপী সমবায় সমিতিসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কোপারেটিভ অ্যালাইয়েন্স (আইসিএ) এর ২০২৩ সালের তথ্য মতে বিশ্বব্যাপী সমবায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩০ লক্ষ। ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১০০ কোটি যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ। বিশ্বের বৃহত্তম ৩০০ সমবায় সমিতির বার্ষিক লেনদেন ২ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। অন্যদিকে ২০২৩ সালের ওয়ার্ল্ড

কোঅপারেটিভ মনিটরের তথ্যমতে ২৮ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে সমবায় সেক্টরে, যা বিশ্বের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ। সমবায় পদ্ধতির গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা বিবেচনা করে জাতিসংঘ ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেটিভস অ্যালায়েন্সের সহায়তায় সমবায় ব্যবস্থাকে বিশ্বব্যাপী টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ার জন্য পার্টনার হিসেবে গ্রহণ করেছে, এবং রেজলুশন করে চলতি ২০২৫ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। সমবায় বর্ষের প্রতিপাদ্য করা হয়েছে Cooperative Build a Better world.

সাংবিধানিক ব্যবস্থা

সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালিসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় সম্পর্কিত উল্লেখ ছিল নিম্নরুপ:

(১) ১টি জাতীয় সমবায় ব্যাংক, ৬২টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, ৪১০৭ টি ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি এবং ২৫,০০০ টি কৃষি সমবায় সমিতির পক্ষে দেশের মোট কৃষি ঋণ চাহিদার সামান্য অংশই পুরণ করা সম্ভব।

(২) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে দেশের ২৫০ টি থানা আই আর ডি পি এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে এবং ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষীদেরকে সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

(৩) আই আর ডি পি কর্তৃক অন্যান্য সমবায় সমিতি গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

টি আই বি এর জরিপ

২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে টি আই বি “সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন পেশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে সমবায় সেক্টরে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার ওপর গবেষণা ভিত্তিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশনসহ সমবায় সেক্টরের সম্ভাবনার বিষয়গুলোতে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করে।

(১) সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা যুগোপযোগীকরণ;

(২) সময় উপযোগী নীতি নির্ধারণ;

(৩) নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান সমবায় অধিদপ্তরের সংস্কার;

(৪) অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা;

(৫) সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি’র সমন্বয়;

পর্যালোচনা

(১) সমবায় অধিদপ্তর হচ্ছে বাংলাদেশের সমবায় সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০০% ভাগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার খুব অল্পই সমবায়ের বিকাশ ও উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেই অর্থে সময়ের চাহিদা/দাবি অনুযায়ী সমবায় সমিতি আইন ও বিধি সমবায় বান্ধব নয় বললেই চলে। অথচ সমবায়ের উন্নয়ন ও বিকাশকে চিন্তা করে নিবন্ধক পদবির সঙ্গে ২০১৩ সালে আইন সংশোধন করে মহাপরিচালক শব্দযুক্ত করা হয়েছে।

(২) আইনের বলে সমবায় অধিদপ্তর একটি সমবায় সমিতির নিবন্ধন থেকে শুরু করে যে কাজগুলো করে থাকে তা একটি সরকারি অধিদপ্তর তার অধীনস্থ দপ্তর-সংস্থার ওপর যেভাবে নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, মনিটর ইত্যাদি যে নিয়মে করে থাকে তা হওয়ার কথা নয়। কারণ প্রতিটি সমবায় সমিতি আইনগতভাবেই একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং আইন, বিধি ও উপআইনের আলোকে এর বার্ষিক সাধারণ সভাই হচ্ছে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। সূতরাং সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণসূত্রে কর্তৃত্ব এবং বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে সমবায় সমিতির অবাধ কর্তৃত্ব (Liberties) পারস্পারিক সাংঘর্ষিক।

(৩) প্রমোশনাল ওয়ার্ক হিসেবে যা করা হয় তা হচ্ছে কেবলমাত্র সমবায়ীদেরকে কুমিল্লায় অবস্থিত জাতীয় সমবায় একাডেমি এবং দেশের বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে অবস্থিত যোনাল প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে দেওয়া প্রশিক্ষণ। কোনো সেমিনার, কর্মশালা, দিবস উদযাপন খুব একটা দেখা যায় না। অথচ সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহীর পদবি হচ্ছে-নিবন্ধক ও মহাপরিচালক। অর্থাৎ এজন্যই মুখ্যত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকার সঙ্গে সাধারণত প্রমোশনাল কার্যক্রম একত্রে যায় না। লক্ষণীয় যে, প্রমোশনাল কাজের সঙ্গে জড়িয়ে মহাপরিচালক পদবি করা হলেও এই পদবিটা ছাড়া মাঠ পর্যায় পর্যন্ত অন্যান্য পদবিগুলো মহাপরিচালক পদবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক যে সকল দিবস ও কর্মসূচি বিশ্বব্যাপী প্রতিপালিত হয়ে থাকে সেগুলোর সঙ্গেও সমবায় অধিদপ্তরের সম্পৃক্ততা একেবারেই কম।

(৪) সমবায় সমিতি পর্যায়ে কাজ করে সমবায় সমিতির সদস্যগণ এবং তাদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীগণ। নিবন্ধনের পরে একটি সমিতির বার্ষিক অডিট করা ছাড়া মূলত: সমবায় অধিদপ্তরের কোনো কাজ নেই বললেই চলে। আবার সরকারি কোনো কর্মসূচি কখনও সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়ার নজীর নেই। অন্যদিকে, সরকারি প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সরকারের পক্ষে জাতি গঠনমূলক সংস্থাগুলো (Nation Building Departments) জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে প্রধানত কাজ করে বিধায় এসকল সংস্থার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে ক্যাডার কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা ও প্রয়োজনীয়তা বোধগম্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ মূলত: সরকারের কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচনসহ অন্যান্য জাতীয় দিবস পালনের সঙ্গে সাময়িকভাবে সম্পৃক্ত হয় মাত্র। এজন্য সমবায় সমিতিগুলোর কাজকর্ম দেখভালের জন্য সমবায় অধিদপ্তরে ক্যাডার সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। অন্যদিকে, স্বাভাবিকভাবে সমবায় ক্যাডার কর্মকর্তাগণও এ সকল কাজে অনীহা দেখায় ও হতাশ হয়। এজন্য ক্যাডার কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সমবায় ক্যাডার কর্মকর্তাদের ভূমিকা ও অবদান উল্লেখ করার মতো কিছু নাই যা অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ করে থাকে।

(৫) ১৯০৪ সালের আইন বলে তখন সরকারি কর্মকর্তাগণের উদ্যোগে যেমন বেশিরভাগ সমবায় সমিতি গঠিত হতো তেমনিভাবে এখন পর্যন্ত এই ধারা কমবেশি অব্যাহত। কিন্তু সমবায় নীতি অনুযায়ী স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠা ভিন্ন সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে পারে না।

(৬) সমবায় অধিদপ্তরের কোনো প্রকল্পই প্রতিষ্ঠিত কোনো সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় না, বরং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নতুনভাবে সমবায় কর্মকর্তাগণ সমবায় সমিতি গঠন করে এবং প্রকল্প শেষ হলে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে অতীতের ন্যায় সকল দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় সমবায় সমিতির উপর। এতে সমিতি অচল হয়ে পড়ে ফলে সমবায় পদ্ধতি সম্পর্কে বিদ্যমান ইমেজ সংকট আরও ঘণীভূত হয়।

(৭) সমবায় সমিতিগুলোর সঙ্গে সমবায় অধিদপ্তরের ইতিবাচক সম্পর্ক কাম্য থাকলেও সেই পরিবেশের ঘাটতি লক্ষ্যণীয়; যা সমবায় আন্দোলনকে বাধাগ্রস্থ করে।

(৮) সমবায় অধিদপ্তর হতে জাতীয় সমবায় একাডেমি এবং যোনাল ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে সরকারি বরাদ্দের আওতায় আয় বর্ধক ও সমবায় নিয়ম-নীতি সম্পর্কিত যে সকল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা মূলত: আইন-কানুন ও নিয়ম নীতি সম্পর্কিত। সমিতির আয়-বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণগুলো সরকারি বরাদ্দ ভিত্তিক হওয়ায় এগুলোর কার্যকারিতা কম। কারণ এসকল প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সমবায়ীদের স্ব-উদ্যেগ ও আর্থিক অংশগ্রহণ নেই।

(৯) অধিকতর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় সমবায়ীদের নিজস্ব মতামত দেয়ার উপযুক্ত প্লাটফরমগুলো- যেমন জাতীয় সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতি কোনো ভাবেই সমবায়ীদের পক্ষে সোচ্চার হতে পারছে না।

(১০) আইন কানুন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমবায়ীদের অংশগ্রহণ নামমাত্র বা আইওয়াশিং স্বরুপ। এজন্য আইন ও বিধিগুলো কেবলই আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের আধিপত্যে জর্জরিত।

(১১) বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত দ্বি-স্তর সমবায় সমিতিগুলো সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অডিট ও তদারকির অভাবে বর্তমানে অচল এবং অনেকটা বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অথচ ষাটের দশকে দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির সফলতায় উজ্জল দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছিল।

(১২) প্রতিটি সমবায় সমিতি আর্থ-সামাজিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সমবায় সমিতি কর্তৃক উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ বিষয়। অথচ প্রতিটি সমবায় সমিতিরই তাদের নিজেদের সদস্যদের নিজস্ব তহবিলের বাইরে সরকার বা ব্যাংক বা কোনো জাতীয়/কেন্দ্রীয় সমিতি হতে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ নেই। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক নামের একটি ব্যাংক থাকা সত্বেও ইহা কোনো তফসিলি বা বিশেষায়িত ব্যাংক না হওয়ায় দীর্ঘদিন থেকেই নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি সমিতি ব্যতিরেকে হাজার হাজার সমবায় সমিতির আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার আইন ও বিধিগত কোনো সুযোগই নেই। উল্লেখ্য, বিদ্যমান বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে বিশেষায়িত ও সিডিউল ব্যাংক উত্তীর্ণ করার প্রচেষ্টাও অতীতে কয়েকদফা বাধাগ্রস্থ হয়েছে। অথচ পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে সমবায়ের বিকাশের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক যোগান দেওয়া জরুরি এবং সেটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি পৃথক তফসিল ব্যাংক উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।

(১৩) সমবায়ের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হওয়া সত্বেও দেশে বিদ্যমান যে সকল সংস্থার আওতায় সমিতির আদলে বিভিন্ন জন সংগঠন পরিচালিত হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সমবায় অধিদপ্তর কার্যত: কোনো সমন্বয় সাধন করতে পারছে না। এজন্য দরকার সমবায়ের আদলে পরিচালিত জনসংগঠনগুলোকে সমবায় সমিতির ছাতার নীচে নিয়ে আসা এবং তাদের বিকাশের জন্য সমন্বয় জোরদার করা। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য যত জনসংগঠন রয়েছে সমবায় সমিতির ন্যায় সেগুলোকে আইনগত কাঠামোবদ্ধ করত: আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে এগুলোকে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমবায় সমিতি করতে হবে। তবে সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত সমিতিগুলো যেহেতু কল্যাণমূলক হওয়ার বাইরে কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত হওয়ার বিধিগত সুযোগ নেই সেহেতু এগুলো এই বিবেচনার বাইরে থাকবে।

(১৪) বিশ্বের অন্যান্য দেশের সমবায় পদ্ধতি অনেক সফল। আবার রয়েছে সমবায়কে কেন্দ্র করে অনেক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা। এদের সঙ্গে বাংলাদেশের সমবায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টতা দৃশ্যমান নয়। এমনকি সমবায় পদ্ধতিকে বিশ্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে জাতিসংঘকে পার্টনার করা এবং চলতি ২০২৫ সালেকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হলেও এ সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কোন তৎপরতা সমবায় অধিদপ্তর বা বিআরডিবির নেই।

(১৫) সদা পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমবায় পদ্ধতিকেও সমতালে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ অতীতে বিশ্ব মন্দাকালেও দেখা গেছে সমবায় পদ্ধতি মাথা উচু করে

দাঁড়িয়েছে। এজন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ সমবায় পদ্ধতিকে সময়োপযোগী করে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘও এ ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশেও সমবায় পদ্ধতি নিয়ে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। এজন্য জাতীয় স্বার্থে সমবায় পদ্ধতিকে আধুনিক, সমবায়ী বান্ধব ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত করতে যেখানে যেভাবে যতটুকু পরিবর্তন, সংশোধন ও সংস্কার দরকার তা করতেই হবে।

সংযোজনী -৪

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি): নিজের ভারে জর্জরিত একটি প্রতিষ্ঠান

ভূমিকা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ এলাকায় সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ এবং অধ্যাদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম একটি বৃহত্তম সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Body Corporate)। বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি হচ্ছে- গ্রামের দরিদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও নারীকে সমাবায়ভিত্তিক এবং বর্তমান প্রাকটিস অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠী হিসেবে সংগঠিত করে তাদেরকে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা এবং টার্গেট গ্রুপভূক্ত জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করা। বাংলাদেশের সমাবায়ভিত্তিক পল্লী উন্নয়নের প্রাণ পুরুষ ড. আখতার হামিদ খান অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক ষাঁটের দশকে পল্লী উন্নয়নের জন্য কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতির একটি মডেল উদ্ভাবন করেন। এই মডেলের আলোকে ড. খান সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্ষেপে আই আর ডিপি চালু করেন। কর্মসূচিটি সফলতা লাভ করলে সরকার তৎকালীন দেশের সকল থানাতে (বর্তমানে উপজেলা) এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আই আর ডিপি ভিত্তিক কার্যক্রমকে স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে আই আর ডিপি'কে ১৯৭৩ সনে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা' নামে সরকারের একটি উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দশ মাস পরে দাতাদের পরামর্শে সংস্থাটির বিলুপ্তি ঘটিয়ে পুনরায় আই আর ডিপি নাম বহাল করা হয়। অতঃপর বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে আইআরডিপির সকল কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৮২ একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা বিআরডিবি গঠন করা হয়। বোর্ডের মহাপরিচালক বিআরডিবির প্রধান নির্বাহী।

বোর্ডের গঠন

১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবেন যথাক্রমে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব/সিনিয়র সচিব। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, সমবায় অধিদপ্তর, বিসিক, পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় ফেডারেশন,দ্বি-স্তর সমিতিকে আর্থিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সমবায় ইউনিয়নে প্রতিনিধিগণ এই বোর্ডের সদস্য এবং বিআরডিবি'র মহাপরিচালক বোর্ডের সদস্য সচিব।

বোর্ডের কার্যাবলি

অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিআরডিবির প্রধান কাজ ছিল দ্বি-স্তর সমবায় সংগঠন সমূহ গঠন ও পরিচালনা। কালক্রমে বিআরডিবি দ্বি-স্তর সমবায় কর্মে শিথিলতা দেখায় এবং নানা বিকল্প সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক মনযোগী হয়ে পড়ে। সে অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিক গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, আধুনিক সেচ সুবিধার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লীবাসীর আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গ্রামীণ সকল সম্পদের সর্বোত্তম ও সর্বমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে দ্বিস্তর সমিতি ও দলকে নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা, উন্নয়নের মূল স্রোতে নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়ন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহয়তাকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম ও সরকারি-বেসরকারি সেবাসমূহের সমন্বয় সাধন, মৌসুমী অভাব মোকাবেলায় বিশেষ কার্যক্রম, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনে

সহায়তা, উন্নয়ন কর্মকান্ডে জন-অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণসহ বিবিধ কাজ। এছাড়া, উক্ত কাজগুলোর সম্পৃক্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পও বিআর ডিবি বাস্তবায়ন করে থাকে। আবার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে এগুলোকে কর্মসূচি আকারে অনেকগুলো কর্মকান্ড বিআরডিবি বাস্তবায়ন করে চলছে। ঢাকার কাওরান বাজারে নিজস্ব ভবন ছাড়াও দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলা ও উপজেলাগুলোতে বিআরডিবির মাঠ পর্যায়ে নিজস্ব অফিস, ৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৫৮টি গুদাম ঘর রয়েছে।

গবেষণা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা (বার্ড) ২০২৪ সালে "বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণায় বিআরডিবি'র নিম্নোক্ত সকল দিক ও দুর্বলতার দিক তুলে ধরা হয়:

সবল দিকসমূহ

(১) সারাদেশে বিআরডিবি'র ১,৭৬,০০০টি অসমবায় সমিতি রয়েছে। এগুলোকে যেমন আইনভিত্তিক সমবায় সমিতিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে তেমনি এগুলোর মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তাবায়ন করা সম্ভব। আবার বেশকিছু অসমবায় সমিতিতে নারী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এগুলোকে উপলক্ষ্য করে বিশেষ প্রকল্প ও কর্মসূচি গৃহীত হতে পারে।

(২) বিআরডিবি'র জেলা ভিত্তিক ৩টি বড় আকারের এবং ২৩টি উপজেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সংস্কার করে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।

(৩) সারাদেশব্যাপী ব্যাপৃত ১৫৮টি গুদামঘর ও ১৫০টি গভীর নলকূপকে মেরামত ও সংস্কার করে সৌরবিদ্যুতের আওতায় লাভজনকভাবে ব্যবহার উপযোগী করা যায়।

(৪) জাইকার সহায়তায় বিআরডিবি'র আওতায় পল্লী উন্নয়নের জন্য পিআরডিপি লিংক মডেল নামে পরীক্ষিত পল্লী উন্নয়ন মডেল রয়েছে।

(৫) বিভিন্ন সমবায় সমিতি ও সংগঠণের হাতে জমাকৃত বড় আকারের মূলধন রয়েছে। এগুলো একটি অনুমোদিত নীতিমালার আওতায় পল্লীর মানুষদের জীবন-মানোন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়।

(৬) বিআরডিবি'র আওতায় দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান বৃদ্ধিমূলক উন্নয়ন প্রকল্প যেমন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে তেমন বেশ কিছু সমাপ্ত প্রকল্প রাজস্ব খাতে কর্মসূচি আকারে চালু আছে। এগুলোকে একটি সমন্বিত কর্মসূচি আকারে চালু করা যায়। এতে অর্থ সম্পদ, মানব সম্পদ ও সময় সম্পদের সাশ্রয় ঘটতে পারে।

দুর্বলতাসমূহ

(১) বিভিন্ন অসমবায় সমিতিতে সদস্যদের মধ্যে বিনিয়োগের জন্য ঋণ চাহিদা থাকলেও তা মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব পরিলক্ষিত।

(২) জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও মেরামত, সংরক্ষণ ও আর্থিক বরাদ্দের অভাবে যথাযথভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।

(৩) বিভিন্ন জটিলতার কারণে সারাদেশে ৫২% সমবায় সমিতি এবং ৫৮% ইউসিসিএ অকার্যকর হয়ে বোঝাস্বরূপ হয়েছে।

(৪) বর্তমান সমবায় আদলে বিআরডিবির আওতাধীন দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির সংশ্লিষ্টতা কেবল সংখ্যা ছাড়া আর কিছু নেই। অথচ দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির ভিত্তিতে শুরু হওয়া আইআরডিপি এবং উক্ত আইআরডিপি রূপান্তরিত হয় বিআরডিবিতে। সমবায় সমিতি হওয়ায় এগুলোর রেজিস্ট্রেশন সমবায় অধিদপ্তরের হাতে এবং অডিটও সমবায় অধিদপ্তরের হাতে। অথচ এ সকল সমিতির নিয়মিত অডিট কার্যক্রম নেই।

(৫) বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির ঋণ বিতরণের সিলিং ও হার, প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী সহায়তা, প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালনা, জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পেনশন ও আনুতোষিক সুবিধা, শূন্য পদ পূরণ, নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের মধ্যে ভিন্নতা ও বিভিন্ন মুখিতা রয়েছে, যা অর্থ, সময় ও শ্রমের পুনরাবৃত্তি ও অপচয় ঘটছে এবং বিভিন্ন দলাদলির সৃষ্টি হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যঘাত ঘটছে।

বিআরডিবি'র বাজেট (২০২৪-২০২৫ সংশোধিত)

(১) পরিচালন ব্যয় (রাজস্ব খাত)	= ১৭৯,৩১,০০০০০.০০
(২) পরিচালন ব্যয় (উন্নয়ন খাত)	= ২৭৭,২০,০০০০০.০০
মোট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	**= ৪৫৬৫১০০.০০০.০০**

বিআরডিবি'র জনবল

মোট জনবল = ১০,৩৫৫ জন তন্মধ্যে
রাজস্বখাতে ৩,৪০৩ জন এবং প্রকল্পে ৬,৯৫২ জন।

পর্যালোচনা

১। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সংগঠন ভিত্তিক কাজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) মূল আইন কাঠামো ভিত্তিক দ্বি-স্তর সমবায় সংগঠন ভিত্তিক কাজ; এবং

(খ) আইন বহির্ভূত অন্যান্য সংগঠন ভিত্তিক কাজ, যথা দলভিত্তিক কাজ ও নানা দাতা সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ।

সমবায়ভিত্তিক সংগঠনের নাম হচ্ছে দ্বি-স্তর সমবায় সমিতি এর প্রথম স্তরে থাকে গ্রাম ভিত্তিক প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতি এবং এসকল প্রাথমিক সমিতির প্রতিনিধি সমন্বয়ে থাকে উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি যা উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা ইউসিসিএ নামে পরিচিত। বর্তমানে ৪৮৯টি উপজেলায় এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। একটি সমবায় সমিতি যেভাবে পরিচালিত হওয়ার কথা এগুলো কমবেশি সেভাবেই চলছে। এগুলোর ব্যবস্থাপনা বিআরডিবি'র হতে ন্যস্ত। এ সকল ইউসিসি এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন ফেডারেশন নামের জাতীয় সমিতি রয়েছে। অন্যদিকে, সমবায় সংগঠনের বাইরে অনানুষ্ঠানিক বা লিগ্যাল ফ্রেমের বাইরে যে সংগঠনগুলো থাকে তার মাধ্যমে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিবিধ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। কর্মসূচির প্রয়োজনে টার্গেট গ্রুপ আকারে এ সকল সংগঠন তৈরি করা হয়।

দ্বি-স্তর সমবায় সমিতিগুলোর মূল আর্থিক ভিত্তি প্রধানত দুই রকম:

(ক) সদস্যদের দ্বারা নিয়মিতভাবে পরিশোধকৃত শেয়ার ও সঞ্চয়; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক আলাদাভাবে এবং বিভিন্ন প্রকল্প সূত্রে প্রাপ্ত বরাদ্দ।

২। ১৯৮২ সালের যে অধ্যাদেশ বলে বিআরডিবি গঠিত সেই অধ্যাদেশের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বিআরডিবি'র আর্থিক সংস্থান সম্পর্কে নিম্নরূপ বিধানের কথা উল্লেখ আছে:

1) There shall be three funds of the board, The Rural Development fund, the special project fund and the board operation fund.

2) The rural development fund shall be utilized for changing the village based co-operative societies and TCCAs for their promotional, motivational and developmental activities.

উল্লেখ্য, উপরোক্ত ফান্ড ব্যতীরেকে অধ্যাদেশ অনুযায়ী স্পেশাল প্রজেক্টসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে চর্চা অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিকভাবে গঠিত সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ব্যয়িত হয়।

৩। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে সকল পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বা কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা আছে সেগুলোর মধ্যে প্রধান চারটি কাজের বর্ণনা নিম্নরুপ:

(ক) to promote village based primary co-operatives societies & TCCAs with a view to enabling them to be autonomous, self-managed and financially viable vehicles to increasing production, employment generation and rural development.

(খ) to promote functional cooperatives for generating income and employment for the poor.

(গ) to promote intensive irrigated agriculture as a means to Co-operative Development and also for efficient utilization through Co-operatives or irrigation facilities based on ground and surface water.

(ঘ) to channel and ensure Productive utilization of institutional credit through the village Co-operatives and the UCCAs to diversify activities specially in the marketing of agriculture inputs and produce as a service to their members.

৪। অধ্যাদেশ বা আইন অনুযায়ী বিআরডিবি'র সকল কাজ সমবায় ভিত্তিক হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকলেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এখানে সমবায় ভিত্তিক শক্তিশালী হওয়ার চাইতে এগুলো ক্রমশ: ক্ষীণতর হচ্ছে এবং সমবায় সংগঠনের বাইরে অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন ভিত্তিক কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটছে।

৫। অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন হলেও এর মাধ্যমে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নের নামে যেসকল কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তা কমবেশি সমবায় অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত সকল সমবায় সমিতিই কোনো না কোনোভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অর্থাৎ বিআরডিবি অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠণগুলো প্রকৃতপক্ষে সমবায়ের ভিত্তিতে গড়া কিন্তু সমবায় সমিতি নয়। সূতরাং এগুলোকে সহজেই সমবায় সমিতিরুপে বিধিবদ্ধ সংস্থায় উন্নীত করা যায়।

৬। বিআরডিবি সমবায় সংগঠন ও সমবায় সংগঠন নির্বিশেষে সরকারি ফান্ড তথা Rural Development Fund এবং Special Project Fund ব্যবহার করে যাচ্ছে।পক্ষান্তরে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন সমবায় সংগঠনগুলো শতভাগ নিজেদের শেয়ার, সঞ্চয় ও আমানত সূত্রে জমানো অর্থ দিয়েই তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করছে। বর্তমানে তাদের নিজস্ব তহবিল একটি বড় অংকের কোঠায় চলে এসেছে। অন্যদিকে, বিআরডিবি'র আওতাধীন সমবায় সংগঠনগুলোর নিজেদের তহবিলের পরিমাণ খুবই কম এবং সম্পূর্ণভাবে সরকারি ফান্ডের মুখাপেক্ষি।

৭। উপজেলা পর্যায়ে body corporate মর্যাদায় একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি'র প্রধান কর্মকর্তা প্রথমশ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে চিহ্নিত কিন্তু তারা সরকারি কর্মকর্তা নন। অন্যদিকে, সমবায় অধিদপ্তরের উপজেলা কর্মকর্তা সরকারি কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণিভূক্ত। এজন্য বিআরডিবি'র কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা না হওয়ায় সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নিজেদের মর্যাদাগত ঘাটতি দেখে। অন্যদিকে, সমবায় অধিদপ্তরের উপজেলা কর্মকর্তা সরকারি কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদায় উপজেলা পর্যায়ের কাজে যথাযথভাবে সমন্বয় করতে পারছে না বলেই প্রতীয়মান হয়।

সংযোজনী -৫(ক)
বাংলাদেশে এনজিও এর কার্যক্রম

বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (এনজিও) আর্থসামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিওগুলোর অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, মানবাধিকার রক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়নে এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এনজিওগুলোর কার্যক্রম সরাসরি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, সরকার ও এনজিওদের মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক। সরকারি সংস্থাগুলোর পক্ষে এককভাবে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। এই ঘাটতি পূরণে এনজিওগুলো উদ্ভাবনী ও টেকসই সমাধান নিয়ে কাজ করছে। নিচে বাংলাদেশে এনজিও সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হলো

বাংলাদেশে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর আওতায় নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা

বাংলাদেশে এনজিও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো থেকে নিবন্ধন নিতে হয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর অধীনে এ পর্যন্ত নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা ২,৬৪০টি। এর মধ্যে ২,৩৬৬টি দেশীয় এবং ২৭৪টি বিদেশি এনজিও।

সূত্র: এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো রিপোর্ট- জানুয়ারি ২০২৫

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে একটি এনজিও কাজ শুরু করতে হলে প্রথমে সরকারের নির্দিষ্ট সংস্থার অনুমোদন নিতে হয়। এটি সাধারণত দুটি পর্যায়ে হয়-

ক) স্থানীয় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও সমাজসেবা অধিদপ্তর জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ রেজিস্ট্রেশন থেকে নিবন্ধন নিতে হয়।

খ) আন্তর্জাতিক বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (INGO): তাদেরকে ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো (NGO Affairs Bureau) থেকে অনুমোদন নিয়ে কাজ করতে হয় এবং তাদের কাছে রির্পোট করতে হয়।

কিছু প্রধান নিবন্ধন ও তত্বাবধান কর্তৃপক্ষ

- সমাজসেবা অধিদপ্তর (স্থানীয় এনজিওর জন্য)

- সমবায় অধিদপ্তর (কো-অপারেটিভ সোসাইটির জন)
- জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ রেজিস্ট্রার (অ্যাসোসিয়েশন নিবন্ধন)
- এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো (NGOAB) (বিদেশি তহবিল গ্রহণকারী NGO এর জন্য)
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর স্থানীয় নারী সংগঠন ও সমিতির নিবন্ধন।

বিদেশি অনুদান গ্রহণকারী এনজিওকে FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) অনুযায়ী নিবন্ধন করতে হয়।

তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে।

(ক) দেশীয় উৎস:

- সরকারি সহায়তা ও অনুদান
- স্থানীয় কর্পোরেট সংস্থার CSR (Corporate Social Responsibility) ফান্ড
- সদস্যদের চাঁদা ও দান
- সামাজিক ব্যবসা (Social Business)

(খ) আন্তর্জাতিক উৎস:

- **দাতা সংস্থা:** UNDP, USAID, DFID, World Bank, ADB ইত্যাদি।
- **বহুজাতিক সংস্থা:** European Union, UNICEF, WHO ইত্যাদি।
- **বড় এনজিও:** Oxfam, Save the Children, CARE ইত্যাদি।
- **বিশ্বব্যাংক ও IMF-এর প্রকল্পভিত্তিক অনুদান**

বাংলাদেশে এনজিওগুলোর প্রধান কার্যক্রম

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (এনজিও) প্রধানত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের যাত্রা শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্গঠন, খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে দেশের মানবিক সংকট মোকাবিলায় এনজিওগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তারা শুধু ত্রাণ বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে শুরু করে। বর্তমানে তাদের কার্যক্রমের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়ে নিম্নোক্ত খাতগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

ক) শিক্ষা:

অনেক এনজিও এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষা বিস্তার। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিওগুলো বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা: এনজিও পরিচালিত স্কুল এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

- নারীদের শিক্ষা: মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে তারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষা: যারা শিশুকালে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি, তাদের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ: এনজিওগুলো যুব সমাজের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে, যা তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

খ) স্বাস্থ্যসেবা:

স্বাস্থ্যখাতে কিছু এনজিও'র অবদান অসাধারণ। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তুলতে তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

- মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য: গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ এবং নবজাতকের জন্য টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- পরিবার পরিকল্পনা: জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা: বিনামূল্যে চিকিৎসা, ওষুধ সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

গ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য এনজিওগুলো ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছে।

- মহিলাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি: নারীদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, যা তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করছে।
- কৃষিখাতে ঋণ সহায়তা: কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়, যাতে তারা কৃষি উৎপাদন বাড়াতে পারে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন: ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য মূলধন সহায়তা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ঘ) নারী উন্নয়ন, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার:

এনজিওগুলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং নির্যাতিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।

- নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষা: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা, পথশিশুদের পুনর্বাসন এবং শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে।
- আইনি সহায়তা প্রদান: দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়।
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি: নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার, শ্রমিক অধিকার এবং অন্যান্য সামাজিক ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়।

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা:

পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় এনজিওগুলোর উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ।

- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি: জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- টেকসই কৃষি উন্নয়ন: কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতির প্রসার করা হচ্ছে।

- দূষণ নিয়ন্ত্রণ: জল, বায়ু ও ভূমি দূষণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন গবেষণাধর্মী প্রকল্প পরিচালনা করা হচ্ছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পুনর্বাসন, নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে এনজিওগুলোর অবদান

বাংলাদেশে এনজিওগুলোর অবদান দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দৃশ্যমান। এসব এনজিও তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষেত্রে তাদের অবদান হল:

ক) দারিদ্র্য বিমোচন:
এনজিওগুলো ক্ষুদ্র ঋণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে দরিদ্র জনগণের আর্থিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে। এটি শুধু দারিদ্র্য হ্রাসেই সহায়ক নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেও বড় ভূমিকা রাখছে।

খ) শিক্ষা বিস্তার:
এনজিওগুলো বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যেখানে সরকারি শিক্ষার সুযোগ সীমিত। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, নারী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, ও যুব শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা শিক্ষার বিস্তার ঘটাচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করছে।

গ) স্বাস্থ্যসেবা প্রদান:
গ্রামীণ এলাকায় এনজিওগুলো স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যের মান উন্নত করছে। মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান কর্মসূচি, এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করছে।

ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন:
এনজিওগুলো নারীদের জন্য কর্মসংস্থান, শিক্ষা, ও স্বাস্থ্যসেবায় উন্নতি এনে নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন ঘটাচ্ছে। তারা নারীদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করছে বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে, যেমন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান। এইসব উদ্যোগ নারীদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে তাদের পরিবারের ও সমাজের জন্য বড় প্রভাব ফেলছে।

এছাড়া, এনজিওগুলো পরিবেশ রক্ষা, মানবাধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, এবং সামাজিক অবহেলিত জনগণের অধিকার রক্ষায়ও কাজ করছে।

এনজিওগুলোর প্রধান চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

বাংলাদেশে এনজিওগুলো যেভাবে দেশজুড়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তাতে কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এগুলো প্রধানত আর্থিক, প্রশাসনিক এবং পরিচালনাগত সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা তাদের কার্যক্রমের সফলতা ও স্বচ্ছতা ব্যাহত করতে পারে।

ক) চ্যালেঞ্জসমূহ:

- **সুশাসন ও জবাবদিহির অভাব:** কিছু এনজিওতে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। পরিচালনা পর্যায়ে জবাবদিহি এবং স্বচ্ছতার অভাব, বিশেষ করে তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে, এনজিওগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা কমাতে পারে।

- **অর্থায়নের অনিশ্চয়তা:** অধিকাংশ এনজিও বিদেশি অনুদান বা দাতা সংস্থার উপর নির্ভরশীল, যার কারণে অর্থায়ন দীর্ঘমেয়াদী ও স্থিতিশীল নয়। স্থানীয় তহবিলের অভাবও কার্যক্রমের চলমানতা নিশ্চিত করতে কঠিন হয়ে পড়ে।

- **কার্যক্রমের স্বচ্ছতার অভাব:** কিছু এনজিও প্রকল্পের বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারে না, যার ফলে কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠে। এতে এনজিওগুলোর কার্যক্রমের প্রকৃত প্রভাব জনগণের কাছে পরিষ্কার হয় না এবং তাদের কার্যক্রমে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

খ) চ্যালেঞ্জ সমাধানের উপায়:

- **সুশাসন নিশ্চিতকরণ:** এনজিওগুলো তাদের পরিচালনা পর্ষদ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে পারে। সঠিক নিয়মাবলি এবং পদ্ধতির মাধ্যমে দুর্নীতি কমানো, নিয়োগ ও তহবিল ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা উচিত। সরকারের পক্ষ থেকে শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।
- **অভ্যন্তরীণ সংস্কার:** কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা। সঠিক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা জরুরি। এনজিওগুলোর কর্মকর্তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া ও তাদের শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।
- **অর্থায়নের বিকল্প উৎস খোঁজা:** এনজিওগুলো স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের উপায় খুঁজে বের করতে পারে। সমাজের ধনী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের দানে নির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (CSR) তহবিলও ব্যবহার করা যেতে পারে। স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে আরও উন্নত অর্থায়ন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে স্থায়ী আর্থিক সহায়তা অর্জন করা সম্ভব।
- **কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি:** প্রকল্প বাস্তবায়ন, তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং প্রভাবমূলক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। এনজিওগুলো নিয়মিতভাবে তাদের কাজের অগ্রগতি, ফলাফল ও অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারে। এর মাধ্যমে জনগণ ও দাতা সংস্থাগুলোর বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। প্রজেক্টের প্রতি সমালোচনা ও নিরপেক্ষ তদারকি চালানোর জন্য আরও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এই সমাধানগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে, এনজিওগুলোর কার্যক্রম আরও সফল ও টেকসই হবে এবং সমাজে তাদের প্রভাব আরও দৃশ্যমান হবে।

সর্বোপরি, এনজিওগুলোর টেকসই ভবিষ্যতের জন্য তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এতে করে তারা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সংযোজনী -৫(খ)

বাংলাদেশে এমএফআই এর কার্যক্রম

এমএফআই (MFI) বা মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা দরিদ্র জনগণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বা মাইক্রো-ক্রেডিট প্রদান করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত ব্যাংকিং সেবা থেকে বঞ্চিত মানুষদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। এমএফআইগুলো তাদের গ্রাহকদের ছোট পরিমাণে ঋণ, সঞ্চয় সুবিধা, ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদান করে, যাতে তারা নিজেদের ব্যবসা শুরু বা বাড়াতে পারে এবং জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পায়। তবে বর্তমানে কিছু

এমএফআই তাদের ক্ষদ্র ও মিডিয়াম উদ্যোগী (এন্টারপ্রাইজ) ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদেরকে বড় ঋণ গ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে।

এমএফআই গুলোর লক্ষ্য হলো:

ক. **দরিদ্রতা বিমোচন**: মূলত নিম্ন আয়ের এবং সমাজের প্রান্তিক জনগণকে ঋণ প্রদান করে তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করা।
খ. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি**: যারা ব্যাংকিং সেবা থেকে বঞ্চিত, তাদেরকে আর্থিক সেবা প্রদান করা।
গ. **উন্নয়নমূলক কার্যক্রম**: বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোগে সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশে এমএফআইগুলো Microcredit Regulatory Authority (MRA) এর অধীনে নিবন্ধিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

এক নজরে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং এর মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগণকে আর্থিক স্বাবলম্বী করতে সহায়তা করা হচ্ছে। গত দশ বছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও এদের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এক নজরে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো-

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠাণের সংখ্যা: ৭২৪ টি
- শাখার সংখ্যা: ২৬,০৭১ টি
- সদস্য সংখ্যা: ৪.১৫ কোটি
- সঞ্চয়স্থিতি: ৬৮৫৯১ কোটি টাকা
- ঋণী সংখ্যা: ৩.২২ কোটি
- ঋণস্থিতি: ১৫৯৪১০ কোটি টাকা
- কর্মী সংখ্যা ২.৮৪ লক্ষ

সূত্র: MRA Annual Statistics Report- June 2024

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের অবদান

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য বিমোচন, নারী ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এই ঋণের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু ও সম্প্রসারণ করতে পারে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়ের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। বিশেষ করে, নারীরা ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করে পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নেও এটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে। যেমন-

- গ্রামীণ অর্থায়নের প্রায় ৮৫% যোগান আসে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে।
- জিডিপি-তে ক্ষুদ্রঋণ খাতের অবদান প্রায় ১৪%।
- বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৪০% কৃষি খাতে এবং ৩১% ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে বিনিয়োগ হয়।
- প্রতি বছর প্রায় ৮% উপকারভোগী উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে।

এছাড়া ক্ষুদ্রঋণের নিজস্ব আয় থেকে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়ে থাকে। যেমন

- স্বাস্থ্য কর্মসূচি।
- শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি।
- শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি।
- নারীর ক্ষমতায়ন।
- সচেতনতা ও আইনী সহায়তা।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮১৯ কোটি টাকা সামাজিক কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়েছে।

সূত্র: MRA Annual Statistics Report- June 2024

ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের বিদ্যমান তহবিলের উৎস

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো (MFI) নিজেদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বহুমুখী তহবিল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করে থাকে। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের প্রধান উৎসসমূহ হলো:

ক) সদস্য সঞ্চয় (৩৮%)

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির একটি বড় অংশ অর্থায়ন হয় ঋণগ্রহীতাদের সঞ্চয় থেকে। মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণগ্রহীতাদের নিয়মিত সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এই সঞ্চিত অর্থ থেকেই ঋণ বিতরণ করা হয়।

খ) মাইক্রোফাইন্যান্সের ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত (৩৪%)

প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে যে উদ্বৃত্ত অর্থ লাভ করে, তার একটি বড় অংশ পুনরায় বিনিয়োগ করে থাকে। এই উদ্বৃত্ত মূলধন মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমকে টেকসই করে তোলে এবং দীর্ঘমেয়াদে আরও বেশি মানুষকে ঋণ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়।

গ) ব্যাংকের ঋণ (১৪%)

অনেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং তা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ব্যবহার করে। ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে:

- প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ বিতরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- বৃহৎ আকারের ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।
- সাময়িক আর্থিক ঘাটতি পূরণ করা যায়।

ঘ) পিকেএসএফ-এর ঋণ (৬%)

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থায়ন সংস্থা। পিকেএসএফ এনজিওগুলোর মধ্যে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ করে এবং এর মাধ্যমে তারা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

ঙ) অন্যান্য তহবিল (৮%)

ক্ষুদ্রঋণের তহবিলের আরও একটি অংশ আসে বিভিন্ন দাতা সংস্থা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, সরকারি অনুদান এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি (CSR) থেকে। এসব তহবিলের মাধ্যমে:

- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ব্যপ্তি আরও বৃদ্ধি করা হয়।
- বিশেষ প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন সম্ভব হয়, যেমন জলবায়ু সহনশীলতা প্রকল্প, কৃষি ঋণ, যুব ঋণ ইত্যাদি।
- দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়।

সূত্র: MRA Annual Statistics Report- June 2024

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো (MFI) যেভাবে কাজ করে

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো (Microfinance Institutions - MFI) মূলত দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে থাকে, যা তারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা বা জীবিকা নির্বাহের কাজে ব্যবহার করে। এমএফআইগুলোর কাজ করার পদ্ধতি-

- গ্রুপ ভিত্তিক কার্যক্রম: সাধারণত ১৫-২৫ জনের একটি গ্রুপ তৈরি করা হয়। সদস্যদেরকে স্বতন্ত্র ঋণ দেয়া হয় তবে গ্রুপের সকলের সম্মতি প্রয়োজন হয় ও রেজুলেশন খাতায় তা লিপিবদ্ধ করা হয় যাতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ থাকে।
- স্বতন্ত্র ঋণ কার্যক্রম: কিছু ক্ষেত্রে উদ্যোগী সদস্যদেরকে স্বতন্ত্রভাবে ভর্তি করে স্বতন্ত্র ঋণ দেয়া হয়। এখানে গ্রুপের কোন কার্যক্রম হয় না।
- জামানতবিহীন ঋণ: প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া হয়।
- সাপ্তাহিক/মাসিক/এককালীন কিস্তিতে পরিশোধ: সহজ ও ছোট কিস্তিতে সাপ্তাহিক/মাসিক ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা থাকে। কিছু কৃষি ঋণ এককালীন পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় এমএফআইদের জন্য প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান (MFI) গুলো নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। যদিও ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তবুও বিভিন্ন আর্থিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জের কারণে কার্যক্রমে কিছু বাধা সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবন্ধকতাগুলোর কারণে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে, যা মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের লক্ষ্য পূরণে বাধাগ্রস্ত করে। কিছু প্রধান প্রতিবন্ধকতা নিম্নরূপ-

- তহবিল সংকট।
- দক্ষ কর্মীর অভাব।
- রেগুলেটরী আইন।
- পলিসিগত সমস্যার কারণে ডিজিট্যাল ফাইন্যান্সিং সিষ্টেমকে (ডিপিএস)যথাযথভাবে ব্যবহার করতে না পারা।
- গবেষণা ও হালনাগাদ তথ্যের ঘাটতি।

প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতাগুলোর উত্তরণে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, যা মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান (MFI) গুলোর কার্যক্রমকে আরও দক্ষ ও সফল করতে সাহায্য করবে। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সঠিক সুবিধা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে পারবে। এর মধ্যে রয়েছে:

- **তহবিল সংকট উত্তরণে-** এমআরএ কর্তৃক স্বেচ্ছা ও মেয়াদী আমানত উন্মুক্ত করে দেয়া। ব্যাংকের ঋণের সহজলভ্যতার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এমএফআইদের জন্য উপযোগী স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রস্তুত করা। পুঁজি বাজার থেকে তহবিল গ্রহণের ব্যাপারে এমআরএ প্রদত্ত শর্ত আরও সহজ করা। সরকার কর্তৃক এমএফআইদের জন্য স্বতন্ত্র বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের পলিসি ডেভেলপ করা যাতে সহজে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া তহবিল সংগ্রহ করা যায়।

- **দক্ষ কর্মীর অভাব নিরসন-** মাইক্রোফ্যাইন্যান্স কর্মীদেরকে উচ্চতর, মাঝারীমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। যুপোপযোগী শিক্ষা এবং ফাইন্যান্সিয়াল এ্যানালিষ্ট তৈরি করা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোফাইন্যান্সের উপর একাডেমিক সাবজেক্ট সংযোজন। InM এর মতো আরও ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলা যারা মাইক্রোফাইন্যান্স এর উপর ডিপ্লোমা কোর্স সহ নানামূখী প্রশিক্ষণ ও প্রফেশনাল কোর্স এর সার্টিফিকেট প্রদান করবে।
- **রেগুলেটরী আইন রিভিউ-** মাইক্রোফাইন্যান্স বিধিমালা রিভিউ করে বর্তমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিমালা প্রস্তুতের জন্য এমআরএ এর সাথে একটি উচ্চতর টেকনিক্যাল টীম গঠন করা। নতুন বিধিমালাতে বাংলাদেশে মাইক্রোফাইন্যান্স পরিচালনার ক্ষেত্রে সহজ করে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। প্রতি ৩-৪ বছর অন্তর বিধিমালা রিভিউ করা।
- **জিজিট্যাল ফাইন্যান্সিং সিষ্টেম (ডিপিএস)-** সরকার কর্তৃক এমএফআই এর জন্য স্বতন্ত্র সহজ ও সকলের জন্য উপযোগী পলিসি করা। ডিএফএস এর খরচ কে বহন করবে তা সুনির্ধারণ করা।
- **গবেষণা ও হালনাগাদ তথ্য-** মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি উন্মুক্ত ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা। নিয়মিত আপডেট নিশ্চিত করতে এমএফআই, বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করা।

উপসংহার

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals - SDGs) ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ, বৈষম্য হ্রাস, ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ১৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) এই লক্ষ্যগুলো অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে সরাসরি ও উল্লেখযোগ্যভাবে যেসকল লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখছে তা হলো-

- দারিদ্র্য বিমোচন (SDG 1: No Poverty)
- ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব (SDG 2: Zero Hunger)
- সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (SDG 3: Good Health and Well-being)
- মানসম্মত শিক্ষা (SDG 4: Quality Education)
- লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন (SDG 5: Gender Equality)
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন (SDG 6: Clean Water and Sanitation)
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান (SDG 8: Decent Work and Economic Growth)
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা (SDG 13: Climate Action)
- অংশীদারিত্ব ও উন্নয়ন সহযোগিতা (SDG 17: Partnerships for the Goals)

অন্যান্য লক্ষগুলো পূরণেও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে NGO ও MFI-রা অবদান রেখে চলেছে। যেমন- সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি (SDG 7: Affordable and Clean Energy), শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো (SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure), অসমতা হ্রাস (SDG 10: Reduced Inequalities), টেকসই নগর ও বাসস্থান (SDG 11: Sustainable Cities and Communities), টেকসই উৎপাদন ও ভোগব্যবস্থা (SDG 12: Responsible Consumption and Production), জলজ সম্পদের সংরক্ষণ (SDG 14: Life Below Water), ভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (SDG 15: Life on Land), শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions)।

বর্তমানে সকল এনজিও ও এমএফআই গুলো সমাজসেবা অধিদপ্তর ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অধীনে ব্যবস্থাপনা করা হয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রধানমন্ত্রী/প্রদান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন। এ ব্যুরো স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনে ন্যস্ত হতে পারে। তাতে মাঠ পর্যায়ে এমএফআই-দের কার্যকারীতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

অধ্যায়-পনেরো

পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও জবাবদিহি নিশ্চিতের জন্য বিরাজিত অনুবিভাগকে অধিদপ্তরে রূপান্তর

১. প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি শক্তিশালী অধিদপ্তর গঠন:

স্থানীয় সরকার বিভাগের বর্তমান কাঠামোর আওতায় দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩৩১টি পৌরসভা, ৬১টি জেলা পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ এবং ৪৫৭৯টি ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধদপ্তর(এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর(ডিপিএইচই) ওয়াসাসহ অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থা এ বিভাগের আওতাধীন। এ কারণে স্থানীয় সরকার বিভাগ দেশের একক মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে সবচেয়ে বড় মন্ত্রণালয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক, উন্নয়ন ও ক্রয় কার্যক্রম তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত বিধায় প্রতি অর্থবছর সম্পাদিত ক্রয় চুক্তির আওতায় এ বিভাগ হাজার হাজার ছোট-বড় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উক্ত বিশাল ব্যাপ্তির কার্যাদি পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়নের জন্য বর্তমান জনবল কাঠামোতে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ, বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকারের পক্ষে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়নের পর্যাপ্ত সক্ষমতা প্রত্যাশা অনুসারে নেই। এ প্রেক্ষিতে, এই অনুবিভাগের কার্যক্রমসহ প্রস্তাবিত অধিদপ্তর গঠনের লক্ষ্যে তথ্যাদিসহ কার্যকরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

২. পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ স্থানীয় সরকার বিভাগের ৬টি অনুবিভাগের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুবিভাগ। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে সরাসরি ও বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন এবং এ বিভাগের আওতাধীন চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ, সরেজমিন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি; ডিএলজি ও ডিডিএলজি এবং উইং এর অধীনস্থ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি নির্ধারণ এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন আইন/বিধি/আদেশ ও নির্দেশ জারি/বাস্তবায়ন, পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও নিয়োগ, বাজেট প্রণয়ন; কর্মতৎপরতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক দায়িত্ব পালন, প্রশিক্ষণ, কর্মশিবির ও সম্মেলন সেটআপের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের বেতন বরাদ্দ বাবদ অর্থছাড় এবং সকল জেলার উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এ বিভাগ থেকে সম্পাদন করা হয়।

৩. স্থানীয় সরকার বিভাগে বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য জনবল কাঠামো নিম্নরূপ:

প্রশাসনিক কাঠামো

অনুবিভাগ প্রধান	অধিশাখা	শাখা
মহাপরিচালক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখা	১. পরিবীক্ষণ-১ শাখা, ২. পরিবীক্ষণ-২ শাখা, ৩. পরিবীক্ষণ-৩ শাখা, ৪. মূল্যায়ন-১ শাখা, ৫. মূল্যায়ন-২ শাখা, ৬. মূল্যায়ন-৩ শাখা
	পরিচালক-১	পরিদর্শন শাখা
	পরিচালক-২	
	পরিকল্পনা অধিশাখা	১. পরিকল্পনা-১ শাখা, ২. পরিকল্পনা-২ শাখা, ৩. পরিকল্পনা-৩ শাখা

৩. অনুবিভাগে জনবল কাঠামো, কাজের বিস্তৃতি এবং কাজের পরিমাণ বিবেচনায় কর্মরত মহাপরিচালক, পরিচালক ও পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাগণ অস্থায়ী হিসেবে কর্মরত থাকেন এবং যেকোনো সময় অন্যত্র বদলী হওয়াটা একটি স্বাভাবিক বিষয় হওয়ায় সম্পাদিত কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয় না। এছাড়া অনুবিভাগ প্রধানের অন্যতম কাজ হিসেবে পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশ, কর্মী নিয়োগ, পরিচালনা, সমন্বয়, তথ্য পেশ, আয়-ব্যয় প্রভৃতি কার্যাদি দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না, যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মধারার সাফল্য ও দক্ষতা বাধাগ্রস্ত এবং সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াকরণকে বিলম্বিত করে। এ পর্যায়ে কার্যকর ও সর্বোত্তম বিবেচনায় স্থানীয় সরকার বিভাগের কাঠামো পুনর্গঠনের আওতায় পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ এর কার্যাদি সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর নামে একটি পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা হবে। নিম্নবর্ণিত কারণে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে;

- **প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ:** স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক কর্তৃত্বকে সঠিক মাত্রায় বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় অর্পণ করার মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যকরণ ও অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রচলন সহজতর করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার বিভাগ এমন কার্যাদি সম্পাদন করে যা স্থানীয় পরিষেবা, অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় একটি কার্যকর অধিদপ্তর গঠন হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি মনিটরিং ও নিরীক্ষাকরণের মাধ্যমে জনগণের চাহিদাগুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ এবং অগ্রাধিকার দেওয়া সহজ হবে।

- **বিশেষায়িত দক্ষতা:** স্থানীয় সরকার প্রশাসনের জন্য নগর পরিকল্পনা, স্থানীয় কর, স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী, গণপূর্ত এবং নাগরিক সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রয়োজন। একটি স্বতন্ত্র ও কার্যকর অধিদপ্তর হলে এ সকল বিশেষ দক্ষতা এবং জ্ঞানকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করবে। এছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় নতুন এ অধিদপ্তর গঠনের ফলে যোগ্যতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও কর্মী নিযুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

- **কার্যকর সম্পদ বরাদ্দ:** বর্তমান অবস্থায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপরীতে অর্থ বরাদ্দ হয়। অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত পরিচালক ও উপ-পরিচালকের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনায় কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এ পর্যায়ে অধিদপ্তরের স্বতন্ত্র জনবল কাঠামোর আওতায় যথাক্রমে পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হলে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার ও কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, তহবিল এবং কর্মী নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

- **জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা:** একটি বিশেষায়িত অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন এবং জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা স্থানীয় জনগণকে প্রভাবিত করে এবং সমস্যা সমাধানে অধিদপ্তরকে জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হয়।

- **সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন:** ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩৩১টি পৌরসভা, ৬১টি জেলা পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৪,৫৭৯টি ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সমন্বয় পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বর্তমান স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ এর পক্ষে সূচারুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। একটি পৃথক অধিদপ্তর সৃষ্টি হলে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত নীতিগুলো দেশব্যাপী সমানভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে এবং বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন, জাতীয় নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং স্থানীয় অভিযোজনকে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন:** একটি পৃথক অধিদপ্তর বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনকে শক্তিশালী করা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের জনগণের চাহিদা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষমতায়নকে তরান্বিত করবে।

- **নানা আর্থিক অনিয়ম:** আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কাজ করা, ক্ষমতা ও আইন বহির্ভূত কাজ ইত্যাদি নিরুপন ও তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক স্তর হিসেবে কাজ করবে।

- **সক্ষমতা বৃদ্ধি:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায়শই প্রশাসন, বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানিক ও জনসক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় একটি পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা হলে কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং তৃণমূল পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

- **নীতিগত সমর্থন:** সরকারের বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সমর্থন প্রয়োজন হয়। পরোক্ষভাবে এ সমর্থনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও সমর্থন প্রতিফলিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় সৃজিত অধিদপ্তর কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের কাছে জনগণের উদ্বেগগুলোকে কার্যকরভাবে জানাতে সক্ষম হবে।

- **পরিকল্পণা প্রণয়ন ও বাস্তাবায়ন:** স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় সৃজিত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনের স্থানীয় পরিকল্পণা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ করে কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি করা সহজ হবে।

৪. স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর এর মূল কাজসমূহ

উপজেলা, ইউনিয়ন, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলো একীভূত আইনের আওতায় বাধ্যতামূলক সেবা নিশ্চিতে তদারকি এবং সহায়তা করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এছাড়া জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকরভাবে অবদান রাখা এবং জনগণের চাহিদা পূরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রযুক্তিগত সহায়তা, নীতিগত নির্দেশনা এবং আর্থিক তদারকির পাশাপাশি অধিদপ্তর নিম্নরূপ ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য আইনগত এখতিয়ার প্রদান করা যেতে পারে:

- **নীতি বাস্তবায়ন:** স্থানীয় সরকারের নীতিসমূহ জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য এবং আইনি কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করা।

- **কারিগরি সহায়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি:** স্থানীয় সরকার কর্মীদের দক্ষতা ও জ্ঞান উন্নত করার জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি প্রদান করা।

- **সমন্বয়:** স্থানীয় শাসনের বিভিন্ন স্তর, যেমন উপজেলা, ইউনিয়ন, জেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় নিশ্চিত করা।

- সম্মতি ও নিরীক্ষা: স্থানীয় সরকারের আইন, আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রে তদারকি করা এবং আর্থিক (Financial) নিরীক্ষা(Audit), কর্মসম্পাদন নিরীক্ষা (Performance Audit), কমপ্লায়েন্স অডিট (Complience Audit) এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম নিরীক্ষণ করা।

- **জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতা:** সিদ্ধান্ত গ্রহণে নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, স্থানীয় প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং তথ্যে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার সহজতর করা।

- **মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতার পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পরিচালনা করা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা।

৫. প্রস্তাবিত অধিদপ্তরের জন্য কার্যকর পর্যবেক্ষণের নিম্নরূপ পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারে

- **তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন ব্যবস্থা:** স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর আওতাধীন সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ, কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ এবং নিয়মিত প্রতিবেদনের জন্য পরীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থা(এমআইএস) বাস্তবায়ন করতে পারে।

- **মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়:** প্রতিটি জেলায় কার্যকরভাবে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে শক্তিশালী মাঠ পর্যায়ে কার্যালয় স্থাপন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যাগুলোর নিবিড় তত্ত্বাবধান এবং দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে।

- **প্রযুক্তি:** ড্যাশবোর্ড, তথ্যভান্ডার এবং ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যারের মতো আইটি সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিষেবা, আর্থিক ব্যয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ট্র্যাকিং উন্নত করা যেতে পারে।

৬. প্রস্তাবিত অধিদপ্তরের জনবল, নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্মী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য জনবল বণ্টন কৌশলগতভাবে পরিকল্পনা করা উচিত যাতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো দক্ষতার সাথে সরবরাহ করা যায়। প্রতিটি স্থানীয় সরকার এলাকার আকার, জনসংখ্যা এবং নির্দিষ্ট চাহিদার উপর নির্ভর করে বণ্টন পরিবর্তিত হবে, তবে জনবল নিয়োগের রূপরেখা নিচে দেয়া হল:

- **মহাপরিচালক, স্থানীয় সরকার:** মহাপরিচালক, স্থানীয় সরকার অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে বিবেচিত হবেন। তিনি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম তদারকি করবেন। তিনি নীতি বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং বিভাগের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকবেন। অধিদপ্তরে ১ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, ১০ জন পরিচালক, ৭২ জন উপ-পরিচালক, ৭২ জন সহকারী পরিচালক এর পদ সৃজন করা যেতে পারে। প্রতিটি ইউনিটে ৫ জন সহায়ক কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে।

- অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোর আওতায় ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি জেলায় পদায়িত হবেন একজন উপ-পরিচালক। এ অধিদপ্তরের আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে কোন কার্যালয় বা দপ্তর থাকবে না। জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক-এর নেতৃত্বে ১০ জনের একটি ইউনিট কাজ করবে। তার মধ্যে একজন সহকারী পরচালক থাকবেন। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর ও অর্থ ব্যবস্থাপনা, শৃংখলা আনায়ন, বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক (স্থানীয় পরিকল্পণা) পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী কার্যকর বাজেট প্রণয়ন করতে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান করবে।

৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কার্যকর জনশক্তি বিতরণের মূলনীতি

প্রস্তাবিত অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অপারেশনাল ও মাঠ কর্মী নিয়োগের এখতিয়ার প্রদান করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে জনবল বন্টনের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে পরিকল্পনা এমনভাবে করা উচিত

যাতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো দক্ষতার সাথে সরবরাহ করা যায়। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত পরিষেবা বিবেচনায় বিশেষায়িত ব্যবস্থাপনা উন্নত করার প্রয়োজন হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কার্যকর জনশক্তি বন্টনের জন্য নিম্নরূপ নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে:

- **জনসংখ্যা-ভিত্তিক কর্মী নিয়োগ:** জনশক্তি বিতরণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনসংখ্যার আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। অধিক জনসংখ্যার বৃহত্তর এলাকায় মৌলিক পরিষেবা পরিচালনার জন্য আরও কর্মী প্রয়োজন হবে।

- **ভৌগোলিক বিস্তৃতি:** বৃহত্তর জেলা বা পৌরসভায়, সকল নাগরিকের কাছে পরিষেবা পৌঁছানোর জন্যে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিকেন্দ্রীভূত কর্মী বা স্যাটেলাইট অফিস স্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে।

- **বিশেষজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ:** কর্মীদের তাদের নিজ নিজ এলাকায় সুপ্রশিক্ষিত হতে হবে, আরও প্রযুক্তিগত বা পেশাদার কাজের জন্য বিশেষ ভূমিকা (যেমন, নগর পরিকল্পনাবিদ, জি,আই,এস বিশেষজ্ঞ, আর্থিক বিশ্লেষক) থাকা উচিত।

- **প্রযুক্তির ব্যবহার:** ডিজিটাল সরঞ্জাম (প্রয়োজনীয় সফট্ওয়ার) ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক প্রশাসনিক কাজ দূরবর্তী অবস্থান থেকে বা আরও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যেতে পারে, যার ফলে কর্মীরা মাঠ-ভিত্তিক এবং মানব-কেন্দ্রিক পরিষেবাগুলোতে মনোনিবেশ করতে পারবেন।

- **স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কর্মসম্পাদনে স্বেচ্ছাসেবা কর্মসূচিগুলোকে উৎসাহিত করা যার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সুসংহত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নিশ্চিত করা যায়।

- **বণ্টন:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মী নিয়োগ সম্পদ আহরণে দক্ষতা এবং স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা উচিত। জনবল বন্টনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্মী, বিভাগীয় প্রধান ও বিশেষজ্ঞ, অপারেশনাল ও মাঠ কর্মী, সহায়তা পরিষেবা, নাগরিক সেবা ও সহায়তা, বিশেষায়িত টাস্কফোর্স (বৃহত্তর শহর পৌরসভার জন্য), বিকেন্দ্রীভুত পরিষেবা (গ্রামীণ প্রত্যন্ত এলাকা বা ইউনিয়ন পরিষদ) ইত্যাদি অনুসারে নিয়োগ ও কর্মবিভাজন বিবেচনা করা যেতে পারে।

৮. পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন

স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর বা বিভাগীয় বা জেলা দপ্তরের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার ইউনিট যেমন উপজেলা, ইউনিয়ন, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়নের এখতিয়ার প্রদান করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে, জাতীয় নীতিমালার সাথে তাদের কার্যক্রমকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এবং প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানে অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর নিম্নরূপভাবে তত্ত্বাবধান করতে পারে:

ক. উপজেলা পরিষদ

অধিদপ্তর তার স্থানীয় বিভাগ ও জেলা অফিস অথবা মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের আওতায় বাস্তবায়নাধীন জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প, জনসেবা এবং শাসন প্রক্রিয়ার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। পরিদর্শনের মূল ক্ষেত্র হিসেবে নিম্নরুপ কার্যক্রমকে বিবেচনা করা যেতে পারে:

পরিদর্শনের মূল ক্ষেত্র

- **পরিষেবা প্রদান:** স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

- **বাজেট ও অর্থ:** উপজেলাগুলোর সম্পদ আহরণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, তহবিলের যথাযথ বরাদ্দ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।

- **সমন্বয়:** উপজেলা এবং উচ্চ-স্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর (জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন) মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

- স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা।

খ. ইউনিয়ন (গ্রামীণ স্থানীয় শাসন ইউনিট)

অধিদপ্তরকে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকারিতা মূল্যায়ন, জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার সাথে পরিষদের কার্যক্রম সমন্বয়, বাধ্যতামূলক পরিষেবা সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আইনগত এখতিয়ার প্রদান করা যেতে পারে। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় জেলা/বিভাগীয় দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, বিশেষজ্ঞ, পরিদর্শনের এখতিয়ার সম্পন্ন কর্মকর্তা হিসেবে মনোনিত হবেন এবং নিম্নরূপ বিষয় পরিদর্শনের মূল ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

পরিদর্শনের মূল ক্ষেত্র

- **শাসন ও প্রশাসন:** প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ ২০২৫ (ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯) ও পরিচালন বিধি অনুসারে কার্য সম্পাদনে স্বচ্ছতা ও সুশাসন;
- **জনকল্যাণ:** স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মতো স্থানীয় কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদানের তদারকি;
- **স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা:** ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততার পরিসর নিরুপণ।

গ. জেলা পরিষদ

পুনর্গঠিত জেলা পরিষদের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে কি না তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই অধিদপ্তরের জেলা ইউনিট জেলা পরিষদে ন্যায় সরকারি দপ্তরগুলোর কমপ্লায়েন্স মনিটর করবে। কাজ, কর্মী ও অর্থ ব্যবস্থায় সামঞ্জস্যতার উপর ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করবে। বিশেষভাবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন। নিম্নরূপ বিষয় পরিদর্শনের মূল ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

পর্যবেক্ষণের মূল ক্ষেত্র

- **আন্তঃস্থানীয় সরকার সমন্বয়:** জেলা পরিষদগুলো কার্যকরভাবে জেলায় হস্তান্তরকৃত দপ্তরগুলোর সকল কার্যক্রম নিয়মানুযায়ী দক্ষতার সাথে সম্পাদনে সক্ষম হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করবে।

- **প্রকল্প তদারকি:** বিশেষভাবে জেলা পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো জাতীয় কৌশলগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা।
- উপজেলা ও ইউনিয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যান্য কাজের তথ্য সংগ্রহ করবে।
- **নগর সেবা সম্প্রসারণ:** জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন নগর সেবা যথা: স্বাস্থ্য কর্মসূচি, শিক্ষামূলক উদ্যোগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সাধারণ পরিচ্ছন্নতা বাস, ট্রাক্সি রিক্সা স্ট্যান্ড ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা, যানাবহন ব্যবস্থাপনা, কল্যাণমূলক পরিষেবা বাস্তবায়নে পৌরসভা ও সিটিকরর্পোরেশনের উদ্যোগ পর্যবেক্ষণ করা।
- **রাজস্ব তদারকি:** জেলা পরিষদসহ সকল পর্যায়ের পরিষদ ও কাউন্সিলের তহবিল এবং বাজেটে আর্থিক জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- জেলা পর্যায়ের সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা।

ঘ. সিটি কর্পোরেশন

সিটি কর্পোরেশনগুলো বৃহত্তর আয়তন, জনসংখ্যা এবং জটিল নগর চ্যালেঞ্জের কারণে বিশেষায়িত তদারকি প্রয়োজন। অধিদপ্তরের আওতায় নগর পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, জনসেবা এবং অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়নের এখতিয়ার প্রদান করা যেতে পারে।

পরিদর্শনের মূল ক্ষেত্র

- **নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন:** নগরের জন্য কাঠামো পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণমূলক ভূমি ব্যবহারসহ ডিটেইল পরিকল্পনা প্রণয়ন। সিটি কর্পোরেশন আইন অনুসারে প্রণীত নগর পরিকল্পনা নির্দেশিকা, জোনিং আইন অনুসরণ এবং কার্যকরভাবে নগর উন্নয়ন পরিচালনার উদ্যোগ;
- **জনসেবা ও অবকাঠামো:** বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা, পানি সরবরাহ, রাস্তাঘাট এবং পরিবহনের মতো প্রয়োজনীয় নগর পরিষেবাগুলো পর্যবেক্ষণ করা।
- **নগরের সকল ফুটপাত দখলমুক্তকরণ পর্যবেক্ষণ:** ফুটপাত ও মুক্ত এলাকা জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী না থাকলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রথমে নোটিশ ও পরে নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করতে পারবে।
- **রাজস্ব সংগ্রহ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** সিটি কর্পোরেশন কর এবং অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরন এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- **সমাজ কল্যাণ:** জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক পরিষেবা এবং নিম্ন আয়ের নাগরিকদের জন্য আবাসনের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- খোলা ড্রেন ও সুয়ারেজ এর অবস্থা পর্যবেক্ষণে তাদের নিয়মিত প্রতিবেদনের অংশ হবে।
- ট্রাফিক সিগনাল ও যানবাহন শৃঙ্খলা বিষয়ে ট্রাফিক বিভাগের সহায়তায় পর্যবেক্ষণ তৈরি করবে।
- খেলার মাঠ ও পার্কসমূহের বহুবিদ ব্যবহার উৎসাহিত করার কার্যক্রমের উপর নযরদারী থাকবে।
- নগরের নানামূখি দূষণ ব্যবস্থার উপর একটি সূচি ও সূচক তৈরি করে তা পর্যবেক্ষণ করবে। এসব ব্যাপারে পরিবেশ অধিদপ্তরের সহায়তা গ্রহণ করবে।

৬. পৌরসভা

পৌরসভাগুলো সাধারণত ছোট নগর এলাকায় পরিষেবা প্রদান করে তবে অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, পরিষেবা সরবরাহ এবং নগর পরিকল্পনার মতো সিটি কর্পোরেশনগুলোর মতো একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। পৌরসভাগুলো নগর শাসনের জন্য সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো মেনে চলছে কি না তা পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করার এখতিয়ার প্রদান করা যেতে পার এবং এজন্য নিম্নরূপ ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

পরিদর্শনের মূল ক্ষেত্র

- **অবকাঠামো ও জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা:** পানি, রাস্তাঘাট, স্যানিটেশন এবং নিষ্কাশনের মতো মৌলিক অবকাঠামোগত পরিষেবা সরবরাহের তদারকি করা।
- **নগর ব্যবস্থাপনা:** পৌরসভা কার্যকরভাবে নগর স্থান, পাবলিক মার্কেট এবং আবাসিক এলাকা পরিচালনা করছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
- **রাজস্ব ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা:** যথাযথ রাজস্ব সংগ্রহ এবং বাজেট নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।
- **পরিষেবা প্রদান:** পৌরসভাগুলো বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ কর্মসূচির মতো পরিষেবা কতটা কার্যকরভাবে প্রদান করে তা পর্যবেক্ষণ করা।
- ভূমি ব্যবহারসহ স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা।

৯. পুনর্গঠিত স্থানীয় সরকার অধিদপ্তরের জন্য আইনি কাঠামো

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার জন্য বিস্তৃত আইনি কাঠামো প্রয়োজন হবে সরকারি চাকুরি আইন ২০১৮ (ধারা-৫) বিধান অনুসরণে স্থানীয় সরকার বিভাগের জনবল পুনর্গঠনপূর্বক অধিদপ্তর গঠন, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আইনি কাঠামোয় নিম্নরূপ উপাদান বিবেচনা করা যেতে পারে:

ক. আইনি ভিত্তি ও অনুমোদন

- **আইন প্রণয়ন:** স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদে একটি নির্দিষ্ট আইন অথবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং উক্ত আইনে অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য, পরিধি এবং ক্ষমতা সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজন হবে।
- **সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি:** অনুমোদনের পর, জনসচেতনতা নিশ্চিত করার জন্য অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সরকারি গেজেটের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করা যেতে পারে।

খ. উদ্দেশ্য ও আদেশ

- **উদ্দেশ্য:** আইনি কাঠামোতে অধিদপ্তরের উদ্দেশ্যগুলো নির্দিষ্ট করতে হবে, যেমন স্থানীয় শাসনব্যবস্থার উন্নতি, নির্দিষ্ট পরিষেবা প্রদান (যেমন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো), অথবা সম্পদ ব্যবস্থাপনা।
- **কর্মক্ষেত্র:** অধিদপ্তর যে আদেশ, কার্যাবলি এবং দায়িত্বগুলো পরিচালনা করবে তা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হতে হবে এছাড়া নীতি বাস্তবায়ন, পরিষেবা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রক তদারকি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

গ. কাঠামো ও সংগঠন

- **নেতৃত্ব এবং কর্মী নিয়োগ:** আইনি কাঠামোতে অধিদপ্তরের মধ্যে মহাপরিচালক ও পরিচালকের (এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদের) পদের রূপরেখা থাকা উচিত, যার মধ্যে যোগ্যতা, নিয়োগ পদ্ধতি এবং ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- **সাংগঠনিক শ্রেণিবিন্যাস:** অধিদপ্তরের কাঠামো সংজ্ঞায়িতকরণ, মহাপরিচালকের কাছে রিপোর্ট করবে এমন বিভাগ, বিভাগ বা ইউনিট এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করবে।
- **সহায়ক কর্মী এবং সম্পদ:** প্রশাসনিক ও কারিগরি কর্মীদের জন্য বিধান তৈরি করা নিশ্চিত করাসহ সম্পদ বরাদ্দ (তহবিল, অবকাঠামো, ইত্যাদি) এর নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঘ. কার্যাবলি ও ক্ষমতা

- **পরিচালন কর্তৃপক্ষ:** অধিদপ্তরকে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রবিধান জারি করার ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং ক্ষেত্র পর্যায়ে ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার প্রদান করা যেতে পারে।
- **কর্তৃত্ব অর্পণ:** অধিদপ্তরের মধ্যে নিম্নতর কর্মকর্তা বা ইউনিটগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা অর্পণের পদ্ধতি উল্লেখ করা যেতে পারে।
- **জবাবদিহিতা ব্যবস্থা:** অধিদপ্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করার এখতিয়ার প্রদান।

ঙ. আর্থিক বিধান

- **তহবিল:** অধিদপ্তরকে কীভাবে অর্থায়ন করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ (যেমন, স্থানীয় বাজেট, অনুদান, বা নির্দিষ্ট করের মাধ্যমে) সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।
- **আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** নিরীক্ষা, পারফরমেন্স অডিট, কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সহ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- **সম্পদ বরাদ্দ:** অধিদপ্তরের কার্যক্রমের জন্য কীভাবে সম্পদ বরাদ্দ এবং ব্যবহার করা হবে তা নির্দিষ্টকরণ।

চ. প্রবিধান ও নীতি

- **প্রশাসনিক পদ্ধতি:** লাইসেন্স, পারমিট বা অন্যান্য সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রক্রিয়া সহ অধিদপ্তর তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করবে তা সংজ্ঞায়িত করা।
- **জনসাধারণের সাথে মিথস্ক্রিয়া:** জনসাধারণের পরামর্শ, অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং জনগণের সাথে সম্পৃক্ততার জন্য একটি আইনি অধ্যায় থাকতে হবে।
- **সংবিধানে সংশ্লিষ্ট ধারা/আইনি বাধ্যবাধকতা:** অধিদপ্তরের কার্যক্রম বাংলাদেশ সংবিধানের স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট ধারা/নীতি/কৌশল এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বিশেষভাবে শ্রম, পরিবেশ এবং মানবাধিকারের মতো বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

ছ. প্রতিবেদন ও তদারকি

- **তদারকি সংস্থা:** আইনি কাঠামোতে স্থানীয় সরকার কমিশন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এর এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।
- **প্রতিবেদন প্রদান:** অধিদপ্তরকে তার কার্যক্রম, আর্থিক এবং অর্জন সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রাসঙ্গিকভাবে স্থানীয় সরকার কমিশন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে জমা দেবার বিধান নির্দিষ্ট করে দেয়া যেতে পারে।

জ. আন্তঃসরকারি সমন্বয়

- **অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা:** অধিদপ্তরকে অন্যান্য সরকারি সংস্থা (স্থানীয়, আঞ্চলিক, বা জাতীয়), বেসরকারি খাতের সংস্থা (এনজিও) এবং নাগরিক সমাজের সাথে সহযোগিতা করতে হতে পারে। এই সমন্বয় কীভাবে কাজ করবে তা কাঠামোর মধ্যে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।
- **জাতীয়/আঞ্চলিক নীতিমালার সাথে সম্মতি:** অধিদপ্তরের কার্যক্রম বৃহত্তর জাতীয় এবং আঞ্চলিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশেষ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা, নগর পরিকল্পনা, বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলোতে অধিদপ্তরের এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

ঝ. বিরোধ নিষ্পত্তি ও আইনি জবাবদিহিতা

- **বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া:** অধিদপ্তর এবং জনসাধারণ বা অন্যান্য সরকারি সংস্থার মধ্যে যেকোনো বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করা যেতে পারে।
- **আইনি দায়িত্ব:** অধিদপ্তর বা এর কর্মকর্তারা যদি তাদের আইনি কর্তৃত্বের বাইরে কাজ করে, সম্পদের অব্যবস্থাপনা করে, অথবা তাদের ম্যান্ডেট পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে আইনি পরিণতিগুলো নির্দিষ্ট করে দেয়া যেতে পারে।

ঞ. সংশোধন ও পর্যালোচনা

- প্রতি কয়েক বছর অন্তর অধিদপ্তরের কার্যকারিতা এবং প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করার জন্য এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করার জন্য বিধান সন্নিবেশিত করা যেতে পারে।
- **সংশোধন পদ্ধতি:** প্রয়োজনে আইনি কাঠামো সংশোধনের জন্য একটি স্পষ্ট পদ্ধতি উল্লেখ করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে অধিদপ্তরের পরিধি, কার্যাবলি বা কাঠামোতে পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ট. তথ্য অধিকার ও সম্পৃক্ততা

- **তথ্য অধিকার:** অধিদপ্তরের কার্যাবলি এবং পরিষেবাগুলোতে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতে একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- **পরামর্শ ব্যবস্থা:** স্থানীয় জনগণকে প্রভাবিত করে এমন নীতি এবং সিদ্ধান্তের উপর জনসাধারণের পরামর্শের জন্য আইনি ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

১০. বর্ণিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় পৃথক স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর গঠনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, আর্থিক অডিট, পারফরমেন্স অডিট ও কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনার জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন করতে হবে, এ লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে:

- কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এ সিডিউল ১-এ প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার ও প্রতিষ্ঠান বিভাগ অন্তর্ভুক্তি ও কার্যাদি নির্ধারণ। উক্ত বিধিমালার ২ (খ) অনুসারে স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা হিসেবে ঘোষণা;
- স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগের জনবল ও কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস করে নতুন অধিদপ্তর গঠন করার সুপারিশ করা হলো। এ লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে একটি আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা যেতে পারে।
- সৃজিত অধিদপ্তরে প্রশাসনিক কর্মীর পাশাপাশি আর্থিক নিরীক্ষা, পারফরমেন্স অডিট, কমপ্লায়েন্স অডিট, পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প/ কর্মসূচি মূল্যায়নের বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে।
- সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি কর্পোরেশন আইনে বর্ণিত কার্যাদি পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ মূল্যায়নসহ জনবল ব্যবস্থাপনা, বাজেট প্রণয়ন, এ অধিদপ্তরের আওতাধীন হবে।
- স্থানীয় সরকার কমিশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ এ অধিদপ্তরের তদারকিসহ প্রয়োজনীয় আইন কানুনের খসড়া তৈরি করবে।
- বিভাগীয় কমিশনারের জনবল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত পরিচালক এর পদ এবং ডেপুটি কমিশনার কার্যালয়ের জনবল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত উপ-পরিচালক এর পদ বিলুপ্ত হবে। নতুন সৃজিত অধিদপ্তরের আওতায় বর্ণনা অনুসারে পরিচালক ও উপ-পরিচালক পদ সৃজন এবং অনুন্য ১০ জনের একটি সংগঠন উপরে বিবৃত অধিদপ্তরের অধীনে প্রতিটি জেলায় কাজ করবে।
- এ অধিদপ্তর সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের, আয় ব্যয় ও সেবা কর্মের উপর প্রস্তাবিত আইনি কাঠামোর আওতায় প্রতিবছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।

অধ্যায়-ষোলো

জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের রূপরেখা:

বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন ব্যবস্থা বা বিধান নেই। পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়সমূহের বিভিন্ন সংস্থা আলাদা আলাদাভাবে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। পরিকল্পনার ভাষায় একে 'কমপারমেন্টালাইজেশন অব প্লানিং' বলে। এই পদ্ধতিতে সরকারি সংস্থা সমূহের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগের অভাবে দেশের কৌশলগত পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী (Vision) ও উদ্দেশ্য পূরণ বাঁধাগ্রস্ত হয়। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা হল দেশের বিভিন্ন সেক্টরের অবকাঠামো সমূহকে পরিকল্পিতভাবে নির্মাণের বিষয়ে কতগুলো সেক্টরাল নীতিমালার সমন্বয়ে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে এবং এটি হবে সকল মন্ত্রণালয়ের ভৌত অবকাঠামোর খাতভিত্তিক নীতি এবং এই নীতি অনুসরণ করে সকল খাতের ভৌত উপাদানসমূহের জন্য সঠিক ভূমি ব্যবহার নীতি অনুসরণ সম্ভব হবে। অঞ্চল সমূহের কাঠামো পরিকল্পনা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নীতি কাঠামো হিসেবে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ব্যবহৃত হবে। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার নীতির মূল প্রতিপাদ্য হবে দেশের সকল অবকাঠামোর স্বচ্ছ পরিকল্পনা ও ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।

জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়ায় সকল মন্ত্রণালয় ও অধিন্যস্ত সংস্থাসমূহ কারিগরি কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত থেকে তাদের নিজ নিজ সংস্থার বিষয়ে অবদান রাখবে। এটি সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সমূহকে সমন্বয় করার জাতীয় প্লাটফরম হিসেবে গণ্য হবে। যা সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হবে। প্রতি চার মাস অন্তর প্রধানমন্ত্রীর (সরকার প্রধান) সভাপতিত্বে এই কমিটির সভা হতে পারে এবং জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।[৫০] সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যে পর্যালোচনা সভা হয়, তার সিদ্ধান্ত দেশের সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিলের নিয়মিত ও ধারাবাহিক সময়ান্তর সভার মাধ্যমে দেশের সকল মন্ত্রণালয় ও তার অধিন্যস্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে সকল ধরনের অবকাঠামো নির্মাণসহ ভূমি ব্যবহারের বিষয়সমূহ সমন্বয় করা সহজতর হয়। নিম্নে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় উপস্থাপন করা হল।

২। ভৌত পরিকল্পনা:

২.১ ভৌত পরিকল্পনা হল সাধারণভাবে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রতিনিয়ত নির্মিত অবকাঠামোসমূহের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নীতি ও জাতীয় পরিকল্পনা। একটি দেশের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য ভৌত পরিকল্পনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ভৌত পরিকল্পনাকে ঘিরে তাদের আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনাসমূহ আবর্তিত হয়। নগরের সম্প্রসারণের সাথে দেশের প্রবৃদ্ধি, শহরের বাসযোগ্যতা, ভৌত পরিকল্পনা ও অবকাঠামো বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা জড়িত। অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির সাথে অবকাঠামোর চাহিদা ও নগরায়ণ প্রসার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়টি অবকাঠামো বৃদ্ধি ব্যবস্থাপনার কৌশল (Infrastructure Growth Management Strategy) অনুসরণ করে, নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ব্যবস্থাপনা করতে হয়। বাংলাদেশে নগরায়ণের ক্রমবিকাশের সাথে অবকাঠামো বৃদ্ধি ব্যবস্থাপনাকে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করে ভৌত উন্নয়নকে পরিচালিত করা হয় না।

---

[৫০] এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা ও উপযুক্ত উদাহরণ হিসেবে মালয়েশিয়ার ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিলের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। Town and country planning act-1976, National Physical Pln-2005, Ministry of Housing and Local Government, Malaysia.

২.২ স্থানিক পরিকল্পনা কাঠামোর মধ্যে অবকাঠামো বিনির্মাণের জন্য জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা (National Physical Plan) প্রণয়ন ও প্রয়োগের অনুপস্থিতি দেশকে ক্রমান্বয়ে অপরিকল্পিত উন্নয়নের পথে পরিচালিত করছে। সঠিক ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি ও অবকাঠামোর ধরন অনুসারে অনেক ক্ষেত্রেই স্থান নির্বাচনের বিষয়ে যথাযথ তথ্য বিশ্লেষণ না করে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সকল ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ বাংলাদেশে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মে সরকারি খাতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ সংস্থাসমূহ আলাদা আলাদাভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সংস্থাসমূহের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক মহাপরিকল্পনা আছে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নের জন্য ৫ বৎসর মেয়াদি মহাপরিকল্পনা আছে কিন্তু এই সকল মহাপরিকল্পনা কোন জাতীয় উচ্চতর সমন্বিত পরিকল্পনা অর্থাৎ জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা, জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা ও আঞ্চলিক কাঠামো পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয় না। একটি স্বতন্ত্র মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক ও জনবলের সামর্থ্য না থাকায় সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মহাপরিকল্পনাসমূহ যথাযথ নিয়মে বাস্তবায়িত হয় না, এর ফলশ্রুতিতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে চলছে এবং ক্রমান্বয়ে প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে এসব তথাকথিত মহাপরিকল্পনাগুলো (master plan) কিছু মুখচেনা কনসাল্টিং প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কারণে এ সব পরিকল্পনা তৈরিতে উদ্যোগী হয়। এখানে পৌর প্রতিষ্ঠানের জনগণ ও ঐ প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সক্ষমতা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও সামাজিক প্রয়োজন খুব কম বিবেচনা লাভ করে।

২.৩ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের মহাপরিকল্পনাসমূহের সমন্বয়ের জন্য সমন্বিত কোনো সরকারি দলিল বাংলাদেশে নেই। দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন সমন্বয় করার জন্য দেশব্যাপী প্রয়োগের জন্য যে সরকারি দলিল প্রয়োজন তা হল “ জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা” দলিল। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনাবিদদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কোনো কারিগরি দপ্তর বাংলাদেশে নেই। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুতিতে মন্ত্রণালয়ের পারস্পরিক কার্যকর সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে কোন সমন্বিত আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই। এর ফলশ্রুতিতে দৃশ্যমান যে প্রভাব তা হল Global Liability Index এ বিশ্বের ১৭৩ টি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ১৬৮। ঢাকা শহরে বসবাস করে আমরা সহজেই ঢাকার বাসযোগ্যতার ক্রমাবনতি উপলব্ধি করছি। একই কাজটি সারাদেশের সকল নগর ও গ্রামে সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশ দ্রুত কংক্রিটের বস্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সাথে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রশ্ন জড়িত। বাংলাদেশে সাধারণভাবে বিভিন্ন স্থানে অপরিকল্পিত উন্নয়নের অন্য একটি মূল কারণ হল অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টি পরিকল্পিতভাবে ভূমি ব্যবহারের সাথে সমন্বয় না করে যত্রতত্র ভাবে অবকাঠামো নির্মাণ করা। দেশের অপরিকল্পিত উন্নয়নের সাথে অবকাঠামো বৃদ্ধি ও ভৌত পরিকল্পনার বিষয়টি সাধারণ নাগরিকদের সহজে বোধগম্যের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বাজেট সম্পর্কিত একটি তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল।

২.৩.১ বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ কোটি টাকার অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। বর্তমান ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকার মোট বাজেটের মধ্যে উন্নয়ন বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ৮১ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা। এই উন্নয়ন বাজেটের শতকরা আনুমানিক আশি শতাংশ (৮০%) অর্থ সরকারি খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে। এটি কেবলমাত্র সরকারি খাতে অবকাঠামো নির্মাণের বর্তমান আর্থিক বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট। সরকারি খাতে প্রস্তাবিত বাজেটের বাইরেও দেশে বেসরকারিখাতে অনেকগুণ বেশি টাকা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় করা হয়। এই তথ্যটি শুনে হতবাক ও বিস্মিত হতে হয় যে বাংলাদেশে এত উন্নয়নের প্রচার ও কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য থাকলেও, বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় জাতীয়ভিত্তিক ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও

বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত কোন আইন ও নীতিমালা নেই। নেই ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করার জন্য পরিকল্পনাবিদ, ভূগোলবিদ, জিআইএস নিয়ে কার্যকর ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধিদপ্তর ও সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়। এ ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি রেকর্ড ও রাজস্ব নিয়ে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলেও ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। বাংলাদেশে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক ইতিহাস

৩.১ বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে ১৯৬৪ সালে জনসংখ্যা কেন্দ্রিকরণের কোন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের দ্রুত প্রবৃদ্ধি (Agglomeration) ও শিল্পকারখানা অপরিকল্পিত স্থানে নির্মাণের কথা বিবেচনা করে দ্রুত ভৌত পরিকল্পনার একটি সংস্থা তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা সরকারি মহলে অনুভূত হয়, যার মাধ্যমে বর্ধিত নগর এলাকা ও শিল্প এলাকার সমস্যার মোকাবেলা করা হবে বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৫ সালে ৫টি মৌলিক ভৌত পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (Urban Development Directorate) ও রাজউক, সিডিএ জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য "নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা আইন" প্রণয়ন করা। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করে একটি ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উপযোগী কার্যকরী অধিদপ্তর স্থাপনসহ জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠনের কথা দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) ভৌত পরিকল্পনা ও আবাসন অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছিল। উল্লেখিত অধ্যায়ে একটি দেশের ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে যে সকল মৌলিক আইন,কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন তা সুন্দর ও নিখুঁতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণিত মৌলিক আইন ও কৌশলগত বিষয়সমূহ হল:

- নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা আইন।
- নগর উন্নয়ন কৌশলপত্র।
- জাতীয় ভিত্তিক ভৌত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশল তৈরি করার বিষয় পর্যবেক্ষণ করা।
- আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার জন্য নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।
- শিল্প এলাকা ও নতুন জেলা সদর দপ্তরের জন্য পৃথকভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।
- আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে ভৌত পরিকল্পনা ও সমন্বয় কমিটি গঠন।

জাতীয় পর্যায়ে ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠন (National Physical Development Council.)
উপরের মৌলিক আইন ও কৌশলগত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পিত গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলাকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে হবে।

৩.২ ভৌত পরিকল্পনার মত অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দেশ স্বাধীন হওয়ার ৫৩ বৎসর পরেও অদ্যাবধি অবহেলিত। এখনও দেশে নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা আইন প্রণয়ন হয়নি এবং ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ও ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কারিগরি প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রায় ১৮ কোটি মানুষের একটি জনবহুল দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জাতীয়ভিত্তিক কোন আইন নেই। কার্যকরী কোনো অধিদপ্তর নেই। নেই কোনো মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব। অপরিকল্পিতভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্থানে ব্যক্তি ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে যে অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে যার কুফল সারাদেশ ভোগ করছে। সকল পর্যায়ে বৈষম্য সৃষ্টির অনেক কারণের মধ্যে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন না করাটাও একটি মূল কারণ।

বাংলাদেশে পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হল ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ না করা। দেশকে পরিকল্পিত ও বাসযোগ্য করার ক্ষেত্রে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম দ্রুত গ্রহণ করা এবং ভূমি ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরীর কোনো বিকল্প নেই। তিন ফসলী কৃষি জমির উপর রাতারাতি বহুতল আবাসিক ভবন উঠে যাচ্ছে। যার আবার পয়নিস্কাশনের কোন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।

প্রশ্ন হতে পারে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা উন্নয়নের সাথে জাতীয় ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার আইনের সম্পর্ক কী? একসময় বলা হতো সারা বাংলাদেশ একটা গ্রাম। এখন বলা যায়, সারা বাংলাদেশই এক ধরনের অপরিকল্পিত শহর। আমাদের আশংকা, আর দশ বছর পর সারা বাংলাদেশটা হয়ে পড়তে পারে একটি কংক্রিটের জঞ্জাল ও বস্তি। স্থানীয় বন্যা হবে এর নিত্য পরিণতি। পরিবেশ দুষণ হবে অসহনীয়। খোলা স্থান, মুক্ত গণপরিসর বলে কিছু থাকবে না। ক্ষত-বিক্ষত ও বেদখল হবে জলাভূমি, বনভূমি, প্লাবন ভূমি, পাহাড়, হাওর-বাওর, চর প্রকৃতি। ভূমির কোন পৃথক শ্রেণী থাকবে না। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই বিষয়টির রক্ষাকবচ হিসেবে স্থানীয়ভাবে অভিভাবকের ভূমিকায় উপনীত হতে হবে।

৪। বাংলাদেশ ও উন্নত/উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে জাতীয় সমন্বিত উন্নয়ন ধারার বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য

৪.১ একটি উন্নত/উন্নয়নশীল দেশে সমন্বিত উন্নয়নের জন্য সরকার পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যে ৩টি মৌলিক ধারায় সমান্তরালভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।কার্যক্রমসমূহ যথাক্রমে-

১। জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
২। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিলের মাধ্যমে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
৩। জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

বাংলাদেশে এই মৌলিক ৩টি ধারার মধ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ২য় ধারা অর্থাৎ জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যক্রমটি যথাযথ পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়ন করা হয় না। এটি বাস্তবায়নের জন্য নেই কোনো আইনি কাঠামো ও সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান। গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত উন্নয়নের দ্বিতীয় ধারাটি বাস্তবায়ন করানোর দায়িত্ব দেশের নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ ও প্রকৌশলীদের। উপরে বর্ণিত প্রথম ধারাটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন মাধ্যমে আমাদের দেশে ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সকল সরকারি সংস্থায় আর্থিক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কিন্তু ওপরে বর্ণিত দ্বিতীয় ধারাটি জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্বাধীনতার ৫৩ বৎসর পরেও কোন পরিকল্পনা আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

এদেশে জমি সুরক্ষায় কারও কোন মনোযোগ নেই। সর্বত্র কারণে অকারণে জমি নষ্ট করা হচ্ছে। এখন যেকোন জমির প্রতি ইঞ্চি ব্যবহারের পূর্বে ভূমি ব্যবহার ও ভৌত পরিকল্পনার আইন ও নীতিমালা বিবেচনা করতে হবে। কৃষি জমির ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা রীতিমত উদ্বেগজনক। ২০/২৫ বছর পর দেশে চাষের জমি জলাধার খাল-নালা ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকবে কি না ভেবে দেখার বিষয়।

৪.২ উন্নত বিশ্বে নাগরিকদের সেবা প্রদানের মূল চাবিকাঠি হল ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়ন। ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান কম বেশি সম্পৃক্ত থাকে। এই ক্ষেত্রে দেশের স্থানীয় সরকারসমূহ রাষ্ট্রের উচ্চতর ভৌত পরিকল্পনা বিষয়ক আইন ও নীতিমালা অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ের বিস্তারিত ভূমি ব্যবহারসহ সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অন্যদের নির্মাণ কাজে নজরদারী করবে। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কিছু তথ্য ও গৃহীত পদক্ষেপের কথা সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হল।

৫। একটি রাষ্ট্রের ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ওপরের কৌশলগত নির্দেশনাসমূহ একটি মৌলিক বিষয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে সুস্পষ্টভাবে ভৌত পরিকল্পনার বিষয়ে উপরের কৌশলগত করণীয় বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকলেও আমাদের বিগত সরকারসমূহ ও প্রশাসনযন্ত্র দেশের ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কোন একটি প্রাথমিক কাজও শুরু করতে পারেনি। একটি দেশ সমন্বিত ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ছাড়া পরিচালিত হলে অপরিকল্পিত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় নাগরিকদের সেবা প্রদানে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা। বাংলাদেশের সংস্থাপন বা মন্ত্রীপরিষদ প্রশাসনিক কাঠামোর কলেবর সবসময়েই বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রণালয়সমূহ সরকারের জনবল বৃদ্ধির মূল কাজটি করে থাকে। কিন্তু মন্ত্রণালয়টির এ বিষয়ে কোনো মূল্যায়নে নেই দপ্তর ও অধিদপ্তর প্রয়োজন নিরূপন, জনবল যৌক্তিকীকরণ, জনবল স্থানান্তর এসব বিষয়ে কোনো বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন নেই। সরকারের কাঠামোর হালনাগাদ করার কেনো উদ্যোগ নেই। আমাদের দেশ পরিচালনার জন্য আছে ‘রুলস অব বিজনেস।’ এই রুলস অব বিজনেস সময়ান্তরে সংশোধন ও পরিবর্তন হয়, হচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্রের সমন্বিত ভৌত পরিকল্পনার মত একটি মৌলিক বিষয় পরিচালনার জন্য করণীয় বিষয়সমূহ এখনও প্রশাসনিক কাঠামোতে সন্নিবেশিত না হয়ে অবহেলিত। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটিও একটি অন্যতম মূল কারণ।

৬। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে প্রণীত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের ২৭৭ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে পুনঃনামকরণ করে “ভৌত পরিকল্পনা পরিদপ্তর, নগর ও গ্রমীণ পরিকল্পনা পরিদপ্তর” করার কথা বলা হয়েছিল এবং এই অধিদপ্তর জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিলের সচিবালয় হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর্যালোচনায় বলা হয়েছে।

“A National Physical Planning Council should be formed to provide continuous guidance for all physical planning activities in the country and also to approve and modify plans prepared at different levels. The present Directorate renamed as “Physical Planning Directorate “or’’ Town and County Planning Directorate’’ will act as the Secretariat of the National Physical Planning Council. (Page-277, Second Five Year Plan (1980-85)”.

উপরে বর্ণিত এসব কার্যক্রমের কোনটিই বাস্তবায়ন না হওয়ায় এই দেশ পরিকল্পিত ভৌত পরিকল্পনার সিঁড়িতে এখনও পা ফেলতে পারেনি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ কাজটি আর ঐ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর নয় প্রস্তাবিত জনপ্রকৌশল সেবা অধিদপ্তর করতে পারে। কারণ ঐ অধিদপ্তর সারা দেশে বিস্তৃত নয়। লোকবল কম । তাই বিকল্প হিসেবে একত্রিত এলজিইডি ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর যা জনপ্রকৌশল সেবা অধিদপ্তর হিসেবে কেন্দ্রে থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত তাদেরকে পৃথকভাবে জনবল পুনঃসংগঠিত করে একাজের কারিগরি দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৭। বাংলাদেশে ১,৪৯,২১০ বর্গকিলোমিটার ভূমিতে প্রায় ১৭ কোটি ১৫ লক্ষ লোকের বাস। উন্নত বিশ্বের কোন কোন রাষ্ট্র আছে যা বাংলাদেশের চেয়েও আয়তনে বড় ও জনসংখ্যা অনেক কম। আমাদের জনসংখ্যা একটি সম্পদ এবং বৈচিত্র্যময়। যেহেতু একই ভাষায় সকল মানুষ কথা বলে তাই যে কোনো রাষ্ট্রীয় বিষয়ে দ্রুত ঐকমত্য পোষণ করা সহজ। প্রয়োজন শুধু সৎ, বিশ্বাসী, জ্ঞানী, দক্ষ ও আস্থাভাজন নেতৃত্ব। আমরা কর্মঠ জাতি, মানবতার প্রয়োজনে আমরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে ভালোবাসি। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন ধরনের যে সম্পদ আছে তা পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করলে বিশ্বের বুকে একটি সুখী, সমৃদ্ধশীল জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো অসম্ভব কিছু নয়। এই সমৃদ্ধিতে পৌঁছাতে হলে প্রয়োজন পরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বিত ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, তার সাথে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনসম্পৃক্ততা। প্রয়োজন দেশের ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক কাঠামোগত সংস্কার। নিম্নে বাংলাদেশের সমন্বিত ভৌত পরিকল্পনার সাথে ভূমি ব্যবহারের সমন্বয়ের একটি ধারণা সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হল।

৮। সমন্বিত ভৌত পরিকল্পনার সাথে ভূমি ব্যবহারের সমন্বয়

বাংলাদেশে অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের ফলে কৃষিজমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে। নানা অবকাঠামো নির্মাণ, যেমন আবাসন, বাজার, রাস্তাঘাট এবং কলকারখানা নির্মাণের জন্য কৃষিজমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের আশঙ্কা, বর্তমান হারে ভূমি ব্যবহার ও অপব্যবহার চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে কোনো কৃষিজমি অবশিষ্ট থাকবে না। গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৬৯ হাজার হেক্টর আবাদি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। কৃষিজমি হ্রাসের ফলে খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হতে পারে। এছাড়া, অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে এবং পানির স্তর নিচে নামছে।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় কৃষিজমি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার আওতায় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার নীতিমালায় সন্নিবেশিত করে ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখিত ভূমি সংরক্ষণ করা সহজ হবে। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার অনুমোদিত নীতিসমূহ জেলার কাঠামো পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত হয়ে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ভূমির সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নির্দিষ্টভাবে স্পষ্টীকরণ হবে। ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ হল। কৃষি, বনাঞ্চল, রাস্তাঘাট, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, উপকূলীয় অঞ্চল, আবাসন, নদী ও খাল, সেচ ও নিষ্কাশন নালা, পাহাড়, পুকুর ও জলাশয়, রেলপথ, চা ও রাবার এবং হর্টিকালচার বাগান ইত্যাদি। জাতীয় নদী কমিশন দেশের নদী সমূহের সীমানা নির্ধারণ করে দিবে। বন বিভাগ বনের শ্রেণিকরণ ও সীমানা নির্ধারণ করবে। সড়ক ও জনপথ, রেলমন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবাই কোনভাবে ঐ সব ভূমিতে কেউ কোন স্থাপনা করতে পারবে না এ মর্মে নির্দশনা জারি করবে যা কাউন্সিল অনুমোদন করবে। উপরে বর্ণিত ধরণ অনুযায়ী ভূমির শ্রেণিবিন্যাস জাতীয়ভাবে চিহ্নিত করে কঠোর আইন ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে সকল ধরনের ভূমির সংরক্ষণ ও ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন রোধ করা সহজতর হবে।

৯। পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায় পরিকল্পনাসমূহ ও তার মেয়াদ

স্থানিক পরিকল্পনা কাঠামোর আওতায় জাতীয় ভৌত ও নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা অনুসারে জেলা পরিষদ জেলার জন্য কাঠামো পরিকল্পনা (Structure Plan) তৈরি করবে। জেলার কাঠামো পরিকল্পনা অনুসরণে জেলার সকল স্থানীয় সরকারসমূহ তাদের নির্দিষ্ট এলাকার জন্য স্থানীয় পরিকল্পনা (Local Plan) তৈরি করবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে কাঠামো পরিকল্পনা তৈরি করার পরে স্থানীয় পরিকল্পনা তৈরি করবে। স্থানীয় পরিকল্পনাটি ভূমি ব্যবহারসহ একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা। সকল সরকারি সংস্থা এই সকল পরিকল্পনা প্রণয়নে সম্পৃক্ত থাকবে। কাঠামো পরিকল্পনার মেয়াদ হবে ২৫ বৎসর এবং স্থানীয় পরিকল্পনার মেয়াদ হবে ১০ বৎসর। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার মেয়াদ হবে ১০ বছর। প্রতি ৫ বছর পর পর দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে এই পরিকল্পনাসমূহ হালনাগাদ হবে।

১০। সমন্বিত ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ধারণা

একটি দেশকে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে পরিচালিত করার জন্য সঠিক ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়ে কেন্দ্র থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনাবিদদের নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা আছে। সঠিক ভৌত পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দিয়ে জাতীয়ভিত্তিক ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজসমূহ সম্পাদন করা হয়। এর মধ্যে অধিদপ্তর কাঠামোটি বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। একটি জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা অধিদপ্তর বাংলাদেশের সমুদয় জাতীয় পর্যায়ের কৌশলগত পরিকল্পনা দলিল

তৈরি করবে এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসরণে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় পরিকল্পনা তৈরি করবে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোসহ কার্যক্রমের বর্ণনা দেওয়া হল।

প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রস্তাবিত জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের নিম্নলিখিত পরিকল্পনাবিদ জনবল নিয়ে পরিকল্পনা অনুবিভাগ গঠন করে দেশের সমগ্র এলাকার জন্য ভৌত পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা যেতে পারে।

এই ভৌত অবকাঠামো জাতীয়ভাবে পরিবীক্ষণ করা এবং জাতীয় অবকাঠামো ও ভূমি ব্যবহার কাউন্সিলের কারিগরি সহায়তা পরিপূর্ণ প্রতিবেদন প্রদান নবগঠিত জনপ্রকৌশল অধিদপ্তর। তারা জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তৃণমূল পর্যায়ে পরিবীক্ষণ করবে।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ:

১. প্রধান পরিকল্পনাবিদ: পরিকল্পনা অনুবিভাগ পরিচালনা করেন এবং সমস্ত পরিকল্পনা কার্যক্রম তদারকি করেন।
২. উপ-প্রধান পরিকল্পনাবিদ (পরিকল্পনা):
৩. উপ-প্রধান পরিকল্পনাবিদ (উন্নয়ন):

গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলায় যে কোন বাড়িঘর ও স্থাপনা করার সময় তার পানি নিষ্কাশন, পয়ঃনিষ্কাশন জলপ্রবাহ সচল রেখে, জন চলাচল বিঘ্ন ঘটায় কিনা তা দেখেই যে কোন নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে কেউ কোথাও কোনো ছাড় পাবে না এবং নবগঠিত মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুর্নগঠিত জনপ্রকৌশল দপ্তর এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

দেশের সকল ভৌত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্তত: ১০ বছর নতুন ভূমি অধিগ্রহণ এক প্রকার সীল করে দিতে হবে। শুধু ২/৩ বছরের মধ্যে উৎপাদনে যাতে এরকম শিল্প কারখানা স্থাপন, খোলা মাঠ ও পরিসর তৈরি, নতুন বনভূমি সৃষ্টি, পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য নদ-নদী খাল খনন ছাড়া অন্যান্য কাজে নতুন করে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ সীল করে দিতে হবে। সরকারি দপ্তর যারা জমি দখল করে ভবন তৈরি করতে চায় সে জমিসমূহ ফেরত গ্রহণ করতে হবে। জলপথ বন্ধ করে সড়ক নির্মাণ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

উপ-প্রধান পরিকল্পনাবিদ (পরিকল্পনা) এর অধীনে বিভাগসমূহঃ

- নগর পরিকল্পনা বিভাগ: নগর পরিকল্পনা ও আঞ্চলিক পরিচালনা ।
- গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগ: গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনা।
- গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ: পরিকল্পনা নীতিমালা গঠনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করবে।
- স্থানীয় পানি সম্পদ সুরক্ষা ও উন্নয়ন বিভাগ: প্রকৃতি অনুসারে জমির সুরক্ষা ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবে।

উপ- প্রধান পরিকল্পনাবিদ (উন্নয়ন): এর অধীনে বিভাগসমূহঃ

- প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ: উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন তদারকি করবে।
- নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ: প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল মূল্যায়ন করবে।
- প্রযুক্তিগত সহায়তা বিভাগ: প্রযুক্তিগত সহায়তা ও সম্পদ প্রদান করবে।

জেলা পর্যায়ের পরিকল্পনা বিভাগ

- জেলা পরিকল্পনাবিদ: জেলার পরিকল্পনা বিভাগ পরিচালনা করেন।
- উপ-পরিকল্পনাবিদ: জেলার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনায় জেলা পরিকল্পনাবিদকে সহায়তা করেন।

জেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় ইউনিটসমূহ:[৪]

- শহুরে পরিকল্পনা ইউনিট: জেলার নগর প্রকল্প পরিচালনা করেন
- গ্রামীণ পরিকল্পনা ইউনিট: গ্রামীণ সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ করেন
- জিওস্পেশিয়াল ইউনিট: মানচিত্রায়ন ও স্থানিক তথ্য বিশ্লেষণ পরিচালনা করেন
- প্রশাসনিক ইউনিট: প্রশাসনিক কাজ ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা করেন

আপিল বোর্ড

- চেয়ারম্যান: পরিকল্পনা সংক্রান্ত আপিল বোর্ড পরিচালনা করেন।
- ডেপুটি চেয়ারম্যান: আপিল প্রক্রিয়া তদারকিতে চেয়ারম্যানকে সহায্তা করেন।
- প্যানেল সদস্য: আপিল পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষজ্ঞদের দল।
- নিবন্ধক: আপিলের ডকুমেন্টেশন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করেন।
- সচিবালয়: বোর্ডকে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করেন।

ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে[৫]

- উপ পরিকল্পনাবিদ: ইউনিয়ন ও উপজেলার পরিকল্পনা বিভাগ পরিচালনা করেন।

১।সহকারী পরিকল্পনাবিদ নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা উন্নয়ন ইউনিট

২।সহকারী পরিকল্পনাবিদ উন্নয়ন ও প্রয়োগ ইউনিট

৩। সহকারী পরিকল্পনাবিদ তথ্য ব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়ন ইউনিট।

পৌরসভা পর্যায়ে[৬]

উপ পরিকল্পনাবিদ পৌরসভা পরিকল্পনা বিভাগ পরিচালনা করেন।

১।সহকারী পরিকল্পনাবিদ নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা উন্নয়ন ইউনিট

২।সহকারী পরিকল্পনাবিদ উন্নয়ন ও প্রয়োগ ইউনিট

৩। সহকারী পরিকল্পনাবিদ তথ্য ব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়ন ইউনিট ।

সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের পরিকল্পনা বিভাগ[৭]

- প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সিটি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা বিভাগ পরিচালনা করেন।
- উপ- প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সিটি কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনায় প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ পরিকল্পনাবিদকে সহায়তা করেন।

সিটি কর্পোরেশন পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় ইউনিটসমূহ

- নগর পরিকল্পনা ইউনিট: জেলার নগর প্রকল্প পরিচালনা করে।
- জিওস্পেশিয়াল ইউনিট: মানচিত্রায়ন ও স্থানিক তথ্য বিশ্লেষণ পরিচালনা করে।
- প্রশাসনিক ইউনিট: প্রশাসনিক কাজ ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা করে।

১১। এই দেশে পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হল ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ না করা। দেশকে পরিকল্পিত ও বাসযোগ্য করার ক্ষেত্রে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম আশু গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই। প্রস্তাবিত জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইংয়ের মাধ্যমে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করানোর বিষয়ে ক্রমান্বয়ে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল বাংলাদেশে সকল মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থাসমূহকে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেঃ

১। বাংলাদেশের জন্য **"জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০২৫"** অনুমোদন করা;

২। প্রস্তাবিত জনপ্রকৌশল সেবা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইংয়ের জনবল কাঠামো অনুমোদন করে দ্রুত কার্যক্রম শুরু করা;

৩। জাতীয় পর্যায়ে সরকার প্রধানকে সভাপতি করে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠন করা;

উপরের প্রস্তাবসমূহকে কার্যকরভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে সমন্বয়হীন অপরিকল্পিত ভৌত উন্নয়ন থেকে পরিকল্পিত ভৌত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব। এমতাবস্থায় উপরের প্রস্তাবনাসমূহ কার্যকর করার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
"জাতীয় ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ২৫" প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খন্ডে যুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায়-সতেরো

বিবিধ বিষয়াবলি

(১) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও মানবাধিকার রক্ষায় স্থানীয় সরকার

দেশের উন্নয়ন, সুশাসন ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালীভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের একটি অন্যতম ভিত্তি হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার সামগ্রিক কর্মকান্ডের গুণগত মান, স্বচছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে, তৃণমূল মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ উপমহাদেশে স্থানীয় সরকারের এক দীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, দায়িত্বে অবহেলা, আত্মসাৎ ও ক্ষমতাসীনদের অন্যায় প্রভাবের কারণে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সফলতা ও অর্জন রয়েছে সেগুলোও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে স্থানীয় সরকারের শক্তিশালী ব্যবস্থাই পারে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে তরান্বিত করে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে 'স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন' গঠন করে। এ সংস্কার কমিশন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে কোন কোন খাতে কী ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জনগণের সবচেয়ে কাছের প্রশাসন। এ ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই পারে দেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটাতে। তবে এজন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে পর্যাপ্ত বাজেট, ক্ষমতা ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে।

স্থানীয় সরকার আইনে এসব ইউনিটের কাজ নির্ধারণ করা আছে। যেমন, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর তফসিল অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানের মৌলিক কার্যাবলির সংখ্যা ১১০। তদ্রুপ উপজেলা পরিষদে ৩১টি, জেলা পরিষদে ৬৩টি, পৌরসভায় ১৭২টি ও সিটি কর্পোরেশনে ২৪৮টি কার্যক্রমের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদ সমাজ-সম্প্রদায় দ্বারা আরোপিত প্রথাগত কিছু কাজ, সুনির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সম্পদ পায় সেইসব কাজ, বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিরোধ নিষ্পত্তির মত মাত্র ৪টি মৌলিক কাজ করে থাকে। অনুরূপভাবে উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ সমূহ এডিপি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু প্রকল্পে অর্থ বন্টনে সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়া পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলো নগরীর বর্জ্য নিষ্কাশন, রাস্তার আলো ও বাতি রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তা ও নর্দমা মেরামত বা নির্মাণ, জন্ম ও মৃত্যু সনদ ইস্যু, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করলেও প্রকৃত অর্থে তফসিলগুলোতে তালিকাভূক্ত অন্যান্য কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে না।

দেশে বর্তমানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্তরে স্তরে দুর্নীতি এত বেশি অনুপ্রবেশ করেছে, একটা কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে স্থানীয় সরকারের যেসব সক্ষমতা ও সেবা প্রদান করা দরকার সেই সেবা-সুবিধাগুলো এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে নগরের পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোতে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র চোখে পড়ে। সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি স্তরে (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ঠিকাদারদের দৌরাত্ম ও অনিয়ম, পরিবহন সেক্টরে দুর্নীতি, প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা ও অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি) দুর্নীতি এত বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে সেই দূর্বৃত্তায়নের বৃত্ত ভেঙে প্রকৃত নাগরিক সেবা প্রদান করা প্রায় দূরুহ হয়ে পড়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর কাছ থেকে নাগরিকেরা যেসব পরিষেবা পাওয়ার কথা, দুর্নীতি, অসততা ও দূর্বৃত্তায়নের কারণে তারা সেসব পরিষেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্নভাবে হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হচ্ছেন। সেবাভেদে দুর্নীতির ধরণও ভিন্ন। যেমন, দরিদ্র মানুষগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতেও ঘুষ প্রদান করতে হয়। এছাড়া রয়েছে জমিজমা সংক্রান্ত সনদ সংগ্রহ, বিচার ব্যবস্থায় চরম দুর্নীতি, উন্নয়ন কাজের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয় তার যথাযথ ব্যবহার না করে যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাত করা, প্রশাসনিক কাজে দুর্নীতি ও অনিয়ম, নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা ও নবায়ন, বিবাহ সংক্রান্ত, নারী নির্যাতন, পারিবারিক বিরোধ, হোল্ডিং ট্যাক্স, পরিচছন্নতাকর্মীদের বেতন কর্তন করে অর্থ আত্মসাত করা, প্রকল্পের বিলের টাকা ছাড় করাতে ঘুষ দিতে বাধ্য করা, দলীয় প্রভাব খাটিয়ে নিয়ম ভেঙে গাড়ি ব্যবহার করা ও গাড়ি মেরামতের নামে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাত করা, পৌরসভার গার্বেজ গাড়ি ভাড়া দিয়ে সেই টাকা মেয়র কর্তৃক আত্মসাত, ক্রয় কমিটির মাধ্যমে দ্বিগুণ দাম দেখানো, আপ্যায়ন খরচে দুর্নীতি ইত্যাদি।

বিগত সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে এতো বেশি দুর্নীতির আখড়া ও ব্যক্তিস্বার্থ কায়েমের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছিল যে, ‘২৪-এর জুলাই বিপ্লবের পর স্বৈরাচারী সরকারের পতনের সাথে সাথে সারাদেশের জনপ্রতিনিধিরাও পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যে, সরকার পতনের সাথে সাথে সরকার প্রধানসহ তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের দুই মেয়রের একজন বিদেশে পালিয়েছেন এবং অন্যজন কারাগারে।

২০১৬ সালের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর এক রির্পোটে[৫১] দেখা যায়- ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনে কীভাবে নাগরিকেরা দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন।
নিচে একটি সারণির মাধ্যমে তা দেখানো হলো-

সারণি-১৭.১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)
ইউনিয় পরিষদ	৮৫.৫	৩৫.৮	২১.০
পৌরসভা	৮.৪	২৭.৭	১৮.২
সিটি কর্পোরেশন	৬.৪	৪১.০	৩৬.৭
উপজেলা পরিষদ	০.৬	১৭.৮	৮.৬

এ দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের ভেতরে নয়, প্রতিষ্ঠানের বাইরেও অনানুষ্ঠানিকভাবে সংঘটিত হয়। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকা পর্যালোচনা করলে এ দুর্বৃত্তায়নের সীমা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে সেটা আরও স্পষ্ট হবে। ব্রাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর এক গবেষণায় দেখা গেছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে মোট হকারের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ এবং এ হকারদের কাছ থেকে বছরে প্রায় ২ হাজার ১৬০ কোটি টাকা চাঁদা আদায় করা হয়[৫২]। কিন্তু এ বিশাল পরিমাণ টাকা কোথায় যাচ্ছে সেটার হদিস পাওয়া যায় না। এ বৃহৎ চাঁদাবাজির সাথে ক্ষমতাসীন দলীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় বা নিজেরাই এ চাঁদাবাজির সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। কোনো কোনো সময় স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরাই এসব চাঁদাবাজদের প্রশ্রয়-আশ্রয় দিয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া প্রতিদিনের চাঁদাবাজিতে বেশ কয়েকটি সংঘবদ্ধ চক্রও সক্রিয় থাকে। এ চাঁদাবাজির সাথে রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশের সংশ্লিষ্টতাও আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ব্রাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর ‘দ্য স্টেট অব সিটিজ ২০১৬: ট্রাফিক কনজেশন ইন ঢাকা সিটি-গভর্নেন্স পারসপেক্টিভ’ শিরোনামের গবেষণা দলের প্রধান ড. মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ ডয়চে’ভেলেকে বলেন, আদায়কৃত চাঁদার টাকা মোট তিন ভাগে ভাগ হয়। এর মধ্যে

[৫১] “সেবা খাতে দুর্নীতি জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫”, টিআইবি, ২৯ জুন ২০১৬ সালে প্রকাশিত রিপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩৯

[৫২] প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০২২

পুলিশ পায় ৩০%, নিয়ন্ত্রক বা লাইনম্যানরা নেয় ৪০% এবং বাকি ৩০% নেয় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা[৫৩]। অবৈধ স্থাপনা ও ফুটপাত দখলের কারণে রাস্তা সংকুচিত হয়ে যায়। এতে পথচারিদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপারের কারণে বহু দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। বুয়েটের দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের (এআরআই) এর হিসাব মতে, সারা দেশে দুর্ঘটনায় নিহতের ৪৪% পথচারী এবং শুধু ঢাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে পথচারীর সংখ্যা ৪৭%[৫৪]।

অন্যদিকে, সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলররা ইন্টারনেট, ডিশ, ময়লা সংগ্রহ সহ সব ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবসায় জড়িত থাকায় এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ করে। এ নেটওয়ার্ক ব্যবসার মাধ্যমেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা নাগরিকদের একপ্রকার জিম্মি করে রাখে। অনেকে স্থানীয় নেতা ও কাউন্সিলর গ্যাং পুষে বাজার, ফুটপাত, জমিদখল ও হস্তান্তরসহ নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল করে।

স্থানীয় সরকার পরিষেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা নিয়েও অনেক অভিযোগ রয়েছে। প্রান্তিক পরিচয়ের কারণে তারা (ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী, ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী, বেদে, জেলে, মেথর, মুচি ইত্যাদি সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী) এসব প্রতিষ্ঠানের মৌলিক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। যেমন: কোনো দুর্যোগকালীন সময়ে সরকারি ত্রাণ সহায়তার জন্য এ জনগোষ্ঠীর লোকেরা ত্রাণ পেতে বিভিন্ন হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। জনপ্রতিনিধিদের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ জানাতে চাইলেও সংশ্লিষ্ট অফিসসের কর্মচারিদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর নানা ভাতা ও ক্যাশ ট্রান্সফারের ক্ষেত্রেও এ জনগোষ্ঠীকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা তাদের মৌলিক অধিকার হরণের সামিল। অথচ এসব কর্মসূচিতে জনপ্রতিনিধিদের ঘনিষ্টজন বা আত্মীয় স্বজন যারা আর্থিকভাবে স্বচছল তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষত: সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক বিভাগের কর্মী আরেক বিভাগ থেকেও ঘুষ ছাড়া কাজ করে না। আউটসোর্সিং এর কর্মীরা তার প্রধান শিকার। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার এসব প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি রোধ করার লক্ষ্যে কমিশন কতিপয় সুপারিশ পেশ করছে।

সুপারিশমালা:

১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি রোধ করতে হলে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে করা, যাতে আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা থাকে। বিশেষত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শতভাগ লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে করতে হবে। একইসাথে নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রেও (সরকারিভাবে নির্ধারিত সীমা) মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে লেনদেন করতে হবে।

২) যেকোন প্রকল্পের প্রাক্কালিত ব্যয় প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর জনসমক্ষে প্রকাশ করা। অর্থাৎ ভৌত ব্যয় ও কাজের অগ্রগতির তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডেও মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর পারফরম্যান্স অডিট ও আর্থিক নিরীক্ষা না হলে বা নিরীক্ষায় অসস্তি ও অনিয়ম ধরা পড়লে সরকারি অনুদান স্থগিত ও দায়িত্বে অবহেলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৪) দুঃস্থ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ডিজিটাল কার্ড চালু করা, যাতে প্রকৃত সুবিধাভোগীকে সহজে চিহ্নিত করা যায় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি রোধ করা যাবে।

[৫৩] ডয়চে ভেল, ১৩ জুন ২০২৪

[৫৪] প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০২২

৫) সিটি কর্পোরেশন থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদের তৃণমূল পর্যায়ে ই-টেন্ডারিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে দুর্নীতি রোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬) সেবাদান প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্বচছতা ও জবাবদিহিতা আনার লক্ষ্যে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করে সেবার মান বাড়াতে হবে। এতে উভয় শ্রেণিকে দায়বদ্ধতার মধ্যে আনা সম্ভব হবে।

৭) দুর্নীতি রোধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

৮) পরিষদসমূহের স্থায়ী কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সব পরিষদ ও কাউন্সিল সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার থাকতে হবে।

৯) বছরে উপজেলার ৩(তিন) টি ওয়ার্ডে ৩(তিন) টি ভোটার ফোরামের সভা হবে। সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভার প্রধানগণ এবং সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য ভোটারদের কাছে তাদের কাজের জবাবদিহি করবেন।

১০) প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ মানবাধিকারের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। নিজ নিজ এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনার রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনা প্রতিকারের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষর স্মরণাপন্ন হবেন।

১১) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারিদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের মাধ্যমে তাদের নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করা। এতে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে স্বচছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

১২) আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিজন জনপ্রতিনিধিকে তদন্তের আওতায় ও দোষী সাব্যস্থ হলে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

(২) স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দের সমিতি/এসোসিয়েশন

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হলো নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ নানা সময়ে নানা নীতিগত প্রশাসনিক, সাংগঠনিক, আইনগত ও অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নানারুপ অসুবিধার সম্মুখীন হন। এ প্রেক্ষাপটে, একটি শক্তিশালী সমিতি বা এসোসিয়েশন টেকসই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জাতীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে, যা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে, এর উন্নয়ন ঘটাতে এবং জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের স্বার্থ রক্ষা করতে সহায়ক হতে পারে।

স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন মূলত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম। এর প্রধান লক্ষ্য হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমর্থন করা, তাদের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং জাতীয় সরকারের কাছে স্থানীয় সরকারের প্রয়োজন ও দাবি তুলে ধরা। স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন- স্থানীয় সরকার এবং জাতীয় সরকারের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ

সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে। স্থানীয় সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করা, জাতীয় সরকার এবং অন্যান্য অংশীজনদের কাছে স্থানীয় সরকারের স্বার্থ তুলে ধরা স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন-এর অন্যতম প্রধান কাজ। এছাড়াও, নানা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও নেটওয়ার্কিং বাড়ানো, যাতে তারা একে অপরের কাছ থেকে ভালো কাজগুলো শিখতে ও ভাগ করে নিতে পারে, সেক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় সরকারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নত সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, তথ্য এবং প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের জন্য সহায়ক নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে প্রভাব বিস্তার করাও স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের 'লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন' (এলজিএ), ৩১৭টি ইংলিশ কাউন্সিল এবং ২২টি ওয়েলশ কাউন্সিলের সমন্বয়ে গঠিত, যা স্থানীয় সরকারের জাতীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত। এই সংস্থাটি জাতীয় সরকারের কাছে স্থানীয় সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল এবং ক্ষমতা আদায়ে সর্বদা সচেষ্ট। শুধু তাই নয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনাম বৃদ্ধি এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়েও সহায়তা করে থাকে। নেদারল্যান্ডসের 'অ্যাসোসিয়েশন অফ নেদারল্যান্ডস মিউনিসিপ্যালিটিস' (ভিএনজি), যা ১৯১২ সালে ২৮টি ডাচ শহর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, বর্তমানে ৩৪২টি ডাচ পৌরসভার স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে চলেছে। ভিএনজি, ভিএনজি ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতেও ভূমিকা রাখে। অস্ট্রেলিয়ান লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (এএলজিএ), দেশের ৫৩৭টি কাউন্সিলকে প্রতিনিধিত্ব করে, নানা জাতীয় সংস্থায় স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে এবং স্থানীয় সরকারের উদ্বেগকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরে। মালয়েশিয়ার 'মালয়েশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ লোকাল অথরিটিজ' (মালা), ২০০০ সালে গঠিত, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও ভাবমূর্তি বাড়াতে এবং স্থানীয় সরকারগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করতে কাজ করে। এমনকি ভারতের কেরালা রাজ্যেও 'গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি' ১৯৬৬ সাল থেকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে গবেষণা, আলোচনা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। 'কেরালা ইনস্টিটিউট অফ লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (KILA), স্থানীয় সরকার সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, স্থানীয় সরকার এবং বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন কেবল একটি সংস্থা নয়, এটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন স্থানীয় সরকারের স্বার্থ রক্ষা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এখনও দুর্বল এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়শই সীমিত ক্ষমতা, অপর্যাপ্ত তহবিল এবং জাতীয় সরকারের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এ পরিস্থিতিতে, একটি শক্তিশালী এবং টেকসই স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একটি টেকসই স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশনের কেন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে চলে আসে। প্রথমত, স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে জাতীয় পর্যায়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে এবং এটি স্থানীয় সরকার বিষয়ক নীতি ও আইন প্রণয়নে সরকারকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং ভালো কাজগুলোর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে, যা প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি করবে, যা স্থানীয় সরকারগুলোকে একে অপরের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে জানতে এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করবে। চতুর্থত, একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন স্থানীয়

সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও বেশি নাগরিক-বান্ধব এবং জবাবদিহিমূলক হতে উৎসাহিত করবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। পঞ্চমত, স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন স্থানীয় সরকারগুলোকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সহায়তা করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পরিবেশ রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্থানীয় সরকারগুলোর ভূমিকা বাড়াতে স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশে বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম (বিইউপিএফ), উপজেলা পরিষদ ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ (ইউপিএফবি), এবং মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (এমএবি)-এর মতো স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন বিদ্যমান থাকলেও, এদের কার্যক্রম খুবই সীমিত এবং সমন্বয়হীন। একটি টেকসই এলজিএ গঠনের মাধ্যমে এই সংস্থাগুলোকে একত্রিত করে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা সম্ভব। বাংলাদেশে একটি টেকসই স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন গঠনের সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল। প্রয়োজন শুধু স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের আন্তরিক ও সমন্বিত প্রচেষ্টা স্থানীয় সরকার বান্ধব সুশীল সমাজের সুদৃষ্টি এবং সরকারের সহযোগিতা। স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন-কে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এটি স্থানীয় সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল, ক্ষমতা এবং স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে পারে। এ লক্ষ্যে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, বিইউপিএফ, ইউপিএফবি, এবং এমএবি-এর মতো সংস্থাগুলোকে একত্রিত করে একটি জাতীয় স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন গঠন করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন-কে একটি শক্তিশালী আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দেওয়া প্রয়োজন, যা এটিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি ও সমর্থন পেতে সাহায্য করবে। তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী তহবিল তৈরি করা দরকার, যা মূলত সদস্য চাঁদা, বেসরকারি অনুদান এবং নানা সামাজিক উৎস থেকে আসতে পারে। চতুর্থত, স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন-এর কর্মী ও সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা আবশ্যক। পঞ্চমত, জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের স্বার্থে নিয়মিত আলোচনা ও এডভোকেসি এবং সরকারের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার মত দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

সরকারি সহায়তা ও অনুদান নির্ভর কোন সংঘ, সংস্থা, সমিতি বা এসোসিয়েশন নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারবে না। অতীতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও দাতা সংস্থা নির্ভর কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও তারা কার্যকর অবদান রাখতে পারেনি। বিভক্ত ও খণ্ডিত অনেকগুলো সমিতি/সংস্থা গঠিত হয়। সবগুলো সংস্থায় গণতান্ত্রিক নীতি কাঠামোর অভাব ছিল। তাই স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন গঠনের সময় তিনটি প্রধান বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হবে।

এক. স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তর ও প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক পৃথক পৃথক সমিতি হবে, নাকি সকল সদস্য ও কাউন্সিলরদের একটিমাত্র জাতীয় সমিতি হবে।

দুই. পৃথক পৃথক স্তর ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সমিতি হলে সকল প্রতিষ্ঠানের মিলিত একটি গণতান্ত্রিক ফেডারেশন থাকা প্রয়োজন হবে। নতুন প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সদস্য/কাউন্সিলর প্রধান, তাই সবার একটি জাতীয় সমিতি হতেও বাধা থাকার কথা নয়। তবে দলবাজির কারণে নানা উপদলে বিভক্ত হবার ঝুঁকি থেকে যায়।

তিন. একটি স্বচ্ছ, গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র এবং সে গঠনতন্ত্রের আওতায় অর্থ সংগ্রহ ও তার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে স্বচ্ছতা অপরিহার্য। উপরের তিনটি বিষয়ে ঐক্যমত্য হলে ধাপে ধাপে একটি স্বচ্ছ, সুন্দর, গতিশীল ও দেশব্যাপী শক্তিশালী একটি স্থানীয় সরকার সমিতি গড়ে উঠতে পারে। এ সমিতি স্থানীয় সরকারের পক্ষে নানা নীতি বিতর্ক সৃষ্টি ও তার মাধ্যমে সরকারের স্থানীয় সরকার ও বিকেন্দ্রীকরণ নীতিতে ইতিবাচক ধারা যুক্ত করতে পারে।

(৩) সামাজিক নিরাপত্তা

ভূমিকা

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মানব উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবুও, দারিদ্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এখনও উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার জন্য সকল স্তরে সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় কার্যকর স্থানীয় শাসনের একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তৃণমূল পর্যায়ে পরিষেবা প্রদান এবং নাগরিকদের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার মধ্যে দারিদ্র হ্রাস এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার লক্ষ্যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই অধ্যায়ে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়িত নির্দেশিকা বিশ্লেষণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে আরো ভালোভাবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়িত করতে পারে, অর্থাৎ যাতে প্রকৃত অর্থে স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচন করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সূচারুভাবে পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে সংস্কারের জন্য সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা

বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে নিহিত আছে, যা রাষ্ট্রীয় নীতির একটি মৌলিক নীতি হিসেবে সামাজিক সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করে। স্বাধীনতার পর প্রাথমিকভাবে দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে এটি দারিদ্র, পশ্চাৎপদতা, দুর্যোগের ঝুঁকি এবং জীবনচক্রের ঝুঁকি মোকাবেলায় একটি বিস্তৃত কাঠামোতে বিকশিত হয়েছে। ২০১৫ সালের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে, যার লক্ষ্য দারিদ্র্য¨, বৈষম্য এবং মানব উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, জীবনচক্র-ভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা।

বাংলাদেশে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৪০টি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর বার্ষিক বাজেট প্রায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ১৬.৫৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫২ শতাংশ। এ কর্মসূচিগুলো কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, যার মধ্যে রয়েছে

ক) সামাজিক সহায়তা: নগদ স্থানান্তর (যেমন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা), খাদ্য বিতরণ (যেমন, ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর খাদ্য), এবং উপবৃত্তি (যেমন, প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি) এর মতো অ-অনুদানমূলক প্রকল্প।

খ) সামাজিক বীমা: সীমিত অবদানমূলক প্রকল্প, যেমন ২০২২ সালে চালু হওয়া পোশাক শ্রমিকদের জন্য পাইলট কর্মসংস্থান আঘাত প্রকল্প, অসুস্থতা, মাতৃত্ব এবং পেনশন অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতীয় সামাজিক বীমা প্রকল্পের (NSIS) পরিকল্পনা রয়েছে।

গ) কর্মসৃজন ও শ্রমবাজারভিত্তিক কর্মসূচি: দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি (EGPP) এর মতো গণপূর্ত কর্মসূচি সহ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগ।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে প্রাথমিক সংযোগ হিসেবে কাজ করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় জনগণের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বিধায়

তাদের চাহিদা চিহ্নিত করা, পরিষেবা প্রদান এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে তাদের মূল কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ক) সুবিধাভোগীদের সনাক্তকরণ ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠী নির্ধারণ

ইউনিয়ন পরিষদগুলো বয়স্ক ভাতা বা দুঃস্থ মহিলা সহায়তার (ভিডব্লিউবি) মতো কর্মসূচির জন্য যোগ্য সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় জনগণের জ্ঞান ব্যবহার করে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সুবিধাভোগীদের প্রাথমিক তালিকা তৈরি করে উপজেলা পর্যায়ে প্রেরণ করেন। উপজেলার সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাগণ সুবিধাভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করেন। মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচি গ্রাম ও শহর উভয় জায়গায় স্থানে স্থানেই বাস্তবায়িত করা হয় বিধায় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ প্রাথমিক তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা স্থানীয় সরকারি অফিসসে প্রেরণ করেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপকারভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করার পর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তা বাস্তবায়িত করে। কোনো কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। অবশ্য এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ অনেক পুরনো। এর ফলে অযোগ্য ব্যক্তিদের সুবিধাভোগী হওয়ার এবং যোগ্য ব্যক্তিদের বঞ্চিত হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত বিভিন্ন গবেষণা ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে পাওয়া যায়।

খ) পরিষেবা প্রদান ও বিতরণ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো নগদ, খাদ্য বা উপকরণ সহায়তা বিতরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিয়ন পরিষদগুলো ভাতা বিতরণ করে এবং জনসাধারণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়িত করে, অন্যদিকে উপজেলা পরিষদগুলো বৃহৎ আকারের কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলো বস্তিবাসীদের জন্য সহায়তার মতো শহুরে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত করে, যদিও উপকারভোগীর সংখ্যা গ্রামীণ এলাকার তুলনায় কম হয়ে থাকে।

গ) পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং অভিযোগ সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। NSSS-এর বাস্তবায়িত কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় এবং প্রভাব বৃদ্ধির জন্য উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটির মতো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়েছে।

ঘ) স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা

নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন, ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোর অধিকার নিশ্চিত করেন। আইনের দ্বারা বাধ্যবাধকতা তৈরি করে নারী সদস্য বা নারী কাউন্সিলররা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীপ্রধান পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের চ্যালেঞ্জসমূহ:

ক) আর্থিক নির্ভরতা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সীমিত রাজস্ব-বৃদ্ধির ক্ষমতাসহ কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানান্তরের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। এটি সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগ উদ্ভাবন বা সম্প্রসারণে তাদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে।

খ) সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

অনেক স্থানীয় কর্মকর্তা জটিল কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষণ এবং সম্পদের অভাব রয়েছে, যার ফলাফল অদক্ষতা থেকে কাজ করার সক্ষমতা সীমাবদধ হয়ে পড়ে।

গ) কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়গুলো কর্মসূচি প্রণয়ন এবং অর্থের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখে। এটা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ন করে।

ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা

উপজেলা পরিষদগুলো নির্বাচিত হলেও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অনির্বাচিত প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হয়। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাস্তবায়িত হলেও কর্মসূচিগুলোর উপকারভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, যেমন উপজেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা কিংবা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ শুধুমাত্র প্রাথমিক তালিকা তৈরি করেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারেন না। সরকারি কর্মকর্তাদের তৈরি করা চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তার আর্থিক, খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পড়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর। ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত সংসদ সদস্যের অনুমোদনক্রমে উপকারভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্তগ্রহণের কর্তৃত্ব নেই কিন্তু বাস্তবায়নের দায়িত্ব রয়েছে।

ঙ. অভিযোজনমূলক সামাজিক নিরাপত্তা

বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং কোভিড-১৯ মহামারীর মতো অর্থনৈতিক ধাক্কার প্রতি অভিযোজনমূলক সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

চ. লিঙ্গ ও অন্তর্ভুক্তিতে ঘাটতি

যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, সামাজিক সুরক্ষা নীতিতে তাদের প্রভাব সীমিত রয়েছে।

সারণি ১৭.২: গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সরকার	উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা		
			স্থানীয় সরকার	কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর	অন্যান্য
মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন	উপকারভোগী নির্বাচনে চেয়ারম্যান, সদস্য ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ উপযুক্ত নারী ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রচারণা চালাবেন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌর মেয়র ইউনিয়ন/পৌরসভা কমিটির মাধ্যমে অনলাইনের আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক প্রাথমিক তালিকা উপজেলা কমিটির নিকট সুপারিশসহ প্রেরণ করবেন। সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে অনলাইনের আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক প্রাথমিক তালিকা জেলা কমিটির নিকট সুপারিশসহ প্রেরণ করবেন।	উপকারভোগী নির্বাচনে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/প্রোগ্রাম অফিসসার নারী উন্নয়নকর্মী, স্বাস্থ্য কর্মী ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারীদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে কমিউনিটি পর্যায়ে বৈঠক করবেন; উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/প্রোগ্রাম অফিসসার উপকারভোগী নির্বাচনের নির্দেশনা অনুযায়ী সুপারিশকৃত আবেদনগুলো যাচাই করবেন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সহায়তায় তালিকা চূড়ান্ত করবেন; জেলা প্রশাসক জেলা কমিটির[৫৫] মাধ্যমে উপ-পরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর প্রাথমিক তালিকাটি যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য) সহায়তায় যাচাই করবেন এবং জেলার পর্যায়ের সভায় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপকারভোগীর তালিকা চূড়ান্ত করবেন; গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরতদের সুপারিশ আবেদন সমূহ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখা তথ্য পুনরায় যাচাই বাছাই করবে এবং চূড়ান্ত অনুমোদন করবে।	গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরতদের অনলাইনে আবেদন সমূহ সংশ্লিষ্ট সমিতিসমূহ বিজিএমইএ বিজিএমইএ বি কে এম এ যাচাই করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে অনুমোদের জন্য অনলাইনে সুপারিশ করবে
বয়স্ক ভাতা	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন	ইউনিয়ন কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক বয়স্কভাতার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে। পৌরসভা[৫৬]/মহানগর[৫৭] কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক	সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা বয়স্কভাতার জন্য প্রাপ্ত আবেদনের আলোকে ইউনিয়ন ও পৌরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক পৃথক তালিকা প্রণয়ন করবেন। ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক তালিকা এবং আবেদনপত্রসমূহ উপজেলা কমিটিতে[৫৮] উপস্থাপন করতে হবে। উপজেলা কমিটি প্রার্থী তালিকা ও আবেদনপত্রসমূহ	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের সম্মতি/অনুমোদনক্রমে ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

[৫৫] জেলা প্রশাসক জেলা কমিটির সভাপতি ও উপ-পরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সদস্য সচিব। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন পৌরসভা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ।

[৫৬] পৌরসভা কমিটিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) (জেলা পর্যায়ের পৌরসভা)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা) সভাপতি ও সংশিস্নষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্য সচিব। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্যের ২ (দুই) জন (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) প্রতিনিধি, পৌরসভার মেয়রের ১ (এক) জন প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাউন্সিলর এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ।

[৫৭] মহানগর/সিটি কর্পোরেশন কমিটিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রতি শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এলাকার জন্য একজন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা) সভাপতি ও সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্য সচিব । সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ১ (এক) জন, মেয়রের প্রতিনিধি ১ (এক) জন, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ।

[৫৮] উপজেলা কমিটিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সভাপতি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহসভাপতি, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ সদস্য। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ।

কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সরকার	উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা		
			স্থানীয় সরকার	কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর	অন্যান্য
			বরাদ্দ অনুযায়ী চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করবে।	যাচাই-বাছাইপূর্বক বরাদ্দ অনুযায়ী চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করবে।	
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত ভাতা	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আবেদনের তালিকা যাচাই বাছাইপূর্বক প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত আবেদনকারীদের তালিকা চূড়ান্ত করবে অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির বরাবর প্রেরণ করবে। উপজেলা কমিটি[৫৯] ইউনিয়ন কমিটির থেকে প্রাপ্ত তালিকা সমূহ যাচাই বাছাই করে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করবে।	সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসসার সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে আবেদনসমূহ প্রয়োজনীয় তথ্যসহ যাচাই-বাছাইপূর্বক উপযুক্ত আবেদনকারীদের বরাদ্দ অনুযায়ী চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করবে। পৌরসভা[৬০]/সিটি কর্পোরেশন কমিটি[৬১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তালিকা চূড়ান্ত করতে অসমর্থ হলে জেলা কমিটি পরবর্তী এক মাসের মধ্যে তালিকা চূড়ান্ত করবে।	
দুঃস্থ মহিলা সহায়তা (ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট, ভিডব্লিউবি) (দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন বা ভিজিডি)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ইউনিয়ন পরিষদ	ইউনিয়ন মহিলা নির্বাচন কমিটি প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে সংগৃহীত যোগ্য সম্ভাব্য উপকারভোগীর মহিলার তালিকা করে একত্রিত করানো যাচাই করে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে উপজেলা কমিটির সভাপতি নিকট পেশ করবে।	উপজেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপকারভোগীর তালিকায় অনুমোদন প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রস্তুতকৃত ভিজিডি মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকার প্রতি পাতায় স্বাক্ষর করবেন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে স্বাক্ষরিত তালিকা প্রেরণ করবেন।	

[৫৯] উপজেলা কমিটিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সভাপতি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহসভাপতি, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ সদস্য। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ। স্থানীয় সংসদ সদস্য কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করবেন।

[৬০] পৌরসভা কমিটিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) (জেলা পর্যায়ের পৌরসভা)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা) সভাপতি ও সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্য সচিব। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্যের ২ (দুই) জন (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) প্রতিনিধি, পৌরসভার মেয়রের ১ (এক) জন প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাউন্সিলর এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও ব্যাংকের/মোবাইল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ।

[৬১] সিটি কর্পোরেশন কমিটিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রতি শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এলাকার জন্য একজন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা) সভাপতি ও সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্য সচিব। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ১ (এক) জন, মেয়রের প্রতিনিধি ১ (এক) জন, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও ব্যাংকের/ মোবাইল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ।

কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সরকার	উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা		
			স্থানীয় সরকার	কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর	অন্যান্য
আশ্রয়ণ-২		উপজেলা		উপজেলা নির্বাহী অফিসসার স্থানীয় জন-প্রতিনিধি/স্কাউট/রোভার/গার্লস গাইড অথবা সুবিধামত অন্য কোন মাধ্যমের সহায়তায় নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন করবে।[৬২] উপজেলা নির্বাহী অফিসসার উপকারভোগীদের অনুমোদিত তালিকার ১ কপি নিজ কার্যালয়ে সংরক্ষণ করবেন, ১ কপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। সেমিপাকা/পাকা ব্যারাক নির্মাণের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসসার ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করবে এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ব্যারাক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবে। ব্যারাক নির্মাণ শেষে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসসার এর নিকট হস্তান্তর করবে।	

[৬২] উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সদস্য সচিব, এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সদস্য।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা শক্তিশালী করার উপায়

উপরিল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলো সত্ত্বেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা শক্তিশালী করার আরো সুযোগ রয়েছে।

ক. কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণে সংস্কার

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৃহত্তর আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা হলে তারা নিজেরাই স্থানীয়ভাবে কিছু সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প চালু করতে পারবে। বিশেষ করে অভিযোজনমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কিছু প্রকল্প পাইলট আকারে কিছু নির্দিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এতে করে ব্যয় সাশ্রয় হবে এবং স্থানীয় সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে সমাধান করা যাবে।

খ. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন বড় আকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্ভাব্য উপকারভোগীর প্রাথমিক তালিকা তৈরি করলেও তালিকা চূড়ান্ত করার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, যেমন উপজেলা নির্বাহী অফিসসার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপ-পরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রমুখের। যদিও উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন কমিটিতে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেয়রের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকেন, তবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন সরকারি কর্মকর্তারা। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আরো ক্ষমতায়িত করার সুযোগ রয়েছে। চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত খসড়া তালিকা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে উপস্থাপন করতে পারেন। এরপর তা চেয়ারম্যান ও মেয়রদের সম্মতিক্রমে বরাদ্দ প্রদানের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসসার জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করা যেতে পারে।

গ. উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন কমিটি পুনর্গঠন

সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপজেলা/পৌরসভা কমিটিতে উপজেলা চেয়ারম্যানকে সভাপতি করতে হবে। অনুরূপভাবে জেলা পর্যায়ে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন কমিটিতে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করতে হবে। এভাবে কমিটিগুলো পুনর্গঠন করলে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে বলে কমিশন মনে করে।

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সংসদ সদস্যের প্রভাবমুক্তকরণ

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত ভাতা কর্মসূচিতে স্থানীয় সংসদ সদস্য উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এজন্য এ কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সরাসরি প্রভাব থাকে। অর্থাৎ সংসদ সদস্যের মতের বাইরে গিয়ে কাউকে উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয় না। এ কারণে এ কর্মসূচিতে সঠিকভাবে উপকারভোগী চিহ্নিত ও চূড়ান্ত করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত ভাতা ও ভালনারেবল উইমেন বেনিফিটের মত বড় কর্মসূচিতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন কমিটিতে স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকেন। ফলে কর্মসূচিগুলোর উপকারভোগীর তালিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য বা তার প্রতিনিধিরা (সাধারণত স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ) উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। এতে যথাযথভাবে উপকারভোগীর তালিকা তৈরি করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই এসব কমিটি থেকে স্থানীয় সংসদ সদস্য বা তার প্রতিনিধিদের বাদ দিতে হবে। সংসদ সদস্যের কাজ সংসদে আইন প্রণয়ন করা। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত

প্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তারা ভারসাম্যপূর্ণ কর্তৃত্বের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

ঙ. স্থানীয় সরকারের নিজস্ব অর্থে পাইলট আকারে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে

স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র, ঝুঁকি, পশ্চাৎপদতা, প্রতিবন্ধকতা, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় বাস্তবতা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারে। এ কর্মসূচির অর্থ কিছুটা স্থানীয় উৎস থেকে আহরিত রাজস্ব আয় এবং বাকিটা কেন্দ্রীয় সরকার, বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে আসতে পারে। অবশ্য ঢালাওভাবে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ ধরনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব নাও হতে পারে। যেমন চর, হাওর, পার্বত্য দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত ও উপকূলবর্তী অনেক ইউনিয়ন রয়েছে যাদের স্থানীয় উৎস থেকে আহরিত রাজস্ব অনেক কম বলে তাদের আর্থিক সক্ষমতাও কম। এ কারণে কিছু নির্বাচিত ইউনিয়নে এ ধরনের প্রকল্প বা কর্মসূচি পাইলট আকারে চালু করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যেমন জাতিসংঘ) এ ধরনের কর্মসূচিতে অর্থায়ন করতে পারে। যদি সফলভাবে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, তাহলে পরবর্তীতে দেশব্যাপী ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে নিজস্ব অর্থে স্থানীয় বাস্তবতা অনুযায়ী গৃহীত সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

চ. উদ্বৃত্ত রাজস্বের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে শিশু-বান্ধব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হাতে নিতে হবে

সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক শিশুদের জন্য চাহিদাভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করতে উপজেলা পরিষদ ও অন্য সব স্তরের স্বচ্ছল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো রাজস্ব উদ্বৃত্তের একটি অংশ বরাদ্দ রাখতে পারে। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে তাদের বার্ষিক বাজেটে এই শিশুদের জন্য একটি বিশেষ অংশ বরাদ্দ করতে হবে। এই শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য চাহিদাভিত্তিক বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে বাজেটের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং শিশুদের মতামত ও চাহিদা বাজেটে প্রতিফলিত করার জন্য নিয়মিত সভা ও আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।

সুপারিশ

১. বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার এবং সামাজিক নিরাপত্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তৃণমূল পর্যায়ে পরিষেবা প্রদানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। যদিও দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ এবং শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবুও কার্যকর বিকেন্দ্রায়ণ, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি রয়ে গেছে যা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণকে পূণাঙ্গ রূপ দেয়নি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা সম্ভব হলে এ সমস্যার অনেকাংশে সমাধান করা যাবে।

২. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংখ্যা কমিয়ে সর্বাধিক পাঁচটি কর্মসূচির মধ্যে সীমিত করে ঐ পাঁচটির মধ্যে নগদ হস্তান্তর, শিক্ষা বৃত্তি, দরিদ্রদের খাদ্য সহায়তা, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা, প্রসূতি ও শিশু পরিচর্যা, মৌসুমী কর্মসৃজন এই কয়টি কার্যক্রমকে একীভূত ও সমন্বয় করে উপকার ভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং প্রতিবছর কিছু পুরানো উপকারভোগী বাদ যেতে পারে এবং নতুনদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৩. সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে মূল উপকারভোগী বাছাই কেন্দ্র নির্ধারণ করে ব্যবস্থাপনার জন্য মন্ত্রণালয় সংখ্যা দুই বা তিনে একত্রিত করতে হবে। অধিক মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং ব্যবস্থাপনাগত জটিলতা সৃষ্টি করে।

৪. বেনিফিসিয়ারিদের ডিজিটাল তথ্য ভিত্তি তৈরি করে ব্যাংক কিংবা অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে ক্যাশ হস্তান্তরের নির্ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. জাতীয় বিকেন্দ্রায়ন নীতি প্রণয়ন

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হলো কেন্দ্রায়ন। বাংলাদেশ প্রকৃতিগতভাবে একটি অতিকেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র। রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা ব্যক্তি ও পরিবার নিয়ন্ত্রিত। শাসন কাঠামো নির্বাহী নিয়ন্ত্রিত। গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বি হলেও তা নির্বাচনের চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। অতিকেন্দ্রায়িত শাসন ও রাষ্ট্র কাঠামোতে ক্ষমতা চর্চা এক ধরণের প্রশাসনিক কোষ্ঠ কাঠিন্যে (Administrative Constipation) আক্রান্ত হয়। এখানে গণতন্ত্র, জনসেবা, স্বাধীনতা কোন কিছুই সহজে ডেলিভারী হয় না। মানুষের শরীরের কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের জন্য ল্যাক্সেটিভ দেয়া হয়। তখন কঠিন কোষ্ঠ তরলায়িত হয়ে সহজ ডেলিভারী হয়ে শরীরে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। অসুস্থ অতিকেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সুস্থ স্বাভাবিক করার ল্যাক্সেটিভ হলো সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ বিকেন্দ্রায়ন। অধ্যায় তিন এ বর্ণিত নানা ধরণ ও প্রকৃতির বিকেন্দ্রিকরণের প্রয়োগ করে এ অতিকেন্দ্রায়িত রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার ক্রম বিকেন্দ্রিকরণের একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন আবশ্যক। এ নীতি অনুসরণ করে দীর্ঘ মেয়াদে 'ট্রায়াল এন্ড ইরর' পদ্ধতি অনুসরণ করে জাতীয় সংসদ থেকে ইউনিয়ন পরিষদ, রাষ্ট্রপতি/প্রধনমন্ত্রী থেকে স্থানীয় সরকারের প্রধান নির্বাহী, মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রি/সচিব থেকে ঐ মন্ত্রণালয়ের সর্বনিম্ন নির্বাহী, পুলিশের আইজপি থেকে গ্রাম পুলিশের অধিনায়ক, ব্যক্তি ভোক্তা থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সবার মন, মেধা, অভিজ্ঞতা ও সামর্থের ব্যবহারের নীতিই হবে বিকেন্দ্রায়ন নীতির মূল উদ্দেশ্য। বিকেন্দ্রায়নের ফলে সমাজের সুপ্ত সকল শক্তি ও সমর্থ বিকশিত হয়। পুরো সমাজ শক্তিশালী ও স্ব-চালিত হয়।

বিকেন্দ্রায়নের মূল শর্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অর্ন্তগত হয়ে ক্ষমতা চর্চা। অর্থাৎ সঠিক সতর্ক নজরদারী ও সহায়তাকারীর আওতায় ক্ষমতা চর্চা। এখানে সমান্তরাল ও উল্লম্ব (Horizontal and Vertical) উভয় পদ্ধতির মনিটরিং কার্যকর রাখতে হয়। যেখানে যাকে যতদুর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেয়া হবে তার সাথে কর্ম, কর্মী, অর্থ ও নিজস্ব মেধা মনন ও সামর্থ প্রয়োগের স্বাধীনতা দেয়া হয় (Function, Functionary, Fund and Freedom-Four 'F's) বর্তমানে এ নীতি (Four 'F's), এদেশে কার্যকর নয়। কাজ দেয়া হলে কর্মী থাকে না। কর্মী আছে অর্থ অপ্রতুল। কর্ম কর্মী ও অর্থ আছে কিন্তু তাদের হাত পা, চোখ, কান বন্ধ করে রাখা হয়। প্রশাসন আছে, কিন্তু সে প্রশাসন চোখে দেখে না, কানে শুনে না, হাত পা নাড়াচাড়া করে না। কেউ কাজ করলেও কিছু বলে না, না করলেও কিছু বলে না। সবকিছুই যেন কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মত। ৬ লক্ষ অধিবাসীর জন্য একটি ৫০ শয্যার হাসপাতালে ১৩জন চিকিৎসকের স্থলে ৩জন কর্মরত। বাকী কর্মচারী, বেড-বিছানা, খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদির অবস্থা সহজে অনুমেয়। একই রকম অবস্থা রংপুরের তারাগঞ্জেও দেখা গেছে। ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ চিকিৎসক নিয়মিতভাবে 'অনিয়মিত'। শুধু স্বাস্থ্য বিভাগ নয়, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মোহাম্মদপুর বাবর রোডের বাসিন্দারা তিনটি চিঠি লিখেও ডিএনসিসি থেকে কোন উত্তর পায় না। এ সমস্যা কেন্দ্রায়িত নির্দেশনা পদ্ধতিতেও সমাধান করা যায়। সেটি হবে উল্লম্ব (Vertical) পদ্ধতি। এ সমাধান হবে স্বল্পকালীন। টেকসই সমাধান হবে সমান্তরাল ও উল্লম্ব পদ্ধতির সমন্বয়। বিকেন্দ্রায়ন যেখানে হবে সেখানে স্বাস্থ্য বিষয়ে জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার ও জেলার সিভিল সার্জন সকল পক্ষের যথাযথ ভূমিকা ও নজরদারী থাকবে।

একটি সুচিন্তিত জাতীয় বিকেন্দ্রায়ন নীতি এসব বিষয়ের টেকসই সমাধানের জন্য আবশ্যক বলে এ কমিশন মনে করে।

৫. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যসুচিতে অন্তর্ভুক্ত করণ

স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি সম্পর্কিত একটি ধারণা স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা সর্বস্তরে একটি নতুন সচেনতা সৃষ্টি করবে। একই সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নিকটস্থ বিদ্যালয়ে নানা কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ গ্রহণ করলে সেটি বাস্তবে হাতে কলমে কিশোর বয়স থেকে ধারণা নিয়ে ভবিষ্যত সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে

৬. স্থানীয় সরকার দিবস

স্থানীয় সরকার দিবস বহুদিনের (২০০৯ থেকে) চেষ্টা তদবিরের পর জাতীয়ভাবে ২০২৪ থেকে স্থানীয় সরকার দিবস পালিত হচ্ছে। দেশের প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তাদের নাগরিকদের নিয়ে প্রতিবছর একদিন এদিবসটি পালন করুক। এটি একটি জবাবদিহি দিবস হিসেবে পালিত হতে পারে। একই সাথে এটি হবে স্থানীয় গণতন্ত্রের উৎসব উৎযাপন দিবস। দেশের প্রধান ও সরকার প্রধানের অংশগ্রহনে এ দিবসটি একটি মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় দিবস হিসেবে চিহ্নিত হউক।

৭. (ক) জাতিসংঘের উদ্যেগে বিশ্বব্যাপী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন

স্থানীয় সরকার বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত একটি শাসন কাঠামো। আন্তর্জাতিকভাবে এ ব্যবস্থার সুরক্ষা, বিকাশ ও মান উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা থাকতে পারে। জাতিসংঘের অনেক বিষয়ে বিশেষ বিশেষ সংস্থা রয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ, নারীর অধিকার সুরক্ষা, মানবাধিকার, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ও জননিরাপত্তাসহ আরও অন্যান্য অনেক নাগরিক সেবা বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

এজন্য শুধু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে মূল জ্যোতিকেন্দ্রে রেখে বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘের একটি সংস্থা গঠিত হওয়া সমীচীন মনে করে এ কমিশন। এ সংস্থার অর্থায়নে বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্র ও সারা বিশ্বের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিকভাবেও অংশগ্রহণ করতে পারে। এ কমিশন আশা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে জাতিসংঘ মহাসচিবকে এ বিষয়ে একটি অনুরোধ বার্তা পাঠাতে পারেন এবং জাতিসংঘের উপযুক্ত কোন অধিবেশনে তিনি নিজে বা জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধির মাধ্যমে বিষয়টি উত্থাপন করতে পারেন। আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বাংলাদেশ বলতে পারে জাতিসংঘের অধিনস্থ সংগঠন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত। যদি UN Agency for local Government promotion (UNALGP) প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূসের বাংলাদেশ সরকার এ প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর বাংলাদেশে স্থাপনে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

(খ) বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের বিশেষ স্থানীয় সরকার দিবস পালন:

বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের উদ্যেগে ৩৬৫ দিনের একটি বছরে ২১৮টি দিবস সপ্তাহ পালন করা হয়। প্রতিমাসে একাধিক দিবস পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। ১২টি মাসের মধ্যে শুধুমাত্র সর্বাপেক্ষা কম দিবস পালন করা হয় জানুয়ারি মাসে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহের শনিবার এ দিবসটি পালনের প্রস্তাব করা যেতে পারে। তা করা হলে নতুন স্থানীয় সরকার দিবসসহ মোট সাতটি দিন বিশেষ দিবস পালিত হবে। জাতিসংঘ কর্তৃক উদযাপিত দিবসের সংখ্যা বেড়ে হবে ২১৯ দিন।

অধ্যায়-আঠারো

বিবিএস পরিচালিত জাতীয় জরিপের ফলাফল

স্থানীয় সরকার সংস্কার বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ-২০২৫ ফলাফলের সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে সারা বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলায় পল্লী ও শহর এলাকায় স্থানীয় সরকারের সংস্কারের বিভিন্ন বিষয় মতামত গ্রহণের জন্য একটি খানা জরিপ পরিচালনা করে জরিপ পরিচালনা করে।

জরিপের নকশা ও পদ্ধতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক প্রতি দশ বছর অন্তর জনশুমারি ও গৃহগণনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জনশুমারি ও গৃহণনা-২০২২ কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে জোনাল অপারেশন পরিচালনা করে ৮০ থেকে ১২০ টি (গড়ে ১০০টি) খানার সমন্বয়ে গণনা এলাকায় (EA) বিভক্ত করে গণনা এলাকা ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়। এই গণনা এলাকাসমূহকে সেন্সাস ব্লকও বলা হয়। বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত সকল জরিপ কার্যক্রমের নমুনা ফ্রেম হিসেবে এই সেন্সাস ব্লক বা গণনা এলাকাকে ব্যবহার করা হয়। শুমারি পরবর্তী সময়ে বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত জরিপের জন্য উক্ত নমুনা এলাকাসমূহ নিয়মিত ব্যবহার হয়ে থাকে এবং এগুলো মূলত Integrated Multipurpose Sample-IMPS হিসেবে পরিচিত। এই IMPS এর সংখ্যা ২,৭৬৬ । স্থানীয় সরকার সংস্কার বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৫ এ ২,৭৬৬ প্রাথমিক নমুনায়ন একক (PSU) হতে প্রতি জেলায় ৩০ টি PSU করে মোট ৬৪×৩০= ১,৯২০টি PSU নির্ধারণ করে নমুনায়নের মাধ্যমে প্রতিটি PSU হতে ২৪ টি খানা নিয়ে মোট ৬৪×৩০×২৪ = ৪৬,০৮০ টি খানা হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

জরিপের নমুনা আকার

প্রতিটি ডোমেইন বা জেলার জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় নমুনার আকার নির্ধারণে নিম্নের সূত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে:

যেখানে, সমগ্রকের মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের অনুপাত p=০.০৫, স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ভেরিয়েটের মান α (৫%) খারাপ নমুনার সম্ভাবনাকে অনুমতি দেয়, $z_{(\alpha n2)}$=১.৯৬, মার্জিন অব এরর, e=০.০৫, টু স্টেজ স্ট্রাটিফাইড ক্লাস্টার স্যাম্পলিং ব্যবহার করে কমপ্লেক্স সার্ভের জন্য ডিজাইন ইফেক্ট, $deff$=১.৮ ।

জরিপের নমুনায়ন

গ্রহণযোগ্য পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে যেকোনো জরিপ পরিচালনার জন্য নমুনা ফ্রেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নমুনা ফ্রেম হতে নমুনা খানা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে PSU সমূহে অবস্থিত খানাসমূহের হালনাগাদ তালিকা নিয়ে স্যাম্পল নির্বাচন করা হয়। আলোচ্য জরিপের নমুনায়নের জন্য নমুনা কাঠামোটি জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ হতে তৈরিকৃত IMPS এর উপর ভিত্তি করে স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এসভিআরএস) জরিপে ব্যবহৃত PSU হতে নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, IMPS মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক খানা, হোস্টেল, হোটেল, হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম, সামরিক ও পুলিশ ব্যারাক, কারাগার ইত্যাদি জরিপের কাভারেজ থেকে বাদ রেখে শুধু সাধারণ খানাসমূহকে জরিপের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। জরিপের নমুনা নকশাটি একটি দুই স্তরবিশিষ্ট স্ট্র্যাটিফায়েড ক্লাস্টার দৈব নমুনায়নের নকশা, যেখানে প্রথম স্তরে PSU সমূহ নমুনা কাঠামো থেকে নির্বাচন করা হয়। জেলাভিত্তিক উপাত্ত প্রাপ্তির লক্ষ্যে Equal Allocation Method ব্যবহার করে প্রতি জেলায় ৩০টি PSU দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করে প্রতি PSU হতে ২৪ টি খানা নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করা হয়। নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিটি খানা হতে ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব নাগরিকের মধ্য হতে Kish Grid Selection পদ্ধতিতে ০১ জন নির্বাচিত যোগ্য উত্তরদাতার নিকট হতে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

জরিপ পরিচালনা ও উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

জরিপ কার্যক্রমটি মানসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বিবিএস এর উপযুক্ত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ০১টি ওয়ার্কিং কমিটি, ০১টি টেকনিক্যাল কমিটি এবং ০১টি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। পাশাপাশি জরিপের ডিজাইন প্রণয়নের জন্য ০১টি মেথডলোজি নির্ধারণ, স্যাম্পল ডিজাইন ও প্রণয়ন কমিটিও গঠন করা হয়। এছাড়াও জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে ০১টি ট্যাবুলেশন প্লান প্রস্তুত কমিটি এবং ০১টি প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও বিবিএস এর পক্ষ হতে সুষ্ঠুভাবে জরিপ পরিচালনার জন্য মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দেশব্যাপী জরিপটি যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য ১ম পর্যায়ে মাস্টার ট্রেইনার (মূল প্রশিক্ষক) হিসেবে বিভাগীয় সুপারভাইজিং কর্মকর্তা এবং জেলা সুপারভাইজিং কর্মকর্তাগণের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলা/বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ে মোট ৯৭০ জন তথ্য সংগ্রহকারী এবং ২৬০ জন সুপারভাইজিং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণে উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত সাক্ষাতকারের কৌশল, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন অংশ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয় এবং মাঠপর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক CAPI App ব্যবহারে করে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে নির্ভুলভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করে যথাযথভাবে সার্ভারে প্রেরণ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আইটি প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। জরিপ প্রশ্নপত্র নিয়ে মাঠ পর্যায়ে প্রি-টেস্ট এবং CAPI App এর যথার্থতা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ফিল্ড-টেস্টও সম্পাদন করা হয়।

চিত্র-১.১: বিভাগ ও জেলার ভিত্তিতে নমুনা খানাসমূহের বিন্যাস

(স্থানীয় সরকার সংস্কার বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৫)

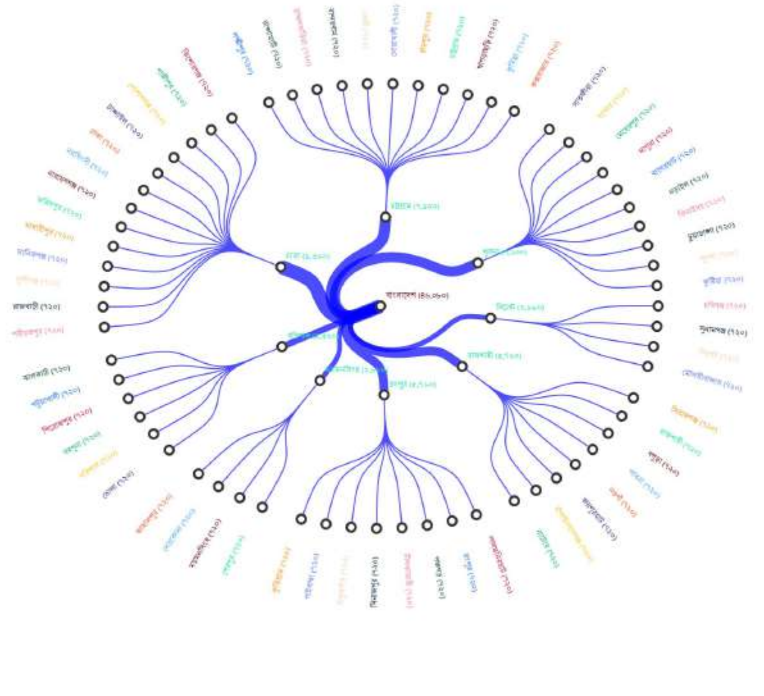

খানাসমূহের মধ্যে ৮৫.৯ শতাংশ পল্লী ও বাকি ১৪.১ শতাংশ শহর এলাকায় অবস্থিত। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৮.৫ শতাংশ পুরুষ ও ৫১.৫ শতাংশ নারী। পল্লী এলাকায় উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৮.৩ শতাংশ পুরুষ ও ৫১.৭ শতাংশ নারী, আর শহর এলাকায় উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৯.১ শতাংশ পুরুষ ও ৫০.৯ শতাংশ নারী।

জরিপের ফলাফল গুলো সংক্ষেপে নিচে উপস্থাপন করা হল।

দলীয় প্রতীকে নির্বাচন: খানা পর্যায়ের উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭১.১ শতাংশ) দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সমর্থন করেন না। মাত্র ২৪.৮ শতাংশ দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সমর্থন করেন।

সারণি ১৮.১: দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সমর্থন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	২৪.৯	৭০.৯	৩.৮	০.৪	১০০.০
শহর	২৪.৬	৭১.৩	৩.৪	০.৭	১০০.০
মোট	২৪.৮	৭১.১	৩.৬	০.৫	১০০.০

চিত্র ২: দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সমর্থন করেন (উত্তরদাতাদের %)

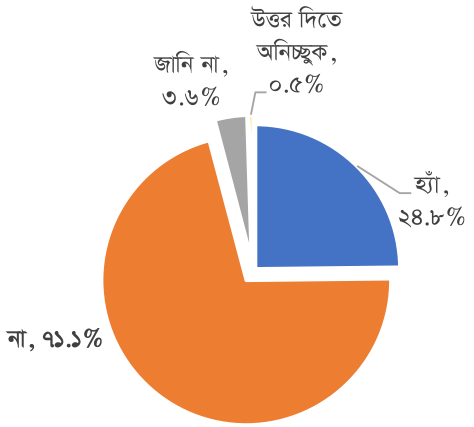

নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি: উত্তরদাতাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (৫৩ শতাংশ) চায় নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে বর্তমান সংরক্ষিত পদ্ধতির পরিবর্তে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি[৬৩] প্রবর্তন করা দরকার। ৩৬.৮ শতাংশ উত্তরদাতা এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা দরকার নেই বলে মনে করেন।

সারণি ১৮.২: নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি প্রবর্তন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৫১.৪	৩৭.৬	১০.৩	০.৬	১০০.০
শহর	৫৬.১	৩৫.০	৮.০	০.৯	১০০.০
মোট	৫৩.০	৩৬.৮	৯.৬	০.৭	১০০.০

[৬৩] ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির উদাহরণ: একটি ইউনিয়নে ৯ টি ওয়ার্ড থাকলে প্রথমবার ১, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে, দ্বিতীয়বার ২, ৫, ও ৮ নং ওয়ার্ডে তৃতীয়বার ৩, ৬, ও ৯ নং ওয়ার্ডে শুধুমাত্র নারীরা নির্বাচিত হবেন। এভাবে নারীদের জন্য ওয়ার্ড বদল হতে থাকবে।

চিত্র ৩: নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি প্রবর্তন করা দরকার মনে করেন (উত্তরদাতাদের %)

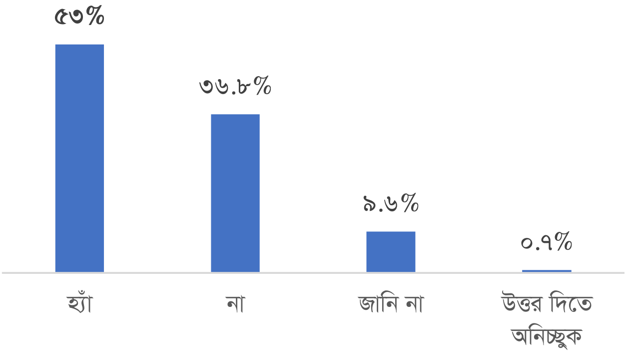

স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন: নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন ৮৩.৭ শতাংশ উত্তরদাতা। মাত্র ৬.৯ শতাংশ উত্তরদাতা এ কমিশন গঠনের প্রয়োজন নেই বলে মত দিয়েছেন।

সারণি ১৮.৩: নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৮৩.৪	৬.৩	৯.৭	০.৬	১০০.০
শহর	৮৪.৩	৮.০	৭.১	০.৬	১০০.০
মোট	৮৩.৭	৬.৯	৮.৯	০.৬	১০০.০

চিত্র ৪: স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা প্রয়োজনীয় মনে করেন (উত্তরদাতাদের %)

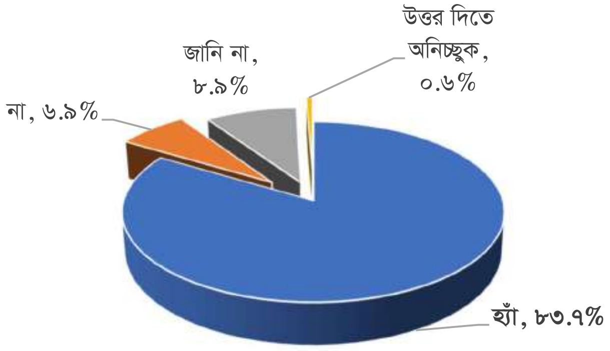

জনপ্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রায় সকল উত্তরদাতা (৯৭.১ শতাংশ) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন। যারা মনে করেন যে স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তাদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ প্রায় উত্তরদাতা মনে করেন যে প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হওয়া উচিত এইচএসসি বা সমমান। আর ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন প্রার্থীদের শিক্ষা এইচএস এসএসসি বা সমমান হওয়া উচিত। প্রার্থীদের স্নাতক বা সমমান শিক্ষাগত যোগ্যতা চান ২৫.৪ শতাংশ উত্তরদাতা।

সারণি ১৮.৪: নির্বাচনে প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	৫ম শ্রেণি/ সমমান	৮ম শ্রেণি/ সমমান	এসএসসি/ সমমান	এইচএসসি/ সমমান	স্নাতক/ সমমান	স্নাতকোত্তর/ সমমান	মোট
পল্লী	০.৭	২.৫	৩৩.৬	৩৭.৯	২২.০	৩.৩	১০০.০
শহর	০.৭	১.৬	২২.৮	৩৭.৫	৩২.৩	৫.২	১০০.০
মোট	০.৭	২.২	৩০.০	৩৭.৮	২৫.৪	৩.৯	১০০.০

* যারা মনে করেন যে স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তাদের মধ্যে।

চিত্র ৫: স্থানীয় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজনীয় মনে করেন (উত্তরদাতাদের %)

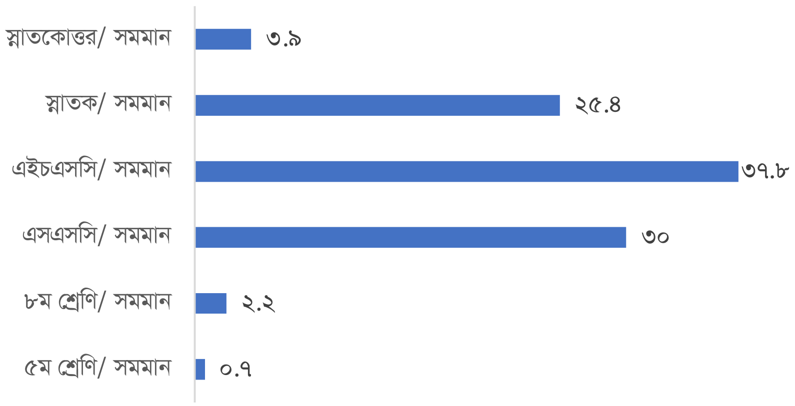

অভিন্ন আইন প্রণয়ন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পাঁচটি মৌলিক আইন ও শতাধিক প্রজ্ঞাপন/আদেশ রয়েছে যা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালনাকে জটিল করে তুলেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম পরিচালনাকে সহজ ও সবার কাছে বোধগম্য করতে সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এক ও অভিন্ন আইন প্রণয়ন করা উচিত বলে মত দিয়েছেন তিন-চতুর্থাংশের বেশি (৭৭ শতাংশ) উত্তরদাতা। মাত্র ৯.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বর্তমানের আইনসমূহের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা উচিত বলে মনে করেন।

সারণি ১৮.৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অভিন্ন আইন প্রণয়ন করা উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৭৫.৬	১০.১	১৩.৪	০.৯	১০০.০
শহর	৭৯.৯	৮.১	১১.১	০.৯	১০০.০
মোট	৭৭.০	৯.৪	১২.৭	০.৯	১০০.০

চিত্র ৬: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অভিন্ন আইন প্রণয়ন করা উচিত মনে করেন (উত্তরদাতাদের %)

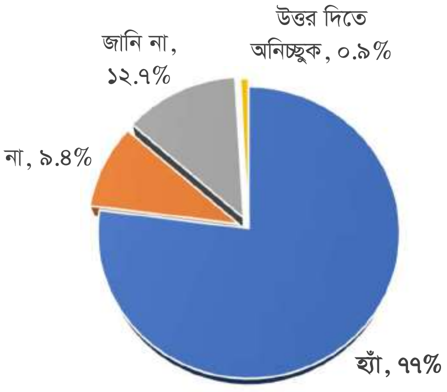

স্থানীয় সরকার সার্ভিস: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন প্রশাসনিক/দায়িত্বশীল পদে নিজস্ব জনবলের সংকট রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়। জনবলের নির্দিষ্ট কাঠামো, পদোন্নতি ও পদসোপান নেই। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সমন্বিত সার্ভিস কাঠামো (স্থানীয় সরকার সার্ভিস) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিন-চতুর্থাংশের বেশি (৭৭.৫ শতাংশ) উত্তরদাতা। মাত্র ৮.৭ শতাংশ উত্তরদাতা নতুন সার্ভিস কাঠামো প্রয়োজন নেই বলে মত দিয়েছেন।

সারণি ১৮.৬: স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৬৩.২	২৭.৮	৮.৩	০.৭	১০০.০
শহর	৬৭.২	২৬.৬	৫.৫	০.৮	১০০.০
মোট	৬৪.৫	২৭.৪	৭.৪	০.৭	১০০.০

চিত্র ৭: স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয় মনে করেন (উত্তরদাতাদের %)

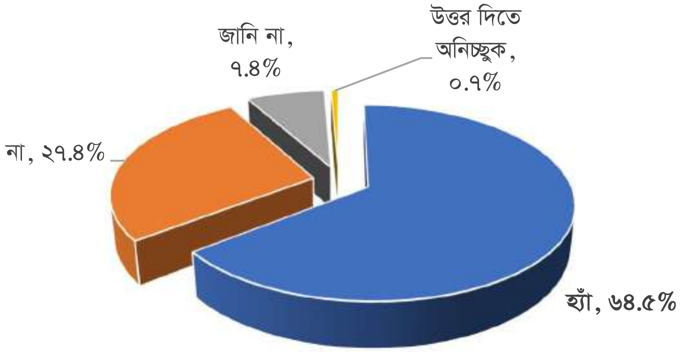

উপজেলা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনা: বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা সদর ও অনেক ইউনিয়ন সদরে অপরিকল্পিত বাণিজ্যিক, শিল্প ও আধুনিক বাসস্থান গড়ে উঠছে, যা পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি তৈরি করছে। এটি মোকাবিলায় ৮৫ শতাংশ উত্তরদাতা উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনাবিদের কার্যালয় থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন। মাত্র ৭.৭ শতাংশ উত্তরদাতা পরিকল্পনাবিদের কার্যালয় থাকা প্রয়োজন নেই বলে মত ব্যক্ত করেন।

সারণি ১৮.৭: উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনাবিদের কার্যালয় থাকার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৮০.৫	১০.৫	৮.৪	০.৬	১০০.০
শহর	৮৫.০	৭.৭	৬.৬	০.৭	১০০.০
মোট	৮২.০	৯.৬	৭.৮	০.৭	১০০.০

চিত্র ৮: উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনাবিদের কার্যালয় থাকা প্রয়োজনীয় মনে করেন (উত্তরদাতাদের %)

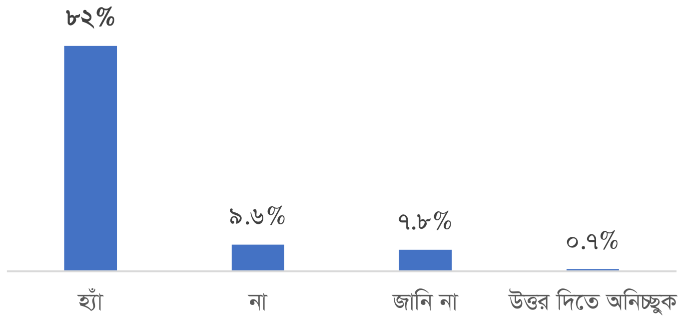

নির্বাচনে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ: স্থানীয় সরকারের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য যেহেতু বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি জন দাবি রয়েছে, কিন্তু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় তা কতটুকু সম্ভব সে বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়ায়, স্থানীয় নির্বাচনে সদস্য বা কাউন্সিলর হিসেবে সরকারি-বেসরকারি চাকুরিজীবী-পেশাজীবীদেরও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার প্রশ্নে অর্ধেকের বেশি (৫৮.২ শতাংশ) উত্তরদাতা স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে চাকুরিজীবী-পেশাজীবীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত বলে মনে করেন। আর ৩৭.৭ শতাংশ উত্তরদাতা এ সুযোগ থাকা উচিত নয় বলে মনে করেন।

সারণি ১৮.৮: স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৫৬.১	৩৯.৬	৩.৮	০.৫	১০০.০
শহর	৬২.৬	৩৩.৮	২.৯	০.৬	১০০.০
মোট	৫৮.২	৩৭.৭	৩.৫	০.৫	১০০.০

চিত্র ৯: উপজেলা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনাবিদের কার্যালয় থাকা প্রয়োজনীয় মনে করেন (উত্তরদাতাদের %)

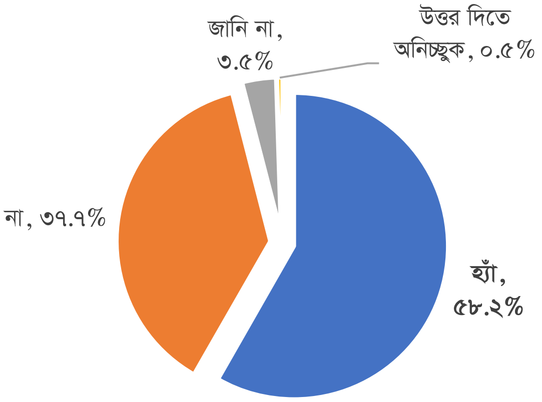

দায়িত্ব পালনে খন্ডকালীন ও সার্বক্ষণিকতার প্রশ্ন : উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭২.১ শতাংশ মনে করেন যে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের সময়সূচি পূর্ণকালীন হওয়া উচিত। অর্থাৎ যারা নির্বাহী দায়িত্বসহ সকল দায়িত্ব পালন করবেন তারা পূর্ণকালীন। অন্যদিকে ২২.৩ শতাংশ মনে করেন তাদের দায়িত্ব পালনের সময়সূচি খন্ডকালীন হওয়া উচিত, অর্থাৎ সভা পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ এর দায়িত্ব পালন করবেন।

সারণি ১৮.৯: স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের সময়সূচি সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	পূর্ণকালীন (নির্বাহী দায়িত্বসহ সকল দায়িত্ব)	খন্ডকালীন (নির্বাহী দায়িত্বসহ সকল দায়িত্ব)		জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৭০.৯	২২.৯		৫.৭	০.৫	১০০.০
শহর	৭৪.৪	২০.৯		৩.৯	০.৭	১০০.০
মোট	৭২.১	২২.৩		৫.১	০.৬	১০০.০

চিত্র ১০: স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের সময়সূচি কেমন হওয়া উচিত (উত্তরদাতাদের %)

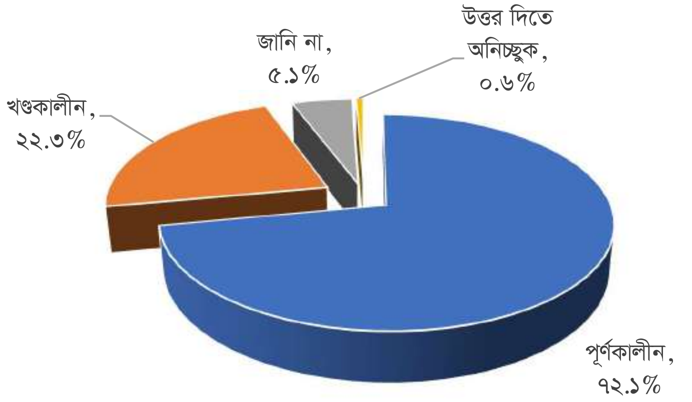

স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের আর্থিক সুবিধা: উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭০.৪ শতাংশ মনে করেন যে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সরকারি বেতনকাঠামো অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধা থাকা উচিত। অন্যদিকে ২৩.৮ শতাংশ মনে করেন তাদের দায়িত্ব খন্ডকালীন হিসেবে নির্ধারিত হারে সম্মানী বা ভাতা পাওয়া উচিত।

সারণি ১৮.১০: স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	পূর্ণকালীন বেতনকাঠামো অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধা	খন্ডকালীন নির্ধারিত (সম্মানী/ভাতা)	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৬৮.৬	২৫.১	৫.৩	১.০	১০০.০
শহর	৭৪.০	২১.২	৩.৭	১.১	১০০.০
মোট	৭০.৪	২৩.৮	৪.৮	১.০	১০০.০

চিত্র ১১: স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের আর্থিক সুবিধার ধরন (উত্তরদাতাদের %)

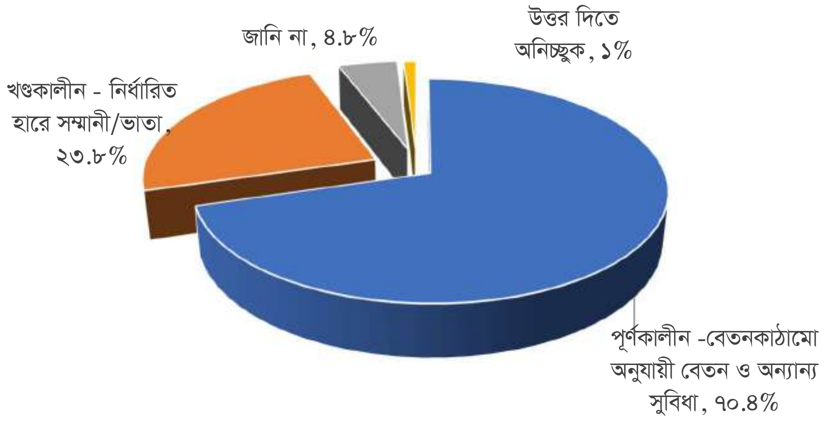

গ্রাম আদালতের কার্যকারিতা: গ্রামীণ বিরোধ নিষ্পত্তিতে বর্তমান 'গ্রাম আদালত' ব্যবস্থা কার্যকর মনে করেন মাত্র ২৪.৩ শতাংশ উত্তরদাতা। ৩৪.৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এ আদালত আংশিকভাবে কার্যকর। অন্যদিকে ২১.৬ শতাংশ উত্তরদাতার মতে গ্রাম আদালত ব্যবস্থা কার্যকর নয়।

সারণি ১৮.১১: গ্রাম আদালত ব্যবস্থার কার্যকারিতা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	কার্যকর	আংশিকভাবে কার্যকর	কার্যকর নয়
পল্লী	২৪.৭	৩৫.৮	২০.৭
শহর	২৩.৩	৩২.০	২৩.৩
মোট	২৪.৩	৩৪.৬	২১.৬

চিত্র ১২: গ্রাম আদালত ব্যবস্থার কার্যকারিতা (উত্তরদাতাদের %)

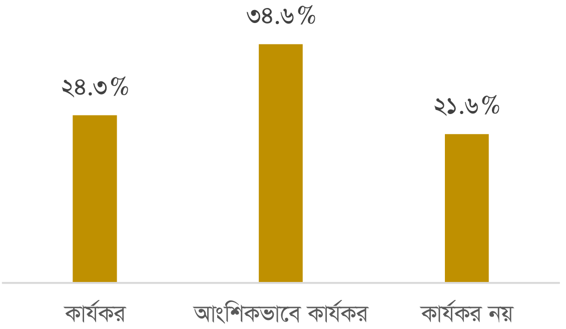

উপজেলা পর্যায়ে আদালত পুনঃপ্রতিষ্ঠা:- বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের চিন্তা-ভাবনা চলমান। একসময় উপজেলা পর্যায়ে আদালতের কার্যক্রম চলমান ছিল। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত পুনরায় প্রতিষ্ঠার বিষয় সমর্থন করেন ৮০.৪ শতাংশ উত্তরদাতা। অন্যদিকে ১২.৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন উপজেলা পর্যায়ে আদালত পুনরায় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই।

সারণি ১৮.১২: উপজেলা পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত পুনরায় প্রতিষ্ঠা সমর্থন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	মোট
পল্লী	৭৯.৮	১৩.০	৭.১	১০০.০
শহর	৮১.৭	১১.৯	৬.৩	১০০.০
মোট	৮০.৪	১২.৬	৬.৯	১০০.০

চিত্র ১৩: উপজেলা পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত পুনরায় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন (উত্তরদাতাদের %)

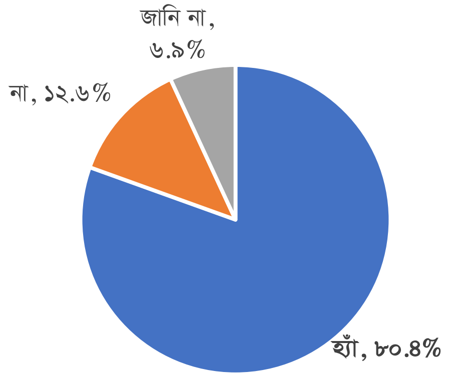

দুর্বল পৌরসভাগুলো বাতিলকরণ:- বিগত সময়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় বেশকিছু ইউনিয়ন পরিষদকে পৌরসভা ঘোষণা করা হয়েছে। গঠনকালীন সময়ে সেগুলো আইনানুগভাবে গঠিত হয়নি। এসব পৌরসভাগুলোর আর্থিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল রয়ে গেছে। তারা নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনাসহ জরুরি পৌর সেবাগুলো সঠিকভাবে প্রদান করতে পারে না। তাদের কর্মীদের বেতন-ভাতাও নিয়মিত পরিশোধ করতে পারে না। রাজনৈতিক বিবেচনায় ঘোষিত এসব দুর্বল পৌরসভাগুলোকে যাচাই-বাছাই করে বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন ৭২.৬ শতাংশ উত্তরদাতা। অন্যদিকে ১৬.৪ শতাংশ উত্তরদাতা এ উদ্যোগ নেওয়া উচিত নয় বলে মত দিয়েছেন।

সারণি ১৮.১৩: দুর্বল পৌরসভাগুলোকে যাচাই-বাছাই করে বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৭১.৭	১৬.১	১১.২	১.১	১০০.০
শহর	৭৪.৬	১৭.০	৭.৪	১.০	১০০.০
মোট	৭২.৬	১৬.৪	৯.৯	১.১	১০০.০

চিত্র ১৪: দুর্বল পৌরসভাগুলোকে যাচাই-বাছাই করে বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া উচিত (উত্তরদাতাদের %)

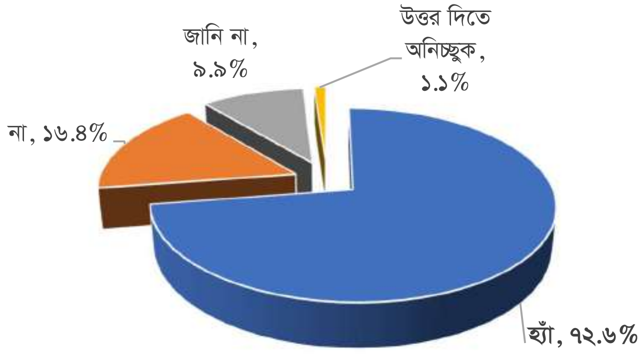

পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলা পরিষদ নির্বাচন: আইন অনুযায়ী পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলা পরিষদসমূহে প্রতি পাঁচ বছর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে প্রথম ও শেষবারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সরকার মনোনীত সদস্যদের দ্বারাই অগণতান্ত্রিক উপায়ে এই পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৮৫.৬ শতাংশ উত্তরদাতা অবিলম্বে পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন চান। অন্যদিকে ১১.৬ শতাংশ উত্তরদাতা এ নির্বাচন চান না।

সারণি ১৮.১৪: পার্বত্য চট্রগ্রামের জেলা পরিষদে নির্বাচন আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৮৪.১	১৪.১	১.৭	১০০.০
শহর	৮৭.৩	৮.৫	৪.২	১০০.০
মোট	৮৫.৬	১১.৬	২.৮	১০০.০

চিত্র ১৫: পার্বত্য চট্রগ্রামের জেলা পরিষদে নির্বাচন আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত (উত্তরদাতাদের %)

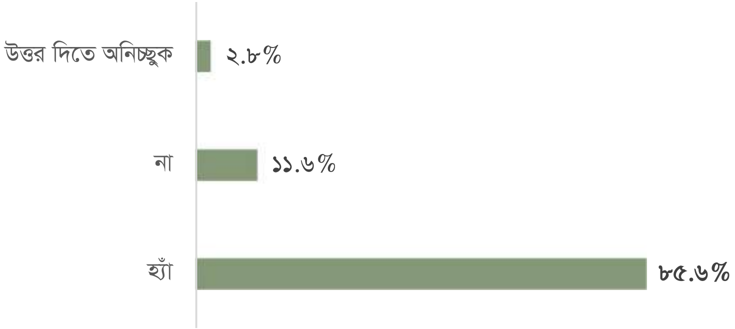

পার্বত্য চট্রগ্রামের সকল জেলার অধিকাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন চান। বিশেষ করে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার প্রায় সকল উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা অবিলম্বে জেলা পরিষদ নির্বাচন চান।

সারণি ১৮.১৫: আগামী দিনে পার্বত্য জেলা পরিষদে নির্বাচন আয়োজন সংক্রান্ত মতামতের জেলাভিত্তিক বিন্যাস (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
বান্দরবান	৯৩.৮	৩.৩	৩.০	১০০.০
খাগড়াছড়ি	৭৯.১	১৫.৭	৫.১	১০০.০
রাঙ্গামাটি	৮৭.৪	১২.৫	০.১	১০০.০
মোট	৮৫.৬	১১.৬	২.৮	১০০.০

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদে নির্বাচনের ইতিবাচক প্রভাব:- জরিপের অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদসমূহে নির্বাচন হলে তা গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে (৮৩.৮ শতাংশ), দুর্নীতি হ্রাস করতে (৬৭.৭ শতাংশ) এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ গঠনে (৬৫.৫ শতাংশ) সহায়তা করবে।

সারণি ১৮.১৬: পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদে নির্বাচনের সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

	পল্লী	শহর	মোট
গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা	৮০.৩	৮৮.০	৮৩.৮
দুর্নীতি হ্রাস করা	৬৫.৯	৬৯.৯	৬৭.৭
জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ গঠন	৬১.৪	৭২.৭	৬৬.৫

চিত্র ১৬: পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদে নির্বাচনের সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব (উত্তরদাতাদের %)

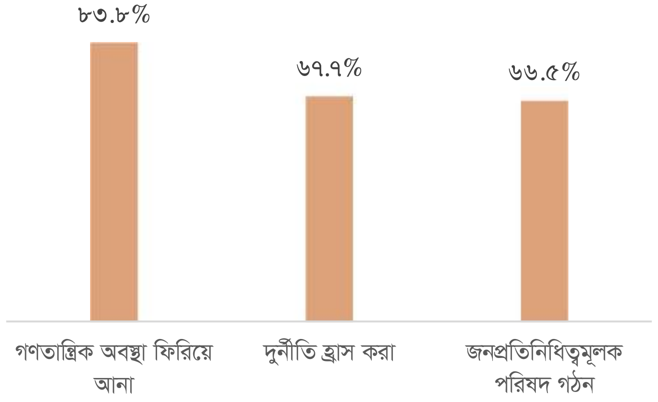

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ:- জরিপের অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হল ইউনিয়ন পরিষদ (৯২.৮ শতাংশ)। পরবর্তী প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ হল উপজেলা পরিষদ (৮৩.১ শতাংশ), প্রথাগত ব্যবস্থা (রাজা-হেডম্যান-কারবারী ব্যবস্থা) (৭৪.৫ শতাংশ) এবং জেলা পরিষদ (৬৫.৩ শতাংশ)। আনুপাতিকভাবে কম উত্তরদাতা মনে করেন যে পৌরসভা (৪২ শতাংশ) ও বাজার ফান্ড (২৯.৯ শতাংশ) এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সারণি ১৮.১৭: পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

	পল্লী	শহর	মোট
ইউনিয়ন পরিষদ	৯৬.০	৮৮.৯	৯২.৮
উপজেলা পরিষদ	৮২.০	৮৪.৫	৮৩.১
প্রথাগত ব্যবস্থা (রাজা-হেডম্যান-কারবারী ব্যবস্থা)	৮২.১	৬৫.১	৭৪.৫
জেলা পরিষদ	৬৭.৩	৬২.৯	৬৫.৩
পৌরসভা	৩৫.৯	৪৯.৫	৪২.০
বাজার ফান্ড	২৬.৩	৩৪.৪	২৯.৯

চিত্র ১৭: পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনটি প্রয়োজনীয় (উত্তরদাতাদের %)

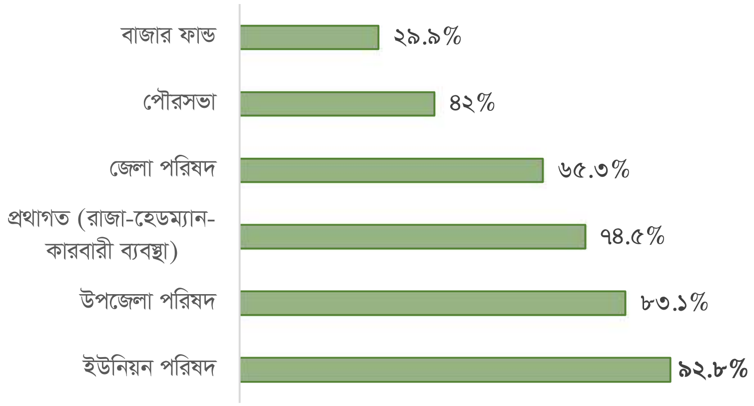

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর:- প্রায় সকল উত্তরদাতা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হোক এটি চান (৯০.৯ শতাংশ)। মাত্র ৯.১ শতাংশ উত্তরদাতা এটি চান না।

সারণি ১৮.১৮: পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	মোট
পল্লী	৯৪.৭	৫.৩	১০০.০
শহর	৮৬.২	১৩.৮	১০০.০
মোট	৯০.৯	৯.১	১০০.০

চিত্র ১৮: পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর প্রয়োজন

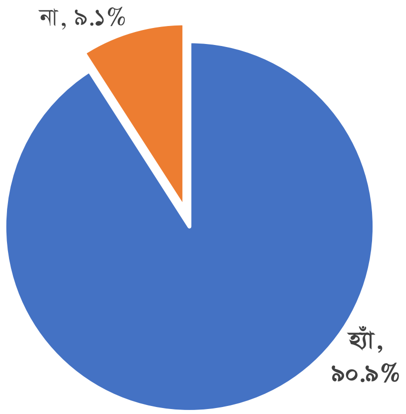

(উত্তরদাতাদের %)

পরিষেবাগুলোর জন্য অনলাইনে আবেদনের সুযোগ: প্রায় সকল উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে প্রদান করা পরিষেবাগুলো অনলাইনে আবেদনের সুযোগ রাখা, অনলাইনে আবেদনের অবস্থা পর্যালোচনা এবং অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকা উচিত (৯০.৯ শতাংশ)। এতে যে কোনো স্থান থেকে তারা আবেদন করা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে তার প্রতিকার পেতে পারবেন।

সারণি ১৮.১৯: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিষেবাগুলো গ্রহণের জন্য অনলাইনে আবেদন ও অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৯০.৪	৪.২	৫.০	০.৪	১০০.০
শহর	৯২.৪	৩.৯	৩.১	০.৫	১০০.০
মোট	৯১.১	৪.১	৪.৪	০.৫	১০০.০

চিত্র ১৯: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিষেবাগুলো গ্রহণের জন্য অনলাইনে আবেদন ও অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকা প্রয়োজন (উত্তরদাতাদের %)

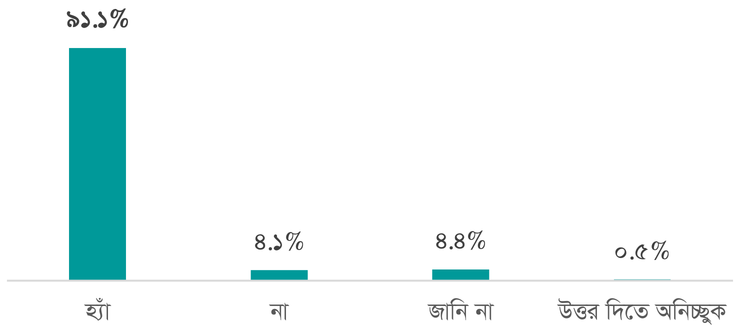

সেবা গ্রহণ করার পর সন্তুষ্টি অনলাইনে প্রকাশ: প্রায় সকল উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে প্রদান করা পরিষেবাগুলো অনলাইনে সেবা গ্রহণ করার পর সন্তুষ্টি/অসন্তুষ্টি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা উচিত (৮৮ শতাংশ)। এতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার মান সম্পর্কে সাধারণ জনগণ জানতে পারবেন এবং কর্তৃপক্ষ সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

সারণি ১৮.২০: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করার পর সন্তুষ্টি/অসন্তুষ্টি অনলাইনে প্রকাশ সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৮৭.৩	৪.৯	৭.১	০.৭	১০০.০
শহর	৮৯.৪	৪.৯	৫.২	০.৫	১০০.০
মোট	৮৮.০	৪.৯	৬.৪	০.৬	১০০.০

চিত্র ২০: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করার পর সন্তুষ্টি/অসন্তুষ্টি অনলাইন মাধ্যমে প্রকাশ প্রয়োজন (উত্তরদাতাদের %)

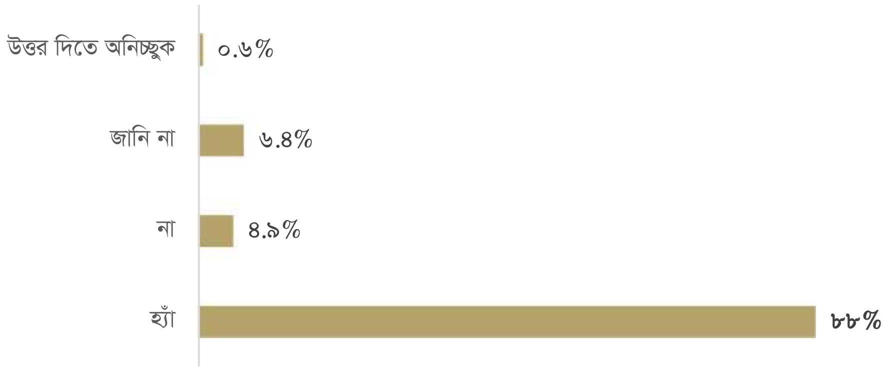

সেবা এবং পরিসংখ্যান জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ: প্রায় সকল উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা এবং পরিসংখ্যান জনগণের জন্য উন্মুক্ত এবং অনলাইন মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া উচিত (৮৮.১ শতাংশ)। এতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন ও তার ভৌগোলিক এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান সম্পর্কে সাধারণ জনগণ জানতে পারবেন। এতে ঐ এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের মানদণ্ড তৈরি সহজ হবে।

সারণি ১৮.২১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা এবং পরিসংখ্যান জনগণের জন্য উন্মুক্ত এবং অনলাইন মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

	সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকা উচিত	আংশিক উন্মুক্ত থাকা উচিত	উন্মুক্ত থাকা উচিত নয়	মোট
পল্লী	৮৮.০	৯.৭	২.৩	১০০.০
শহর	৮৮.২	৯.৮	২.০	১০০.০
মোট	৮৮.১	৯.৭	২.২	১০০.০

চিত্র ২১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা এবং পরিসংখ্যান জনগণের জন্য উন্মুক্ত এবং অনলাইন প্রকাশ প্রয়োজন (উত্তরদাতাদের %)

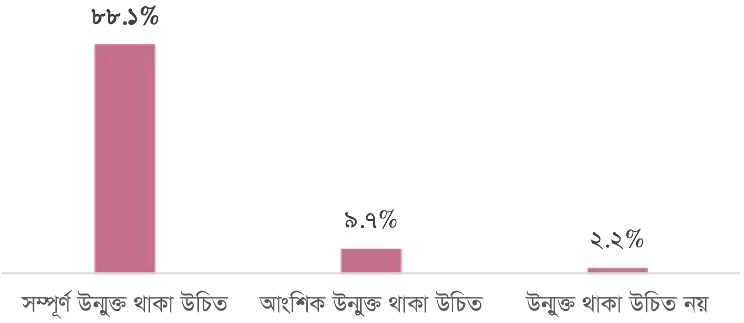

এছাড়া, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পদ্ধতি ও পরিষদের গঠন নিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা, ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সিএসও, এনজিও, স্থানীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে প্রায় ৩০টি সরাসরি আলোচনা এবং ই-মেইল, বর্তমানে স্থানীয় সরকারে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্পন্ন হচ্ছে, যেখানে চেয়ারম্যান ও মেয়র সরাসরি এলাকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হচ্ছেন। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতিতে। সুতরাং স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে মতবিনিময় সভার অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে সংসদীয় পদ্ধতিতে স্থানীয় নির্বাচন ও পরিষদ পরিচালনার পরিষদের গঠনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক মতামত এসেছে। কিন্তু জরিপ পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটি নিয়ে বিভ্রান্তি ও জটিলতা তৈরি হওয়ার কারণে জরিপের ফলাফলে এ বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের আগে নাকি পরে হবে সে বিষয়ে নির্বাচন সংস্কার কমিশনের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী পরিচালিত জরিপে জনগণের পরিষ্কার মতামত এসেছে। তাই এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে তথ্য পুনরায় তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজনীয় মনে করেনি। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি এ তিন জেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রায় ৮৬ শতাংশ উত্তরদাতা জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দান করেন।

সারণি ১৮.২২: মূল নির্দেশকগুলো সহগ

Indicators	Coefficients (%)	Linearized Std. Errors	[95% conf. interval	
কখনো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন				
গ্রাম	৯০.৭	১.৬৭	৮৭.৩	৯৪.০
শহর	৮৯.৫	১.৬০	৮৬.৩	৯২.৭
দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সমর্থন করেন না				
গ্রাম	৫৩.৬	৪.১৯	৪৫.২	৬১.৯
শহর	৫০.৫	৬.৬৫	৩৭.২	৬৩.৭
নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী কমিশন গঠন প্রয়োজন				
গ্রাম	৮৯.৭	২.১৩	৮৫.৪	৯৩.৯
শহর	৯১.৭	১.৬৯	৮৮.৪	৯৫.১
সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কি এক ও অভিন্ন আইন প্রণয়ন করা উচিত				
গ্রাম	৮৭.২	২.১৬	৮২.৯	৯১.৪
শহর	৮৯.০	২.৫৭	৮৩.৮	৯৪.১
সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সমন্বিত সার্ভিস কাঠামো (স্থানীয় সরকার সার্ভিস) গঠন প্রয়োজন				
গ্রাম	৮১.৯	৩.২৯	৭৫.৪	৮৮.৫
শহর	৮৬.২	৩.০৬	৮০.২	৯২.৩
উপজেলা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনাবিদের কার্যালয় থাকা প্রয়োজন				
গ্রাম	৭৯.৫	৪.৪৬	৭০.৬	৮৮.৩
শহর	৮৪.৫	৪.৩৫	৭৫.৯	৯৩.১
স্থানীয় সরকারের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত				
গ্রাম	৫৯.৭	৫.১৯	৪৯.৪	৭০.০
শহর	৬৪.৭	৪.৮১	৫৫.১	৭৪.২
স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের সময়সূচি পূর্ণকালীন হওয়া উচিত				
গ্রাম	৬৭.১	৫.৪৮	৫৬.২	৭৮.০
শহর	৫৪.২	৫.৭৭	৪২.৮	৬৫.৭
স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আর্থিক সুবিধা পূর্ণকালীন হওয়া উচিত				
গ্রাম	৬৯.১	৪.৮২	৫৯.৬	৭৮.৭
শহর	৭১.৪	৫.৮৭	৫৯.৮	৮৩.১
উপজেলা পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত পুনরায় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন				
গ্রাম	৯১.৫	১.৯৫	৮৭.৬	৯৫.৩
শহর	৯৩.৪	১.৬৬	৯০.১	৯৬.৭
গ্রামীণ বিরোধ নিষ্পত্তিতে বর্তমান ‘গ্রাম আদালত’ ব্যবস্থা আংশিক কার্যকর				
গ্রাম	৪২.০	৪.৫৩	৩৩.০	৫১.০
শহর	৩১.৫	৫.০২	২১.৫	৪১.৫
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিষেবাগুলোর অনলাইনে আবেদনের সুযোগ রাখা, অনলাইনে আবেদনের অবস্থা পর্যালোচনা এবং অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকা উচিত				
গ্রাম	৯৪.০	১.২১	৯১.৬	৯৬.৪
শহর	৯৬.৩	১.১৭	৯৩.৯	৯৮.৬
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ করার পর মতামত/ফলাফল অনলাইন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত				
গ্রাম	৯০.২	২.০৭	৮৬.১	৯৪.৩
শহর	৯৪.৪	১.৮৭	৯০.৭	৯৮.১
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় সকল সেবা সংক্রান্ত তথ্য এবং পরিসংখ্যান জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন				
গ্রাম	৮৬.৬	৩.৫৩	৭৯.৬	৯৩.৬
শহর	৭৭.৭	৫.২১	৬৭.৩	৮৮.০
রাজনৈতিক বিবেচনায় ঘোষিত দুর্বল পৌরসভাগুলোকে যাচাই-বাছাই করে বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন				
গ্রাম	৭৭.৫	৩.৯০	৬৯.৭	৮৫.২
শহর	৮৬.৮	৩.০৬	৮০.৭	৯২.৯
আগামী দিনে পার্বত্য জেলা পরিষদে নির্বাচন চান				
গ্রাম	৮৪.২	৪.৪৮	৭৫.৩	৯৩.১
শহর	৯০.৫	৩.৭৪	৮৩.১	৯৮.০

Indicators	Coefficients (%)	Linearized Std. Errors	[95% conf. interval	
পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকারের সংস্থা প্রভৃতি একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানান্তর হোক এটি চান				
গ্রাম	৮৬.২	৩.৬৩	৭৯.০	৯৩.৫
শহর	৮৩.১	৪.৫৭	৭৪.০	৯২.২
খানার মালিকানাধীন/পরিচালনাধীন কোন জমি-জমা/বসতবাড়ি/টিলা/পাহাড় ইত্যাদি আছে				
গ্রাম	৯৪.৫	২.০৮	৯০.৩	৯৮.৬
শহর	৮৬.২	৪.৩৫	৭৭.৫	৯৪.৮
খানার সদস্যগণ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচির আওতায় কোন সুযোগ-সুবিধা পান				
গ্রাম	৩০.৮	৩.২১	২৪.৫	৩৭.২
শহর	২২.১	৩.৬৪	১৪.৮	২৯.৩

উপসংহার

দীর্ঘ ১৮টি অধ্যায়ে সমাপ্ত একটি প্রতিবেদন, যার মধ্যে আবার ৪টি নতুন আইনের খসড়াও সংযোজিত হয়েছে, সে রকম একটি প্রতিবেদনের উপসংহার লেখা বেশ জটিল ও কষ্টকর। প্রতিবেদন লেখা হলো। যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে পেশ করা হবে। তার পর সুনির্বাচিত কিছু অংশ বা সুপারিশ দেশের সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা হবে। শেষে আসবে ঐক্যমত্যের প্রশ্ন এবং সর্বশেষে বাস্তবায়নের উদ্যোগ কবে কীভাবে নেয়া হবে সেসব প্রশ্ন আমাদের অজানা।

প্রতিবেদন সমাপ্ত হবার আগে থেকে প্রতিবেদনের বিভিন্ন প্রতিপাদ্য নিয়ে গণমাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। ঘুরে ফিরে একটি স্থানে সকল আলোচনা স্তিত হয়। স্থানীয় সরকার নির্বাচন কবে এবং কীভাবে হচ্ছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের চেয়ে নির্বাচনের গুরুত্বই যেন অনেক বেশি। এটি এদেশের গণতন্ত্রের এক ধরনের ভবিতব্য। নির্বাচনে কারা জয়ী হয়। নির্বাচনের পরে তারা কী-ডেলিভারী দেন। সে সব কোন প্রশ্নের উদ্রেক করে না।

বর্তমান স্থানীয় সরকার কাঠামো পাঁচটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পনেরোটি পদে নির্বাচন হয়। প্রতিটি পদে প্রতিজন ভোটার ভোট দেন। শেষ পর্যন্ত ভোটের সকল ফলাফল একটি করে মোট পাঁচ পদে যথা তিন জন চেয়ারম্যান ও দুই জন মেয়রে কেন্দ্রিভূত হয়। নির্বাচনে অর্থ, পেশীশক্তি, সন্ত্রাস, দলবাজি, অস্থিরতা এসব প্রসঙ্গ নাইই বললাম।

একটি সুষ্ঠু ও কার্যশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনে নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু সে জন্য নির্বাচনের প্রার্থী ও ভোটার সবার ন্যূনতম সততার একটি মাপকাঠি প্রয়োজন। সম্পূর্ণ সততা বিবর্জিত, অসৎ পথ ও পন্থা অবলম্বন করে যে ভোটার ভোট চর্চা করেন এবং যে প্রার্থী নির্বাচিত হন তাদের কাছ থেকে আর যাই আশা করুন, অন্তত: গণতন্ত্র ও একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা আশা করা যায় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অসততা পাশাপাশি চলে না। গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য সমাজে ন্যূনতম সততা ও আইনের শাসন প্রয়োজন।

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সকল সুপারিশমালা একটি সততা ও ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মানের অঙ্গীকারের দলিল। প্রতিবেদনের প্রথম অংশে স্থানীয় সরকারের ইতিহাস, সংগঠন কাঠামো আইন এবং পরবর্তীতে নারীর অংশগ্রহণ, অর্থায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার, জনবল সমস্যা, স্থানীয় সরকার কমিশন এবং দ্বিতীয়াংশের আলোচনায় স্থানীয় সরকার সহায়ক সরকারি প্রশাসন তথা মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর-অধিদপ্তরসমূহের পুর্নগঠন এবং একটি জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার আইনের সুপারিশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের সুপারিশসমূহ দেশে স্থানীয় সংগঠন, স্থানীয় সম্পদ ও স্থানীয় উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চার করতে পারে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১১টি কমিশনের অন্য পাঁচটি কমিশন ও তাদের সুপারিশমালায় স্থানীয় সরকারের নানা বিষয়ে সুপারিশ করেছেন, যার সাথে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সম্পূর্ণ ঐক্যমত্য রয়েছে।

এ কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রশাসনের সমান্তরাল একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরঞ্চ ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলায় সমন্বিত প্রশাসনিক কাঠামোর অঙ্গীভূত একক কাঠামো হিসেবে দেখতে চায়। সে একক কাঠামোগত পরিবর্তন এ সংস্কারের মৌলিক অবদান হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে। তাতে তৃণমূল থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক একটি স্মার্ট প্রশাসন গড়ে উঠতে পারে। এ প্রশাসন হবে লক্ষ্য অভিমুখী, ব্যয় সাশ্রয়ী, অপচয়রোধী সত্যিকারের জনসম্পৃক্ত একটি প্রশাসন ব্যবস্থা। বিকেন্দ্রীকরণ হবে এ প্রশাসন কাঠামোর একটি সৃজনশীল বিকাশ ও সক্ষমতা সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন। এ বিকেন্দ্রীকরণ 'বিগ ভেঙ্গা' তত্ত্বে এক সাথে নয়, ধীরে ধীরে 'ট্রায়াল এন্ড এরর' পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে করা যাবে। তবে কোথাও থেমে থাকলে চলবে না। যেমন 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' কাঠামো বা একটি সংগঠন সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি শুরু করার পর নানা পর্যায়ে নিখুঁতভাবে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করে একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে হবে। তবে 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠন প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করলে অন্যান্য সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নে অর্থবহ সহায়তার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের বেশিরভাগ বিষয় স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে অন্যান্য ৪/৫টি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দ্রুত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। শুধুমাত্র চারটি ক্ষেত্রে পৃথক আইন প্রণয়নের বা বিরাজিত আইন সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। বাকি সকল পরিবর্তন আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

Administrative and Services Reorganisation Committee (ASRC) (1972) *Report under the leadership of M.A. Chowdhury*.

Adnan, S. (2004) *Migration Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*. Dhaka, p. 57.

Ahmed, S. and D'Costa, B. (2019) *Urban local governance in Bangladesh: Policy and practice*. Routledge. Available at: https://doi.org/10.4324/9780429028321

Ahmed, T. (2012) *Decentralization and the local state*. Political Economy of Local Government in Bangladesh, Dhaka: Agami Prokashoni.

Ahmed, T. (2016) *Reforms Agenda for Local Government*. Dhaka: BIGD, BRAC University and Prothoma.

Ahmed, T. (2024) 'Policy Issues on Ward Shova in Bangladesh' in Tofail Ahmed (ed.) *Essays on Politics, Governance and Development (1981–2021): Reminiscence and Remembrance*. Comilla: BARD.

Ahmed, T. and Islam, M.N. (1995) 'Decentralised District Planning in Bangladesh: An Operational Framework', *Development Review*, 7(1 & 2).

Ahmed, Tofail. (2010) *Municipal governance in South Asia: A case study of Bangladesh*. Dhaka: Pathak Samabesh.

Ahmed, Tofail. (2012) *Urban poverty and slum development in Bangladesh*. Dhaka: Academic Press and Publishers Library.

Ahmed, Tofail. (2014) *Local government and decentralization in Bangladesh: Theory and practice*. Palok Publishers.

Ahmed, Tofail. (2016) *Urban governance in Bangladesh: Challenges and opportunities*. Dhaka: University Press Limited.

Ahmed, Tofail, Rashid, Masuda,Shefali, Mashuda, *Gender Dimensions in Local Government Institutions*. July 2003.

Barfield, C.E. (1981) 'Rethinking federalism', *The Journal of Economic Perspectives*, 11, pp. 43–64. DOI: 10.1257/jep.11.4.43

Boyne, G., Powell, M. and Ashworth, R. (2001) 'Spatial Equity and Public Services: An empirical analysis of local government finance in England', *Public Management Review*, 3(1), pp. 19–34.

Boyne, G.A. (1998) *Public Choice Theory and Local Government: A Comparative Analysis of the UK and the USA*. Palgrave Macmillan.

Bhattacharya,D. Monem, M. and Rezwana S. (2013) *Finance for Local Government in Bangladesh: An Elusive Agenda.* Dhaka: Centre for Policy Dialogue.

Chowdhury, M.J.A. and Hossain, M.S. (2017) *Urban poverty in Bangladesh: Slum communities, migration and social integration*. Palgrave Macmillan. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-41114-6

Christaller, W. (1933) *Die zentralen Orte in Süddeutschland*. Jena: Gustav Fischer.

Cockburn, C. (1977) *The local state: Management of cities and people*. London: Pluto Press.

Committee for Administrative Reorganisation/Reform (1982) *Report under the leadership of Rear Admiral Mahbub Ali Khan*.

Conyers, D. (1981) 'Decentralization for Regional Development: A comparative study of Tanzania, Zambia and Papua New Guinea', *Public Administration and Development*, 1(2), pp. 107–120.

Davis, K. (1969) *World urbanization 1950–1970: Volume II: Analysis of trends, relationships, and development*. University of California Press.

Dupré, J.S. (1969) 'Intergovernmental Relations and the Metropolitan Area' in Feldman, L.D. (ed.) *Politics and Government of Urban Canada*. London: Methuen.

Durham University, Curtin University, University of Rajshahi, American International University-Bangladesh and Khulna University, *Social Innovation Through Technology Nudging: Developing A Behavioral Toolkit for Diffusing Solar Irrigation - iCARE Innovation Fund Project*, submitted to Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), Bangkok, December 2024

Finance Division. (2024) *Medium Term Budgetary Framework 2024–25 to 2026–27*. Dhaka: Government of Bangladesh.

Government of West Bengal (2004) *West Bengal Act XLI of 1973; The West Bengal Panchayat Act 1973 (As modified up to the 31st January 2004)*. Kolkata: Government of West Bengal.
Gosh, S. and Kumar, A. (2024) *Elected Women Representatives in India: Assessing the Impact and Challenges.* New Delhi: Observer Research Foundation.
Government of Bangladesh (GOB), *Constitution of the People Republic of Bangladesh*, Ministry of law, Justice and parliamentary Affairs, Dhaka.
Harris, C.D. and Ullman, E.L. (1945) 'The nature of cities', *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 242(1), pp. 7–17. Available at: https://doi.org/10.1177/ 000271624524200103
Hoyt, H. (1939) *The structure and growth of residential neighborhoods in American cities*. Federal Housing Administration.
Hye, H.A. (1985) 'Introduction' in Hye, H.A. (ed.) *Decentralization, Local Government, Institutions and Resource Mobilisation*. Comilla: BARD.
Islam, Mohammad T. (2017) *Understanding the Effectiveness of Union Parishad Standing Committee: A Perspective on Bangladesh*. London, LSE South Asia Centre.
Islam, Mohammad T. (2018*) Rural Dispute Resolution in Bangladesh: Popular Perceptions about Village Courts*? Oxford: Department of International Development.
Islam, Mohammad T. (2019) *Cooperation or interference: Bangladesh MP's role in local government.* London: LSE South Asia Centre.
Islam, Mohammad T. (2019*) Rural dispute resolution in Bangladesh: how do village courts safeguard justice*? London: Routledge Contemporary South Asia.
Islam, Mohammad T. (2020) *Combating COVID-19 in Rural Bangladesh: The Role of the Local Government.* Singapore, NUS Institute of South Asian Studies.
Islam, Mohammad T. (2021) *Citizen's Participation in Grassroots Governance through Local Government Bodies: Bangladesh Perspective.* Cambridge: Faculty of History.
Islam, Mohammad T. (2024) *Cities in Bangladesh Must Refocus to Combat Climate Change.* Harvard: Weatherhead Center for International Affairs.
Islam, N. (2020) *Urbanization in Bangladesh: Challenges and opportunities*. University Press Limited.
Jabbar, A. (2024) 'Delays in Local Government Development Projects in Bangladesh: Causes and Impacts', *Bangladesh Journal of Administration Management*, Volume 37 (1).
Kabir, M. (2015) *Mapping of Fiscal Flow and Local Government Financing in Bangladesh*. Dhaka: Government of Bangladesh and UNDP.
Kerala Institute of Local Administration (1994) *Kerala Panchayat Raj Act 1994*. CD-ROM. Mulagunnathu Kavu, Thrissur-680581: Kerala Institute of Local Administration.
Khan, M.M. (1998) *Administrative Reforms in Bangladesh*. Dhaka: UPL.
Khan, M.M. (2016) *Urban local government system in Bangladesh: An evaluation*. Asiatic Society of Bangladesh.
Ladner, A. (2024) 'Switzerland', in Steytler, N. (ed.) *The Forum of Federations Handbook on Local Government in Federal Systems*. Palgrave McMillan/Springer Nature Switzerland, pp. 471–499. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41283-7
Laski, H.J. (1931) *The Grammar of Politics*. London: George Allen & Unwin.
Mathew, G. (1994) *Panchayati Raj from legislation to movement*. New Delhi: Concept Publishing House.
Mill, J.S. (1861) *Representative Government*. London: Everyman.
Oates, W.E. (1977) *The Political Economy of Fiscal Federalism*. Mass: Lexington Books.
O'Connor, J. (1973) *The Fiscal Crisis of the State*. New York: St. Martin's Press.
Rahman, A., Kabir, M. and Razzaque, M. (2007) 'Bangladesh: Civic Participation in Sub-National Budgeting', in Shah, A. (ed.) *Participatory Budgeting*, Vol III. Washington, DC: World Bank, pp. 1–29.
Rondinelli, D. and Cheema, C.G. (1983) *Decentralization and Development, Policy Implementation in Development Countries*. London: SAGE.
Roy, R.D., Chakma, P. and Lira, S. (2010) *Compendium on National and International Laws & Indigenous Peoples in Bangladesh*, pp. 281–325.

Sharma, M., Lee, J. and Streeter, W. (2023) 'Mobilizing Resources through Municipal Bonds: Experiences from Developed and Developing Countries', *ADB Sustainable Development Working Paper No 88*. Manila: Asian Development Bank.
Siddiqui, K. (ed.) (2018) *Megacity governance in South Asia: A comparative study of Dhaka, Kolkata and Karachi*. A H Development Publishing House.
Smit, B.C. (1985) *Denationalisation: The Territorial Dimension of the State*. London: George Elen and Unwin.
Stiglitz, J.E. (1977) 'The Theory of Local Public Goods', in Feldstein, M.S. and Inman, R.P. (eds.) *The Economics of Public Services*. Palgrave Macmillan, pp. 274–333.
Tinker, H. (1968) *India and Pakistan; a political analysis*. New York: F. A. Praeger.
Tocqueville, A.D. (1835) *Democracy in America*. New York: Vintage Books.
Uphoff, N. (1985) 'Local Institutions and Decentralization for Development' in Hye, H.A. (ed.) *Decentralization, Local Government Institutions, and Resource Mobilisation*. Comilla: BARD.
UN Women (2021) *Women's Representation in Local Government: A Global Analysis*. New York: UN Women.
UNDP and EU (2024) *Capacity Development of Local Government*. Dhaka: UNDP Bangladesh.
UNICEF (2011), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Dhaka: UNICEF.
Walker, B. (1985) *Welfare Economics and Urban Problems*. London: Hutchinson.
Wilson, C.H. (1948) *Essays on Local Government*. Oxford: Basil Blackwell.
Wirth, L. (1938) 'Urbanism as a way of life', *American Journal of Sociology*, 44(1), pp. 1–24. Available at: https://doi.org/10.1086/217913
Zibol, Abdur R. (2019) *Accountability of Judicial Administration in Bangladesh*. Switzerland: Springer Nature Global Encyclopedia of Public Administration.
Zibol, Abdur R. (2021) *Delays in Litigation of Judicial Administration in Bangladesh*. Switzerland: Springer Nature Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance.
আহমেদ, তোফায়েল (২০২২) বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় শাসন ও পল্লী উন্নয়নঃ 'তিন দশকের নীতিচিন্তা' (১৯৯০-২০২২), কুমিল্লা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
আহমেদ, তোফায়েল (২০২৩) বাংলাদেশে সমবায়ের নতুন সম্ভাবনা, ঢাকা: সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড
আহমেদ, তোফায়েল (২০২৩) সংস্কার সংলাপ: সূচনা সূত্র: রাষ্ট্র, নির্বাচন, শাসন-প্রশাসন ও সংবিধান, ঢাকা: গ্রন্থিক প্রকাশন
তালুকদার, ম. স. র. (২০২৫) সালিশ বিচারের ইতিবৃত্ত. ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ।
দৈনিক যুগান্তর (২০২১) '২৯ আগস্ট ২০২১'. Available at: https://www.jugantor.com/index.php/tp-bangla-face/458937
পার্বত্য নিউজ (২০২২) *অনলাইন পত্রিকা: পার্বত্য নিউজ, বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০২২.*
প্রথম আলো (২০২২) 'ঢাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: সমস্যা ও সমাধানের পথ'. Available at: https:// www.prothomalo.com
প্রথম আলো (২০২২) ২৭ জুলাই ২০২২.
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম (২০১০) বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা: দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড. ঢাকা: উৎস প্রকাশন.
বিবিএস (২০২২) জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২, ন্যাশনাল রিপোর্ট (ভলিউম-১), পৃষ্ঠা ৩৬৫-৩৭৪. ঢাকা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
রহমান, মোঃ মকসুদুর (২০১৩) বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন. ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা
স্থানীয় সরকার কমিশন (১৯৯৭) প্রতিবেদন. অ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী, এমপি-সভাপতি। ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন (১৯৯২) প্রতিবেদন. জুলাই। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, তথ্যমন্ত্রী-চেয়ারম্যান। ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি প্রতিবেদন (১ম খন্ড, ২য় খন্ড ও ৪র্থ খন্ড) ও সকল অধ্যাদেশ-২০০৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
সিডও এবং বাংলাদেশ,সিডও কমিটির সমাপনী অভিমত এবং সুপারিশ, ২০১১, সিটিজেনস ইনিশিয়েটিভস অন সিডও, বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১১।
শামীমা সুলতানা বনাম বাংলাদেশ মামলার রায় (রীট নং-৩৩০৪/২০০৩), মামলা নং-৫৭, ডিএলআর (২০০৫)।
হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান, নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬।
খাতুন, মাশহুদা, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারে নারীর পদমর্যাদা ও অবস্হান: সংস্কার প্রস্তাবনা-২০০৭, ঢাকা, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র।
খাতুন, মাশহুদা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সরাসরি নির্বাচনের ভুমিকা-২০০৮, ঢাকা, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র।
সমতার পথে অগ্রগতি: জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন-২০২৪-২০২৫; অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সুপারিশ বাস্তবায়নে অনুসরণীয় পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

ক্রমিক নং	বিষয়	টাস্কফোর্স গঠন সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করণ	সময়সীমা
১.	স্থানীয় সরকারের সমজাতীয় সংগঠন কাঠামো ও একক আইন কাঠামো এবং এতদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় যা প্রতিবেদনের অধ্যায়- ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ও ৮ এ বিস্তারিত বিধৃত। সে অধ্যায়গুলো অধ্যয়নপূর্বক সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও আইন বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত একটি টাস্কফোর্স সুপারিশসমূহ তালিকাবদ্ধ করে তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সুপারিশ করে তা ঐকমত্য কমিশনে পেশ করবেন।	১। জুন ৩০, ২০২৫ এর মধ্যে কাজ শেষ করবেন।
		২। ঐকমত্য কমিশন এ সুপারিশগুলো নিয়ে স্থানীয় সরকার কমিশনের সাথে চূড়ান্ত করবেন।	২। জুলাই ১-১৫, ২০২৫
		৩। রাজনৈতিক দল বা নাগরিক সমাজের সাথে সংলাপ।	৩। জুলাই ২৫-৩০, ২০২৫
		৪। সরকার কর্তৃক অধ্যাদেশ জারি বা সার্কুলারের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।	৪। সেপ্টেম্বর ২০২৫
২.	স্থানীয় সরকার নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার ও নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ক আলোচনা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ ও নির্বাচন কমিশেনের প্রতিনিধি নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করবেন। অধ্যায় ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯ এর আলোকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্ভাব্য করনীয় নির্ধারণ করে তা ঐকমত্য কমিশনে পাঠাবেন।	জুলাই ৩০, ২০২৫
৩.	'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠন ও 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' প্রবর্তন বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় ও দিক পর্যালোচনা করে করনীয় প্রস্তাব প্রণয়ন। অধ্যয়নের অধ্যায়সমূহ যথাক্রমে- দুই, বারো ও তেরো।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ ও জনপ্রশাসন থেকে সদস্য গ্রহণপূর্বক একটি টাস্কফোর্স গঠন।	১। জুন ৩০, ২০২৫
		২। ঐকমত্য কমিশনে সুপারিশ পেশ	২। জুলাই ১-৫, ২০২৫
		৩। একমত্য কমিশন স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সাথে মতবিনিময়।	৩। জুলাই ১০-১৫, ২০২৫
		৪। সরকারের নিকট বাস্তবায়নের সুপারিশসহ সকল ডকুমেন্ট পেশ।	৪। আগস্ট ১৫, ২০২৫
৪.	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অর্থায়ন- অধ্যায়-আট, নয় ও ষোলো অধ্যয়ন করবেন।	১। অর্থ বিভাগ ও স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন।	১। জুলাই-২০২৫
		২। টাস্কফোর্স কর্তৃক ঐকমত্য কমিশনে প্রতিবেদন পেশ।	২। আগস্ট-২০২৫
		৩। ঐকমত্য কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনা।	৩। জুলাই-আগস্ট ২০২৫
		৪। সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রেরণ।	৪। আগস্ট-২০২৫

ক্রমিক নং	বিষয়	টাস্কফোর্স গঠন সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করণ	সময়সীমা
৫.	স্থানীয় সরকার বিভাগের পুনর্গঠন, সরকারি দপ্তর/অধিদপ্তর একত্রিকরণ, নতুন অধিদপ্তর সৃষ্টি, এনজিও ব্যুরো, স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানান্তর ইত্যাদি। অধ্যায়- চৌদ্দ ও পনেরো।	১। জনপ্রশাসন বিভাগের সভাপতিত্বে টাস্কফোর্স হতে পারে। সদস্য থাকবেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দুইটি বিভাগের দুইজন অতিরিক্ত সচিব ও অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি।	১। মে ২০-২৫(কমিটি গঠন)
		২। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল।	২। জুলাই ১৫, ২২৫
		৩। ঐকমত্য কমিশন ও স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের মতবিনিময়।	৩। জুলাই ২০-৩০, ২০২৫
		৪। রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রুপের সাথে আলোচনা।	৪। জুলাই ৩০-আগস্ট ১৫, ২০২৫
		৫। সরকারের কাছে বাস্তবায়নের সুপারিশ	৫। ৩০ আগস্ট, ২০২৫
৬.	জাতীয় ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার আইন ২০২৫। অধ্যায়- ষোলো ও চৌদ্দ	১। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সভাপতিত্বে একটি টাস্কফোর্স। সদস্য থাকতে পারেন ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, সবমায় অধিদপ্তর ও বিআরডিপি প্রভৃতি।	১। মে ১৫, ২০২৫ (কমিটি গঠন)
		২। ঐকমত্য কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল	২। জুলাই ১৫, ২০২৫
		৩। ঐকমত্য কমিশন স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনসহ অন্যান্য স্টেক-হোল্ডারদের সাথে আলোচনা।	৩। আগস্ট, ২০২৫
		৪। সরকারের কাছে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ পেশ	৪। আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০২৫
৭.	জাতীয় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি প্রণয়ন ও অন্যান্য সুপারিশ। অধ্যায়- সতেরো।	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাপতিত্বে একটি কমিটি হতে পারে। যেখানে জনপ্রশাসন, অর্থ, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি থাকতে পারে।	১। কমিটি গঠন-জুন ১৫, ২০২৫
		২। প্রতিবেদন দাখিল ঐকমত্য কমিশন	২। আগস্ট ১৫, ২০২৫
		৩। পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ।	৩। সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫